জন্মান্তর

নিগূঢ়ানন্দ

জন্মান্তর

নিগূঢ়ানন্দ

করুণা প্রকাশনী। কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ—১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
ধীরেন শাসমল

মুদ্রাকর
প্রিন্টেক্স
৯এ, রামধন মিত্র লেন
কলিকাতা ৪

৺জননী স্নেহলতা সরকারের পুণ্যস্মৃতি স্মরণে

এই লেখকের ঃ

মহাতীর্থ একান্ন পীঠের সন্ধানে (৩য় সং)
মৃত্যু ও পরলোক (২য় সং)
দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা (২য় সং) (দুই খণ্ড)
সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড)
পৃথিবীর অধ্যাত্ম সাধনা ও ভারত (দুইখণ্ড)
ঈশ্বর মরে গেল (নতুন সং)
সাধু সন্তের দেশে
আত্মার রহস্য সন্ধান (যন্ত্রস্থ)
একান্ন পীঠের সাধক।
গীতা চণ্ডী ও ভারতের দেবদেবী।
সহস্রারের পথে (২য় সং যন্ত্রস্থ)
দক্ষিণ দরওয়াজার নগরী (৩য় সং যন্ত্রস্থ)

প্রকাশকের বক্তব্য

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, স্থূলদেহের মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহ থাকে। আশা আকাঙ্ক্ষার তাড়নার ফলে তাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়। একেই বলে জন্মান্তর। কিন্তু এ জীবনেও প্রায় প্রত্যেকেরই জন্মান্তর হয়। ছোট বেলার বহু ঘটনা এজীবনেই স্মৃতির অতল তলে তলিয়ে থাকে। কখনও লজ অব্ অ্যাসোসিয়েশনে আবার তা জেগে উঠতে পারে। তখন বর্তমানের সঙ্গে অতীতকে তুলনা করে সে বুঝতে পারে জীবন কী এক বিস্ময়কর প্রবাহ। কতকাল ধরে যে এই জীবনের প্রবাহ সে টেনে চলেছে তা সে নিজেও জানে না। কখনও কখনও অদ্ভুত সব স্বপ্নের মধ্য দিয়ে য়ুঙের collective unconscious-এর মত তা তাকে নাড়িয়ে দেয়।

বর্তমান কাহিনী তেমনই এক কাহিনী। পঁচিশ বছর আগে লেখক একবার তীর্থস্থানে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সে নিয়ে একটা গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। পঁচিশ বছর পরে আবার যখন সেই স্থানেই তিনি গিয়ে উপস্থিত হন, তখন তাঁর বিস্মৃত স্মৃতি জেগে উঠে। ইতিমধ্যে হিমালয়ের এক মহাপুরুষের কল্যাণে তাঁর মধ্যে দিব্যচেতনা জেগে উঠেছে। পঁচিশ বছর আগের পার্থিব চেতনার সঙ্গে বর্তমান আধ্যাত্মচেতনার তুলনা করে নিজেই তিনি বিস্ময় বোধ করেন। তা ছাড়া ইতিমধ্যে যোগবলে তিনি তাঁর গত ছয়টি জীবনের চিত্র দেখে ফেলেছেন। এবং কি করে এই পূর্ব জন্মের চিত্র দেখা সম্ভব অধুনা কোয়ান্টাম ফিজিক্সের কল্যাণে তাও জেনে নিয়েছেন। সেই গত পঁচিশ বছর আগে লিখিত কাহিনীর পাশাপাশি বর্তমান অভিজ্ঞতার তুলনা করে জন্মান্তরের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে বর্তমান গ্রন্থ তারই চমকপ্রদ সাক্ষ্য। এতে এমন কিছু অভিনব চিন্তা পাঠক পাবেন যা তাঁদের চিন্তার সূত্রকেই পাল্টে দেবে, বিশেষ করে হিন্দুদের পুরাণ-কাহিনীর অন্তরালে লুক্কায়িত চিরন্তন সত্যের গল্পকথা। পাঠক বর্তমান গ্রন্থে সাধক লেখক নিগূঢ়ানন্দের আর এক বিচিত্র পরিচয় পাবেন। গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন মাত্রার সংযোজনা হয়ে থাকবে আশা করি।

এক

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগের কথা। অনন্ত বিশ্বজগতের সময় মানুষের আবিষ্কৃত সংখ্যার পৃষ্ঠে অসংখ্য শূন্য বসিয়েও বোধহয় স্থির করা সম্ভব নয়। সেই হিসাবাঙ্কের অতীত সময়ে মধ্যে ২৫টি বছর সমুদ্রের বেলাভূমিতে এক টুকরো বালুকণার মত মাত্র। কিংবা আমাদেরই ছায়াপথের অগণিত গ্রহনক্ষত্রের মধ্যে একটি নক্ষত্রের মত। সময়ের হিসেবে পঁচিশ বছর কোন বছরই নয়। কিন্তু মানবজীবনের সময়সীমার পরিপ্রেক্ষিতে পঁচিশ বছর তার জীবনের চারটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রায় একটি অধ্যায়ের কালকে সম্পূর্ণ ধারণ করে আছে। সেই হিসেবে পচিশ বছর তো একটি মানুষের জীবনে একটি যুগপ্রমাণ। আরো যদি সাধারণ বিচার করি তাহলে প্রায় দুই যুগ, কারণ সাধারণের বিচারে বার বছরে এক যুগ হয়। এই যুগ একটি মানব-জীবনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এক নতুন পরিবর্তন এখন। শিল্পবিপ্লবের ফলে accelerative thrust-এর যুগে দুটো দিনের ব্যবধান যখন আমাদের সম্পূর্ণ নতুন এক যুগে টেনে দিতে পারে তখন পঁচিশ বছর তো অনেক অনেক সময়। তবুও ভারতীয়দের রক্ষণশীল সমাজে সময় যখন সহজে পাল্টাতে চায় না তখন পঁচিশ বছর সময় একটি মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দেবে এমন মনে করা কিছুটা কষ্টকর। বিশেষ করে পঞ্চাশোর্ধ্বে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন।

ভারতীয়দের বিচারে পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রেতলোকের কাল। অর্থাৎ জীবনের সূর্য তখন আকাশের সূর্যের মতই পশ্চিম গগনে ঢলে পড়ে। তবুও জীবনের মূল শিকড় থেকে তখনও যে আমরা বিচ্ছিন্ন হতে পারি তাতো নয়। অনেক কিছুই হয়তো আমরা ভুলে যাই। কিন্তু আমাদের মনের কুঠুরি থেকে যে তা হারিয়ে যায়, তা নয়। সংস্কার হয়ে, বেগ হয়ে, অবচেতন মনের কোথাও হয়তো তা চাপা পড়ে থাকে। জন্মান্তরে আবার তারই বিকাশ ঘটে। . সুতরাং পঁচিশ বছর কেন পঁচিশ লক্ষ বছরেও যে মানুষ তার সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারে তা নয়। সে অর্থে মানুষের দেহের রূপান্তর ঘটে বটে কিন্তু তার সংস্কারের রূপান্তর ঘটে না। আর এই সংস্কারের রূপান্তর ঘটাই মানুষের যথার্থ জন্মান্তর। অর্থাৎ এক বিশ্বাসের সীমানা ছাড়িয়ে অন্য বিশ্বাসের দুয়ারে এসে দাঁড়ানো। অধুনা বিজ্ঞান মানুষের একটি বিশ্বাসের তার ছিঁড়ে দিয়ে তাকে যেন মুহুর্মুহু অন্য বিশ্বাসের তারে যুক্ত করছে। মানুষের জীবন যেন লাফিয়ে লাফিয়ে এগুচ্ছে quantum leap-এর মত। গতকাল যা সত্য আজ তা মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে। গতকাল যে বিশ্বাস ছিল অনড় আজ সে বিশ্বাসের চিহ্নমাত্র

আর অবশিষ্ট নেই। মাটির পাত্রে পথিপার্শ্বে রান্না করে খেয়ে পথিক যেমন তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলে যায়—তেমনিই। মাটির পাত্র ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বর্তমানকালের জীবনও যেন সেই কুযান্টাম লিপের জন্য তেমনই ছিন্নমূল। চরৈবেতি, চরৈবেতি, শুধু নিত্য নতুন বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলা এই ভাব। সেই ভয়ঙ্কর ভাবের কথাই Alvin Toffler বর্ণনা করেছেন তাঁর Future Shock গ্রন্থে। কিন্তু এতে বিপ্লব হচ্ছে বটে, তবে জন্মান্তর হচ্ছে কিনা বলা যায় না। প্রাচীন বিশ্বাসের সমস্ত সূত্র ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে, নব বিশ্বাসে দাঁড়াতে পারলে তবেই হয় জন্মান্তর। Future Shock-এর যুগেও মানুষ তার সংস্কারের বন্ধন কাটিয়ে নিত্য নতুন লাফালাফিতেও যথার্থ জন্মান্তরিত হতে পারছে কিনা সেটা মনস্তত্ত্ববিদেরাই বলতে পাবেন। তবে আমি অবাক হচ্ছি এই প্রত্যয়ে পেঁৗছে যে পঁচিশ বছরে সত্যি আমার আজ জন্মান্তব হয়েছে।

ঠিক পঁচিশ বছর। আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছি—অঘটন পটীয়সী কোন শক্তিব প্রচণ্ড তাড়নাতে ভাবনাচিন্তা করার অবকাশ পাবার আগেই যেন এক প্রবল বন্যার স্রোতে তীব্র বেগে ভাসমান হয়ে আর একদিন আমি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম। কিন্তু তখন এখানে দাঁড়িয়ে যে কথা ভেবেছিলাম—আজ সেখানে দাঁড়িয়ে সেই বিষয়ের উপর ভাবতে গিয়ে—অকস্মাৎ আমার মনে হচ্ছে যে, সেদিন আমি যা ভেবেছিলাম, সে ভাবনার সঙ্গে আজ আমার এই মুহূর্তের ভাবনার কোন মিলই নেই। যেন অতীতের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়ে আমি এখন সম্পূর্ণ নতুন প্রজন্মে দাঁড়িয়ে আ ছ। ভাবছি কাশীর বিশ্বেশ্বব মন্দিরের গর্ভগৃহে দাঁড়িয়ে শিবলিঙ্গেব দিকে তাকিয়ে।

সেদিনের সেই স্মৃতি মনের পর্দায় টেনে আনতে গিয়ে একটা শিহরণ যে পাচ্ছি না তা নয়। কিন্তু সেই শিহরণ মৃতের দেহে অকস্মাৎ প্রাণশক্তি ফিরে এসে ক্ষণিকের আলোড়ন সৃষ্টি করে চলে যাবার মতই। মনে পড়ছে, কিন্তু মনে গেঁথে নেই। অথচ সে তো একটা উপন্যাসের মত কাহিনীই। আজ আমার কাছে অবান্তর মনে হলেও সেই সরল সবুজ, সহজ স্মৃতিটাকে একটু না হয় চারণা করেই নেওয়া যাক। তাহলে দুই যুগেব ছিন্নমূল ব্যবধানের কথা জানতে পাঠকের হয়তো ভালই লাগবে। এবং নব প্রজন্মের 'আমি' এবং অতীতের রক্তমাংসে কামনা-বাসনাওয়ালা-'আমি'র চরিত্র বিশ্লেষণ কবে পাঠকও বুঝতে পারবেন জন্মান্তর সত্যিই কি। সেবার ভ্রমণ সেরে এসে একটি কাহিনী লিখেছিলুম। স্মৃতিচারণা হিসেবে আমি যখন লেখনী ধারণ করে সেই কথাটাই বলতে যাচ্ছি তখন সেই গ্রন্থ থেকেই না হোক হুবহু কাহিনীটিকে তুলে দেওয়া যাক ঃ

ওরা বেরুবে তীর্থযাত্রায়। কিন্তু তীর্থযাত্রী হবার তো আমার ইচ্ছে ছিল না। তবু ওরা যখন ধরল পথের গাইড হবার জন্যে, অস্বীকার করতে পারলুম না। কারণ কাশী থেকে আরম্ভ করে মথুরা বৃন্দাবন সবই ঘুরবে ওরা। ঐ পথেই তো দিল্লী

আগ্রা পড়বে। তাহলে এই ফাঁকে আমার বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত একদা ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী এবং আগ্রাও তো দেখে আসা যায়!

কত না জাঁকজমক, কত না হাসি, অবশেষে কত না করুণ কান্নার বেদনাময় নাটক অভিনীত হয়েছে দিল্লী-আগ্রাতে। যে ইতিহাস পড়ে কল্পনায় মনের প্রান্তে আলোড়ন জাগে, কখনো হর্ষে কখনো বিষাদে মন-প্রাণ রোমাঞ্চিত হয়, সে ইতিহাসের জীবন্ত ঘটনাকে চোখের উপর দেখতে না পেলেও সেই রঙ্গমঞ্চের প্রত্যক্ষ স্পর্শ তো লাভ করতে পারব! ইতিহাস পথ-যাত্রীর সব চেয়ে বড় পথ-যাত্রা তো সেই সব ঐতিহাসিক স্থানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া। ঐতিহাসিকের কাছে সেই তো তীর্থ। সুতরাং রাজী হয়ে গেলুম।

ওরা যাবে তিনজন—রাঙামাসী, বীরেনদা আর মিনু। মিনু বি. এ পাস করে এম. এ-তে ভর্তি হয়েছে। সাবজেক্ট বাংলা। ধর্মে কতদূর ওর আগ্রহ জানি না। হয়তো শিল্পীর দৃষ্টিতে নতুন দেশ দেখবে বলেই ওর এত আগ্রহ। তাই তীর্থযাত্রীদের সঙ্গ নিয়েছে বুঝি। রাঙামাসী আর বীরেনদার উদ্দেশ্য নির্ভেজাল তীর্থের পুণ্য অর্জন করা।

রয়োস্পর্শ হচ্ছিল। আমি যুক্ত হওয়াতে দোষটা কাটল। দেশ-বিদেশ সম্পর্কে ওদের ধারণা ততটা নেই নতুন জায়গায় নতুন মানুষের সঙ্গে চলাফেরাতেও ওরা অভ্যস্ত নয়। আমাকে পাওয়াতে ওদের সাহস বাড়ল। মিনুর আনন্দ হল এই কারণে যে নতুন জায়গাগুলোর ঐতিহাসিক পশ্চাদ্‌পট আমি ওকে ব্যাখ্যা করে দিতে পারব। কিন্তু ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাই নি। তীর্থস্থানগুলির মাহাত্ম্য অথবা ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক যে কাহিনীই তার থাক না কেন, তাও আমার জানা নেই।

সে কথা ওকে বললুম। ও বলল: তবু তো তুমি ঐতিহাসিক। ইতিহাসের ছাত্র, যতটুকু জানা যায়।

কাশী হরিদ্বার মথুরা বৃন্দাবনের ইতিহাস নিয়ে কোন বর্ণনা দিতে পারব বলে আমার ভরসা হল না। কিন্তু দিল্লী-আগ্রাতে তাকে কিছুটা তৃপ্ত করতে পারব এ সাহস আমার আছে।

বেলা তিনটেতে আমরা বেরিয়ে পড়লুম বাসা ছেড়ে। কাছেই কাটিহার স্টেশন। সেখান থেকেই এলাহাবাদগামী ট্রেনে চাপব কাশীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু আগে থাকতে আমাদের রিজার্ভেসন ছিল না। তাতে আবার পুজোর বাজার। গাড়িতে উঠতে পারব কিনা সেটাই ছিল সন্দেহ। বাসার সকলে বলল: এটা বাংলাদেশ নয়। বেড়াবার হিড়িক এখানে তত নেই। এখানে লোকেরা ঘোরে কাজের ধান্দায়, উপার্জনের জন্যে। আসামগামী ট্রেনে এখানে ভিড় হবে, কিন্তু আপার ইন্ডিয়ার দিকে তেমন হবে না। স্টেশনে এসে জিজ্ঞেস করতে সেরকম উত্তরই পাওয়া গেল।

স্টেশন মাস্টার বললেন ঃ থ্রি টায়ার বগিতে উঠে পড়বেন। T T C এলে রিজার্ভ করিয়ে নেবেন, কোন অসুবিধে হবে না। সুতরাং টিকিট কেটে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

ট্রেন এসে ইন্ করল বেলা চারটের। খুঁজে পেতে দেখা গেল ওদের কথাই ঠিক। ভিড় খুব বেশী নেই। থ্রিটায়ার স্লিপিং বার্থ একদম খালি। আমরা ওতেই উঠে পড়লুম। T. T C-র সঙ্গে পূর্বাহ্নেই যোগাযোগ হয়েছিল। গাড়ি ছাড়লে তিনি আমাদের পাশে এসে বসলেন। ভদ্রলোক বিহারী। ভদ্রতাটা তিনি একটু বেশীই করলেন। বললেন ঃ স্লিপিং রিজার্ভেসন করতে গেলে ডিউ ফেয়ার অনেক পড়বে। খামোকা অত টাকা ব্যয় করবেন কেন। তার চেয়ে এই গরীবকে কিছু দিন, দেখবেন নিরাপদে কাশী পেঁাছে দেব আপনাদের। আপনারাও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেতে পারবেন।

বীরেনদা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন ঃ ই তো বহুত আচ্ছি বাত্ হ্যায়। কিন্তু আমি বীরেনদার দিকে এমন করে তাকালুম যে বীরেনদা আমার সে দৃষ্টির অর্থ তৎক্ষণাৎ ধরে নিলেন। সরকারি তহশীলদার তিনি। বহু মানুষের সঙ্গে তার নিত্য যোগাযোগ। মানুষের মুখচোখ দেখেই তার ভেতরের অবস্থাটা আঁচ করে নিতে পারেন। আমায় ইঙ্গিতে বললেন ঃ তুমি চুপ কর।

আমি জানালার ফাঁকে বাইরে দৃষ্টি গলিয়ে বসে রইলুম। ওদের করণীয় কাজ সমাধা হলে T T C. গেলেন ওধারে। বীরেনদা এবার মুখ খুললেন ঃ দিনরাত হামেশাই এমন হচ্ছে। এটাকে গ্রাহ্য করলে চলে না। প্রতিবাদ আমি করলুম না এই কারণে যে, আমার খরচটা বীরেনদা বর্তমানে চালিয়ে দিচ্ছেন। কলকাতায় ফিরে গিয়ে টাকাটা শোধ করব এই কথা। কাটিহার এসেছিলুম দুধ আর মাছ খেতে। হঠাৎ তীর্থ-যাত্রার মত অঘটন ঘটবে এটা আমি পূর্বাহ্নে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করতে পারি নি। পারলে নিশ্চয়ই প্রস্তুত হয়ে আসতুম। শুধু বললুম ঃ যা খুশি করুন। আমি তীর্থযাত্রায় যাচ্ছিনে। যাচ্ছি দিল্লী-আগ্রার টানে। পাপপুণ্য বিচার আমার হবে না।

বীরেনদা যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বললেন ঃ জয় বাবা বিশ্বেশ্বর। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ বাবা বিশ্বেশ্বর এতে কিছু মনে করবেন না। তুমি আজে-বাজে কথা বোল না।

আমি বললুম ঃ আমার তীর্থপুণ্য রাষ্ট্র এবং দেশের প্রতি কর্তব্যে। সেই খানটায় মনের মধ্যে খচ্‌খচ্ করছে। ছোটবেলায় পড়েছিলুম কিনা ঃ অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।

বীরেনদা বললেন ঃ ওই লেখাপড়া শিখেই তোমরা কিছু করতে পারলে না। মাড়োয়ারীদের দেখ ওরা কি না করছে। গাড়ি, বাড়ি, আনন্দ, সব।

মনে হল মিল, বেন্থাম, প্রভৃতি পণ্ডিতদের ইউটিলিটেরিয়ান থিওরি বীরেনদাকে

শুনিয়ে দিই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাইবেলের প্যারাবোলের কথা মনে পড়ল, 'অপ্রস্তুত ভূমিতে বীজ ছড়িয়ে লাভ নেই।'

মিনু এ যুগের মেয়ে। উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে। সজ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক মনের মধ্যে ওর ভিন্ন প্রকার একটা রুচি জন্ম নিয়েছে, যে রুচি মাড়োয়ারীদের জীবনদর্শনকে গ্রহণ করতে পারে না। তাই যদি হত, তবে বাংলাসাহিত্য নিয়ে এম এ পড়তে যেতো না ও। ও আমাকে বলল: সন্তুদা, আমিও কিন্তু তীর্থযাত্রী নই, এ কথাটা মনে রেখ!

রাঙামাসী সেকেলে লোক। লিখতেও জানেন না, পড়তেও পারেন না। শুধু জানেন সরল সাদাসিধেভাবে কি করে চলতে হয়। মাঝখানে যে কি একটা কারচুপি ঘটে গেল, তিনি সেটা বিন্দুবিসর্গ ঠাহর করতে পারেন নি। তিনি বীরেনদার দিকে তাকিয়ে বললেন: কি হয়েছে বীরু?

বীরেনদা বললেন: কিছু না মাসীমা। তুমি ওদের কথায় কান দিও না। রাঙামাসীর মনে তখন একটা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছে। মিনুর কথা কটি তাঁর কানে গিয়েছে, 'আমি কিন্তু তীর্থযাত্রী নই।' তীর্থে না গেলে আমরা কোথায় যাচ্ছি এটাই রাঙামাসীর প্রশ্ন। তিনি বীরেনদাকে সরাসরি প্রশ্ন করে বসলেন: আমরা কাশীতেই যাচ্ছি তো?

বীরেনদা অবাক হয়ে বললেন, কাশী যাচ্ছি না তো কোথায় যাচ্ছি তবে?

রাঙামাসী বললেন: না, মিনু বলছিল কিনা, তাই।

বীরেনদা বললেন: তোমাদের মেয়ে এ যুগের, তার মধ্যে আবার একটু লেখাপড়া শিখেছে। ওদের কথা তুমি বুঝবে না। তার চেয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও— দেখ নতুন নতুন গ্রাম দেশগুলো পেছনে ছুটে চলেছে।

রাঙামাসী আমাদের এই আশ্চর্য হেঁয়ালীর অর্থ বুঝতে না পেরে সত্যি সত্যি বাইরে তাকালেন।

আমি মিনুকে বললুম: মিনু এম এ-তে ফার্স্টক্লাস পাবে নিশ্চয়ই?

মিনু বলল: কে জানে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাইনথ্ পেপার বলে একটা কথা আছে, সেটা তো তুমি জানই।

আমি বললুম: সে নাইনথ্ পেপার মেয়েদের পক্ষে ম্যানেজ করাই বেশী সহজ। তুমি সেটা পারনি?

মিনু একটু লাল হয়ে উঠল। একটু চুপ করে থাকল। গম্ভীর দেখাল ওকে। তারপর বলল: নাইনথ্ পেপার যারা ম্যানেজ করে আমি সে দলের নই।. বিদ্যাটা আমাদের তীর্থ। বীরুদার মত পথের মধ্যে তার পুণ্যিটাকে নষ্ট করে দিতে রাজী নই।

আমি বললুম: পিউরিটানরাই ঠকে বেশী।

মিনু বলল: তুমি তো ইতিহাসের ছাত্র। জান তো এই পিউরিটানরাই ইংরেজদের জন্য আমেরিকাতে ঘর করেছিল?

মিনু ছাত্রী ভাল জানি। হঠাৎ তর্কে তাকে হারিয়ে দিতে পারব না। আমি চুপ করে রইলুম।

মিনু কিছুকাল আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল: হঠাৎ আমার ফার্স্টক্লাসের কথা তোমার মনে এল কেন?

আমি বললুম: ফার্স্টক্লাস পেলে কলেজে একটা চাকরি পেতে। বাংলাদেশে সবচেয়ে অনাদর তো বাংলার। ফার্স্টক্লাস না পেলে প্রাইমারী স্কুলেও কেউ ডাকতে চায় না। ইউনিভার্সিটিতে নাইনথ্ পেপার ম্যানেজ না করলেও চাকরি জীবনে টুয়েলভ্থ থেকে হানড্রেডথ পেপার ম্যানেজ করতে হয় তাকে।

মিনু একটু গম্ভীর হল। ভাবল বাংলা পড়ছে বলে, তাকে বুঝি আমি বিদ্রূপ করছি। সে সন্দেহ যাতে তার মনে বিন্দুমাত্র স্থান না পায়, সে জন্যে তাড়াতাড়ি আমি বললুম: এ সব আমার কথা নয় মিনু।

মিনু আড়-চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল: তবে কার?

আমি বললুম: মফস্বল কলেজে যখন চাকরি করতুম, তখন আমাদের সহকর্মী ছিলেন কমলাপতিবাবু। নিজেকে নিয়ে বিদ্রূপ করে নানা কথাই বলতেন তিনি। সত্যি মজার লোক ছিলেন। এসব কথা তাঁরই। বাংলাসাহিত্য নিয়ে তিনি যে আর একটা গল্প বলতেন, শুনলে তো তুমি হেসে লুটোপুটি খাবে।

মিনু বলল: কি শুনি!

মিনুর গম্ভীর ভাবটা তখনো কাটে নি। ওকে একটু লঘু করবার জন্য আমি বললুম: এক মুটে যাচ্ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে। সিনেট হলের পাশে এসে বিরাট বাড়িটা দেখে থমকে দাঁড়াল সে। অনেক লোকের জটলা। ছেলে মেয়েদের ভিড়। হাঁ করে লোকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে কিছুকাল তাকিয়ে থাকল। এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিলেন সিনেট হলের কাছে। মুটে জিজ্ঞেস করলে: হ্যাঁ মশাই, এ বাড়িটা কি?

ভদ্রলোক বললেন: বিশ্ববিদ্যালয়।

—এখানে কি হয়?

—লেখাপড়া। ছেলেমেয়েরা এম. এ. পড়ে। এখন পরীক্ষা হচ্ছে।

—তা, কি কি পড়ানো হয়?

ভদ্রলোক বললেন: বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, দর্শন, ইংরেজী, বাংলা সব কিছু।

চোখ বড় বড় করে মুটে বলল: বাংলাও পড়ানো হয়?

—হ্যাঁ।

আর বিলম্ব না করে মুটে মাথা থেকে ঝাঁকাটা নামিয়ে ভদ্রলোকের কাছে রেখে বলল: একটু দেখবেন ঝাঁকাটা? তা হলে একটা বাংলা পরীক্ষা দিয়ে আসি।

গল্প শুনে এক সঙ্গে বীরেনদা আর মিনু দু'জনেই হেসে উঠল।

আমি ভাবলুম ঃ যাক বাঁচা গেল। মিনুর মনের সন্দেহটা ঘুচল।

কিন্তু আমি থামলে মিনু আবার আমার দিকে তাকাল ঃ তুমি তখন প্রফেসারির কথা কেন বলছিলে বল তো? জান তো বি এ অনার্সে আমি ফার্স্টক্লাস পেয়েছি। এম এ তে হঠাৎ যদি দু দাঁড়ি হয়েও যায়—তবু চান্স একটা পাব বলেই আশা করি।

আমি বললুম ঃ বলছিলুম এমনি।

মিনু বলল ঃ না, তোমার মনে নিশ্চয়ই অন্য কোন কথা ছিল। বল।

আমি বললুম ঃ হঁ্যা, ছিল বৈ কি। বলছিলুম কি, প্রফেসারি পেলে ছাত্রদের কখনো হয়তো তুমি Amplify করতে দেবে—"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।"

কথা শুনে মিনু হেসে তাকাল বীরেনদার দিকে। বীরেনদার মুখটা একটু লাল হয়ে উঠল। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ বেড়াতে এসেছ, বাইরের দিকে একটু তাকাও তো দেখি। তুমি না গল্প কবিতা লেখ!

সত্যি, বীরেনদার কথাটা যেন ম্যাজিকের মত আমার উপর কাজ করল। যেমন 'বেলা যায়' কথাটা রজক-কন্যার মুখে শুনে লালাবাবুর অন্তরে অপার্থিব এক পরিবর্তন এসেছিল। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালুম।

মাসটা কার্তিক। অপরাহ্নের রৌদ্র রাঙা হয়ে এসেছে। সূর্য আকাশের গায়ে পশ্চিমে একটু না গড়াতেই এখন আলোর গায়ে কমলা রঙয়ের একটা আভা ফুটে ওঠে। সেই রঙয়ের ছায়া কেমন একটা উদাস সুরে ভরা। হেমন্তের কলমী ফুল ভরা মাঠে হেলানো দিনের আকাশ চুইয়ে যখন এই ম্লান দিন নামে—তখন মনের মধ্যে এক অন্যভাব জাগে। কিসের যেন একটা হাহাকার সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির গায়ে লুকিয়ে থাকে। তার চরিত্র উদ্ধার করা যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়। ঋতু বদলেছে। শরৎ যে কখন কিভাবে আসে ধরাই যায় না। হেমন্ত একমাত্র 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা' ছাড়া মাঠে ঘাটে ধরা পড়ে না। মাঠে মাঠে কার্তিক অঘ্রাণে ধান থাকে, আর সারা আশ্বিন ভর শ্রাবণের ঋণ শোধ করতে বর্ষা নামে। হেমন্তের শূন্য মাঠের হাহাকার কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রতীক হিসাবে কাজ করেছে। সেই প্রতীক আমিও অনুভব করি।

পূর্ববাংলার-মাঠে এ সময়ে বহুদিন আগে শূন্য ক্ষেত দেখা যেত। তখন ধান কাটা মাঠে কলমীফুল ফুটত, আর ফুটত অজস্র ঘেঁটুফুল। অঘ্রাণের প্রতি রবিবার নাটাই পুজো হত। ছোটবেলায় সেই ঘেঁটু আর কমলী সংগ্রহ করতে গিয়ে অঘ্রাণের কমলা রোদের মলিন রহস্যময় স্পর্শ অনুভব করতুম। কলকাতার আশেপাশে চব্বিশ পরগনা থেকে আরম্ভ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার মাঠে বর্তমানে হেমন্তের ছায়া নজরে পড়ে না। কিন্তু স্মৃতির মধ্যে তার অনুভব একটা স্বপ্নের আবছায়া জগতের মত আমার কাছে বেঁচে আছে।

হঠাৎ বহুদিন পরে বাইরে তাকিয়ে কমলা রোদের সেই মলিন হাসি মাঠের বুকে পড়ে আছে দেখলুম। ফেকাসে হয়ে আসা ধানের গুচ্ছে মাঠ ভরে নেই। ধান কাটা মাঠের একটা হাহাকার নিয়ে দুই দিকে বিরাট ধুধু প্রান্তর পড়ে আছে। শালিক আর বক্ চরছে। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে আর নামছে। এই সেই হেমন্তের উদাস মাঠ। আমার সেই ছোটবেলায় দেখা মাঠ। আমি যেন সমস্ত অন্তরকে প্রসারিত করে সেই মাঠের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিলুম। মন্ময় নয়, সেই মাঠের মধ্যে তন্ময় হয়ে গেলুম। হাজার বছর ধূসর অতীতের এক মোহময় ইঙ্গিতে যেন হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকতে লাগল। কতক্ষণ ও ভাবে বাইরে তাকিয়ে ছিলুম জানি না। হঠাৎ চমক্ ভাঙল বীরেনদার কথা শুনে।

ঐ মাঠের দিকে বীরেনদাও তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁর ছবি ছিল ভিন্ন। আমি যেখানে স্বপ্নের নরম রোদে ডুবে যাচ্ছিলুম—হারানো অতীতের গন্ধ পেয়ে মুগ্ধ হচ্ছিলুম, বীরেনদা সেখানে স্বর্ণকারের মত লাভালাভের কষ্টিপাথরে মাঠের বিচার করছিলেন। যে মাঠের শূন্য প্রান্তরের হাহাকার আমার ভাল লাগে, সেখানে বীরেনদার ভাল লাগে সবুজ সতেজ ধান গাছ। আমার মাঠ যেখানে হেমন্তের শূন্যতায় ভরে থাকা উচিত, বীরেনদার সেখানে ভরে থাকা উচিত সাবলীল শস্যে। আর এইটেই বাস্তব অভিজ্ঞতা।

বীরেনদা বললেন : উঃ, কী সর্বনাশ! কোথাও এক ছটাক শস্য নেই! এবার আর খেয়ে বাঁচতে হবে না।

আমার স্বপ্ন ভেঙে গেল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল নিত্যদিন সংবাদপত্রে সাংবাদিকদের চিৎকার : প্রচণ্ড খরা, অনাবৃষ্টি। বিহার উত্তরপ্রদেশ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন। স্বপ্ন-ভঙ্গের এই আঘাতটা যেন আমার কাছে মর্মান্তিক ঠেকল। আমি ফিরে তাকালুম বীরেনদার দিকে।

বীরেনদা মাঠের দিকে আঙুল তুলে বললেন : দেখেছ? আমি এতক্ষণ দেখি নি, কিন্তু এবার দেখলুম, মাঠে শস্য নেই।

বীরেনদা বললেন : মাঠগুলো ফেটে হাঁ করে আছে। ধানগুলো মাটিতে শুকিয়ে গেছে। ঘাসগুলো কেমন পুড়ে লালচে হয়ে গেছে। এবার যে কি হবে তাই ভাবি।

আমিও ভাবলুম। আমেরিকার কাছে নিত্য গম ভিক্ষা করে আমাদের তনু রক্ষা করতে হয়। আঠারো বছর স্বাধীনতা লাভের পরও আমাদের যদি আকাশের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হয় তাহলে এই সব পরিকল্পনাগুলো গেল কোথায়? না, বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত এই প্রকৃতিকে বশে আনা? আত্ম অহংকারে বিজ্ঞান নিয়ে মানুষ ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে মেতেছে। পরীক্ষা করছে অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা। প্রকৃতি ক্ষেপে গিয়ে তাই মানুষের উপর বিরূপ হয়েছে। বছর বিশেক আগেও যে প্রকৃতি স্বাভাবিক ছিল, আজ সে অস্বাভাবিক হল কেন? মানুষের নীচ বৃত্তিই কি

প্রকৃতিকে মানুষের প্রতি উদাসীন করে তুলেছে? শত সহস্র মানুষ কীটের মত বেড়ে চলেছে নিত্য দিন। প্রকৃতি আর বইতে পারছে না। ম্যালথাসের থিওরির প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে আসছে তাই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলুম। কারণ যাই হোক, ভারতবর্ষের মানুষের সামনে আজ বিপর্যয়।

স্বপ্নের পিঠে এমন নিষ্ঠুর চাবুক আগে আর পড়েনি বোধহয়। জীবনানন্দের হেমন্তের মাঠ, আমার বাল্যকালের ধূসর স্বপ্নের হেমন্ত-মাঠকে ফেলে গাড়ির মধ্যে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিয়ে এলুম। ওদিকে মিনু বাইরের দিকে তাকিয়ে। একটা তন্ময় ভাবের মধ্যেই যেন ও ডুবে আছে। বাংলাসাহিত্যের মেয়ে। কোন্ শিল্পজগতের ইশারা পেয়েছে এর মধ্যে কে জানে। বীরেনদা মাঠেব দিকে তাকিয়ে বার বার আফসোসসূচক শব্দ করতে লাগলেন। কিন্তু আমি তাকিয়ে থাকলুম মিনুর দিকে। ওর কাঁচা সোনার মত রঙের উপর হেমন্তর ছায়া পড়েছে। কানের দুলে পাথর বসানো, তাতে ম্লান সূর্য প্রতিফলিত হয়ে রঙের দ্যুতি ছড়াচ্ছে। 'কুমারী শুক্লা' (কুমারী শুক্লা বসি একাকিনী পড়িতে নিরত কাব্য কাহিনী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) এমনি জানালার ধারে বসে থাকতো কিনা কে জানে। আমি যেন কিছুটা বিমুগ্ধ হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকলুম।

কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলুম জানি না। সংবিৎ ফিরে এল মিনু জানালা থেকে ভেতরে দৃষ্টি ফেরালে। মুখ ফেরাতেই চোখে চোখ মিলে গেল। আমি যে এতক্ষণ ওর দিকেই তাকিয়ে ছিলুম—এটা বুঝি মিনু বুঝতে পারল। এক ঝলক লজ্জাকে আরক্ত ভঙ্গিতে ওর মুখের উপর আমি দেখতে পেলুম। চোখ দুটো একটু নিচু করে নিল মিনু। ততক্ষণে একটা সংকোচ আমিও বোধ করলুম, এবং মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকাব বলে ভাবলুম।

এটা নিতান্তই অসৌজন্য। রাঙামাসী আমার বন্ধু শঙ্করের আপন মাসী হলেও আমার নিজের নয়—যদিও নিজের মাসীর মতই আমি তাকে দেখতে শিখেছি। মিনুকে নাম ধরে ডাকলেও সে আমার বন্ধুরই বোন। মাসতুতো ভাই বীরেনদার সঙ্গে সে হঠাৎ সুযোগ বুঝে দেশ ঘুরতে বেরিয়েছে। অবশ্য রাঙামাসী সঙ্গে আছেন। আমি এসেছি বীরেনদা সঙ্গে আছেন বলে, আর আমাকে নেহাত ধরেছেন বলে। নইলে শুধু মাত্র মিনু আর রাঙামাসীকে নিয়ে আমার পক্ষে বেরুনো সম্ভব হত না, শোভনীয় হত না।

সুতরাং মিনুর সঙ্গে আমার সৌহার্দ্য যতই থাক, সামাজিক নৈকট্য নিশ্চয়ই অত্যন্ত কাছের নয়। এ হেন অবস্থায় এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকাটা সৌজন্যের আওতার মধ্যে ততটা পড়ে না। সুতরাং দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বাইরে তাকাতে যাচ্ছিলুম আমি। কিন্তু ততক্ষণে লজ্জার নম্রতা কাটিয়ে মিনু সহজ হয়ে উঠেছে। আমার দিকে স্পষ্ট সোজাসুজি ফিরে তাকিয়েছে সে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললুম : এক মনে কুমারী শুক্লার মত বাইরের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিলে ?

মিনু বলল : এমনিই তাকিয়ে ছিলুম।

আমি বললুম : সাহিত্যের লোক তোমরা—এমনি একটা বিস্তৃত উদার প্রকৃতিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলে তুমি সেটা বিশ্বাস হয় না। ভাবছিলে নিশ্চয়ই কিছু একটা ?

দুটো চোখ একটু বড় করে আমার দিকে তাকাল মিনু : কি আবার ভাবব ?

আমি বললুম : নিদেন পক্ষে জীবনানন্দ দাশের কবিতার কথা। সেই যে :

"চারিদিকে ছায়া—রোদ—খুদ—কুঁড়ো—কার্তিকের ভিড ;
চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান,
পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি-ধান ভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ।"

মিনু একটু রাঙিয়ে উঠে বলল : তোমার মত অত কাব্য আমি করতে পারিনে।

আমি বললুম : কাব্য করা, কাব্য পড়া, এর জন্যেই তো তোমরা—

মিনু বলল : ওটা তোমার কাজ।

আমি বললুম : সেকি! আমি যে নিরস, ইতিহাসের লোক !

মিনু বলল : জানতো, ইতিহাসই আজ বাংলাসাহিত্যের রোমান্সের মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে ? বড় থেকে ছোট লেখক কাকে না দেখছ আজ ইতিহাসকে কেন্দ্র করে রোমান্টিক গল্প সৃষ্টির প্রয়াসে ? তোমরা ঐতিহাসিকেরাই এখন রসের কেন্দ্র হয়ে উঠেছ।

আমি বললুম : দয়া করে আমাদের টেনো না মিনু। ইতিহাসের প্রেম নিরলঙ্কার এবং অকৃত্রিম। ইনিয়ে বিনিয়ে মিথ্যে লিখতে হাজারো বার একজন ঐতিহাসিকের হাত কাঁপবে। ইতিহাসের কবরাশ্রিতা নায়িকাকে ভোলাবার জন্যে অতিরঞ্জনে রঞ্জিত করতে পারব না তাকে। ওটা তোমাদের মত কল্পনাবিলাসী সাহিত্যের লোকেদের কাজ। ইতিহাসের কাজ সত্যানুসন্ধান, অতিরঞ্জন নয়।

বীরেনদা এবার দৃষ্টি ফেরালেন। তিনি এতক্ষণ বুঝি আমাদের কথাই শুনছিলেন, বললেন : তীর্থযাত্রায় বেরিয়েও নিজেদের কথা ভুলতে পারছ না তোমরা। আছো লেখাপড়া নিয়ে।

আমি বললুম : আমাদের কাজ লেখাপড়া নিয়েই। সব সময় যদি সেটা করতে পারতুম তবে বর্তে যেতুম। কিন্তু সেটা পারিনে। আর তীর্থের কথা বলতে গেলে আগেই জানিয়ে রাখছি—কাশী মথুরা বৃন্দাবন আমার উদ্দেশ্য নয়। দিল্লী-আগ্রার স্বপ্ন নিয়ে আমি বেরিয়েছি।

রাঙামাসী বললেন : ও সব বলতে নেই। তীর্থযাত্রায় চলেছিস না তো কোথায় চলেছিস ? পূর্বজন্মের সুকৃতি না থাকলে এত অল্প বয়সে তীর্থযাত্রা হয় না। তীর্থস্থান চোখে দেখতে পায় ক'জন বল্ ?

আমি বললুম : ও কথাটা মিনুকে বল। বয়সের আগেই তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছে ও। আমার বয়স হয়ে গেছে। দশ বছর কলেজে অধ্যাপনা করে বুড়ো হয়ে গেছি। তীর্থযাত্রার পুণ্য আমার জন্যে নয়। বুড়ো হয়েও যখন ধর্মে মতি হয় নি, তখন হবেও না আর কোনদিন।

মিনু বলল : যথেষ্ট বয়েস হয়ে গেছে তো তোমার। চুল পেকে, দাঁত পড়ে গেছে। ঘরে নাতি-নাতনী রেখে বেরিয়েছ। কলেজে তোমাকে ছেলেরা অধ্যাপক বলে মানে কিনা তাই ভাবি। আমাদের পড়াতে এলে তো তোমার মত ছেলেমানুষ মাস্টারকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতুম।

রাঙামাসী বললেন : ভগবান দর্পহারী। ধর্ম মানিনে, ধর্ম মানিনে এমন বলিস নে। তিনি যে কখন কেমনভাবে কার দর্প ভাঙেন জানিনে। শেষে দেখবি এই ভগবান ভগবান বলে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াবি।

মনে ভাবলুম সত্যিই তো জগতের উৎসই যদি ভগবান হন তবে ইতিহাস তার চাইতে বড় হবে কি করে? ইতিহাস তো জগৎকে নিয়ে। ভগবানকে জানে কে যে তাঁর ইতিহাস রচনা করবে? পরাবিজ্ঞানের ভাষা তো হেঁয়ালী। তাঁর ব্যাখ্যা করবে কে? ফ্রয়েড মনে করেন ঈশ্বর সম্পর্কিত চিন্তা এসেছে পিতার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক থেকে। ঈশ্বর হলেন মানব মনের প্রজেকশন। মার্কসীয়রা ঈশ্বরের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করেন না। যাঁরা ঈশ্বরকে নিরাকার মনে করেন তাঁরা কিভাবে তাহলে তিনি সাকার জগৎ সৃষ্টি করেছেন তা বলতে পারেন না। বিজ্ঞান ঈশ্বর নিয়ে মাথা না ঘামালেও জগৎ সৃষ্টির উৎস নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। একদল মনে করেন Blackhole থেকে শক্তি বিস্ফোরিত হয়ে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। শূন্যে শক্তির উদ্ভব বৈজ্ঞানিকদের মতে আপনা আপনিই হয়। কোথায়ও কোন charge তৈরী হলে তার চতুর্দিকে শূন্যও চঞ্চল হয়, একে বলে field অপর কোন চার্জের সান্নিধ্যে এলে আলোড়ন ঘটে, বিস্ফোরণ হয়। সুতরাং শূন্য শূন্য নয়, তারও response করবার ক্ষমতা আছে। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'তবু শূন্য শূন্য নয়…'। এই শূন্য থেকেই শক্তির সৃষ্টি হয়—matter is composed chiefly of nothing শক্তির নাম 'ভগ'। শূন্য থেকে তার উদ্ভব ঘটে বলে শূন্য হল শক্তির অধীশ্বর অর্থাৎ 'বান'। সুতরাং শূন্যই হল ভগবান। কিন্তু এত সব ব্যাখ্যা করে আমি কিছু বললুম না। শুধু বললুম : অমন কথা বোল না মাসীমা। আমার র‍্যাকের বইগুলো তবে কেঁদে ভাসাবে। ইতিহাস হাহাকার করবে।

রাঙামাসী বললেন : ভগবানের চেয়ে বড় আবার ইতিহাস আছে নাকি?

মিনু আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল : নাও এবার উত্তর দাও সন্তুদা?

আমি বললুম : মাসীমা বিশপ বার্কলের মত মোক্ষম অস্ত্র ছেড়েছেন—Idealism। ইতিহাস খতম, তোমাদের সাহিত্যেরই বুঝি জয় হবে।

মিনু বলল : হবে তো নিশ্চয়ই। সাহিত্য জীবন এবং জীবনাতীত দু'টোকে নিয়েই। তোমাদের ইতিহাস সেই জীবনাতীতকে কোন মূল্য দেয় নাকি?

আমি বললুম : জীবনের বাইরে যে জীবন, তাকে চিনিও না, জানিও না। না জেনে না চিনে মন্তব্য করি কি করে। সুতরাং এখানে ঐতিহাসিকের কাছ থেকে কোন উত্তর পাবে না। তবে একথা জেনো, কাশীর চাইতে আগ্রা-দিল্লীর হাতছানিই এখনো বেশি ডাকছে আমাকে।

রাঙামাসী কি বলবেন বলে যেন তাকালেন আমার দিকে। কিন্তু তাঁকে কথা বলতে না দিয়ে মিনু বলল : তুমি ওব কথায় কিছু মনে করো না মাসীমা। বড় বড় নাস্তিকেরা অন্তরের মধ্যে সব চেয়ে বড় আস্তিক হয়।

আমি বললুম : দশচক্রে ভগবান ভূত হয় জানি। কিন্তু একজন জলজ্যান্ত মানুষ অদ্ভুত হয় এই প্রথম দেখলুম।

আমার কথাটার ইঙ্গিত রাঙামাসী কতটা ধরতে পারলেন জানি না। কিন্তু মিনু বুঝতে পেরে ফিক করে হেসে বাইরেব দিকে তাকাল। মনে মনে সে যে বেশ একটা পুলক অনুভব কবছে সেটা আমি বুঝতে পাবলুম। মিনুকে আর একবার লক্ষ্য করে দেখে বাইবে তাকাল ম। কার্তিকের বোদ বাইরে একেবাবে নিরুত্তাপ হবে পড়েছে। কমলা রঙ আরো গভীব হয়েছে। তাব মধ্যে শীতেব গা ঘেঁষাঘেঁষি একটা স্নিগ্ধতা নেমেছে। হেমন্তর উদাসীন অন্তর যেন সমস্ত মাঠের উপর ঝুঁকে পড়েছে। দূরে গ্রামগুলির উপর ধোঁয়ার মত কুয়াশার রেখা গাছের মাথায় মাথায় দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। চলন্ত গাড়ি থেকে সেই সব অপসৃয়মান দৃশ্যেব দিকে আমি আবাব তাকিয়ে দেখতে লাগলুম।

গল্প কবতে করতে ইতিমধ্যে অনেকগুলো ছোট স্টেশন পেরিয়ে এসেছি। দু'-একটা স্টেশনে গাড়ি থেমেছেও। কিন্তু স্লিপিং বার্থে খুব অল্প লোকই উঠেছে। তারা দূরে দূরে বসে আছে। সুতবাং আমাদের দুটো বেঞ্চে পারিবারিক পবিবেশ নষ্ট হযনি এতটুকু।

দেখতে দেখতে সূর্যটা দূরে গ্রামের কালো রেখার আড়ালে ডুবেগেল। দেহাতী লোকেবা ধুলো ভরা পথের উপর দিয়ে কেউ বা বোঁচকা মাথায়, কেউ বা পিঠে নিয়ে চলেছে। পশ্চিম দেশের ছোট গেঁয়ো বউ মাথায় ঘোমটা দিয়ে হাঁটছে। মাঠের উপর দিয়ে রাখালেরা গরু নিয়ে ফিবছে। এ সবকিছুই স্মৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে জড়ানো। সেই স্মৃতির মধ্যে গভীরভাবে ডুবতে যাব হঠাৎ রাঙামাসীর কণ্ঠ কানে এল : সন্ধ্যে হল। বৌমা ঘরে প্রদীপ জেলেছে কিনা কে জানে। তার আবার চলতে ফিরতে বারোমাস। ছেলেপিলেগুলোকে হাতমুখ ধুইয়ে ঘরে তুলেছে কিনা কে বলবে। রুনুটা আবার বেরুবাব সময় বায়না ধরে বড় কাঁদছিল।

এবার ফিবে তাকাতেই হল আমাকে। মওকা পেয়েছি, ছেড়ে দেওয়া যায না। বললুম : সেকি রাঙামাসী। তীর্থে বেরিয়েও পেছনের টান ছাড়তে পারছ না ?

রাঙামাসী জবাব দিলেন : তীর্থে বেরিয়েছি বলে সংসার ছাড়তে হবে এমন কথা ঠাকুব বলেন নি। বরং সংসারে থেকে তীর্থ করতে বলেছেন।

কী দৃঢ় বিশ্বাসে কত অনায়াসে রাঙামাসী কথা কয়টি বললেন। শাস্ত্র গ্রন্থাদি

তিনি তো কিছুই পড়েন নি। অথচ ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্বে একথাটাই তো বলা হয়েছে ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষের চিন্তাতে। সেখানে তীর্থের অর্থ বহিঃতীর্থ নয়। যথার্থতীর্থ আন্তর তীর্থ। মানসতীর্থের শেষে হল অন্তর্দরিয়া অর্থাৎ পরমাত্মারূপ কারণ সমুদ্র। সেখানে ডুব দিতে হবে। দেহজ্ঞান হলেই সবতীর্থ জ্ঞান হয়, কারণ এই দেহের মধ্যেই রয়েছে অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। দেহের চৈতন্য-শক্তি-মাত্রা অর্থাৎ ডাই-মেনশন যদি বৃদ্ধি পায় তবে অন্তর্বিশ্ব বহির্বিশ্বে পরিণত হয়। Carl Sagan-এর মতে inside turns out. ফলে মানুষ নিজেরই দেহের অভ্যন্তরে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখতে পায়। দেখতে পায় দুই ছায়াপথের মধ্যস্থ আলোকিত মহাজাগতিক ধূলিস্তর বা মেঘ, অনন্ত ছায়াপথ, গ্রহ, নক্ষত্র, সব। ছায়াপথ যেমন গঠিত সংখ্যাতীত তরল জাতীয় অগ্নিগোলক দ্বারা তেমনই মানুষের দেহও গঠিত অসংখ্য স্নায়ুকোষ দিয়ে। মানুষের দেহ এবং অনন্ত বিশ্বও সেদিক থেকে দেখতে গেলে একই সাংগঠনিক কায়দায় গঠিত। মানবের দেহের অনন্ত কোষই তার তীর্থক্ষেত্র। কিন্তু সে কথা রাঙামাসীকে বললুম না। তাঁকে রাগাবার জন্য বললুম: যাই বল, আমি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তীর্থে বেরুইনি। তবু দেখ, পিছু টান আমার নেই :

রাঙামাসী বললেন: যে যা কর, তখন বুঝবে।

মিনু ফিরে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল: হ্যাঁ মাসীমা তীর্থ ঘুরে এসে সন্তুদার একটা বিয়ে লাগিয়ে দাও এবার।

রাঙামাসী বললেন: নমিতার মার তো খুব পছন্দ। বলছিল আমাকে। তবে ঠিক সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু মেয়েটি ভাল।

আমি বললুম: মাসীমা তুমি থাম তো। যাচ্ছি তীর্থ করতে, এখন ওসব কথা বোল না।

মিনু মুচকি হেসে বলল: সে কি কথা! এতক্ষণ যে বড় বলছিলে তীর্থযাত্রায় আগ্রহ নেই, এবার?

আমি বললুম: তুমি চুপ করতো মিনু।

মিনু আমার দিকে তাকিয়ে হাসল একটু। রাঙামাসীও হাসলেন। বীরেনদা বিহারের মাঠের হালচাল পরীক্ষা করে দেখছিলেন—কতটা শস্য এবার হবে, কি হবে না। তিনিও ফিরে তাকালেন। বিয়ের যোগাযোগ করতে তার জুড়ি নেই, একথা আমি জানি। এ ব্যাপারে তাঁর বিরাট আগ্রহ। সুতরাং কম্পার্টমেন্টের ভেতর থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বাইরে তাকালুম আমি। ওরা বোধ হয় পরস্পর চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে হাসল। হাসুক গে। আমি বাইরে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম।

সূর্য ডুবে গেছে। একটা ম্লান ছায়া নেমেছে পৃথিবীর উপর। একটুনি এই ছায়া গাঢ় হয়ে অন্ধকারে পরিণত হবে। অপরিচিত দেশের বুকে এই ছায়া একটা রহস্যে ভরা। চলন্ত ট্রেন থেকে সেই ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকলে একটা অব্যক্ত ভাবের শিহরণ জাগে।

কিন্তু সেই ছায়ার রহস্যময়তাকে নষ্ট করে দিয়ে গাড়ির মধ্যে আলো জ্বলে উঠল। আলোটা যেন আমার গায়ে বিঁধে সন্ধ্যাটাকে সহসা রাত্রিতে পরিণত করে দিল। বীরেনদা আহার এবং নিদ্রার ব্যাপারে বড় পার্টিকুলার। আলো দেখেই তিনি বলে উঠলেন: রাত্রি হয়ে গেল, মিনু খাবার-দাবার কি আছে বের কর। খেয়ে-দেয়ে বিছানা করে শুয়ে পড়ি। সারারাত গাড়ি চলবে। দেশে দেশে ঘুরতে হবে ক'দিন। শরীরের দিকে নজর রাখতে হবে। ভাগ্যক্রমে যখন স্লিপিং বার্থ পেয়ে গেছি, সদ্ব্যবহার করা যাক।

আমি মনে মনে ভাবলুম—দেশ-বিদেশ ঘোরার এই নমুনা নাকি। অন্ধকারের মধ্যে গাড়ি চলবে অপরিচিত দেশের বুকের উপর দিয়ে। সে স্বাদ না নিয়ে শুয়ে পড়লে নতুন দেশের পরিচয় মিলল কী? কিন্তু বীরেনদাকে কি সে কথা বোঝানো যাবে? তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ট্যাক্স সংগ্রহ করেন। হিসেব করে গুণে সরকারী তশিলে জমা দেন। জীবনটা তাঁর হিসেব-নিকেশের। বে-হিসেবের মধ্যে জীবনের যে একটা ভিন্ন স্বাদ, সেটা তিনি বুঝবেন না। তাঁকে বোঝানোও যাবে না। ঘুমোন বীরেনদা, আমি ঘুমোব না।

বিদেশের বুকে ঘনায়মান রাত্রির অন্ধকারের যে একটা স্বাদ আছে সেটা সাহিত্যের ছাত্রী মিনুর অনুভবে সাড়া দেয় কি না, কে জানে। কিন্তু বীরেনদার প্রস্তাবে মিনু তৎক্ষণাৎই সাড়া দিয়ে খাবার-দাবার বের করল না। লুচি, তরকারি আর মিষ্টি তার ঝুড়িতে সাজানো রয়েছে। মিনুকেও দেখলুম—বাইরের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে আছে। হয়তো তার দেহ মনে অব্যক্ত শিল্পজগতের রসের ঘোর লেগেছে। গাড়ি চাকায় চাকায় সুর তুলে এগিয়ে চলেছে! যন্ত্রের এ এক ছন্দময় গতি। মিনু বাংলাসাহিত্যের ছাত্রী, এই ঝকাঝক্ শব্দের মধ্যে ও হয়তো শুনছে—'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।' কিন্তু অন্ধকার যতই ঘন হতে লাগল, আমার মনে পড়তে লাগল, স্টিফেন স্পেন্ডারের কবিতা—'The Express'-এর বর্ণনা।

মিনুর দিকে তাকিয়ে দেখলুম—একটা যেন তন্ময়তা আছে তার মধ্যে। হঠাৎ তাকে প্রশ্ন করলুম: আচ্ছা মিনু, অন্ধকারের বুকের মধ্য দিয়ে এই যে বিরাট প্রান্তর অতিক্রম করে গাড়ি চলেছে—তোমার কিছু মনে পড়ছে না?

মিনু তাকাল আমার দিকে: কি মনে পড়বে?

—কিছু না?

—হেঁয়ালী ছেড়ে স্পষ্ট করে বল।

—নিদেন পক্ষে রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতার লাইনও মনে পড়ছে না? গাড়ির এই ঝক্‌ঝক্ শব্দটাকে মনে হচ্ছে না যেন সে বলছে—হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে?

মিনু বলল: এই দেখ সন্তুদা তোমার আসল রূপ ধরা পড়ছে। ঐতিহাসিক হয়েও তুমি কল্পনা-বিলাসী।

আমি একটু লজ্জিত হয়ে বললুম ঃ না, হঠাৎ মনে পড়ল কথাটা তাই। রবীন্দ্রনাথের উচ্চমার্গের ভাব নিরস ইতিহাসের ছাত্র পাবে কোথায় বল? বরং আমার মনে পড়ছে — স্টিফেন স্পেন্ডারের 'দি এক্সপ্রেসের' কথা। নিশ্চয়ই এ লাইন দুটো তোমার মনে আছে ঃ

At last further than Edinburgh or Rome
Beyond the crest of the world, she reaches night…

মিনু একটু দুষ্টু হাসি হেসে বলল ঃ ইতিহাস কিন্তু তোমার উপর রাগ করবে সন্তুদা। ইতিহাসের নির্মম সত্যের পথ পরিহার করে তুমি রোমান্টিসিজমের পথে পা বাড়িয়েছ।

আমি বললুম ঃ এই মুহূর্তে ইতিহাসের নির্মম সত্য আর কি হতে পারে?

মিনু বলল ঃ নিত্যকার খবরের কাগজের যে সংবাদ,—ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট, তাই। বিহারের ভৌগোলিক অবস্থা বিচার করে, রেলওয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিচার করে, এটা টেরোরিস্ট জোন কিনা জানা। স্যাবটেজ পদ্ধতির কথা চিন্তা করে বৈজ্ঞানিক ভঙ্গীতে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যে, এ ট্রেনটায় কোন অ্যাকসিডেন্ট ঘটতে পারে কি না।

অ্যাকসিডেন্টের কথা শুনে রাঙামাসী শিউরে উঠে বিশ্বনাথকে স্মরণ করলেন ঃ জয় বাবা বিশ্বনাথ। একি অলক্ষুণে কথা বলছিস মিনু! আর কোন কথা নেই তোর!

আমি বললুম ঃ দেখতো মাসীমা, মেয়েটা কেমন বেয়াড়া হয়েছে। সত্যি সাহিত্যের ছাত্রীর মাথায় এমন বিদ্ঘুটে কল্পনা আসতে পারে আমি ভাবতেও পারিনে।

মিনু বলল ঃ ইতিহাসের মাথায় যদি রোমান্টিক অপদেবতা ভর করতে পারে, তবে ধর্মচ্যুত হয়ে সাহিত্যও কেন ইতিহাসের পদ্ধতিতে চিন্তা করতে পারবে না? আর তা ছাড়া তুমি কি আমাকে একটি ক্রিয়েটিভ জিনিয়াস ঠাউরেছ নাকি!

হঠাৎ কেন যেন একটা সন্দেহের খোঁচা লাগল আমার মনে। গতির তালে তালে আমার মধ্যে অদ্ভুত একটা আবেগ জেগে ওঠে। সত্যি নিজেকে তখন সামলাতে পারি না। জনবহুল কলকাতার বাসের গতিও আমার মধ্যে একটা কল্পনার স্রোত জাগায়। নিত্য পরিচিত ফুটপাথগুলিকেও নতুন আলোতে দেখি আমি। আমার সেই আবেগ-টাকে মিনু ভুল বুঝল নাকি। হাজার হোক, সে আমার বোন তো নয়, বন্ধুর বোন। কাছে পেয়ে রোমান্টিক আতিশয্য দেখানোর অন্য অর্থও তো সে করে নিতে পারে!

মুহূর্তে একটা সংকোচ অনুভব করলুম। আমার কথা যেন বন্ধ হয়ে গেল। মনের মধ্যে একটা ভার অনুভব করলুম। নিস্তব্ধ হয়ে বাইরে তাকালুম। আমি যে একটা কিছু মনে করেছি—মিনু সেটা বুঝতে পারল কিনা কে জানে। হঠাৎ আর কথা না বলে আমি যদি তেমনিভাবে বাইরে তাকিয়ে থাকতুম, ব্যাপারটাকে অস্বাভাবিক মনে হত। কিন্তু বীরেনদা বাঁচিয়ে দিলেন। স্বপ্ন জগতে কল্পনাবিহারী হবার পাত্র তিনি নন। রোমান্টিক আলোচনায় মন ভরে, পেট ভরে না। মনের বালাই বীরেনদার ততটা নেই, যতটা আছে পেটের প্রশ্ন। তিনি অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। গাড়ির ভেতর আলো

জ্বলেছে মানেই রাত্রি হয়ে গেছে। আহার-পর্ব সেরে এবার তিনি শয়নে পদ্মনাভত্ব করতে চান। এটা তার অভ্যাস। সারাদিন খেটেখুটে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে সন্ধ্যাবেলাতেই তিনি খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েন। গ্রামদেশে সন্ধ্যাই অনেক রাত। কলকাতাবাসীর পক্ষে সন্ধ্যার চারিত্র সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

বীরেনদা আবার মিনুকে তাড়া লাগালেন ঃ কই খাবারগুলো বের কর। ইতিমধ্যে তিনি নিজের বাঙ্কে তাঁর বিছানা বিছিয়ে শয়ন প্রস্তুতি সেরে রেখেছিলেন।

মিনু বলল ঃ বের করছি। সবে তো সন্ধ্যে।

বীরেনদা বললেন ঃ সন্ধ্যে কোথায়? অনেক রাত্রি এখন। গাড়ির জার্নিতে একটা ক্লান্তিও তো আছে!

রাঙামাসীও সায় দিয়ে বললেন ঃ হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড় সব। নতুন জায়গায় কোথায় কিভাবে গিয়ে পৌঁছুব—ঘুমিয়ে নেয়া ভাল। নইলে গাড়ির ঝাঁকিতে শরীর খারাপ লাগবে।

মিনু অগত্যা তার প্লাস্টিকের ঝুড়িব্যাগে হাত দিল। ফ্লাস্ক খুলে জল দিয়ে হাত ধুয়ে নিল। তিনটে টিফিন ক্যারিয়ারের ঢাকনিতে লুচি তরকারি আর মিষ্টি সাজাল। আমি বাইরে তাকিয়ে থেকেও সবকিছু আঁচ করে নিতে পারলুম। মাসীমা গাড়িতে রাত্রিবেলা একটা কমলালেবু আর দুটো কলার বেশী খাবেন না এটা নিশ্চিত সত্য। সুতরাং তাঁর জন্যে খাবার সাজানোর প্রয়োজন নেই।

খাবারগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে বীরেনদার দিকে এগিয়ে দিল মিনু। তারপর আমাকে ডাকল ঃ এই যে সন্তুদা নাও।

একটা নিতান্ত অনাগ্রহেই যেন ফিরে তাকালুম আমি। কিছু আগে সূক্ষ্ম যে আঘাতটা মিনু আমাকে করেছে, সেটা আর কেউ না বুঝলেও আমি তো বুঝি। সেই আঘাতের জন্য আমার মুখে যে একটা নিরাগ্রহ ভাব ফুটে উঠেছিল, মিনু কি তা বুঝল?

আমি বললুম ঃ সে কি, এখনি খাব!

মিনু হেসে বলল ঃ অনেক রাত হয়ে গেছে সেটা জান না বুঝি?

—তাই নাকি। এমন করে কথাটা বললুম, যেন ইতিপূর্বে বীরেনদার কথা আমি শুনতেই পাইনি।

মিনু বলল ঃ হ্যাঁ। খেয়েদেয়ে ঘুমোও। গাড়ির ঝাঁকিতে নইলে শরীর খারাপ হবে। দেশ ভ্রমণের আনন্দ তো গাড়ির মধ্যে ঘুমোনোতেই।

বীরেনদার এত ভোঁতা বুদ্ধি নয় যে মিনুর এই মোটা আঘাতটাকে ধরতে পারবেন না। তিনি বললেন ঃ খেয়েদেয়ে যত পার অন্ধকারের মধ্যে নতুন দেশ দেখ। আমি ঘুমোব।

সূক্ষ্ম মান অভিমানের ধার বীরেনদা ধারেন না। আমি ভাবলুম, বীরেনদার মত যদি আমিও হতে পারতুম। কিন্তু আমার মনে মিনুর তির্যক্ কথাগুলো তখনো

কাঁটার মত ফুটছিল। মিনু খাবার বাড়িয়ে দিলে হাতে করে নিলুম। কিন্তু মনের মধ্যে একটা স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব আনতে পারলুম না। আড়চোখে তাকিয়ে মিনু হয়তো আমার মুখখানা দেখে নিল, কিন্তু কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করল না।

খাওয়ার শেষে মুখ হাত মুছে বীরেনদা বাঙ্কে উঠে গেলেন। মিনু হাতটা ধুয়ে নিয়ে রাঙামাসীর বিছানা খুলল। আমি রাঙামাসীর সিটে বসে ছিলুম—আমায় বলল ওর সিটে গিয়ে বসতে। আমি উঠে গিয়ে ওধারে নির্বিকারভাবে বাইরে তাকিয়ে রইলুম। রাঙামাসীর বিছানা বিছিয়ে মিনু এবার আমার দিকে তাকাল ঃ ওদিকটায় বোস। আমার বিছানাটাও করে নি।

আমি কিছুমাত্র বাক্য ব্যয় না করে আবার এধারে এসে বসে বাইরে তাকালুম। ঘন অন্ধকার জানালার বাইরে যেন হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

মিনু নিজের বিছানাটা ছড়িয়ে নিয়ে জানালার ধারে বসল। আমাকে বলল ঃ তোমার বিছানা করলে না?

বললুম ঃ সে করব'খন, এখন একটু বসি। মাসীমার পায়ের কাছে বসলে কোন অসুবিধে হবে না তো?

রাঙামাসী বললেন ঃ শোন ছেলের কথা, কি যাচ্ছেতাই বলিস যে!

মিনু এবার আমার দিকে তাকাল। বোধ হয় আমার মনের অবস্থা অনেকটা সে আঁচ করতে পেরেছে। আড়চোখে সে একবার আমাকে তাকিয়ে দেখল, তারপর বাইরে তাকাল। ওধারে ক'জন অবাঙালী যাত্রীর হিন্দী ভাষা শোনা যাচ্ছে। নিতান্ত বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা। ভারতবর্ষ নয়, বিশ্ব নয়, নিতান্তই গ্রাম্য পলিটিক্স। ওদিকে কান দেবার কিছু নেই। জানালার বাইরে ঘন অন্ধকারে নিজেকে সঁপে দেবার চেষ্টা করলুম। গাড়ী এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে আরো দু'একটা স্টেশনে সে থেমেছে। কিন্তু যাত্রী ওঠা-নামা তত নেই। যত নামছে তত উঠছে না।

মন যখন একা, তখন বেপরোয়া চিন্তা করতে লজিকের সে ধার ধারে না। কত বিচিত্র কথাই না চিন্তা করতে লাগলুম। এই যে সব নতুন নতুন গ্রাম পেরিয়ে গাড়ী যাচ্ছে, তাদের সেই খড়ো ঘরের নিচে কি রকম সব মানুষ? তারা এখন কি করছে? কি ভাবছে? হাসি কান্না, প্রেম প্রণয়ের খেলা তাদের মধ্যেও আছে নিশ্চয়ই? কলকাতার নবনীতা সেন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট তরুণ সজল দাশগুপ্তের সঙ্গে কার্জন পার্কের বেঞ্চে বসে, বা কালো অ্যামবাসেডরে পাশাপাশি বসে যে প্রণয়ের খেলা খেলে, দেশকাল ভেদে তার রূপটা ভিন্ন হলেও এখানে কোন লসমিয়া হয়তো সীতারামীয়াকে তেমনি ভালবাসে। খড়ের ঘরের নিচে শুয়ে সেই দুই প্রেমিক প্রেমিকা কি ভাবছে এখন? কারো খড়ের ঘরের নিচে কি বাংলাদেশের সান্ধ্য কীর্তনের আসরের মত কৃষকদের গানের আসর বসেছে? কে জানে! আমার মন এমনি শত সহস্র কল্পনার জাল বুনে চলল।

মিনু কি ভাবছিল জানি না। অনেকক্ষণ সেও চুপ করে বসে রইল। তারপর

গাড়ীর ঝাঁকির একটা আলস্য অনুভব করল বোধ হয়। আমি অনুভব করতে পারলুম, সে যেন হাই তুলল। তারপর বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কম্পার্টমেণ্টের ভেতরে তাকাল। একবার আমার দিকেও তাকিয়ে দেখল। তারপর আপন মনেই বলল: আর নয়, এবার ঘুম পাচ্ছে। কবি সাহিত্যিক তো নই যে অন্ধকারের মধ্যে ভাব-রাজ্যে সাঁতরে বেড়াব।

কথাটা নিশ্চয়ই সে আমাকে লক্ষ্য করেই বলল। কিন্তু আমি তার কোন প্রত্যুত্তর করলুম না। পায়ের উপর চাদরটা টেনে দিয়ে মিনুও শুয়ে পড়ল। ওধারে নিতান্ত বৈষয়িক কথার প্লাবনও স্তিমিত হয়ে এসেছে। এখানে বীরেনদা এখন ঘুমের দেশে। রাঙামাসী কখন কমলা আর কলার সদ্ব্যবহার করে আধো ঘুমের রাজ্যে। আধো ঘুমের রাজ্যে এই কারণে যে কখনো তিনি পূর্ণ মাত্রায় ঘুমোন না। বয়েস বেশী হলে বোধহয় এই হাফ-ইন্‌সমনিয়াব রোগ সকলেরই হয়।

গাড়ীর মধ্যে আমি প্রথম নির্জনতার স্বাদ অনুভব করতে পারছি। একবার মনে হল, লাইটটা অফ করে দিতে পারলে নির্জনতার আরো নিবিড় নৈকট্য লাভ করতে পারতুম। কিন্তু সে সাহস হল না। কারণ গাড়ীতে মিনু রয়েছে। ভাবজগতের স্পর্শে বাস্তবকে বিসর্জন দেওয়া যায় না। আমি বাইরের অন্ধকারের স্পর্শই আরো বেশী করে নেবার চেষ্টা করলুম। অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে নিজের কাছে অনেক নিবিড় করে ধরা যায়। একাকী অন্ধকারে বসে নিজেকে যতটা স্পষ্ট করে দেখা যায়—আলোর মধ্যে ততটা দেখা যায় না। এই সেই অন্ধকার—যার রূপ শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' দেখতে পেয়েছিল। এই অন্ধকার যুগ-যুগান্ত থেকে চলে আসছে। সত্যিই বিচিত্র! কুমুদরঞ্জনের কবিতা মনে পড়ল: 'সেদিনও সজনী এমনি রজনী আঁধিয়ার…।'

হয়তো অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। কতক্ষণ সেই অন্ধকারের মধ্যে বসে নিজেকে হারিয়ে ছিলুম জানি না। হঠাৎ চমক ভাঙল মিনুর কণ্ঠ শুনে: সন্তুদা, কাব্যের একটা সীমা আছে। সেটা ছাড়িয়ে যেও না। সন্ধ্যাটা রাত নয় বলে রাত বারটা কিন্তু রাত। এবার শুয়ে পড়।

আমার চৈতন্য হল। সত্যি বোধ হয় অনেক রাত হয়ে গেছে। গাড়ীর শব্দকে অতিক্রম করেও বাইরে ঝিঁঝির ডাক শুনতে পাচ্ছি। থমথম করছে রাত্রি। পৃথিবী বোধ হয় এখন নিদ্রায় অচৈতন্য। বললুম: হ্যাঁ মিনু, এখন শুতে যাচ্ছি।

উঠে দাঁড়িয়ে বাঙ্কে আমার নিজের বিছানাটা খুললুম। কিন্তু হঠাৎ একটা প্রশ্ন আমার মনে জাগল,—তবে কি মিনু এতক্ষণ ঘুমায় নি? আমাকে লক্ষ্য করছিল? যদি লক্ষ্য করে থাকে, কেন করছিল? তাহলে সন্ধ্যাবেলা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে মিনু যে কথা কয়টি বলেছিল, তাকে আমি যে অর্থে নিয়েছি, হয়তো সে অর্থে সে তা ব্যবহার করেনি? বিশ্ব সংসারে সর্বত্রই রহস্য। এ রহস্য ভেদ করবে কে? সত্যকে আমরা নির্মল আলোকে ক'জন দেখতে পাই? আমিও পায়ের উপর চাদর টেনে বালিশের উপর মাথাটা রাখলুম। গাড়ী তার নিজের ছন্দে একটানা ছুটে চলেছে ঝক্ ঝকা ঝক্ শব্দে…

দুই

ঘুম ভাঙল ঠিক ভোরবেলা। দেখি গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে ছাপরা স্টেশনে। ঘুম ভাঙলেন বীরেনদা। তিনি নিজে যেমন সন্ধ্যে না হতেই শুয়ে পড়েন, তেমনি ভোর না হতেই উঠে বসেন। বেলা করে কেউ ঘুমোক এটা তিনি যেন মোটেই সহ্য করতে পারেন না। গাড়ীর দোলনায় ঘুমটা আমার খুব গভীর হয়েই এসেছিল। কত অপরিচিত স্টেশন, কত নতুন মুখ ছাড়িয়ে গাড়ী এসেছে এতদূর, রাত ভরে জানতেও পারিনি। আলস্যটা বেশ ভার হয়েই জমেছিল। বীরেনদার ডাকে প্রসন্ন বোধ করিনি এতটুকু। কিন্তু আমার বিরক্তিকে তিনি গ্রাহ্য না করে এমন হাঁকডাক আরম্ভ করে দিলেন যে আর না উঠে উপায় থাকল না। আড়মোড়া ভেঙে বাঙ্ক থেকে নেমে দাঁড়ালুম। দেখি রাঙামাসী উঠে বসে জপ করছেন। মিনুও কখন উঠে বসেছে। আমি নামতেই ও বলল: সোনব্রিজ পার হল, দেখলে না সন্তুদা? সত্যি, কি ঘুমোতে পার তুমি। যাও, মুখ ধুয়ে এসো। বীরেনদা জানালার ধারে উঁকি দিয়ে বললেন: দেখি, কিছু খাবার মেলে কিনা।

মিনু বলল: দেখো তো চা মেলে কি না। চায়ের ডাক তো শুনছি না।

বীরেনদা বলল: চা, খাবার, কিছুই যে দেখছি না। এ কেমন দেশ রে বাবা!

আমার মনে হল বলি: চা আর তোমাদের মনের মত জলখাবার এখানে মিলবে না। অস্বাস্থ্যকর সভ্যতার হাওয়া এখনো এখানে লাগেনি। চায়ের বদলে গরম দুধ পেতে পার, আর জলখাবারের জন্য ছাতু।

স্টেশনের গায়ে ছাপরা নামটা লেখা দেখেই মনটা আমার অনেকদূরে চলে গিয়েছিল। ছাপরা জেলা থেকে দলে দলে কাহারেরা বেরুতো একদিন বাংলাদেশের গাঁয়ে গাঁয়ে। সেদিন আধুনিক পরিবহণব্যবস্থার এমন উন্নতি হয়নি। বাংলাদেশের বৌ-ঝিরেরা চলাফেরা করত ডুলি পাল্কীতে। সেদিন বড়লোকেরা নিজেরা কাহার রেখে পাল্কীতে চাপতেন। আমাদের বাড়ীতেও পুজোর শেষে ওরা গিয়ে উপস্থিত হত। মাঠের জল তখন কমে এসেছে। নৌকা চলে না, সর্বত্র কাদা। একমাত্র উপায় কাহারেরা। বর্ষার আরম্ভেই যে কাহারেরা দেশে ফিরে যেত, পুজোর পর আবার ফিরে আসতো তারা। ছিল পচু সর্দার আর বঁকুদাস। এই ছাপরা জেলাতেই তাদের বাড়ী ছিল। আমাদের আমবাগানে ঘর করে থাকতো ওরা। বর্ষায় সেই যে ঘরটাকে ফেলে যেত, ঝড়ে জলে বিধ্বস্ত হয়ে থাকতো। আবার হঠাৎ একদিন পুজোর পর এসে, সেই ঘরটাকে পরিষ্কার করতো। নতুন করে ছাউনী দিত। ঘর যতদিন না হত আম বাগানের নিচেই থাকত। শুকনো পাতা কুড়িয়ে রান্না সারত। ওরা ফিরে এলে বহুদিন পরে আবার আমাদের কোন আত্মীয় ফিরে এল বলে মনে হত। ছোটবেলায়

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাদের ঘিরে দাঁড়াতুম। পঞ্চু সর্দার গম্ভীর হলেও বঁকুদাস ছিল হাসিখুশি। আমাকে ডাকতো 'খোকাবাবু' বলে।

ঘর তৈরী হলে মেঝেতে খড় দিয়ে বিছানা পাততো। চার পাঁচজন বেহারা থাকতো সেখানে। শীতের সকালে শুকনো খড়পাতা দিয়ে আগুন পোহাতো। বিকেলেও কুন্ড তৈরী করে আগুন জ্বেলে চারধার ঘিরে বসতো ওরা।

পাল্কী বয়ে টাকা নিত। আর নিত চাল ডাল, তেল নুন, সিধে। আঁচলে চাল-ডাল বাঁধত, আর বাঁশের লাঠির মাথায় যেখানে ফুটো করা ছিল সেখানে তেল ঢালতো। বাঁশের লাঠিটা তেলে তেলে পেকে যেত। লোভের দৃষ্টি ফেলে তাদের সেই পাকানো বাঁশের লাঠির দিকে তাকিয়ে থাকতুম। সেদিন তো ওদের জীবনটা নিয়েই স্বপ্ন দেখতুম। মনে হত, যদি আমিও ডুলি বাইতে পারতুম! যে নতুন বৌ বাপের বাড়ী যাচ্ছে, তার সেই বাড়ীতে উঠে নতুন নতুন মানুষের মুখ দেখতে পেতুম। মেয়ে বা দিদি বা বোনের আগমনে সকলের উচ্ছসিত মুখের ছায়া না জানি কত ভাল দেখায়। নিত্য নতুনের স্পর্শে ভরা সেই বেহারা বা কাহারদের কাছে তাই আমি ঘুরঘুর করতুম।

সেই সব দিন আজ অনেকদূর চলে গেছে। দেশ বিভাগের ফলে সেই ঘর নেই, সেই বাড়ীও নেই। সেই নিজের দেশ আজকে নিজেদের কাছেই প্রবাস, পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) সেই রক্তদাঙ্গার পর থেকে ওরা যে যাওয়া বন্ধ করে দিল আর ফিরল না। আমরাও চলে এলুম দেশ ছেড়ে। সেও আজ সতের আঠার বছরের কথা।

এক সময়ে পঞ্চু সর্দারের প্রবল প্রতাপ ছিল। পাঁচ সাতজনের একটা দলকে সে-ই পরিচালিত করত। এই দুব ছাপরা জেলার গ্রাম থেকে হতভাগিনী মায়েদের বুক ছিঁড়ে তরুণ ছেলেদের নিয়ে যেত সে উপার্জনের জন্য দূর প্রবাসে। তাদের কড়া শাসনে রাখত পঞ্চু সর্দার। মারধোর করত মাঝে মাঝে। তখন আমার ভাল লাগতো না। একবার একটা ছেলেকে সে হাঁটুর নিচে হাত বেঁধে হাঁটু আর হাতের মধ্যে দিয়ে লাঠি ঢুকিয়ে দিয়ে আমগাছের নিচে বসিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু সেই দোর্দন্ডপ্রতাপ পঞ্চু সর্দারের দিনগুলো একই ভাবে যায়নি চিরকাল। বাতে ধরেছিল পঞ্চু সর্দারকে। প্রায় পঙ্গু করে ফেলেছিল। একবার সবাই দেশে ফিরল। সে ফিরতে পারল না। থাকল আমাদের কুঁড়েঘরটাতে। এক পায়ে গুল্‌ নিল। রোজ সকালে সেই গুলে, খুলে পুঁজ ধুতো সে। নোংরা জামা-কাপড়ের উপর সে এক জঘন্য দৃশ্য। শেষ পর্যন্ত ভিক্ষা করেই দিন চালাত। নিরামিষাশী পঞ্চু সর্দার, ছোট ছোট পুঁটি মাছ রেঁধে খেত। তার মাটির পাতিলে সামান্য তেলে সেই মাছ রান্নার সময় এমন বিশ্রী গন্ধ ছাড়তো যে কী বলব। অথচ সেই গন্ধের স্মৃতি আজো আমার মন ভরে রেখেছে।

নতুন করে আবার যখন কাহারেরা এল পরের বছর, বঁকুদাস এল সর্দার হয়ে। উন্নত দেহ, পাকানো গোঁফ। ফর্সা রং। গলায় সোনার পাটা। মাছ-খেকো পঞ্চুকে

সে ঘরে ঢুকতে দিত না। আলাদা রান্না করে খেত আমবাগানের নিচে। প্রাচীন মানুষ যখন রাষ্ট্র সৃষ্টি করেনি, চলতো গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে, তখন যেন ঠিক এমনি ছিল! একদা প্রবল পরাক্রান্ত নেতা বৃদ্ধ অকর্মণ্য হয়ে পড়লে, পঞ্চু সর্দারের মত সেও এমনি এক পাশে অনাদৃত পড়ে থাকতো। আমেরিকাতে বুড়োদের ফেলে দেওয়া হত নেকড়ের ভোগ্য হবার জন্য।

আমি একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলুম। বাইরে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখলুম। এই সেই ছাপরা জেলা। এখানেই পঞ্চু সর্দার আর বঁকুদাসের ঘর ছিল। পঞ্চু সর্দার আর দেশে ফিরতে পারেনি কোনদিন। একদিন ভিক্ষে করতে গিয়ে কোথায় যে হারিয়ে গেল আর ফিরল না। বঁকুদাসরা চলে এসেছিল ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে, আর ফেরেনি। ভেড়ার মাথার কাছে পিঁড়ি ধরে তার শিংয়ের শক্তি পরীক্ষা করত বঁকু-দাস। দেখতো কতখানি জোর আছে। লাঠি খেলা জানতো ভাল। আমাকে শেখাতো একটু একটু। বলতো: খোকাবাবু তুমি লাঠি খেলা শেখ, ভাল পারবে। সেই বঁকুদাস কি আজ বেঁচে আছে? আঠারো বছর পরে এই স্টেশনেই সে এতগুলো মানুষের মধ্যে আছে কিনা কে বলবে! আঠারো বছরে তার পরিবর্তিত রূপ আমি চিনতে পারব না। কিন্তু আমার চোখে সে বেঁচে আছে। সেই যুবক বঁকুদাস, উন্নত দেহ, পাকানো গোঁফ, ইয়া বুকের ছাতি। আজ যদি কুঞ্চিতচর্ম কোন প্রৌঢ় এসে হঠাৎ নমস্কার করে দাঁড়িয়ে বলে: বাবু আমি বঁকুদাস, তাকে মেনে নিতে পারব কি? আর সেই বঁকুদাসই কি আমাকে চিনতে পারবে? বার বছরের যে ছেলেকে সে লাঠি খেলা শেখাতো, আজ সে ত্রিশের কাছাকাছি। আমিও কি তার কাছে হারিয়ে যাইনি? কেমন বিহ্বল, কেমন বেদনাময় মনে হল সব কিছুকে আমার। শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল আমার। অথচ এই পরিবর্তনের যে প্রয়োজনীয়তা আছে তা নিতান্ত সত্য। জীবনে যদি পরিবর্তন না হত জীবন হত বিস্বাদ, একঘেয়ে। অথচ এই পরিবর্তন আমাদের কাছে কত বেদনাদায়ক। 'সৃষ্টি, পরিবর্তন ও ক্ষয়, আবার নবজন্ম' এই নিয়েই তো জগতের নৃত্য ছন্দ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জগতের 'আনন্দ যজ্ঞ'। এই পরিবর্তন ও ক্ষয় তো নবপ্রজন্মের জন্য। গাছের ফল ঝরে গেলে যেমন বীজের মধ্যে গাছ সূক্ষ্ম থেকে স্থূল হয়ে ফুটে বেরয়, জগৎও ধ্বংস হয়ে গেলে সূক্ষ্মরূপে বীজের আকারে থেকে যায়। একে বলে সংস্কার অর্থাৎ বীজের মধ্যে সৃষ্টির বেগ। তাই থেকে আবার নতুন জগতের আবির্ভাব। সত্যকে মানুষ বুদ্ধির মধ্যে ধরতে পারলেও অজ্ঞানতার বশে প্রায়ই বিস্মৃত থাকে। একেই বলে মায়া। এই ভাবতে ভাবতে যখন অন্তরের গভীরে ডুবে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ চমক ভাঙল মিনুর কথা শুনে: ওকি সন্তুদা, অমন আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে রইল যে? ঘুমের ঘোর কাটেনি নাকি এখনো? নাকি ইতিহাসের লোক হয়ে কবির মত স্বপ্ন দেখছ?

একবার মনে হল বলি: কাব্য ইতিহাস সবকিছুই যার পায়ে সঁপে দিয়ে কূল পাইনি, সেই জীবন আমাকে বিহ্বল করে দিয়েছে মিনু। মনে হল বলি,

নজরুলের সেই গানের লাইনটি তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে : "অতীত দিনের স্মৃতি, কেউ ভোলে না কেউ ভোলে।" কিন্তু কিছু বললুম না। মিনুকে বলে কি এই মুহূর্তে আমার মনের অবস্থাটা কি বোঝাতে পারব! এ আমার নিজের, একমাত্র নিজের যে।

মিনু বলল : কৈ যাও, হাত-মুখ ধুয়ে এস।

বললুম : যাচ্ছি মিনু।

সুটকেসটা খুলে টুথ্‌পেস্ট আর ব্রাস নিয়ে ছুটলুম ল্যাট্রিনের দিকে। গাড়ীতে দেশ ভ্রমণ-বাতিকগ্রস্ত লোকের ভীড় নেই। এ গাড়ীটা যদি বাংলাদেশ থেকে এসময় কাশীর দিকে ছুটতো তবে নিশ্চয়ই ভিড়ের শেষ থাকতো না। কিন্তু বিহার থেকে তত যাত্রী বের হয় নি। যা ভিড় তা সাধারণ কম্পার্টমেন্টে। স্লিপিং বার্থে তো নেই-ই। সুতরাং ল্যাট্রিনে লাইনে দাঁড়াতে হল না। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে এলুম। এসে দেখি বীরেনদা গম্ভীর মুখে বসে আছেন। মিনুর মুখে কেমন একটা ব্যর্থতার ছাপ মাখানো। ওদের দু'জনের মুখের দিকেই একবার তাকিয়ে দেখলুম। বললুম : কি ব্যাপার?

মিনু বলল : গাড়ীর দরজা বন্ধ। বাইরে নামা যাচ্ছে না।

আমি বললুম : সেকি। T. T. C. নেই?

মিনু বলল : যাও না, দেখ। দরজার কাছে বসে আছে। দেখ একটু চা যোগাড় করতে পার কিনা। চা-ওয়ালা খাবারওয়ালা কাউকেই তো আমাদের কম্পার্টমেন্টের ত্রিসীমানায় দেখতে পাচ্ছি না।

কী ব্যাপার! একেবারে অসম্ভব বলেই মনে হল আমার কাছে। আমি দরজার কাছে বসা T. T. C. র কাছে এগিয়ে গেলুম।

T. T. C. বললেন : দরজা খুলে নিচে নামবেন না। আর জানালার শার্সিগুলো ফেলে রাখবেন।

আমি বললুম : কেন?

—এখানকার লোক ভাল নয়। দরজা খোলা পেলেই গাড়ীতে উঠে বসবে।

—সেকি। এটাতো স্লিপিং বার্থ! সবার ওঠবার নয়। তাছাড়া আপনি তো দরজাতে বসেই আছেন!

T. T. C. বললেন : ওরা আমাকে মানবে না। জোর ক'রে গাড়ীতে উঠে পড়বে। আর হাতের কাছে যে জিনিস পাবে নামিয়ে নিয়ে চলে যাবে।

—বলেন কি!

—হ্যাঁ। এমন অনেক কেস হয়েছে। তাই আমরা ছাপরা স্টেশনে বার্থের দরজা বন্ধ করে রাখি। এ কম্পার্টমেন্টের দায়িত্ব আমাদের উপর তো!

বললুম : তাজ্জব ব্যাপার তো। এটা কি মগের মুল্লুক নাকি? আইন নেই? আপনি সরুন তো, আমি নিচে নামি। চা আর জলখাবারের দরকার।

T. T C বললেন : না, আপনি দরজা খুলবেন না। বিহার বর্ডার পার হোক, তারপর U. P-র কোন স্টেশনে খাবার কিনবেন। এখানকার অবস্থা এখন ভাল নয়!

ব্যাপারটাকে ততক্ষণে আমিও কিছুটা আঁচ করতে পারলুম। বিহারে নিদারুণ খরা চলেছে এবার। সমস্ত দেশ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছে। লোকগুলো বুঝি তাই মরিয়া হয়ে উঠেছে।

T T C. বললেন : ছাপরার লোকগুলো বড় সাংঘাতিক। রাহাজানির বহু ঘটনা এখানে ঘটে। আমরা তাই বড় সজাগ থাকি।

আমি মনে মনে ভাবলুম : ছাপরা জেলার লোকেরা কি স্বাভাবিকভাবেই সাংঘাতিক, না তারা এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে? ব্রিটিশ আমলে নিশ্চয়ই এমন নিদারুণ বিশৃঙ্খলার কথা কোন যাত্রী কল্পনা করতে পারত না। আঠারো উনিশ বছর স্বাধীনতা পেয়ে ভারতবর্ষের এইসব প্রদেশে পুরানো দিনের সামন্ত বৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আইন নেই। জোতদারের লুণ্ঠন চলেছে দবিদ্রকে। গঙ্গা পার হতে পুলিশের জুলুম দেখেছিলাম স্টীমারে। সামান্য একটা পুঁটলী নিয়ে উঠেছে দেহাতী লোক। রেলওয়ে পুলিশ ঐ পুঁটলীর জন্য চাইছে চার আনা পয়সা। যা দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। লোকটার কাছে পয়সা নেই। কাঁদ কাঁদ হয়ে এসে আমাদের কাছে পড়ল। তাকে বাঁচাতে গিয়ে আমরা অনেকক্ষণ তর্ক করলুম। গোঁফে তা দিয়ে পুলিশটা একবার গুড়িয়ে গুড়িয়ে চাইল আমাদের দিকে। লোকটা বলল : 'বাবু, আপনারা ছিলেন বলে বাঁচলুম। নইলে নিচে নামিয়ে নিয়ে পুলিশটা আমাকে মারধর করতো।' অশিক্ষার ঘোর অন্ধকারে পড়ে রয়েছে বিহার। অজ্ঞতার সুযোগে তাদের উপর চলেছে নানা রকমের জুলুম—যা নাকি চলত বাদশাহী আর নবাবী আমলে।

জনস্বার্থে সরকার যে অর্থ বরাদ্দ করেন, তা সাত ভূতে লুটে খায়। মানুষের ভাগ্য যে তিমিরে সেই তিমিরে। স্বাধীনতা চলল উনিশ বছরের পথে, দেশ কি এগিয়ে গিয়েছে না পিছিয়ে গিয়েছে? পরিকল্পনা আছে, কাজ নেই। পরিসংখ্যান আছে খাতার পাতায়। বিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর সামন্ততন্ত্রের মত হৃদয়হীন শোষণের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। একদিন সেই নবাব বাদশার আমলেও জনসাধারণ এমনি করে ক্ষেপে গিয়েছিল। মনে মনে চেয়েছিল ওদের পতন হোক। তাইতো সাত সাগর তের নদী পাড়ি দিয়ে যে বিদেশীরা এসেছিল, লোকে তাদেরই বরণ করে নিয়েছিল। আইন ও শৃঙ্খলার শান্তি ওরা তবু কিছু দিয়েছিল। সে কথা অনেকেরই মনে আছে আজো। তাই পথেঘাটে নিত্য শুনতে পাই : এর চেয়ে ইংরেজ ভাল ছিল। আঠার বছর স্বাধীনতার পর প্রকৃতিই যদি নির্ভর, তা হলে পরিকল্পনাগুলো গেল কোথায়? এক খরাতেই বিহারের নাভিশ্বাস উঠেছে।

ছাপরা জেলার লোকেরা স্বভাবতই কি এমন দুর্বৃত্ত, দুর্ধর্ষ? কে জানে। এদের মাঝে তো মানুষ হই নি, এদের মাঝে এসে দাঁড়াই নি কখনো। এদের চরিত্রের উপর কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু

যখনই মনে পড়ে সেই বঁকুদাস আর পঞ্চু সর্দারের কথা, তখন যেন কিছুতেই ভাবতে পারিনে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর কতগুলো লোকের বাস বিহারের এই প্রান্তে, যারা দিনে দুপুরে লুটে খায়। আসলে লুটে খেতে বাধ্য হয়েছে ওরা। এ থেকে যদি আমাদের বর্তমান শাসকেরা কোন কিছু না শেখেন, তাহলে তাদের চোখ খুলে দেবে কে ? একদিন এ দেশের লোক অত্যাচারী নবাবের হাত থেকে বাঁচতে শ্বেতকায়দের ডেকেছিল—ফলাফল তার যাই হোক না কেন। আজকে যদি নতুন বিদেশীকে ডাকে কেউ, তার পেছনেও কি অভাবের মুখে মানুষের মনস্তত্ত্বটাকে কাজে লাগাবে না এরা ? দেশটাকে যে কে রক্ষা করবে, কে জানে !

আমি একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলুম। একটিও চা-ওয়ালা নেই। খাবার-ওয়ালার হাঁক শোনা যাচ্ছে না। তা হলে এতই খাবারের অভাব ঘটেছে এখানে যে স্টেশনে ফিরি করবার মত খাবার পর্যন্ত হাতে নেই !

আকাশে একটা রক্ত আভা। সূর্য উঠছে। স্নিগ্ধ প্রভাতের গায়ে মিহি কুয়াশা জড়িয়ে। এই ব্রাহ্ম মুহূর্তের ইন্দ্রিয়াতীত যে একটা সুর সেটা আমি অনুভব করতে পারলুম। কিন্তু উপভোগ করবার সময় নেই। বাইরে থেকে দুই চোখ ভেতরে ফিরিয়ে নিয়ে এলুম। দেখি মিনু বেশ কিছুটা এগিয়ে এসেছে। তার দুই চোখে প্রবল প্রত্যাশা। আমায় বলল : কি, নিচে নামলে ?

আমি একটু ম্লান হেসে বললুম : না।

—ব্যাপারটা কি বল তো ?

আমি বললুম : সূর্য উঠুক, ব্যাপারটা দিনের আলোর মত তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আমি সব কথা ভেঙে না বলে মিনুকে শুধু ইঙ্গিত করলুম। সে ইঙ্গিতের অর্থ মিনু বুঝল কিনা জানি না। কিন্তু আমার মনে থাকল, এবং যথা সময়ে তাকে বুঝিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত থাকলুম।

মিনু বলল : তা হলে, চা-টা কিছু পাওয়া যাবে না ?

আমি হেসে বললুম : না। বিহার পার হয়ে সেই ইউ, পি-তে যদি কিছু মেলে। কিন্তু ইউ, পি, এসে গেলে কাশী আর কতদূর। সবই বাবা বিশ্বনাথের ইচ্ছা বুঝলে মিনু। অভুক্ত থেকে বিশ্বনাথ দর্শন করাটাই কর্তব্য। তাতে পুণ্য বেশী হবে।

মিনু বলল : ও কথা রাঙামাসীকে বল। আজ সারাদিন তুমি না খাইয়ে রাখতে পারবে তাঁকে। কিন্তু বীরেনদা ?

আমি বললুম : কেন, উনিও তো তীর্থেই বেরিয়েছেন ?

মিনু বলল : এ ব্যাপারে তিনি পরম বৌদ্ধ। দেহকে কষ্ট দিয়ে সাধনা করতে রাজী নন। জান না, বীরেনদা ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধোবার পর খাবার না পেলে একদম বিগড়ে যান। ওঁর শোবার ঘরে মাথার কাছে তাই রুটি থাকে। বাড়ীর

সকলের আগে উঠে কখন যে তিনি জলযোগের পাট সারেন, সেটা কেউ জানতে পারে না। দেখ না, কেমন গম্ভীরমুখো হয়ে বসে আছেন। খাবার পাওয়া যাবে না, একথা শুনলে বোধ হয় এক্ষুনি কেঁদে ফেলবেন।

আমি বললুম : বীরেনদা সরকারী তশীলদার নন? সুতরাং তাকে সরকারেরই একজন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আহা, নিজের পেটটা দিয়ে যদি এরা অপরের পেটটার কথা বিচার করতে পারতেন, তবে ছাপরা স্টেশনে আজকে সকালবেলা খাবারের অভাব হত না। আর আমরাও গাড়ী থেকে নামতে পারতুম।

মিনু বলল : তুমি যে কি হেঁয়ালী কর, আমি কিছুই বুঝতে পারি না। বীরেনদার কাছে গিয়ে এমন করে কাব্য করতে যেও না যেন, একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যাবে।

বললুম : ঠিক আছে, বলব না।

আমরা দুজনে যথাস্থানে ফিরে এলুম। সত্যি গম্ভীর এবং করুণ মুখে বীরেনদা বসে আছেন। জানালা দিয়ে তিনি বাইরে তাকিয়ে দেখছেন। সূর্যটা বেশ লাল হয়ে উঠছে। সরকারী তশীলদার নিশ্চয়ই কবিতার স্বপ্ন দেখছেন না, বা প্রাচীন কালের ঋষিদের মত প্রভাতী সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে কোন স্তোত্র আবৃত্তি করছেন না। বরং গড়ুরের ছানার মত সূর্যটার দিকে তাকিয়ে হয়তো ভাবছেন যদি অত বড় একটা লাল ডিম হত।

বীরেনদার কথা চিন্তা করে রাঙামাসীও উদ্বিগ্ন বোধ করছিলেন। আমি আসতেই বললেন : কি রে, কিছু পেলি?

—না।

বিরক্ত রাঙামাসী বললেন : এ কেমনতর স্টেশন।

আমি বললুম : স্টেশনের দোষ নয়, এটাই গুণ মাসী।

ভ্রূ কুঁচকে রাঙামাসী আমার দিকে তাকালেন : মানে?

আমি বললুম : বিহার শেষ হয়ে এল, এখন ইউ, পি। ইউ, পি মানেই বেনারস। আর বেনারস মানেই কাশীর বাবা বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের রাজ্যে অভুক্ত প্রবেশ করতে হয়। তাই এই স্টেশনগুলোতে কোন খাবার মেলে না। এখন থেকে ইউ পি র বর্ডার পর্যন্ত কেউ খাবার বিক্রী করবে না।

রাঙামাসী সরল বিশ্বাসে এ কথাটাকেই সত্য বলে ধরে নিয়ে বললেন : তাই নাকি!

বললুম : হ্যাঁ।

যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে রাঙামাসী বললেন : জয় বাবা বিশ্বনাথ।

মিনু শুধু হাসি লুকোবার জন্যে মুখটা ফিরিয়ে ওধারে তাকাল।

বীরেনদার সমস্ত শরীরটা যেন ঝাঁকি দিয়ে উঠল। তিনি নড়ে চড়ে উঠে আমার দিকে ফিরে তাকাতে চাইলেন বোধ হয়, কিন্তু তাকালেন না।

গাড়ী ছেড়ে দিল। স্নিগ্ধ কুয়াশার মধ্য দিয়ে গাড়ী এগিয়ে চলল। ভিজে ভিজে রেল লাইন, স্টেশন, গাছপালা। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলুম। গাড়ী ধীরে ধীরে স্টেশন ছাড়িয়ে প্রান্তরে প্রবেশ করল। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া আমগাছ এখানে সেখানে। অল্প পরিচিত দেশে এই সব গাছ গাছালিরও একটা আশ্চর্য আকর্ষণ আছে।

হঠাৎ মিনুর কণ্ঠ শুনলুম : কি বলছিলে তখন সন্তুদা? সূর্য উঠলে দিনের আলোর মত কি প্রকাশ হয়ে পড়বে?

আমি বললুম : ছাপরা স্টেশনে খাবার মিলল না কেন, আর T T C কেন আমাদের গাড়ী থেকে নামতে দিল না, দরজা খুলতে মানা করল, দুই দিকে তাকালেই তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

মিনু বলল : আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

আমি বললুম : স্টেশনে নামতে দিল না কেন T T C জান? তা হলে জোর করে কামরায় কেউ উঠে পড়তে পারত, আর আমাদের জিনিস-পত্র দিব্যি নামিয়ে নিয়ে চলে যেত।

—কেন?

—কেন, সে কারণটা আমিও প্রথম ঠাহর করতে পারিনি, তবে এখন বুঝেছি। প্রথম ভেবেছিলুম, এখানকার মানুষগুলোর স্বভাবই এই—খুন জখম রাহাজানি করা। কিন্তু বিশ বছর আগের এই ছাপরা জেলার মানুষের চোখ-মুখ যখন আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠল, তখনই সে ধারণা পালটে গেল। কেন যে মানুষগুলো হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠেছে, সেটা আমি বুঝতে পেরেছি।

আশ্চর্য চোখে মিনু আমার দিকে তাকিয়ে বলল : বিশ বছর আগে তুমি ছাপরা জেলায় এসেছ নাকি?

বঁকুদাস ও পণ্ডু সর্দার, এদের কাহিনী আর ভেঙে বললুম না মিনুকে। এদের সঙ্গে যে আমার পরিচয় আছে, শুধু এইটুকু জানাবার জন্যে বললুম : হ্যাঁ।

আমার সঙ্গে ওদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আমার অতীত ইতিহাসের সব কিছুই প্রায় মিনুরা জানে বললেও হয়। এই ছাপরা জেলায় আমি কোন দিন এসেছিলুম, সে কথা এতদিন কেন ওদের বলিনি, মিনু বোধ হয় এ কথাই ভাবতে লাগল।

গাড়ী তখন স্টেশন ছাড়িয়ে অনেকদূর এগিয়ে এসেছে মাঠের মধ্যে। যা আমি সন্দেহ করেছিলুম, তাই স্পষ্ট দেখতে পেলুম। দুই পাশে রেল লাইনের ধারে ডোবা নালাগুলিতে জল নেই। অথচ এই কার্তিকে তো তারা জলে ভরে থাকে। দুই ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে শস্যের অস্তিত্ব নেই। এমন কি সবুজ এক আস্তরণ ঘাস পর্যন্ত চোখে পড়ছে না। রেললাইনের দু'ধারে কিছু কিছু যা ঘাস আছে মরে লাল হয়ে উঠেছে। ঠিক ভরা জ্যৈষ্ঠের আকাশের নিচেও প্রকৃতির এমন রুদ্র রূপ চোখে পড়ে কিনা সন্দেহ। দুই দিকে শূন্য মাঠ খাঁ খাঁ করছে। লাঙল চষা মাঠ খড়িমাটির

মত ছড়িয়ে আছে। আকণ্ঠ পিপাসায় ধরিত্রী যেন হা হুতাশ করছে। মিনুকে বললুম : দেখতে পাচ্ছ মিনু ?

—কি ?

—দুই দিকের সব কিছু ?

মিনু বলল : হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলতো ?

আমি বললুম : সূর্যের আলোর মত ছাপরা স্টেশনের রহস্যটা এখনো পরিষ্কার হয়ে যায়নি তোমার কাছে ?

আমার কথাবার্তার ঢং-এ সমস্ত ব্যাপারটাই মিনুর কাছে বোধ হয় আরো রহস্যময় হয়ে উঠেছিল। ও কিছু বুঝতে না পেরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

বললুম : সাহিত্য পড়লে বাস্তব বুদ্ধি এমনি করে হারিয়ে যায়। আমাদের বাংলা সাহিত্যটা সস্তা দরের রোমান্সের আড্ডা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিনা প্রতিবাদে বাংলা সাহিত্যের উপর এত বড় একটা অবিচার মিনু মেনে নিতে পারে না। তাই ও বলল : ইংরেজী পড়ে নিজের মাতৃভাষা, নিজের সংস্কৃতি সব কিছুর উপর তোমাদের একটা ঘৃণা জন্মেছে। তোমরা পরের মুখে নিজের সমালোচনা কর। রবীন্দ্রনাথ পড়নি ?

বললুম : রবীন্দ্রনাথ তো অতীন্দ্রিয় জগতের ইঙ্গিতে একজন উন্মাদ বলেই জানি। বুর্জোয়া ভাবাপন্ন বিলাসী কবি। বাস্তব মানুষের সঙ্গে যেমন তাঁর পরিচয় ছিল না, তেমনি ছিল না বাস্তবের সঙ্গে।

অবশ্য কথাটা আমি মিনুকে রাগাবার জন্যই বললুম। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা তা বোধ হয় রবীন্দ্রভক্তদেরও ছাড়িয়ে যায়। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' ; একথা যে কবি বলতে পারেন তিনি বাস্তব বিমুখিন একথা নিশ্চয়ই কেউ বলবে না। তারও চেয়ে বড় সত্য তিনি আবিষ্কার করেছিলেন অন্তর্জগতে, যে সত্য বিজ্ঞানীদের সত্যজ্ঞানের সঙ্গে একেবারে মিলে যায়। বিশ্বজগৎ উৎপত্তির যে তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ তাঁর বলাকা কাব্যের 'চঞ্চলা' কবিতায় দিয়েছেন। তা আজ Big Bang তত্ত্বের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। 'চঞ্চলা' কবিতার এই লাইন কয়টি মনে পড়ল :—

> 'স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে
> বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
> পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে
> আলোকের তীব্র ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণ স্রোতে
> ধাবমান অন্ধকার হতে।'

'ধাবমান অন্ধকার হতে' শব্দ কয়টি তো অধুনা Astrophysics পড়লে রীতিমত চমকে যেতে হয়। সেখানে বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে :—Three thousand years after Big Bang first atoms were born. Before that light could *not travel through space because it would be then absorved by*

the gravitational field অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের তিন লক্ষ বছর পর প্রথম অণু তৈরী হয়। এর আগে আলো দর্শনীয় হবার উপায় ছিল না, কারণ মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র তাকে আত্মস্থ করে রেখেছিল। অথচ এই অবস্থার মধ্য দিয়ে যে শক্তিস্রোত প্রবাহিত হয়েছিল তাঁকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ধাবমান অন্ধকার।' কবিমানসে পদার্থবিদ্যার এমন বাস্তব সত্য যাঁর ধরা পড়তে পারে, তাঁকে অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বানে উন্মাদ বলার মত বাতুলতা আর কি হতে পারে। সাধারণ অর্থে বাস্তব অপেক্ষাও এক্ষেত্রে তিনি অতিবাস্তব। তাঁকে বুর্জোয়া ভাবাপন্ন বিলাসী কবি বলার মত মূর্খামি আর কি হতে পারে। এ সব জেনেও শুধু মিনুকে চটাবার জন্যই আমি কথা কয়টি বললুম। এতে মিনুর মনে কি ধরনের ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া ঘটে সেটা পরখ করার জন্যই এমন ধরনের মজা করলুম আমি। মিনুর প্রতিক্রিয়া আমার চিন্তার মত অতদূর না গেলেও সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সাধারণ বাস্তবতা স্মরণ করে ফুটে বেরুলো। সে বলল: এই নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করে আমার লাভ হবে না সন্তুদা। গোরাতে, চোখের বালিতে, শেষের কবিতায়, কালান্তরে, অজস্র প্রবন্ধে এমন কি বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথের যে বাস্তব জ্ঞান ফুটে উঠেছে, তাকে যারা ভাববিলাস বলে ভাবে—তাদের বাস্তব বুদ্ধির স্ট্যান্ডার্ডের সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা। রবীন্দ্রনাথ বাদ দাও। কিছু মনে কোর না সন্তুদা—রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা তোমার এক্তিয়ারের বাইরে বলে মনে করি আমি। রবীন্দ্রনাথ ছেড়ে আর সবার কথাই বলছি আমি। শরৎচন্দ্রকে কি বলবে তুমি?

—রবীন্দ্রনাথের চেয়েও ভাববিলাসী।

কপাল চাপড়ে মিনু বলল: সাহিত্য নিয়ে তোমার সঙ্গে আর তর্ক করতে রাজী নই আমি। ইতিহাস নিয়ে পড়েছ বলেই বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক খবর না রাখাটাকে গৌরবের মনে কোর না।

এতটা রেগে গিয়েছিল মিনু যে, আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সে আবার বাইরে তাকাল।

তার ভাবখানা এই যে, এ নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করাও পাপ। কিন্তু আমিও সৎ কথা বলতে পেসে ছেড়ে দেব, এমন নই। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এমন উদ্ভট কথাটা জেনেও মিনুকে রাগাবার জন্যেই বলেছি। কারণ কয় বছর আগে পর্যন্ত প্রগতিশীল কম্যুনিস্টরা রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি বলেই অভিহিত করত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাদ দিয়ে শরৎচন্দ্র সর্বাংশে বাস্তববাদী ছিলেন, এটা আমি স্বীকার করতে রাজী নই। বরং যেখানে খাঁটি বাস্তবের চিত্র তিনি উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছেন, সেখানেই ব্যর্থ হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্র আজীবন একটা বঞ্চিত মানুষ। সেই বঞ্চনার অভাবটা রোমান্সের মধ্য দিয়ে তিনি পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন। কি স্নেহের, কি ভালবাসার সর্বক্ষেত্রেই ঐ এক রূপ। তাই বলে একেবারেই বাস্তবতা তাঁর মধ্যে নেই এ কথা বলব না। কিন্তু বাস্তবতার মধ্যে শরৎচন্দ্রের শিল্প-সার্থকতা

ফোটেনি, ফুটেছে স্বপ্নের মধ্যে। নারায়ণী, বিন্দু আর রাজলক্ষ্মী এবং সমগোত্রীয় চরিত্র বাস্তবজগতের রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায় না। যা হলে বঞ্চিত মন তৃপ্ত হত শরৎচন্দ্র সেই চিত্র আঁকতে পেরেছেন বলে বাংলাদেশের পাঠকের মনের এত কাছাকাছি আসতে পেরেছেন। কারণ শরৎচন্দ্রের ঐ আকাঙ্ক্ষা শতকরা একশজন পাঠকেরই মনের আকাঙ্ক্ষা। বাস্তব সেই আকাঙ্ক্ষার মত কাজ করে না বলেই এত নির্মম, অপ্রিয়। সেই অপ্রিয় সত্যকে যথাযথ তুলে ধরলে পাঠক কতদূর তাকে গ্রহণ করতো, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমি মিনুকে বললুম: মিনু, মুখ ফিরিয়ে থেকো না। আমার একটি কথার জবাব দাও। শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলি কি তাঁর বঞ্চিত মনের স্বপ্ন-প্রসূত নয়?

মিনু মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল। তার দুই চোখে তীব্র ব্যঙ্গের ঝলক দেখতে পেলুম। কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে ও বলল: তাহলে শরৎচন্দ্র কিছু কিছু পড়েছ দেখছি? তা এ নিয়ে একটা থিসিস লিখলেই তো পার সন্তুদা। বুঝতে পারছি শরৎচন্দ্র বুঝবার মত মনও তোমার নেই। বাদ দাও শরৎচন্দ্র। তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আর একালের বাংলা ছোট গল্প পড়েছ তো? বাস্তব চিত্র কি তাদের সাহিত্যের মধ্যেও পাওনি তুমি?

এবার কিন্তু মিনুকে রাগাবার জন্যেও কোন কথা বলতে পারলুম না আমি। তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, এদের রচনার বাস্তবতাকে রহস্য ছলেও অস্বীকার করা যায় না। তবু আমি সহজে মিনুর কথা স্বীকার করে নিলুম না। কারণ একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আমার ছিল। বললুম: মিনু, তর্কে হবে না। তুমি বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার একটা সত্যিকারের প্রমাণ আমাকে দাও দেখি।

মিনু প্রশ্নবোধক একটা দৃষ্টিতে মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললুম: দুই পাশে মাঠের দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখ। এ দৃশ্যের বাস্তব বর্ণনা বাংলা সাহিত্যের কোন উপন্যাসে বা গল্পে আছে?

মিনুর চোখে-মুখে হাসির একটা ঝলক খেলে গেল। ও বলল: সন্তুদা, শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্প পড়েছ?

সত্যি আমি একটু লজ্জা পেলুম।

কিন্তু আমাকে আর কোন কথা বলতে না দিয়ে মিনু বলল: শরৎচন্দ্র থাক। শরৎসাহিত্যে যখন তোমার রুচি নেই, তখন অন্য আর একজনের কথাই পাড়ছি। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সেই চিত্র মনে কর তো।

আমি যেন প্রায় আনন্দে ফেটে পড়লুম: থ্রি চিয়ার্স ফর মিনু। সত্যি আনন্দমঠের সেই চিত্রের সঙ্গে এর হুবহু মিল আছে। ঐ চিত্রটা আমার স্মরণে এতক্ষণ আসেনি। বললুম, মিনু, আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা সেই দুর্ভিক্ষের দিনে কি করেছিলেন?

—স্বদেশী ডাকাতি। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

—ছাপরা জেলার এই লোকেরা আজকের দিনে কেন ও পথ বেছে নিয়েছে সেটা বুঝতে পেরেছ ?

মিনু দুই চোখ কপালে তুলে বলল, তাই বল। এতক্ষণে তোমার কথার ইঙ্গিত বুঝলুম সন্তুদা। সত্যি সহজ কথাকে তুমি এমন ঘুরিয়ে বলতে পার !

বললুম, এবার দিনের আলোর মত সব কিছু তোমার কাছে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ?

মিনু বলল, কিন্তু এই আলো দেখাবার জন্য এতক্ষণ তুমি আমাকে আরো অন্ধকারের মধ্যে টেনে নিচ্ছিলে। তোমাদের ইতিহাস কি এমন ঘোরপ্যাঁচের মধ্য দিয়ে চলে নাকি সন্তুদা ?

সে কথার আমি আর কোন জবাব দিলুম না। ইতিমধ্যে বাস্তব মানুষ বীরেনদা প্রকৃতির এই অতি বাস্তব রূপ দেখে তাঁর নিজের বাস্তব ক্ষুধাটাকেও বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি একটা আর্ত চিৎকার করে উঠলেন, কী সর্বনাশ !

রাঙামাসী ভয় পেয়ে বীরেনদার দিকে তাকালেন। কি হল বীরেন ? বীরেনদা বললেন, এ যে দেখছি মরুভূমি হয়ে গেছে। মাঠে একটা ঘাস পর্যন্ত নেই। ধূধূ করছে। এত খরা হয়েছে বিহারে ! সর্বনাশ ! দুর্ভিক্ষ এবার অনিবার্য। আমাদের দিয়ারাতেও এবার বৃষ্টি হয়নি। কিন্তু তাই বলে এমন অবস্থা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা তো এ তুলনায় স্বর্গে আছে।

মাঠের দিকে আবার তাকালুম। রোদের কমলা রঙ মরে গেছে। গলিত রূপোর স্রোতের মত রোদের ধারা এসে পড়েছে বিহারের মাঠে। সকালবেলার এক প্রহর রোদের মধ্যে যেন আগুন ঝরছে। মাঠের বুকে ধুলো উড়ছে। ধূধূ করছে সব।

বেদুইন হয়ে আরব মরুভূমির বুকের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়াইনি। এর চাইতেও নির্মম কিনা সে মরুভূমি কে জানে। ইতিমধ্যে কৃষকেরা মাঠে নেমেছে। ছোট ছোট কুয়ো থেকে গরু দিয়ে জল টেনে মাঠে ঢালছে। বাঁচবার জন্য শেষ প্রয়াস মানুষকে করতেই হবে। মনে মনে বললুম, মানুষের জয় হোক। হতাশার কাছে মানুষ আত্মসমর্পণ করেনি।

গাড়ী চলেছে। কোথাও কিছু নেই। মাটির ঘর আর খড়ের চাল মাঝে মাঝেই নজরে পড়ছে। নির্মম সূর্যের খরতাপ যেন তাদেরও রস নিঃশেষে শুষে নিয়েছে। এই শূন্যতাময় ভূমির উপর দিয়ে গাড়ী এগিয়ে চলেছে ইউ. পি.-র দিকে। এই জ্বালাবহ নির্মম দৃশ্যেরও যেন একটা আকর্ষণ আছে। আমার দৃষ্টিকে কী এক জাদুমন্ত্রবলে যেন হাহাকারভরা এই শূন্যমাঠ আটকে রাখল। গাড়ী ততক্ষণে আরও দু একটা স্টেশন ছাড়িয়ে গেছে। সর্বত্রই এক দৃশ্য। রোদে ঝলছে খাওয়া সীমাহীন ধূধূ মাঠ। এমন দৃশ্য কদাচ চোখে পড়ে। তবে উত্তরপ্রদেশের সীমানা বরাবর যখন এলুম তখন মাঝে মধ্যে নিতান্ত দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কি সব শস্যের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম। ওটা কি গাছ বুঝতে পারলুম না। এ বিষয়ে বীরেনদা

অভিজ্ঞ। দেহাতে, গ্রামে তিনি মানুষ। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে বললেন, ওগুলো অড়হর ডালের গাছ।

এই শুষ্ক মাঠের বুকে নিবিড় সবুজ ছায়া মেলে কি করে ওরা দাঁড়িয়ে আছে ভেবে অবাক লাগল। পালামৌতে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় পাথরের বুকে বটগাছ দেখে বংসা করেছিলেন। থরাক্লিষ্ট উত্তরপ্রদেশও। এই মাঠে সবুজ অড়হর গাছ দেখলেও তিনি ওব চাইতে কম আশ্চর্য হতেন না।

মাঝে মাঝে আরো দূরে আখ খেত নজরে পড়তে লাগল। কিন্তু প্রচুর রস যে ঐ আখের মধ্যে আছে তা মনে হল না। তবু কিছু রস নিশ্চয়ই হবে। সে রস এই আখগাছগুলি কোথা থেকে সংগ্রহ করছে কে জানে।

মিনুকে বললুম, দেখ, দেখ।

—কি ? মিনু আমার দিকে তাকাল।

বললুম, দেখ মরুভূমির বুক থেকেও রস শুষে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আখ আর অড়হর। সত্যি রসজ্ঞ ওরা কি বল ?

বীরেনদা বললেন, বিহার উত্তরপ্রদেশের এই অঞ্চল আখ আর সরষের জন্য বিখ্যাত। যত চিনির কল দেখবে এখানে। তবে এবার আখের যা নমুনা দেখছি তাতে চিনি আর খেতে হবে না। কোথাও তো একটা সরষে ফুল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না।

আমি বললুম, সেকি। আমি তো সর্বত্রই সরষে ফুল দেখছি।

রাঙামাসী সব কথাই শোনেন, কিন্তু নিজে কথা বলেন কম। কোনটা মনের মত হলে তবে তিনি জবাব দেন। সরষে ফুলের কথা শুনে বললেন, কৈ ? কোথাও তো দেখছি না ?

আমি বললুম, আমি কিন্তু সর্বত্রই দেখতে পাচ্ছি।

রাঙামাসী বললেন, বাজে কথা। সরষে ফুল হলুদ, চোখে পড়ত না আমার ?

মিনু বলল, রাঙামাসী তুমি সন্তুদার কথায় কান দিও নাতো। ও'রা অধ্যাপক মানুষ। সহজ করে কোন কথা বলতে জানে না। সহজ জিনিসটাকে কঠিন করে বিভ্রান্তি জাগিয়ে আনন্দ পায়।

রাঙামাসী বললেন, কি জানি বাপু, কিছু বুঝিনে। সরষে ফুল হলে কি আর চোখে দেখতুম না !

মিনু হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ট্রেনের মধ্যেও তুমি অধ্যাপনা করে চলেছ। সত্যি সরষে ফুল দেখিয়ে ছাড়লে সবাইকে।

আমি বীরেনদার দিকে তাকিয়ে বললুম, সত্যি বলেছি কিনা বীরেনদা আপনিই বলুন ? এই মাঠের দিকে তাকিয়ে কৃষক চোখে সরষে ফুল দেখবে না ?

এবার কথার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে বীরেনদা হোহো করে হেসে উঠলেন, তাই

বল। তুমি যে আবার কথার মধ্যে এমন প্যাঁচ কষেছ সেটা কি আমরা ধরতে পেরেছি। আমরা দেহাতি মানুষ, সহজে চলি, সহজ বুঝি।

মিনু হেসে তাকাল আমার দিকে। বীরেনদা এতক্ষণে যে আমার কথার সূক্ষ্ম রসটুকু ধরতে পেরেছেন তাতেই তার আনন্দ। এবার সে নিজেও একটি সূক্ষ্ম রসের অবতারণা করল। বলল, বীরেনদা তুমিও চোখে সরষে ফুল দেখছ কিনা বল।

বীরেনদা মিনুর দিকে তাকালেন, মানে?

মিনু বললে, সেই ছাপরা স্টেশনে ভোর হয়েছে। হাত মুখ ধুয়ে বসে আছ। বেলা এখন নটা। এতক্ষণ পেটে কিছু না দিয়ে চোখে তুমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ, এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

বীরেনদা হেসে বললেন, তা যা বলেছ বোনটি। পেটের ভেতর হ্যাচর প্যাচর করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। কোথাও তো কোন আশার আলোও দেখছি না। খাবার বোধ হয় মিলবে না।

রাঙামাসী বললেন, সন্তু যে বলল, কাশীর আগে কোন স্টেশনে খাবার মেলে না? অভুক্ত হয়ে কাশী যেতে হয়?

মিনু কপট ক্রোধে রাঙামাসীর দিকে তাকিয়ে বলল, সন্তুদার কথা বাদ দাও। ওঁর ইতিহাস-শাস্ত্রে এ সব লেখা থাকতে পারে আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে নেই। তুমি দেখো মাসীমা, সামনের স্টেশনে কিছু না কিছু খাবার মিলবেই।

বীরেনদা দুই কর কপালে যুক্ত করে বললেন, জয় বাবা বিশ্বনাথ, মিনুর কথা যেন সত্য হয়।

কথা বলতে বলতে আশ্চর্যভাবে গাড়ীর গতিও শ্লথ হয়ে এল। বুঝতে পারলুম, স্টেশন অদূরবর্তী। বললুম, মিনুর প্রার্থনা তড়িঘড়ি বাবা বিশ্বনাথ কানে নিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। মনে হয় কোন স্টেশন এসে গেল।

জানালার বাইরে মুখ গলিয়ে বীরেনদা বললেন, হ্যাঁ, স্টেশনই। জয় বাবা, কিছু যেন মেলে।

গাড়ী থামল। ছোট্ট স্টেশন। আগ্রহে মিনু আর বীরেনদা স্টেশনের দিকে পা বাড়ালেন। ভেন্ডারের ডাক শোনা যাচ্ছে। কিন্তু একটি মাত্র চিৎকার শোনা যাচ্ছে :— এই কেলা, কে-এ-এ লা।

দাম খুব বেশী নয়। বীরেনদা একবারে দু'ডজন কিনে ফেললেন। কিছু তো একটা পেটে দেওয়া যাবে। এতেই তিনি সন্তুষ্ট।

আমি মিনুর মুখখানা ভাল করে দেখে নিয়ে বীরেনদার দিকে তাকালুম। এ কেমন হল? বাবা বিশ্বনাথ মিনুর প্রার্থনা শুনেছেন বলে তো মনে হচ্ছে না। এ পদার্থ তো তাঁর ভক্তদের তিনি দেন না। এটা তো—। আচ্ছা বীরেনদা আমরা বোধহয় বিহার ছাড়িয়ে ইউ. পি.-র মধ্যে ঢুকে পড়েছি, তাই না?

একটা কলা মুখে পুরতে পুরতে বীরেনদা বললেন, কেন ?

বললুম বাবা বিশ্বনাথ নয়। অযোধ্যার রাজা মিনুর প্রার্থনা শুনেছেন বলে মনে হচ্ছে। তাই তিনি ভক্তের জন্য ..

মিনুর মুখ লাল হয়ে উঠল, সন্তুদা তুমি বক্‌বক্‌ থামাও তো !

বীরেনদা একগুচ্ছ কলা মিনুর দিকে বাড়িয়ে দিলেন, খাও ।

মিনু কৃত্রিম গাম্ভীর্য মুখে টেনে বলল, না।

বীরেনদা বললেন, নাও, কলাগুলো ভাল। বেশ মিষ্টি।

মিনু আরো মুখ গোঁজ করে বসল।

একেই বলে মিষ্টি অভিমান। বললুম, আমি আমার কথা উইথড্র করে নিচ্ছি মিনু। এবার তুমি নির্বিঘ্নে নিতে পার।

মিনু তবু কোন আগ্রহ দেখলো না।

অগত্যা বীরেনদার কাছ থেকে দুটো কলা আমি নিজে নিয়ে তার একটি মুখে পুরে লললুম, এবার তুমি নিতে পার মিনু। কারণ, রামচন্দ্রের ভক্তের কাজ আমি নিজেই গাবলুম।

মিনু বলল, সে কথাটা নিজের মুখে স্বীকার করলে বলে খুশি হলুম।

বললুম, এবার তা হলে নাও।

হাত বাড়িয়ে বীরেনদার কাছ থেকে মিনু দুটো কলা নিল।

গাড়ী তখন চলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। চাকার শব্দ হচ্ছে ঝক্‌ঝক্‌ ঝকাঝক্‌। কন্তু আমার যেন মনে হল, শব্দ বলছে ঃ—চল কাশী, চল কাশী। মিনুকে বললুম, ার বেশী দেরি নেই, গন্তব্য স্থানে এসে গেছি।

—কি রকম ?

বললুম,—গাড়ীর চাকার শব্দ শোন। দেখ, ঠিক যেন শব্দ হচ্ছে—চল কাশী, ল কাশী।

মিনু বলল, ভক্ত বোঝাই গাড়ী মুক্তি পেয়ে যাবে।

বললুম, পাবেই তো। রাঙামাসীর দিকে তাকিয়ে বললুম, মাসীমা তুমিই বল, শীর ধুলির স্পর্শ যার গায়ে লাগে সে মুক্তি পায় না ? তাহলে যে গাড়ীটা রোজ জ কাশী আসছে তার মুক্তি নেই ?

রাঙামাসী হেসে বললেন, নিশ্চয়ই আছে।

মিনু বলল, মাসীমা অমন কথা বোল না। গাড়ী মুক্তি পেলে কোথায় যাবে জান া ? কাটিহার স্টেশনের পশ্চিমে যে ভাগাড় আছে, সেখানে। ভাঙাচোরা গাড়ী পড়ে াার জায়গায়। তাহলে গাড়ী মুক্তি পেলে সেইখানে পড়ে থাকুক, তুমি চাও ? শিবের শীর ধুলির স্পর্শে এইটুকু মোক্ষ লাভ হবে নাকি ?

রাঙামাসী মিনুকে তিরস্কার করে বললেন, ছিঃ ছিঃ ! ধর্মস্থানে যেতে যেতে কী আজেবাজে কথা বলছিস মিনু।

বললুম, এদের নিয়ে তীর্থে আসাও পাপ মাসীমা।

মিনু আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আহা! কী ধার্মিকরে আমার! মনে মনে তো সর্বক্ষণ কল্পনা করা হচ্ছে দিল্লীর বিবিদের। অবশ্য কথাটা সে খুব আস্তে করেই বলল।

মনে মনে একটু হাসলুম আমি, তারপর বাইরে তাকালুম। গাড়ীর দুইপাশ দিয়ে নতুন দেশ চলে যাচ্ছে। সেই নতুন দেশের আকর্ষণ এড়িয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এই তাহলে উত্তরপ্রদেশ! এ প্রদেশে আসার জন্য অনেক দিন থেকেই আমার ইচ্ছে ছিল। হিন্দু সংস্কৃতি এক বিশেষরূপে এখানে রক্ষা পেয়েছে। অথচ এক-কালে মুসলমান সংস্কৃতির কেন্দ্রও ছিল এখানেই। এই তো সেদিন! সুজাউদ্দৌলা এখানে রাজত্ব করে গেছেন। দিল্লী আগ্রা থেকে আরম্ভ করে উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত মুসলিম ইতিহাস একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত হয়ে আছে। কিন্তু এই উত্তরপ্রদেশ চিরকালই উর্বর প্রদেশ বলে জানি। ভারতবর্ষব্যাপী যখন সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, দিল্লীর মানুষ যখন ড্রেনে পড়ে থাকা মরা ঘোড়ার মাংস খেতে বাধ্য হয়েছে। পশুর রক্ত খেয়েছে। গরুর চামড়ার তরকারীকেও দুর্মূল্য বলে ভেবেছে। সেদিন নিজেকে এবং নিজের সেনাবাহিনীকে বাঁচাবার জন্য মহম্মদ বিন তুঘলককে সবাহিনী এখানে এসে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সেই প্রদেশেরও আজ কি অবস্থা! নালা ডোবায় জল নেই, মাঠে শস্য নেই। চতুর্দিকে অপার শূন্যতায় এক বিরাট বিস্তার। তৃণলতা গুল্ম পর্যন্ত চোখে পড়ছে না। কিন্তু এই বিরাট নির্মম দৃশ্যেরও একটা আকর্ষণ আছে যেন। আমি মুগ্ধ হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে থাকলুম।

গাড়ী চলেছে। আকাশে সূর্য আরো অনেক উপরে উঠে গেছে। বেলা বারোটা এখন। চোত বোশেখের মত আগুন ঝরছে। দুই পাশে কোথাও মনোরম দৃশ্য কিছুই চোখে পড়ছে না। হঠাৎ এমন সময় গাড়ীর গতি আবার শ্লথ হয়ে এল। গাড়ী বোধহয় কোথাও থামবে। সামনে বোধহয় স্টেশন। গলা বাড়িয়ে বাইরে তাকালুম। সত্যি, সামনে একটা স্টেশন। খুব বড় নয় কিন্তু অত্যন্ত সুসজ্জিত। ঝকঝকে তকতকে মনে হচ্ছে। গাড়ী এসে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে থামল। সাজানো-গোছানো একটা ছবির মত স্টেশন। সামনে দক্ষিণ ভারতের গোপুরমের মত প্রবেশপথ। লনে সবুজ ঘাস। সিজন ফ্লাওয়ারও আছে! মরুভূমির মধ্যে সুন্দর মরূদ্যানের মত এটা কি? তাকিয়ে প্লেটে নাম দেখলুম সারনাথ।

তাহলে কাশীর কাছে এসে গেছি। ভারতবর্ষের অতি প্রাচীনকালের একটা সুর যেন আমার দেহতন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চোখের উপর ভেসে উঠল গৌতম বুদ্ধের মূর্তি। এই তো সেই সারনাথ যেখানে বোধি লাভ করার পর সিদ্ধার্থ এসে প্রচার আরম্ভ করলেন তাঁর সম্যক জ্ঞানের কথা, যেখানে পাঁচজন শিষ্য এসে তাঁর

সঙ্গে যোগদান করলেন, যেখানে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্ঘের উৎপত্তি হন। আড়াই হাজার বছরের আগের ইতিহাস আজো এখানে বেঁচে আছে।

কোথায় তবে পরম যোগীপুরুষের চিহ্ন? আমার ব্যস্তচক্ষু এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল। স্টেশনের পেছনে দূরে দেখতে পেলাম প্রাচীন স্তূপ। ভেঙে গেছে। হ্যাঁ, অত্যন্ত প্রাচীন বলেই মনে হয় তাকে। পাশে নতুন অট্টালিকাশ্রেণী। তাহলে ঐ কি সেই প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ? সঙ্গে সঙ্গে আমার মন যেন দু হাজার বছর পেছিয়ে যেতে চাইল। লুব্ধ দৃষ্টিতে আমি প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে থাকলুম।

সারনাথ স্টেশনের শিল্পসমৃদ্ধ রূপ সকলকেই আকর্ষণ করেছিল। রাঙামাসী, বীরেনদা, মিনু সকলেই সেদিকে তাকিয়ে ছিল। বীরেনদা বললেন, বাঃ! সুন্দর সাজানো স্টেশন তো! এটাকে এত সাজিয়েছে কেন?

বললুম, এটা যে পরম পুণ্যতীর্থ বীরেনদা। ঐতিহাসিক স্থান। এখানেই ভগবান তথাগত বোধি লাভ করে প্রথম তাঁর সঙ্ঘ গড়ে তোলেন। আজ থেকে অড়াই হাজার বছর আগের কথা। দেখুন দূরে সেই প্রাচীন ভারতবর্ষের অস্তিত্ব। পুরনো জীর্ণ স্তূপটিকে ওঁদের দেখালুম।

মিনু বলল, নামতে ইচ্ছে করছে।

বীরেনদাকে বললুম, নামবো নাকি?

বীরেনদা বললেন, না, টিকিট কেটেছি বারাণসীর। বরং কাশী থেকে একদিন এসে দেখে যাওয়া যাবে।

আমার আর মিনুর উদ্বেল দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে থাকল প্রাচীন স্তূপের দিকে। বীরেনদা টিকিট দেখে মাইলের হিসেব করে বললেন, কাশী তো খুব কাছে দেখছি। সেখান থেকে একটা রিকশা করেও একদিন এসে ঘুরে দেখা যাবে।

মিনু বলল, এখানে কিন্তু আসা চাই-ই বীরেনদা।

বীরেনদা বললেন, নিশ্চয়ই আসব। আগে কাশী গিয়ে একটা থাকার ব্যবস্থা করি তো।

মিনু বলল, স্টেশনটা এত সাজানো কেন সন্তুদা?

বললুম, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রান্ত থেকে বৌদ্ধেরা এখানে পরিব্রাজনে আসেন। ইতিহাস-সন্ধানী পণ্ডিতেরাও আসেন। তাই ভারত সরকার জায়গাটাকে এত সাজিয়ে রেখেছেন।

গাড়ী বেশীক্ষণ দাঁড়ালো না। অথচ দাঁড়ালে যেন কত ভাল হত। কত বছরের হারানো অতীত যেন জড়িয়ে জড়িয়ে উপরে উঠছিল আমার চেতনাতে। মনে হচ্ছিল, নামি। নেমে দেখি। এর ধুলো অঙ্গে মেখে নি। কিন্তু গাড়ী দাঁড়াল না। চলতে আরম্ভ করে দিল। পেছনের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলুম আমি। এক সময়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল সারনাথ। একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লুম। কিন্তু কাশীও যে এসে গেছে টের পেলুম। উঁচু নিচু মাটির ঢিবি এদিকে ওদিকে। নালা। ছোট

ব্রীজ। শ্বেত বরাহ। যেন ইতিহাসের গন্ধেভরা এক নতুন জগৎ। নতুন। শুধু নতুন। আমি প্রাণ মনভরে দেখতে লাগলুম।

গাড়ীর বেগ ততক্ষণে কমে এসেছে। ছোট ছোট মন্দির এদিকে ওদিকে অনেক। কিন্তু আশ্চর্য। কোন মন্দিরেরই গগনচুম্বী শীর্ষদেশ নেই। ছোট, খুব ছোট ছোট মন্দির সব। কিছু আগে থেকেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু মন্দির নজরে পড়ছিল। প্রত্যেক মন্দিরের উপরই ত্রিশূল। এই ত্রিশূল কেন? আগে আমার ধারণা ছিল ত্রিশূলের সঙ্গে সঙ্গে তার যুক্ত হয়ে মাটিতে লেগে থাকে। অর্থাৎ বজ্রপাত ঘটলে যেন বিদ্যুৎতরঙ্গ মাটিতে চলে যেতে পারে সেই জন্য এই ব্যবস্থা। তবে সেক্ষেত্রে ত্রিশূল না দিয়ে অন্য কিছু দিলেও তো চলতো। এর পিছনে একটা অধ্যাত্ম তত্ত্ব নিশ্চয়ই কাজ করছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মধ্য ত্রিশূলের উপরে বহু ক্ষেত্রেই রয়েছে নক্ষত্র জাতীয় ছাঁচ। এটাই ত্রিশূলকে একটি গূঢ় অর্থ প্রদান করেছে। এই নক্ষত্র হল শূন্য থেকে ফুটে ওঠা বিস্ফোরণজাত আলো—যা অনেক Astrophysicists-এর মতে Black hole থেকে বিস্ফোরিত আলো। এটাই ভারতীয় ভাষায় সৎ শূন্য) চিৎ (বিস্ফোরণের আবেগ) আনন্দ (বিস্ফোরণজাত আলো, বিন্দু)-এর আনন্দ অংশ। এখানেই সত্ত্ব রজঃ তমোরূপ গুণক্ষোভ দেখা দেয়। তার থেকে ধীরে ধীরে অবতারিত হয়ে মন্দিররূপ জগতের প্রকাশ ঘটে, যে জগৎ সূক্ষ্ম থেকে স্থূল নানা প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত। এই জন্য ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্যের দেহে সর্বত্র জীবনলীলার বিচিত্র দৃশ্য! সত্ত্ব রজঃ তমোই হল সৃষ্টির মৌল উপাদান। অধুনা বিজ্ঞানও সেকথা স্বীকার করে নিয়ে বলেছে যে, জগতের মৌল-উপাদান তিনটি fundamental particles এর চেয়ে বেশি হলে হিলিয়াম গ্যাসে জগৎ এত উত্তপ্ত হত যে, প্রাণের সঞ্চার সম্ভব হত না। আর দুই হলে, ম্যাটার ও অ্যান্টিম্যাটার থাকলে অর্থাৎ দুইয়ের সংঘাতে সব ধ্বংস হয়ে যেত। ত্রিশূল হয়তো সত্ত্ব রজঃ ও তমেরই প্রতীক। গভীরভাবে সেই কথা ভাবতে ভাবতে চোখ মেলে তাকালুম। সেই মন্দিরগুলো এখন যেন আরও ঘন আর নিবিড় হয়ে দেখা দিল। এক এক দেশে এক এক ধরনের স্থাপত্য। উড়িষ্যাতে সব মন্দিরের চূড়া আর গঠনপ্রণালী প্রায় এক। পশ্চিমবঙ্গের মন্দিরের ধরন আর একরকম। এই বুঝি তাহলে কাশীর মন্দিরের প্যাটার্ন? মন্দিরের চুড়ো, বাংলাদেশের মন্দির-চুড়োর মত চৌকোণ। বাংলা চালাঘরের মত নয়। উড়িষ্যার মন্দিরের অঙ্গশিখর বা গোলাকৃতি অমলকও নেই এতে। তত কারুকার্যও নেই। ক্রমশ সুচোল শির ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। কাশীর সকল মন্দিরের টাইপই হয়তো এই। আমি কাশীর প্রাণকেন্দ্র বিশ্বনাথ মন্দিরের চূড়া ও ধ্বজা দেখার জন্য ইতস্তত তাকাতে লাগলুম। নিশ্চয়ই সেই বিশাল মন্দিরের চূড়া অভ্রভেদী শীর্ষে ধ্বজা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, যাকে অনেক দূর থেকে নজরে পড়ে। গাড়ী এগিয়ে চলেছে। দেখতে পাচ্ছি হাতের নাগালের মধ্যে পুরনো স্টেশন। হিন্দুর মোক্ষধাম কাশী। কিন্তু কই, সে মন্দিরের চূড়ো কই! অভ্রভেদী তার সেই শীর্ষদেশ কোথায়? কবি সত্যেন দত্তের 'বারাণসী' কবিতার আরম্ভের কথা মনে পড়ল :—

'যাত্রীরা সবে বলিয়া উঠিল : দেখা যায় বারাণসী।
চমকি চাহিনু, স্বর্গ সুষমা মর্ত্ত্যে পড়েছে খসি।
এপারে সবুজ বজরার ক্ষেত, ওপারে পুণ্যপুরী,
দেবের টোপর দেউলে দেউলে কাঁপিছে কিরণ-ঝুরি।।

স্বর্গ দেখিনি, তার সুষমা কি করে কল্পনা করি? তবে মনে মনে এক অপূর্ব শিহরণ লেগেছে সন্দেহ নেই। স্বর্গের সুষমার সঙ্গে এ শিহরণের তুলনা হয় কিনা জানি না। সবুজ বজরার ক্ষেত হয়তো আমাদের পাপে আজ আর নেই। ১৯৬৬ সালের অক্টোবরের কাশী, সেখানে এখন শুধু ধুসর মাঠের হাহাকার। ওপারে পুণ্য পুরীর রেখা দেখছি। কিন্তু কোথায় সেই মন ভোলানো বিস্ময় জাগানো দেব দেউলের টোপর? তবে কি পাপ নয়নে সে টোপর আমার নজরে পড়েনি?

মিনুকে বললুম, মিনু, তুমি কি বিশ্বনাথের মন্দিরের চুড়ো দেখতে পেয়েছ?

মিনু বলল, কই, নাতো কোথায়?

বললুম, আমিও তো তাই খুঁজছি। সত্যেন দত্তের কবিতা মনে পড়ছে না :

'দেবের টোপর দেউলে দেউলে কাঁপিছে কিরণ-ঝুরি?'

মিনু বলল, বাবা! তোমার কত কিছু মনে পড়ে সন্তুদা। এ কবিতাটির কথা আমার একবারও মনে পড়েনি।

বললুম, তা মনে পড়বে কেন। দুদিন পরে যে অধ্যাপিকা হয়ে তোমার কলেজে এই কবিতাটি পড়াতে হবে ছাত্র-ছাত্রীদের।

মিনু বলল, তুমি ঠাট্টা করছ?

বললুম, সত্যি বিশ্বাস কর, বাবা বিশ্বনাথের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি অধ্যাপিকা হও।

মিনু আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল মাত্র।

গাড়ী এসে যখন ওল্ড বারাণসী স্টেশনে থামল, বীরেনদার দিকে তাকালুম, এখানেই নামতে হবে নাকি?

বীরেনদা বললেন, না, আমরা নামব নিউ স্টেশনে।

আমি স্টেশন বোর্ডের দিকে আঙুল তুলে বীরেনদাকে বললুম, দেখুন, এখানে কি লেখা রয়েছে। এখান থেকেই নাকি বিশ্বনাথের মন্দির আর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কাছে।

কাশী নামের আকর্ষণই যেন মাটিতে টেনে নামাতে চাইছে আমাদের। বীরেনদা মাথা চুলকে বললেন, তাহলে এখানেই নাম্‌ব নাকি? কিন্তু কই, যাত্রীরা তো তেমন নামছে না! নিউ স্টেশনে নামা ভাল হবে, বুঝলে। ওখানেই নাম্‌ব।

যেখানেই নামা হোক দুঃখ নেই। কিন্তু আমাকে যেতে হবে তাড়াতাড়ি কাশীর ঘাটে, কেদারঘাটে, রাজা হরিশ্চন্দ্র থেকে আজ পর্যন্ত ভারত-ঐশ্বর্যের এক বিরাট ছড়াছড়ি যে সেখানেই!

তিন

ওল্ড স্টেশন থেকে গাড়ী ছাড়ল। ওল্ড স্টেশন ও নিউ স্টেশনের দূরত্ব কিছুই নয়। কাশীতেই আছি। বিছানাপত্র সব গুছিয়ে ফেললুম। এবার নামতে হবে। নামবো তো! কিন্তু প্রশ্ন হল উঠব কোথায়? কোন সুস্থ পরিকল্পনা নিয়ে, ছক কষে আমরা বেরুই নি। থাকা খাওয়ার কোথায় কি ধরনের সুবিধে সে সম্পর্কে কোন হদিস নিয়ে আসিনি। তবে একজন বাঙালী যাত্রী কাটিহার স্টেশন থেকেই আমাদের বলে দিয়েছিলেন, 'সাবধান, কাশীতে নতুন এসেছেন একথাটা ভাবেসাবে কোন রকমে রিকশাওয়ালাদের জানতে দেবেন না। গিয়ে গম্ভীরভাবে বলবেন, অমুক জায়গায় চল। তাহলে ওরা বুঝবে যে, কাশী আপনাদের কাছে অপরিচিত স্থান নয়। নয়তো আকাশ-চুম্বী ভাড়া চেয়ে বসবে। এমন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে যেটা হয়তো চোরগুণ্ডার আড্ডা। যে কোন তীর্থস্থানেই চোরগুণ্ডার অভাব নেই।

এবার আমাদের চিন্তা হল, যাব তাহলে কোথায়? সঙ্গে মহিলারা আছেন। মিনু আধুনিক মেয়ে হলেও গলার হার আর কানের দুল্ তো ছেড়ে আসতে পারেনি! এম এ. ডিগ্রী নিতে চললেও সেতো আসলে মেয়ে। ঐতিহ্যবাহী স্বভাবকে তো আর সমূলে উপড়ে ফেলা সম্ভব নয়! অপরের কাছ থেকে চলায়, বলায়, হাবে, ভাবে, সর্বপ্রকারে এপ্রিসিয়েশন পাবার জন্য মেয়েরা ব্যস্ত। আমি জানি এ কাহিনী মিনুর হাতে গিয়ে পড়লে আমায় সে খাঁড়া নিয়ে তাড়া করবে। তবু সত্যকে তো আর চেপে যেতে পারি নে। কোন লেখকের পক্ষেই তা সম্ভব নয়—নইলে ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও শেক্সপীয়র লিখতে সাহস করতেন না: women thy name is frailty.

কাটিহার স্টেশন থেকে একটা রেলওয়ে গাইড কিনে নিয়েছিলুম। দীর্ঘ রাস্তায় ঘড়ি আর সে গাইড দেখেছি। কাশীগামী ট্রেনের যে সব নির্ঘণ্ট সেখানে আছে সেখানে সুযোগ বুঝে হোটেলওয়ালারা বিজ্ঞাপন দিতে ভোলেনি। একটা বিজ্ঞাপন বের করে আমি বীরেনদাকে বললুম, এইসব কোন recognised হোটেলে ওঠাই ভাল। বিজ্ঞাপন দিতে যখন সাহস করেছে এরা, দায়-দায়িত্ব একটা আছে নিশ্চয়ই।

কিন্তু আমার প্রস্তাব বীরেনদার মনোমত হল না। হোটেলে থাকার কথা এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করেও তিনি বেরোন নি। না করার কারণ তাঁর ফাণ্ড। ধর্মশালার কথা চিন্তা করে সেই হিসেবেই বেরিয়েছেন। হোটেলে ওঠার কথা চিন্তা করে কেমন যেন মুষড়ে পড়লেন। বললেন, তীর্থে এসে হোটেলে ওঠাটা কি উচিত হবে। বিশেষ করে মাসীমা যখন সঙ্গে রয়েছেন। আমি বললুম, ধর্মশালায় ওঠাও কি উচিত হবে? সঙ্গে মিনু রয়েছে।

ধর্মশালা কি, কেমন জিনিস সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমার কোন প্রত্যক্ষ ধারণা

ছিল না। তবে সাধারণ লোকের ভিড় সেখানে। একটা হৈ হট্টগোল, এই ধারণা ছিল। বারজনের ভিড়ের মধ্যে এক কম্পাউন্ডে থাকা। সে আমার একেবারেই মনঃপুত নয়। অপরপক্ষে হোটেল মানেই সাহেবি খানা আর খরচের ব্যাপার। সেজন্য বীরেনদাও হোটেল-বিরোধী। এদিকে নিউ স্টেশন এগিয়ে আসছে। তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত না নিলেই নয়। রিকশাওয়ালাদের কাছে দাঁড়িয়ে কোথায় উঠব, এ নিয়ে তর্ক জুড়ে দিলে নতুন যাত্রী ভেবে ওরাও পেয়ে বসবে। বীরেনদাকে বললুম, কি করবেন, তাড়াতাড়ি ঠিক করুন।

বীরেনদা গম্ভীর মুখে বললেন, দ্যাখো, কি করবে।

ট্যাঁকের খবর বীরেনদাই রাখেন। আমি রাখিনে। মিনু হয়তো কিছু জানতে পারে। আমি চলেছি ক্রেডিটে। সুতরাং ট্যাঁকের খবর না জানা পর্যন্ত আমার পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও আমি চুপ করে রইলুম।

মিনু একবার আমার, আর একবার বীরেনদার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। যাত্রার প্রাক্কালে থাকার প্রশ্নটাকে সে তেমন আমল দেয়নি। কিন্তু এবার সে ভাবতে আরম্ভ করেছে। হাজার হোক সে তো মেয়েছেলে। দূরদেশ যাত্রা আমাদের সকলেরই এই প্রথম। কলকাতার ছেলে বলে আমাকে চালাক-চতুর ভেবে বীরেনদা গাইড করে এনেছেন। কিন্তু সস্তাদরের গাইড হবার পাত্র যে আমি নই বীরেনদা সেটা পূর্বাহ্নে ঠাহর করতে পারেন নি। ধর্মশালার চরিত্র না জেনে সেখানে মহিলাদের নিয়ে ওঠবার ভরসা আমার নেই। বেড়াতে একমাত্র গিয়েছি দার্জিলিং-এ। থেকেছি হোটেলে। গাড়ীতে ভিড় দেখে ফার্স্টক্লাস রিজার্ভ করে এসেছি শিয়ালদহে। কালিমপঙ ঘুরেছি প্রাইভেটকার ভাড়া করে। সস্তায় সুকৌশলে বিদেশ ভ্রমণের গোপন তথ্য আমার জানা নেই। সুতরাং হোটেলের বাইরে অন্য কোন চিন্তা আমার মাথায় এল না। রাঙামাসী অসহায়ভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ ব্যাপারে তাঁরও যেমন কোন ধারণা নেই, তেমনই প্রস্তাব দেবারও কিছু নেই। কারণ মূল জিনিসটা রয়েছে বীরেনদার হাতে।

সবাই চুপচাপ। হঠাৎ মিনু বলল ঃ আমার মনে হয় প্রথমে হোটেলে ওঠাই ভাল। তারপর খুঁজে পেতে থাকবার মত কোন ধর্মশালা যদি পাওয়া যায়, সেটাকে যদি নিরাপদ মনে হয়, সেখানে থাকা যাবে।

হোটেলের কথা চিন্তায় আনতেই বীরেনদার কেমন যেন একটা অস্বস্তি। কেন, সেটা অনুমান করতে পারি। কিন্তু তাই বলে অস্থানেও তো ওঠা চলে না। বীরেনদার মুখের দিকে তাকালুম আমি।

বীরেনদা এতক্ষণ ধরে সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হবার কথাই বোধহয় ভাবছিলেন। হঠাৎ তিনি বললেন, ধর্মশালায় যদি না উঠতে চাও, রামকৃষ্ণ মিশনে উঠি চল।

—তীর্থযাত্রীদের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনে কোন ব্যবস্থা আছে?

বীরেনদা বললেন, থাকবে না কেন! নিশ্চয়ই আছে। সব তীর্থস্থানেই মিশনে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।

রামকৃষ্ণ মিশনে যদি থাকবার স্থান জুটে যায়, তবে তো ভালই হয়। কারণ নিরাপত্তার বিষয়ে সেখানে পূর্ণ গ্যারান্টি আছে। বিদেশে অনায়াস থেকে নিরাপত্তার মূল্য অনেক বেশী। বললুম, সেটা মন্দ নয়। ওখানে জায়গা পেলে ভালই হয়।

বীরেনদার সন্দেহ ছিল তাঁর এ প্রস্তাব আমি অনুমোদন করব কিনা। আমার কাছে সম্মতি পেয়ে তিনি যেন মুক্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন।

ঠিক হল রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়েই উঠব। ওল্ড স্টেশন থেকে সিদ্ধান্ত নিতে নিতে সেটা এসে ঠেকল নিউ স্টেশনে। অবশেষে যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল গাড়ী তখন নিউ স্টেশনে ইন্ করে গেছে। গাড়ী থামলে আমরা উঠে দাঁড়ালুম। ঘুরতে হবে অনেক দূর পর্যন্ত। সুতরাং অনেক জিনিস নিয়ে ভারি হইনি কেউই। হাল্কা বিছানাপত্র যা এনেছি নিজেরাই বহন করতে পারব। সুটকেসও আনিনি। মিনু শুধু এনেছে একটা প্লাস্টিকের ঝুড়িব্যাগ। তার মধ্যেইও টয়লেট ও রাঙামাসীর কাপড়চোপড়। আমাদের কাপড়চোপড় সব আমাদের নিজেদের বিছানার মধ্যে। কুলির ব্যাপারটাকে একদম আমল দেব না বলেই এই ব্যবস্থা। আমি আর বীরেনদা দুজনে দুটো হোলডোল হাতে নিয়ে গাড়ী থেকে নামলুম। মিনু নামল ঝুড়ি নিয়ে।

পুজোর মরসুম। ভীড় রয়েছে বেশ। তবু ভাগ্যি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এ গাড়ী আসেনি। সিনেমার শো ভাঙার পর যেমন লাইনে দাঁড়িয়ে ভীড় ঠেলে বাইরে আসতে হয় তেমনই যাত্রীর ভীড় ঠেলে নিচে নেমে প্ল্যাটফর্মে কিউ দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালুম। সঙ্গে সঙ্গে টাঙ্গাওয়ালা রিকশাওয়ালা ট্যাক্সিওয়ালারা এসে ঘিরে দাঁড়াল। সহজ হবার যতই চেষ্টা করি না কেন, ওরা ধরে ফেলল যে, আমরা নবাগত। যে যার যানের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে আরম্ভ করল। পশুযান, যন্ত্রযান বাদ দিয়ে অর্ধযন্ত্র অর্ধমানবযানই পছন্দ করলুম আমরা—অর্থাৎ সাইকেল রিকশা। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন যাবার নাম শুনে যা দর হাঁকল তাতে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবার উপক্রম। ভাড়া চাইল রিকশা প্রতি পাঁচ টাকা। অথচ কাটিহারে টি. টি. সির কাছ থেকে যা জেনে এসেছিলুম তাতে ভাড়া আট আনার বেশী নয়। বীরেনদার হাত থেকে বিছানা পড়ে যাবার উপক্রম বলে কি! পাঁচ টা-কা!

আমি একটু হুমকি দিয়ে ভাড়া কমাবার চেষ্টা করলুম: পাঁচ টাকা রিকশা ভাড়া! মগের মুলুক নাকি। চলুন বীরেনদা পায়ে হেঁটেই যাব।

এ হুমকি যে জালে আবদ্ধ সিংহের আস্ফালন মাত্র এটা বুঝতে কারোই অসুবিধা হল না। ওরা শুধু হাসতে লাগল। যার সঙ্গেই দরদস্তুর করি সব শেয়ালের এক রা। নিতান্ত অস্বস্তির মধ্যে পড়া গেল। মিনুর দিকে তাকিয়ে দেখি ওর মুখ শুকিয়ে উঠেছে।

ওদিকে রিকশাওয়ালা, টাঙ্গাওয়ালা, ট্যাক্সিওয়ালা সবাই রীতিমত তাগাদা দিয়ে চলেছে। আসুন বাবু আসুন। সে এক বিরাট অস্বস্তিকর অবস্থা। পাগল বনে যাবার উপক্রম। অপরিচিত লোক দেখলে গাঁয়ের একদল কুকুর যেমন ঘেউঘেউ করতে আরম্ভ করে তেমনই। মরিয়া হয়ে অগত্যা ছোকরা গোছের এক রিকশাওয়ালাকে ধরলুম -দেখ বাপু ঠিক কত নেবে বল।

ও বলল, রিকশা প্রতি তিনটাকা লাগবে। এর কমে কিছুতেই হবে না। একপাল কুকুরের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে থাকা যায় না। অবশেষে ওতেই রাজি হয়ে গেলুম। বিছানাপত্র নিযে দুটো রিকশাতে গিয়ে চাপলুম। বীরেনদা বললেন, রামকৃষ্ণ মিশন নিয়ে চল।

রিকশাওয়ালা বলল, রামকৃষ্ণ মিশন না অন্য কোথাও ? অন্যত্র যেতে চানতো ভাল হোটেলে নিয়ে যেতে পারি।

বীরেনদা বেগে বললেন, যো বোলতা ওহি করো। রামকৃষ্ণ মিশন নিযে চল। হোটেল কা কই জরুবত নেই হ্যায়।

এমন বাচাল রিকশাওয়ালা কখনও দেখিনি। বীরেনদার বিরক্তি দেখেও চুপ করল না। বলল, চিঠি নিয়ে এসেছেন তো বাবু। নেই তো উধাব জায়গা মিলেগা নেহি। বেকাব যানা হোগা।

বীরেনদা রেগে বললেন, মিলুক না মিলুক তাতে তোমার কি ? যা বললুম তাই কর।

নাছোড়বান্দা রিকশাওয়ালা তবু বক্‌বক্ করে চলল। অভি উধর জায়গা নেই মিলেগা বাবুজী। ঘুমকে আনে পড়েগা। দেখিয়ে, চিন্তা করকে দেখিযে।

বীরেনদার মুখ দেখি লাল হয়ে উঠেছে। তিন টাকা রিকশা ভাড়া গচ্চা দিয়ে বক বক্ শুনতে রাজি নন তিনি। কিন্তু রিকশাওয়ালা এতটা বক্‌বক্ করছে কেন, তার কারণ ততক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেছে আমাব কাছে। আসলে হোটেলওয়ালাদের সঙ্গে ওদের কমিশনের ব্যবস্থা আছে। যাত্রী পেঁছে দিতে পারলে বেশ কিছু পাওয়া যায়। তা ছাড়া গুন্ডার দলের সঙ্গেও সাট থাকতে পারে। হোটেলের নাম করে কোথায উঠিয়ে বেঘোরে প্রাণ নেবে কে জানে। বিশ্বেশ্বরের জন্য কাশীর সুখ্যাতি যতই থাক, ষাণ্ডা, পাণ্ডা আর গুণ্ডার জন্য তার কুখ্যাতিও তো কম নেই। প্রদীপের নিচে যেমন অন্ধকার থাকে তেমনই তীর্থের ছায়াতেই থাকে পাপ। মনে হল রিকশাওয়ালার পাল্লায় পড়া কিছুতেই উচিত হবে না। তাই আমিও ধমকে উঠলুম, অন্য কোথাও যাব না সেত বলেই দিয়েছি। তবু বক্‌বক্ করছ কেন। নাও এবার সিধে মিশনের দিকে চল দেখি।

আর বক্‌বক্ না করে রিকশাওয়ালা চলল মিশনের দিকে। স্নান খাওয়াদাওয়া কিছু হয়নি। বীরেনদার মেজাজ খুব তিরিক্ষে হয়ে আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নতুন দেশের একটা উত্তেজনা আছে। সেজন্য ক্ষুধার তাড়না অনেকটাই

অনুভব করা যায় না। আমি কাশীর চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম। কলকাতার মত রাস্তাঘাটে ট্রামবাসের ভিড় নেই। এটা মন্দ নয়। কিন্তু চলতে গেলে তার জন্য যে সেলামী দিতে হয় সেটাই যা একটু যন্ত্রণাদায়ক। রাস্তাগুলো যেন প্লাস্টার করা। কলকাতার হাড়গোড় বের করা রাস্তার চাইতে অনেক ভাল। তুলনামূলকভাবে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই মনে হয়। শুনেছিলাম ইউপিতে শহরগুলো ভাল। এটা বোধহয় মিথ্যে নয়। রাস্তায় আসতে আসতে দুপাশে হাইওয়েও দেখেছি। সেগুলোও মন্দ নয়। কাশীর দিকে বহু দিনের একটা লোভ ছিল। লোভ ছিল তার তীর্থ মাহাত্ম্যের জন্য নয়। কারণ কাশীর ধর্মীয় ইতিহাসের সামান্য মাত্রই আমি জানি। শুধু জানি এটি একটি বড় তীর্থ। হিন্দুধর্মকে আশ্রয় দিয়ে আছে বহুদিন। ইসলামের আক্রমণে যখন হিন্দুধর্ম সংকুচিত তখন কাশীর বিধান, কাশীর সিদ্ধান্তের দিকেই তাকিয়ে থেকেছে সমস্ত হিন্দুসমাজ। ইংরেজ আমলে ঊনবিংশ শতকের বিজ্ঞানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কাশীর ঘাটে যোগমহিমার অলৌকিক শক্তি দেখিয়েছেন তৈলঙ্গস্বামী। স্বামী নিগমানন্দও তাঁর অধ্যাত্ম ক্ষমতার অনেক শক্তিই লাভ করেছিলেন এই কাশীর ঘাটে বসে। ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের গুরু গন্ধবাবা সেদিনও লোকোত্তর মহিমা দেখিয়ে বিজ্ঞানকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছেন। তাঁর সূর্যবিজ্ঞান প্রকাশিত হবার সুযোগ পায়নি. নইলে বিজ্ঞান হয়তো ভিন্নতর দিকে অগ্রসর হত আজ।

ভারতের হেন কোন সাধুসন্ত নেই, যাঁরা কাশীর ঘাটে তাঁদের চরণস্পর্শ রেখে যাননি। অসংখ্য অজ্ঞাত সাধুসন্তের চরণরেণুধন্য এই কাশী ছিল রামায়ণের যুগেও। পৃথিবী বিশ্বামিত্রকে দান করে রাজা হরিশচন্দ্র এই কাশীতে এসেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। কেদারঘাটে তিনি ডোমের কাজ করেছেন। মহাভারতেও কাশীরাজের কথা উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী তো কাশীরাজকে দিয়েই আরম্ভ। পৌরাণিক যুগ থেকেই কাশীর অস্তিত্বের কথা জানি। ইংরেজ যুগে চৈৎসিংকে নিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস এখানেই নাটকীয় ঘটনা ঘটিয়েছেন। প্রাচীনতম কাল থেকে ঘটনার পর ঘটনা ধরে কাশী দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং সেই কাশী সম্পর্কে আমার একটি ঔৎসুক্য ছিলই। কাশী দেখবার সাধ আরো বেড়ে গিয়েছিল সিনেমাতে কাশীর ঘাট দেখে। সেই কাশীর উপর দিয়ে এখন চলেছি। সর্বত্রই তার বিরাট এক রহস্য যেন ছড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখবার লোভ সংবরণ করা যেন সম্ভব হচ্ছে না। মিনুও দেখছি তাকিয়ে আছে। রাঙামাসী কোথায় কিভাবে কি দেখছেন সেটা আঁচ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু বীরেনদা তাকিয়ে আছেন তাঁর নিজের দিকেই। আর উদ্বিগ্ন চিত্তে ভাবছেন রামকৃষ্ণ মিশনে কি জায়গা পাওয়া যাবে? যদি না পাওয়া যায়? সে কথাটা ভাবতেই বোধহয় শিউরে উঠছেন তিনি।

তিন টাকা ভাড়া রিকশা প্রতি। সুতরাং ভেবেছিলুম মিশন অনেক দূরে হবে। কিন্তু সময় লাগল না মোটেও। আট আনা ভাড়াতে পশ্চিমবঙ্গে আজও দিব্যি এমন

অনেক স্থান ঘুরে আসা যায়। ভাবতে ভাবতেই গেটওয়ালা এক বিরাট বাড়ীর কাছে এসে রিকশা থামল। আমি তখনও তন্ময় হয়ে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখছিলুম। রিকশার ঝাঁকুনি খেয়ে চমকে উঠে বললুম,—কি। গাড়ী থামালে যে?

রিকশাওয়ালা বলল, বাবুজী, এহি বামকৃষ্ণ মিশন।

বীরেনদাকে বললুম: বীরেনদা নামুন।

কেউ চেনা-জানা নেই, অপরিচিত কাকে কিভাবে ধরতে হবে ভেবে বীরেনদার মুখখানা যেন শুকিয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারলুম, একা নেমে কোন কিছু খোঁজ করবার সাহস তিনি সংগ্রহ ক'রতে পারছেন না। সুতরাং আমিও নামলুম। বীরেনদাকে বললুম: চলুন, দু'জনে গিয়ে খোঁজ করি। মিনু আর রাঙামাসী বিকশায় থাক।

সাহস পেয়ে বীরেনদা নামলেন। তাকে নিয়ে গেটের ভেতর ঢুকলুম। দারোয়ান গোছের একজন সামনে দাঁড়িয়ে। তাকে বললুম: আচ্ছা, এখানে কোন থাকবাব জায়গা আছে?

আমাদেব দারুণ অজ্ঞতা দেখে সে শুধু একটু হাসলে। বলল: বড়ে মহারাজকে পুছিয়ে।

বড় মহারাজ। সে কে। কে জানে। হয়তো তিনিই আশ্রমের অধ্যক্ষ হবেন। বললুম: তাঁর ঘরটা কোন্ দিকে?

একটা সরু রাস্তা দেখিয়ে ও বললে: উধার। শেষ কোঠী।

চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলুম। সুন্দর, সাজানো, ঝক্‌ঝক তক্‌তক্ করছে মিশন। আয়তন নেহাত কম নয়। তখনো মিশনেব চরিত্র সম্বন্ধে সম্যক কোন ধারণাই কবতে পারিনি। বেলা বোঝা যাচ্ছে না। অসঙ্কোচে বড মহাবাজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলুম।

সব ঘরের দরজা বন্ধ। খাঁটি দ্বিপ্রহর। এখন বিশ্রামের সময়। কি কবি ভাবতে লাগলুম। সৌভাগ্যক্রমে পাশের ঘরের জানালার কাছে এক জন স্বামীজীকে দেখতে পেলুম। জুতো খুলে বারান্দায় উঠে নমস্কার জানালুম তাঁকে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে স্বামীজীরা ব্যবহার জানেন। কোন রকম অবজ্ঞা বা বিরক্তির ভাব না দেখিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন: কাকে চাই?

আমি বললুম: অনেকদূর থেকে কাশী তীর্থে এসেছি। এখানে যদি একটু থাকার স্থান মিলত।

উনি বললেন: সেটা তো আমি বলতে পারব না। পাশের ঘরে ম্যানেজার থাকেন, ওঁকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। উনি এখন ঘুমোচ্ছেন, ঘণ্টাখানেক পরে উঠবেন।

এক ঘণ্টা! স্থান পাব কি পাব, না তার ঠিক নেই। এক ঘণ্টা অপেক্ষা। হঠাৎ যেন রাগই হল। জীবে সেবা করার জন্যেই তো স্বামী বিবেকানন্দ এই মিশন সৃষ্টি করেছেন। সেই স্বামীজীদের এত বিলাস কেন। সুখের নিদ্রা কেন তাদের?

রামকৃষ্ণ মিশন প্রকৃতপক্ষে একটা বড়লোকের আড্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ ধারণা বেশ কিছুদিন থেকেই আমার মনে দানা বাঁধছিল। হঠাৎ আমার মাথা গরম হয়ে গেল। নিচে এসে বীরেনদাকে বললুম : চলুন, মিশনের দরকার নেই।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন বীরেনদা। আমাদের কথাবার্তা শুনতে পান নি। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : কেন, কি হল ? জায়গা পাওয়া যাবে না ?

আমি বললুম : স্বামীজী এখন ঘুমুচ্ছেন। এক ঘণ্টা পরে জাগবেন। জায়গা আছে কি নেই, তার কোন ঠিক নেই, তিনি ঘুম থেকে উঠলে তবে জানা যাবে। ব্রহ্মার মত বিষ্ণুর ধ্যান ভাঙাবার মন্ত্র জপ করি আর কি।

বীরেনদা বললেন : তবে একটু অপেক্ষা করা যাক্।

দপ্ করে আমার মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। বীরেনদাকে একটা ঘৃণ্য নিচু শ্রেণীর জীব বলে মনে হল আমার। একটা নয়া পয়সার জন্য যাঁর এত দরদ—তীর্থস্থান ভ্রমণের সখ তাঁর না হওয়াই উচিত। মনে হল, গরম গরম দুটো কথা শুনিয়ে দি। বুঝতে পারছি, অগত্যা হোটেলে উঠতে হয়, এই ভয়ে তার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু বিরক্তিটাকে যথাসম্ভব চেপে রেখেই বললুম : দেখুন, বেলা এখন বাজে প্রায় দুটো। অভুক্ত, অস্নাত হয়ে, জায়গা পাওয়া যাবে কি যাবে না না জেনে এখানে বসে থাকার কোন মানে হয় না। এই সব মিশন-টিশন প্রকৃতপক্ষে সৎলোকের আড্ডা নয় জানবেন। চলুন, হোটেলে উঠি।

আমার দিকে তাকিয়ে বীরেনদা আমার মনের অবস্থাটা আঁচ করে নিতে পেরেছিলেন। বললেন, চল।

ফিরে এলুম। দেখলুম, রিক্‌শাওয়ালার মুখে একটা দুষ্টু হাসি। কি বাবু, জায়গা মিলল ? তাহলে আমার ভাড়াটা মিটিয়ে দিন।

বিদ্রূপটা যেন শেলের মত বুকে বিঁধল। কিন্তু তাকে গায়ে মাখালে চলে না। তাই বললুম : ভাল হোটেল আছে ? সেখানে নিয়ে চল।

ও বলল : সে ত আগেই বলেছিলুম। হোটেল অনেক আছে। হোটেল না মেলে, দিনপ্রতি চার পাঁচ টাকা ভাড়া দিয়ে ভাল ঘর পাওয়া যায়। একটা ঘর ঠিক করে নেবেন।

হোটেলকে বীরেনদার বড় ভয়। মামলা মোকদ্দমা, অফিসের ব্যাপারে মাঝে মাঝেই জেলা শহরে বীরেনদাকে হোটেলে গিয়ে থাকতে হয়। হোটেলের খরচার কথা তিনি জানেন। হোটেলের বিকল্প, ভাড়া-ঘরের সন্ধান পেয়ে তাঁর চোখ দুটি চক্‌চক্ করে উঠল। বললেন : তাহলে ভাই কোথায় ঘর পাওয়া যায় সেখানেই নিয়ে চল।

আমি আর বাদপ্রতিবাদ কিছু করলুম না। যেখানে হোক এখন একটু বিশ্রামের স্থানের দরকার। মিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, এমন সতেজ পুষ্ট যে মেয়ে তারও মুখ শুকিয়ে উঠেছে। কাশীর এই দুপুরের আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে, মিনুর

দিকে তাকালে সে যে কলকাতার ইউনিভার্সিটিতে পড়া মেয়ে, হলফ করে বলতে পারি একথা কেউ ভাবতে পারবে না।

রিকশাওয়ালা বীরেনদার কথামত ভাড়া-ঘরের সন্ধানে চলল কিনা বুঝতে পারলুম না। কিন্তু সে চলল ঠিকই। খানিক পরে একটা গলির মোড়ে এসে থামল: বাবু, এখানে খোঁজ করতে পারেন।

বীরেনদা বললেন: কি, ঘর ভাড়া?

সে কথার উত্তর না দিয়ে ও বলল: আসুন, কথা বলবেন।

আমি আর বীরেনদা ওর পিছু পিছু চললুম। সাংঘাতিক গলি। দেখলেই গেন ভয় করে।

কোথায় হে?

—এই যে এখানে, ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে কথা বলুন।

ঘরে ঢুকে দেখি, একটা হোটেল। দু'জন সাহেব মেম খাচ্ছেন। বীরেনদার মুখ তো শুকিয়ে উঠল। রিকশাওয়ালা আমাকে নিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

লোকটা যেন চৌকোস। দশ মুখে কথা বলে। অনর্গল ইংরেজী বাংলায়, প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় অনেক কথাই বলছিল। মুহূর্তের মধ্যে জানিয়ে দিল যে তিনি বাংলাদেশের লোক। বাড়ী ফরিদপুরে।

আমি বললুম: থাকবার জায়গা মিলবে তো?

—মিলবে। ক'খানা ঘর চাই? একখানার বেশী কিন্তু দিতে পারব না। ক'জন আছেন?

বললুম: চার জন।

একটু ভেবে, মাথায় দুটো টোকা মেরে বললেন: না, অতবড় ঘর দিতে পারব না।

বীরেনদার মুখে তখন কি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, সেটা লক্ষ্য করবার সময় ছিল না। হোটেলেও ঘর পাওয়া যাবে না শুনে আমি নিতান্ত ভেঙে পড়লুম। পুজোর ভিড়ে হতভাগ্য বাঙালীরা বোধহয় কাশী ভেঙে ভিড় করেছে। উদ্ভট সখ জাতটার। পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, বেড়াবার সখ আছে। পুজোর মরশুমে বহির্গামী বাঙালীর কি ভিড়। এবার কলকাতা থেকে বেরুতে গিয়েই সেটা টের পেয়েছিলুম।

আমার মুখের ভাবসাব দেখে ম্যানেজার বাবুর বুঝি করুণা হল। বললেন: হ্যাঁ, যদি দু ঘণ্টা অপেক্ষা করতে পারেন, তবে একটা ঘর খালি হবে।

বললুম: দু'ঘণ্টা কোথায় থাকব? সঙ্গে মেয়েছেলে আছে।

ম্যানেজারবাবু বললেন: সে জন্য ভাববেন না। উপরে আমি থাকি। আমার বোনও আছে। মেয়েছেলেরা ওখানে বিশ্রাম করতে পারেন।

তবু একটু আশার আলো। আমি বললুম: বেশ তাই হবে। কত চার্জ এখানে?

—পার হেড দশ টাকা। থাকা খাওয়া।

—দশ টাকা! তার মানে একদিনে চল্লিশ টাকা!

বীরেনদার দিকে তাকিয়ে দেখি তার দুটো পা যেন কাঁপছে। পারলে ওখানেই বসে প'ড়েন।

কিন্তু যাই হোক, কাশীর দুপুরের আকাশের নিচে ল্যাং ল্যাং করে ঘোরার আমার ইচ্ছে নেই। যায় চল্লিশ টাকা যাবে। এক রাত থাকব। বিকেলে বিশ্বনাথ দর্শন করে, সকালবেলাই হরিদ্বারের উদ্দেশ্যে স্টেশনে বেরিয়ে পড়ব। বীরেনদাকে বললুম ঃ কি করবেন ভাবুন।

ওঁর চোখ যেন তখন গর্তে ঢুকে গেছে। বললেন ঃ যা ভাল হয় কর।

ম্যানেজার বললেন ঃ মেয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। যান, ওদের নিয়ে আসুন।

আমি বীরেনদার দিকে তাকালুম। বুঝতে পারলুম তাঁর অনিচ্ছা। কিন্তু তাঁর দুমনা ভাবকে এই মুহূর্তে আর প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। যাহোক একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বললুম ঃ চলুন, ওদের নিয়ে আসি।

বীরেনদার যেন শক্তি নেই এমনভাবে বললেন ঃ চল!

বাইরে এসে মিনুকে ডাকলুম ঃ মিনু, রাঙামাসীকে নিয়ে নামো।

মিনু ক্লান্ত। আর সে ঘুরতে পারছে না। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। রাঙামাসীকে নিয়ে নেমে এল।

আমাদের সামান্য বিছানাপত্র। দু'জন রিকশাওয়ালা হাতে করে এনে ঘরে উঠাল।

ম্যানেজার বললেন ঃ ওদের নিয়ে উপরে উঠে যান। ছাদে আমার ঘর। ওখানে আমার বোন রয়েছে।

বীরেনদাকে বললুম ঃ যান, ওদের নিয়ে উপরে যান। বিছানা এখানেই থাক। আমি ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে আসি। একটা প্রাণহীন নির্জীব ব্যক্তির মত বীরেনদা মিনু আর রাঙামাসীকে নিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। ভাড়া মেটাতে বাইরে এসে দেখি রিকশাওয়ালা একটা লোকের সঙ্গে গুজ্‌গুজ্‌ করছে। লোকটা এইমাত্র ঘরের ভেতর ছিল। চেহারা দেখে ভদ্র মনে হয় না। সঙ্গে সঙ্গে কি একটা সন্দেহের দোলা লাগল মনে। আমি একটু গম্ভীর হয়ে গেলুম। কোন একটা ফাঁদে পড়েছি কিনা কে জানে।

ভাড়া মেটাতে গেলে আরো আট আনা বেশী চার্জ করল রিকশাওয়ালা। মিশন থেকে হোটেলে পেঁছে দেবার জন্য আট আনা Extra-charge. বাত বিতণ্ডা করার মোটেই ইচ্ছে হল না। দুটো রিক্‌শাকে সাতটি টাকা দিয়ে বিদেয় করলুম।

ফিরে এসে দেখি, ম্যানেজারবাবুও তখন উপরে উঠে গেছেন। সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে হোটেলের মালিক ক্যাশে বসে। জিনিসপত্রগুলো তার জিম্মায় রেখে আমিও

উপরে উঠলুম। ছাদের এক কোণে বিষণ্ণ মুখে বীরেনদা বসে। একটি ছোট ঘর। তাতে মিনু আর রাঙামাসী। ম্যানেজার বাবুও আছেন সেখানে। আর রয়েছে তাঁর বোন। বয়স্কা বোনকে নিয়ে ভাই একা থাকেন, কেমন যেন খট্‌কা লাগল। ভাই বোনের মুখের আদলেও কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পেলুম না। ম্যানেজারবাবু আমাকে দেখে ডাকলেন : আসুন ভেতরে আসুন। লজ্জা পাচ্ছেন বুঝি? ও আমার বোন। লজ্জা কি? বুঝতে পাচ্ছি দেশ বিদেশে চলাফেরার অভ্যাস আপনার নেই।

দেশ বিদেশে চলাফেরার খুব অভ্যাস নেই সত্যি। কিন্তু তাই বলে হোটেলে থাকি নি এমন নয়। গ্রীষ্মে দার্জিলিং বেড়িয়ে এসেছি। হোটেলে উঠেছি। কিন্তু সেখানে এমন একটা রহস্যময় পরিস্থিতি লক্ষ্য করি নি। নিরাপত্তার অভাবের কথা মনেও ওঠে নি। কিন্তু এখানে বার বার যেন মনের ভেতর থেকে কি একটা সন্দেহ দোলা দিতে থাকল। মিনুকে দেখলুম, সেও বিমর্ষ মুখে বসে। শুধু রাঙামাসীর মুখ দেখে তাঁর ভেতরটা আঁচ করা কোন দিনই সম্ভব নয়।

একটু স্নানের প্রয়োজন। খাবারের প্রয়োজন। ছাদের উপর জলের ট্যাংক রয়েছে। ম্যানেজারবাবু বললেন : স্নান করতে চান তো ওখানে সেরে নিতে পারেন। গা-টা ঘিন্‌ঘিন্ করছে, একটু স্নানের প্রয়োজন। বীরেনদাকে বললুম : স্নান করবেন তো!

জলের দিক থেকে বীরেনদা একটু বাতিকগ্রস্ত লোক। বললেন : হ্যাঁ, স্নান করতেই হবে।

মিনুর ঝুড়ি-ব্যাগে, তেল সাবান সবই আছে। তেল সাবান, গামছা নিয়ে এসে কলতলায় বসলুম। গাড়ীর ধকল যতটা না গেছে কাশীতে থাকার সংস্থান করতে তার চেয়ে বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যেন। স্নান সেরে একটু আরাম বোধ হল। বীরেনদাও ভাল করে স্নান করে নিলেন। এই উন্মুক্ত ছাদের উপর মিনুর স্নান সম্ভব নয়। সে স্নান করল না।

রাঙামাসীকে ঘরে বসিয়ে মিনু আর বীরেনদাকে নিয়ে নিচে খেতে গেলুম। রাঙামাসী বিধবা, হোটেলের ভাত তিনি কখনো খাবেন না জানি। তার জন্যে দই মিষ্টির কথা বলে আমরা নীচে এলুম।

মাছ ভাত ডাল তরকারি। দশ মিনিট টেবিলে অপেক্ষা করার পর খাবার এল। কি এক অজ্ঞাত কারণে যেন ভাল লাগল না আমার। অর্ধেক খাওয়া হয়েছে, হঠাৎ দেখি, ডোরা কাটা গেঞ্জি গায়ে একটা লোক টেবিলের ওধারে এসে বসল। আমাদের দিকে বার বার লক্ষ্য করে দেখতে লাগল সে। এমন লোক খিদিরপুর আর রাজাবাজারে দেখা যায়। টেবিলের উপর রেডিও বসানো। রেডিও নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল সে। এই লোকটাকেই কিছু আগে রিকশাওয়ালার সঙ্গে গুজ্‌গুজ্ করতে দেখেছি। আমার বুকের ভেতরটা গুরুগুরু করে কেঁপে উঠল। তাহলে··· !

ভাল করে লোকটাকে লক্ষ্য করতে যাব, হঠাৎ তার সঙ্গে চোখা-চোখি হয়ে গেল।

গলায় একটা রুমাল পর্যন্ত বাঁধা। কলকাতায় এমন রুমাল গলায় পরে ডক এরিয়াতে কারা ঘুরে বেড়ায় জানি।

লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে বলল : আপনাকে কোথায় দেখেছি বলে মনে হয়? অবশ্য কথাটা সে হিন্দীতেই বলল।

জীবনে প্রথম যে কাশীতে এল, তাকে সে কোথায় দেখতে পারে? ঘনিষ্ঠতা করতে চায় নাকি! খুব কথা বলবার ইচ্ছা হল না। ছোট্ট করে বললুম : হবে হয়তো।

সমস্ত খাবারটাই যেন বিস্বাদ লাগল। কোন রকমে শেষ করে উঠে দাঁড়ালুম। বীরেনদার মনেও আমার মত একটা সন্দেহ উঁকি দিয়েছে কিনা কে জানে। তার মত ভোজনবিলাসী লোকও দেখলুম খেতে পারলেন না। মিনুর কথা বাদ! সে স্নাত, এখনো মনের মত থাকবার জায়গা মেলে নি। উষ্কখুষ্ক চেহারা। সেত ধরতে গেলে কিছু মুখেই দিলে না।

খাওয়া শেষ করে মিনুকে বললুম : তুমি ওপরে যাও। আমরা আসছি।

মিনু উপরে উঠে গেল। ক্যাশে মালিক বসে। বললুম : আমাদের রুম এখনো মিলবে না?

অল্পবয়স্ক মালিক। ম্যানেজারও অল্প বয়সের। সবটাই যেন কেমন। মালিক বললেন : আরো থোড়া দেরি হবে।

আচ্ছা আমরা তবে বাইরে থেকে ঘুরে আসছি।

বীরেনদাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এলুম। গলি ছেড়ে বড় রাস্তায় পা দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। বললুম : বীরেনদা শুনুন, এ জায়গাটাকে ভাল মনে হচ্ছে না! এখানে থাকব না। চলুন, রামকৃষ্ণ মিশনেই আর একবার ঘুরে আসি। এতক্ষণ হয়তো স্বামীজী ঘুম থেকে উঠেছেন। যদি ওখানে জায়গা না মেলে তবে কোন স্টেশনে উঠব, তবু এখানে নয়। আমার যেন কেমন লাগছে। দেখলুম, আমার মত বীরেনদার মনেও সন্দেহের দোলা লেগেছে। বললেন : এটা একটা গুন্ডার আড্ডা কিনা কে জানে! রিকশাওয়ালাটা কথা নেই, বার্তা নেই, এমন জায়গাতে এনে ওঠলো! আসলে ওদের সঙ্গেও যোগাযোগ আছে। কাশীতে রিকশাওয়ালা নৌকাওয়ালা এদের কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। কাশী আসলে পান্ডা, গুন্ডা আর রান্ডার জায়গা।

বললুম : মিশনে চলুন। মিশনে থাকবার জায়গা না মেলে, স্বামীজীদের কাছে থেকে একটা সৎ পরামর্শ তো পাওয়া যাবে।

এবার সুযোগ পেয়ে বীরেনদা বললেন : আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলুম, দেখ।

আগের ভুল নিয়ে তর্ক করে কালক্ষেপ করা অর্থহীন। সুতরাং বীরেনদাকে নিয়ে মিশনের দিকে এগিয়ে চললুম। মনের মধ্যে একটা সন্দেহ ছিল, থাকবার জায়গা পাব কিনা। স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন থেকে পূর্বাহ্ণে পত্র দিয়ে না জানিয়ে এলে এ সমস্ত

জায়গায় থাকবার ব্যবস্থা হয় না। তীর্থস্থানে যাত্রীদের বড় ভিড়। নিরাপত্তার জন্য যাত্রীবা রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম প্রভৃতি স্থানে পূর্বাহ্লেই ব্যবস্থা করে আসে। একথা আমাদের জানাও ছিল না, আর সেভাবে ব্যবস্থাও করা হয় নি। আমার তো প্রকৃতপক্ষে 'হঠাৎ নিমন্ত্রণ' এই তীর্থদর্শনে আসা। তবু মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলুম, যেন আশ্রয়টা পেয়ে যাই।

বীরেনদাকে নিয়ে আবার মিশনে এসে উঠলুম। স্বামীজীদের দিবানিদ্রা শেষ হয়েছে। অনেক স্বামীজীকে এখন মিশনের প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়াতে দেখলুম। মিশনাধ্যক্ষের ঘরের দিকে আমরা এগিয়ে গেলুম। গিয়ে শুনলুম, তিনি এইমাত্র অফিসের দিকে বেরিয়ে গেছেন। সামনেই অফিসঘর। আবার ফিরে এলুম। রাস্তার মধ্যেই মিশনাধ্যক্ষ বন্ধু মহারাজের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সৌম্যকান্তি, কিন্তু তেজোদীপ্ত চেহারা বন্ধু মহারাজের। বীরেনদাকে বললুম: আপনি বলবেন সব। গিয়ে প্রথম একটা প্রণাম করবেন। প্রণামে দেবতারা সন্তুষ্ট হন, মানুষ তো দূরের কথা।

কাউকে কোন প্রস্তাব নিয়ে অ্যাপ্রোচ করতে বীরেনদার বড সংকোচ। আমারও তথৈবচ। কিন্তু প্রস্তাবটা পেশ করতে হবে তো! বীরেনদাকে বললুম: যান, এগিয়ে যান।

বীরেনদা অসহায়ের মত আমার মুখের দিকে একবার তাকালেন। সে দৃষ্টির অর্থ —আমাকেই বলতে হবে।

আমি বললুম: যান, আর দেরী করবেন না. স্বামীজীরা কাজের লোক, আবার হয়তো এক্ষুনি কোথায় চলে যাবেন।

ইতস্তত ভাব কাটিয়ে বীরেনদা হঠাৎ যেন কাজটা সেরে ফেললেন। ধুপ করে স্বামীজীর পায়ের উপর গড় করলেন। হঠাৎ প্রণামে একটু চমকে উঠলেও স্বামীজী সহাস্য মুখে বীরেনদার দিকে ফিরে তাকালেন। এমন প্রণামে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা তাঁরা অভ্যস্ত।

—কি চাই?

হাত কচলে বীরেনদা বললেন: আজ্ঞে, তীর্থ করতে এসেছি। যদি এখানে একটু আশ্রয় মিলত।

স্বামীজী বললেন: চিঠি আছে? চিঠি ছাড়া তো এখানে কোন জায়গা মেলে না।

বীরেনদা নিতান্ত হতাশ হয়ে পড়লেন। আমি সেই অতি প্রাকৃত শক্তির কাছে মনে মনে প্রার্থনা জানালুম। কি হল কে জানে। হঠাৎ স্বামীজী বললেন: কোথেকে আসছ তোমরা?

আমি বললুম: কাটিহার থেকে।

স্বামীজী বললেন: হ্যাঁ, কাটিহার থেকে লোক আসবার কথা ছিল। মিশন থেকে লেখা চিঠি এসেছিল। মিশনের সঙ্গে পরিচয় আছে?

হঠাৎ যেন একটা আশার আলো দেখতে পেলুম। বললুম ঃ আছে। আমার ছোট ভাই তো মিশনে থেকেই পড়তো!

—তাই নাকি? স্বামীজী আমার দিকে তাকালেন। তা চিঠি আননি কেন?

আমি বললুম ঃ তাড়াহুড়ো করে আসাতে চিঠির কথা ভুলে গেছি।

কি একটু ভাবলেন তিনি। বললেন ঃ সঙ্গে কে আছে?

বীরেনদা বললেন ঃ এক বোন, আর মাসীমা।

স্বামীজী বললেন ঃ একটা ঘর খালি আছে। নিতে পার, তবে ঘরের ভাড়া পড়বে তিন টাকা দৈনিক। আর এখানেই খাবে তো?

বীরেনদা বললেন ঃ আজ্ঞে, এখানে খেতে পেলে তো—

—এখানে কিন্তু মাছ মাংস চলে না।

যেন জিব্ কাটলেন বীরেনদা ঃ কি যে বলেন, মাছ মাংস দিয়ে কি হবে।

স্বামীজী বললেন ঃ দু' বেলা খাওয়ার জন্যে পার হেড দু'টাকা পড়বে।

বীরেনদা বললেন ঃ আজ্ঞে যা বলবেন, তাই হবে।

স্বামীজী বললেন ঃ এস, অফিস থেকে চাবিটা নিয়ে যাও তবে।

এতক্ষণ একটা সাসপেন্সের মধ্যে ছিলুম। যেন ঘাম দিয়ে বাঁচলুম। জয় মা তারা।

স্বামীজীর সঙ্গে মিশন অফিসে এলুম। নামধাম লিখিয়ে তিনি একটা চাবি দিলেন আমাদের। দিনের বেলা এগারটা আর রাত্রি নয়টাতে এখানে খাবার দেওয়া হয়। সময় মত আসবে।

আবার স্বামীজীকে প্রণাম করলুম ঃ নিশ্চয়ই।

রামকৃষ্ণ মিশনে স্থান পাব এটা প্রত্যাশার বাইরে ছিল। একটু আগেই মিশনের স্বামীজীদের উপর অশ্রদ্ধা দেখিয়ে মনে মনে যে গালাগাল করেছি, সে জন্য অনুতপ্ত হলুম।

মিশনের একজন দারোয়ানকে আমাদের ঘরটা দেখিয়ে দিতে বললেন স্বামীজী। ঠিক মিশনের মধ্যে থাকবার জায়গা নেই। যাত্রীদের আশ্রয় দেবার জন্য বাইরে রাস্তার ওপাশে একটা ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে। সেখানে আমাদের থাকবার জায়গা হল।

বীরেনদা দারোয়ানকে একটা টাকা বক্শিশ দিতে চাইলেন। কিন্তু সে নিলে না। বলল, যাবার দিন দেবেন।

ঘরটা খুলে দেখে নিলুম। ঠিক আমাদের মনের মত ঘর। দুটো চৌকি পাতা। পাশে বাথরুম। অনবরত জল, ভিড় নেই। কয়েকজন বিধবা মিশনের আনুকূল্যে নামমাত্র ভাড়াতে এখানে আছেন। তাঁরা শেষ জীবন কাশীবাস করতে এসেছেন।

ঘরটা দেখে শুনে আবার তালা দিয়ে বাইরে এলুম। দ্রুত পায়ে ছুটলুম হোটেলের দিকে—ইম্পিরিয়াল হোটেল। কিন্তু আর এক প্রশ্ন দেখা দিল। হোটেলে

একবার উঠেছি, ওরা কি সহজে ছেড়ে দেবে? পার হেড দশ টাকা ভাড়া নিয়ে না ছাড়ে! বীরেনদাকে সে কথাটা জানাতে তিনি বললেন: এখন পর্যন্ত তো আমাদের ঘরই দেয় নি, ভাড়া চাইবে কি? আর চায় যদি তো দিয়ে দেব। ভাবব, কোন অন্যায় করেছিলুম তার ক্ষতিপূরণ দিলুম।

হোটেলে এসে উঠলুম। বীরেনদাকে বললুম: যান, রাঙামাসী আর মিনুকে নিয়ে আসুন। আমি মালিকের সঙ্গে কথা বলছি।

বীরেনদা উপরে উঠে গেলেন। মালিকের কাছে এগিয়ে যেতে তিনি বললেন: আপনাদের ঘর এখনো খালি হয়নি। মিনিট দশেকের মধ্যে ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

আমি বললুম: দেখুন, ঘরের আর আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা বাইরে ব্যবস্থা করে ফেলেছি। আপনাকে কত দিতে হবে বলুন, আমরা এখনই চলে যাব।

একটু যেন ক্ষুণ্ণ হলেন তিনি: চলে যাবেন!

—হ্যাঁ। আপনি যদি ঘর ভাড়াটাও রাখতে চান, রাখতে পারেন।

আমাদের এখনও পর্যন্ত ঘরই দিতে পারেন নি, ঘর ভাড়াটা আর কি করে চান। মালিক বললেন: না, ঘর ভাড়া লাগবে না। আপনাদের মিল্ চার্জটা দিলেই চলবে।

যাক্ বাঁচা গেল। চারজনে বার টাকা দিয়ে খালাস। এক্ষুনি চল্লিশটা টাকা আদায় করে নিলে আমাদের বলবার কিছু ছিল না।

টাকা মিটিয়ে দিয়ে উপরে যাব, দেখি ওরা নামছে। বীরেনদা হাঁফাতে আরম্ভ করেছেন।

মিনুর মুখ দেখি একেবারে শুকিয়ে গেছে। বাইরে এসে সে বলল: বাবা বাঁচলুম। কোথায় উঠিয়েছিলে?

আমি বললুম: কেন, ভাইবোনের ঘরে তো বেশ ভালই ছিলে।

মিনু বলল: সন্তুদা আমি মেয়েমানুষ। দৃষ্টিটা স্বভাবতই একটু তীক্ষ্ণ। ভাইবোন কাকে বলে আমাকে শিখিও না। ছিঃ! গা ঘিন্ ঘিন্ করছে। ওখানে গিয়ে একটু স্নান করব।

বীরেনদা বললেন: ভাইবোন না কচু। স্রেফ একটা ব্যবসা। ভগবান খুব বাঁচিয়েছেন। সন্তুর জন্যই যত সব ঝামেলা। তখন বললুম হোটেলে উঠে কাজ নেই। তীর্থস্থানে এসে কেউ হোটেলে ওঠে নাকি?

আমি বললুম: দোষটা আমাকে একা দেবেন না। মিনুও হোটেলের পক্ষেই রায় দিয়েছিল।

মিনু বলল: যা খুশি বল। এরপর থেকে আর কোন হোটেলে ওঠবার মত নেই আমার জেনো। এটা একটা হোটেল কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

মিনুকে রাগাবার জন্যে বললুম: কিন্তু উঠছ মিশনে। মাছ মাংস নেই সেখানে, জেনো।

মিনু বলল ঃ মাছ মাংসে দরকার নেই। কি যে খেলুম ভগবান জানেন। পয়সা দিয়ে ও খাবার কেউ খায় নাকি। নিরামিষ অনেক ভাল। তা ছাড়া খেতে তো আসি নি। এসেছি বেড়াতে। শুধু ভদ্রভাবে থাকবার জায়গা পেলে আর কিছু চাইনে।

দূরত্বটা খুব বেশী ছিল না। তবু না হেঁটে রিক্‌শা করেই চলে এলুম আমরা। ঘর দেখে মিনু খুশি। হ্যাঁ, এই হল ভদ্র জায়গা।

মনের উপর দিয়ে বিরাট ধস্তাধস্তি গেছে। আমি তখনই চৌকির উপর গড়িয়ে পড়তে চাইলুম।

মিনু বাধা দিয়ে বলল ঃ দাঁড়াও দাঁড়াও। চৌকিটা না ঝেড়েই শুয়ে পড়ছ যে! তোমার ঘেন্নাও নেই নাকি সন্তুদা।

দেখলুম মেয়েরা পরবাসেও গৃহিণী! ইতস্তত তাকিয়ে কি যেন খুঁজল মিনু, তারপর হঠাৎ বাইরে চলে গেল। ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম না। কিন্তু কিছু-কাল পরে সে যখন ফিরে এল, দেখি তার হাতে ঝাঁটা।

মিনু বলল ঃ ওধারে বিধবা ক'জন মহিলা থাকেন। তাঁরা এখানেই বাস করেন। ওদের কাছ থেকে চেয়ে ঝাঁটাটা নিয়ে এলুম।

মিনুর দিকে তাকিয়ে বললুম ঃ 'মেয়েবা লক্ষ্মী, মেয়েরাই 'শ্রী' এই মুহূর্তে তোমার দিকে তাকিয়ে যে কোনও অবিশ্বাসী লোককেও সে কথা স্বীকার করতে হবে।

মিনু বলল ঃ নাও, বেশী বক্‌বক্ তোমাকে করতে হবে না। তুমি কিভাবে থাক সে তো আমার অজানা নেই। বারমাসে বিছানার চাদর বদলাও না। ঘরে ঢুকলে গা ঘিন্‌ঘিন্ করে।

আমি হেসে উঠলুম ঃ কি করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকি বল। ভুল করে সরস্বতীর সাধনাই করলুম, লক্ষ্মীব সাধনা তো করিনি। এখন বুঝছি লক্ষ্মীর সাধনা না করে ভুল করেছি।

মিনু বলল ঃ সরস্বতীর কাঁধে বদনাম চাপিও না! আমরাও কি আর তাঁকে একটু-আধটু শ্রদ্ধা করিনে।

আমি বললুম ঃ সেটা সোনায় সোহাগা হয়েছে। মূর্তিমতী লক্ষ্মী সরস্বতীকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমাদের প্রতি লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি কই?

মিনু বলল ঃ তাকেও আরাধনা কর।

আমি বললুম ঃ এবার তাকে চিনলুম। সাধনার চেষ্টা করে দেখব ভাগ্য ফেরে কিনা। এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন কোন ইঙ্গিত নিশ্চয়ই ছিল। বুদ্ধিমতী মিনুর সেটা বুঝতে বিলম্ব হল না। সে একটু রাঙিয়ে উঠে আড়চোখে আমার দিকে তাকাল।

বীরেনদা কলতলায় হাত-মুখ ধুতে গেছেন। মাসীমাও বেরুলেন।

মিনু আস্তে করে বলল : লক্ষ্মীর সাধনা করার মত মনোবৃত্তি তোমার থাকলে তো—

আমার বুকের মধ্যে মুহূর্তে একটা পুলকের স্পন্দন অনুভব করলুম। মিনু কি বলছে? তাহলে ··? অথচ গাড়ীতে মিনু কাল অমন করে বলল কেন। মিনু যেন সেই মুহূর্তে রহস্যময়ী হয়ে উঠল। মিনুর দিকে তাকিয়ে সেই রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করলুম।

মিনু বলল : তাকিয়ে কি দেখছ? চাদরটা ওপাশে ধর তো।

আমি বললুম : সত্যি লেখাপড়া শিখেও তুমি এমন গৃহিণীপনা জান।

মিনু বলল : তোমার কাছ থেকে আমার সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

আমি বললুম : তুমি যে ঘরে পড়বে সে ঘর আলো হবে।

মিনু বলল : অন্ধকার ঘরের মালিকরা সচেতন হয়ে আলোর খোঁজ করেন, তবে না!

আবার মিনুর দিকে তাকিয়ে দেখলুম। এই সেই মিনু। এতদিন ওর সঙ্গে মিশেছি। একটা জেদী মেয়ে ছাড়া ওকে তো আমার ইতিপূর্বে আর কিছুই মনে হয় নি। বি এ পড়বার সময় ইতিহাসটা পড়তো আমার কাছে। ইতিহাসের বাইরে অনৈতিহাসিক চর্চা করতে গেলে ধমকে দিত। এতে মাঝে মাঝে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হয়ে মিনুর ওপর বিরক্ত হতুম আমি। কিন্তু তাকে সব সময়ই দুর্বোধ্য মনে হত। যে মিনু লেখাপড়ার বাইরে অন্য বিষয়ে বিন্দুমাত্র আমাকে প্রশ্রয় দিত না, সে ও তার বান্ধবী জয়ন্তী আমার কাছে ইতিহাস বুঝে নিতে এলে আমাকে হুঁশিয়ার করে দিত। বলত : বিনা পয়সায় পড়িয়ে নিজের মানটাকে এমন করে ছোট কোর না। এটা হ্যাংলামো হচ্ছে না কি?

আমি বলতুম : একটু বুঝতে এস।

মিনু বলত : এমন হাজারো জন বুঝতে এলে তুমি দোর খুলে দিয়ে বসে থাকবে নাকি?

একদিন আমি বলেছিলুম : তোমাকেও আমি বিনা পয়সাতেই পড়াই। মিনু যেন একটা আহত ভুজঙ্গিনীর মত আমার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। তারপর বলেছিল : তোমার মন বুঝলুম। তোমাকে অযথা যদি বিরক্ত করে থাকি, ক্ষমা কোর। সেই যে মিনু চলে গিয়েছিল, আর কখনো আমার কাছে ইতিহাস বুঝতে আসে নি। ওদের বাড়ী গিয়ে কদাচ ওর সাক্ষাৎ পেয়েছি। আমাকে এড়িয়ে এড়িয়েই চলত সে। বি এ. পাস করে ও চুকল বাংলা নিয়ে এম. এ-তে। পড়া দেখানোর আর কোনও প্রশ্নই থাকল না।

বীডন স্ট্রীটে মিনুদের বাড়ী। মধ্য কলকাতার কোনও কলেজে আমি অধ্যাপনা করি। মাঝে মাঝে যাই। এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় যে ওদের আর পর বলে ভাবতে পারিনে। কিন্তু তার পর থেকে মিনুর সঙ্গে এক ঘরে বসে কখনো কথা হয় নি।

কাটিহারে মিনু এসেছে এ আমি জানতুমও না। আমি এসেছিলুম ওর ভাই শঙ্করের সঙ্গে। মাসীর বাড়ী কাটিহারে, আমাকে প্রাণ ভরে মাছ খাওয়াবে বলে ও ধরে এনেছিল। এখানে এসে মিনুর সঙ্গে দেখা। শঙ্কর চলে গেল কি একটা কাজে জলপাইগুড়িতে মামার কাছে। মিনু চলল রাঙামাসীর সঙ্গে তীর্থে। বীরেনদার পেড়াপীড়িতে আমাকেও সঙ্গ নিতে হল।

মিনুর সঙ্গে বহুদিন পর আবার মুখোমুখী দেখা। তার মেজাজের কথা আমি জানি। গাড়ীর মধ্যে সে-মেজাজের খোঁচা এরই মধ্যে সে একটু দিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ সেই মিনুর এমন একটা বিরাট পটপরিবর্তন আমার কাছে অবিশ্বাস্য ছিল। মিনুর মধ্যে আজ নতুন সুরের আমেজ পেয়ে আমি তো হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি। আবার হাঁ করে মিনুর দিকে তাকিয়ে রইলুম। চাদরটা ধরতে পর্যন্ত ভুলে গেলুম।

আমার এই বিহ্বল অবস্থার সঠিক চরিত্রটা মিনু কি আঁচ করতে পারল? শুনেছি মেয়েদের একটা সহজাত বৃত্তি আছে, যা দিয়ে তারা পুরুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে।

মিনু বলল: হাঁ করে কি দেখছ? চাদরটা ধর।

আমি চাদরের প্রান্তটা ধরলুম। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে তখন মিনুর প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে একটা ভাব গুমরে মরছে। ডাকলুম: মিনু।

হঠাৎ এমন সময় বীরেনদা ঘরে ঢুকলেন। মিনু যেন একটু চমকে উঠল। বলল: যাও সন্তুদা। হাত-মুখ ধুয়ে এসো। হাত-মুখ না ধুয়ে তুমি বিছানায় উঠবে না।

নন্দনকাননের একটা সুমিষ্ট পাখি যেন আমার বুকের মধ্যে ডেকে উঠতে চাইল। তোয়ালে নিয়ে বাথরুমের দিকে চললুম। বাথরুমের কাছে গিয়ে দেখি, মুখ মুছতে মুছতে রাঙামাসী বেরুচ্ছেন: আঃ, কি আরাম! শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল।

আমি বললুম: মাসী, এ গঙ্গাজল। শরীর না জুড়িয়ে যায় কোথায় বল? চোখ থেকে তোয়ালে তুলে নিয়ে মাসী বললে: ও সন্তু, চান করবি নাকি? কর, ভাল লাগবে।

আমি বললুম: তীর্থস্থানে এসে বেশী ভক্তি দেখালে কাশী টেনে ধরবে। দু'বার স্নান করবার আর ইচ্ছে নেই।

—জল ভাল। ভার নয়। অসুখ করবে না। মুখ মুছতে মুছতে মাসী চলে গেলেন ঘরের দিকে।

শরীরের মধ্যে একটা ক্লান্তি আর ক্লেদাক্ত ভাব আমারও ছিল। বাথরুমে ঢুকে জল ছেড়ে দিয়ে, বার বার চোখে-মুখে দিলুম। সত্যি শরীরটাকে যেন স্নিগ্ধ মনে হল। মুখ মুছে বাইরে এসে দেখি, স্নানের সরঞ্জাম নিয়ে মিনু দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে চোখে চোখে হতে আবার সে একটু রাঙিয়ে উঠল। আমার পাশ কাটিয়ে বাথরুমে ঢুকল সে।

ঘণ্টা খানেক নতুন ঘরে সবাই মিলে বিশ্রাম করা গেল। ও পাশের বিধবা মহিলারা ইতিমধ্যে এসে উঁকি দিয়ে গেলেন। রাঙামাসীর কাছ থেকে আমাদের খোঁজখবর নিলেন।

ঘুম পাচ্ছিল কিন্তু ঘুমালে একটা দিনই নষ্ট হবে। কাশীর আসল রূপ তার ঘাটে আর মন্দিরে নিশ্চয়ই রয়েছে। বিকেলেই মন্দির আর ঘাটটা ঘুরে আসা দরকার।

আমি বীরেনদাকে বললুম: চলুন, এবার একটু মন্দিরের দিকে যাওয়া যাক, বিকেলটা নষ্ট করে কি হবে।

আমি জানি দিনের বেলা বীরেনদার কোন আলস্য নেই। রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁকে আটকে রাখা মুশকিল। খাওয়া হলে তো ব্যস, ঘুমিয়ে পড়বেন। বীরেনদা বসে থাকতে পারেন না। হয় কাজ, নয় নিদ্রা। কিন্তু দিবানিদ্রা তাঁর ধাতে সয় না।

বীরেনদা সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন: চল। মন্দিরটা ঘুরেই আসা যাক।

মিনুর দিকে তাকালুম আমি: কি, বিশ্রাম করবে, না যাবে?

মিনু বলল: তুমি আমায় কি মনে করেছ বলতো? ঘুমোবার জন্যে তো আসি নি।

রাঙামাসীকে বললুম: কি রাঙামাসী যাবে তো?

রাঙামাসী বললেন: ও কি কথা! যাব না মানে! বিশ্বনাথ দর্শনের জন্যেই তো আসা।

আমি বললুম: তাহলে তোমরা তৈরী হয়ে নাও, আমরা দুটো রিকশা ঠিক করে আসি। ঘাট দূর হবে বলে মনে হচ্ছে।

বীরেনদাকে নিয়ে রিকশার খোঁজে বেরুলাম। কাছেই দুটো রিকশা মিলল। চার আনা করে চার্জ। মিনু আর রাঙামাসীও ইতিমধ্যে প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে। ওদের নিয়ে বেরুলাম।

মন্দির দূর নয়। আমাদের মিশন থেকে দশ মিনিটের পথ। পথে যানবাহনের ভিড় নেই। শুধু মন্দিরের কিছু আগে যে ক্রসিং, সেখানে ভীড়। পুলিসকে সেখানে ট্রাফিক কন্ট্রোল করতে দেখলুম।

আগাগোড়া রাস্তাতে আমি কিন্তু মন্দিরের চুড়ো লক্ষ্য করে চলেছিলুম। কিন্তু কি আশ্চর্য! কোথাও সে মন্দিরের চুড়ো আমার নজরে পড়ল না। কোন একটা বিরাট মন্দিরই চোখে পড়ল না। অথচ কাশীর প্রতিটি বাড়ীকেই একটি মন্দির বললে অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক গৃহসংলগ্ন এক একটি ছোট শিবমন্দির নজরে পড়তে লাগল।

রিকশা থামল। মন্দির এসে গেছে। কিন্তু তাকিয়ে কোথাও মন্দিরের অস্তিত্ব আমার নজরে পড়ল না। ভারতবিখ্যাত যে কাশীর মন্দির তার শীর্ষদেশটা গগনচুম্বী হবে না, একথা কখনো কি ভাবা যায়?

শুনেছিলুম কাশীতে পান্ডার উৎপাত। কিন্তু দু'একটা ক্ষুদে পান্ডা ছাড়া আর

কেউ বিরক্ত করল না। তবে তাদের কাউকেই আমার পছন্দ হল না। বীরেনদাকে বললুম: পাণ্ডা ঠিক করব আমি। আপনারা কথা বলবেন না।

মিনু বলল: কেন, কোন পাণ্ডা তোমার জানা আছে নাকি?

আমি বললুম: না, তা জানা নেই। মুখ চোখ দেখে তা ঠিক করব। Face is the index of mind. যার মুখ দেখে ভাল বলে মনে হবে, তাকেই ঠিক করব।

মিনু একটা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকাল: তোমার কাজ মরা মানুষের চরিত্র ঘাঁটা। জ্যান্ত মানুষের তুমি কি জান?

আমি বললুম: তবু তোমাদের মত উদ্ভট কল্পনার রাজ্যের মানুষের থেকে অনেক ভাল।

মিনু বলল: বটে, মানুষ চেনার পরিচয় তো তুমি হোটেলটাতে ভালই দিয়েছিলে। বীরেনদার দিকে তাকিয়ে ও বলল: অব্যবস্থর লোককে বিশ্বাস করবেন না। আপনি নিজে পাণ্ডা ঠিক করুন।

বীরেনদা বললেন: আচ্ছা, আচ্ছা হবে'খন।

কথা বলতে বলতে সামনে এক পাণ্ডা এসে হাজির। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরা। মাথায় টিকি। একজোড়া প্রাচীন ধরনের গোঁপ। কাঁধের উপর আধ পরিষ্কার চাদর। যেন তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম এমন ভাব দেখিয়ে সে এসে বলল: আসুন, বাবু আসুন। ঐ দোকানে জুতো খুলে চলুন।

ভাল করে তাকিয়ে দেখে মনে হল, লোকটা খারাপ নয়। বীরেনদাকে বললুম: একে নেওয়া যেতে পারে, তবে দরদস্তুর ঠিক করে।

জিজ্ঞাসা করলুম: মন্দির ঘুরিয়ে দেখাতে কত নেবে?

জিব্ কেটে সে বলল: টাকার কথা তুলছেন কেন? আমরা পুরোহিতেরা আপনাদের মত তীর্থযাত্রীদের দানেই তো বেঁচে আছি। টাকার কথা পরে, আগে বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করুন তো!

আমি বললুম: আগে টাকার কথা ঠিক করে নাও।

পাণ্ডা বলল: যা খুশী দেবেন।

—না, আগে ঠিক করে নাও কত নেবে।

—আচ্ছা দেবেন পাঁচ টাকা।

—পাঁচ টাকা! বল কি? না, তবে পাণ্ডার দরকার নেই। এমনিই যাব।

—কত দেবেন?

বীরেনদার দিকে ফিরে তাকালুম আমি।

বীরেনদা বললেন: দু'টাকার বেশী দেব না।

পাণ্ডা বলল: আর এক টাকা বাড়িয়ে তিন টাকা করে দিন।

আমি বললুম: ঠিক আছে চল।

বীরেনদা এতে সন্তুষ্ট হলেন না। তার ধারণা দরদস্তুর করলে আর এক টাকা কমত।

আমি তাঁকে বোঝালুম : তীর্থস্থানে এসে দরদস্তুর করে কি হবে। এ টাকা নষ্ট হবে না, এটা জানবেন।

বীরেনদা আর কথা না বাড়িয়ে বললেন : চল, চল।

কিছু দূরে ফুল নৈবেদ্যের দোকান। জুতো ছেড়ে গঙ্গা জলে হাত ধুয়ে নিলুম আমরা।

পাণ্ডা রাঙামাসীকে ধরলে : কত পুজো দেবেন, নৈবেদ্য এখান থেকেই কিনুন?

রাঙামাসী বীরেনদার দিকে তাকালেন। এ বয়সে বিধবা মেয়েদের ফুল নৈবেদ্যের টাকার অঙ্ক স্থির করা যে কত কষ্টসাধ্য তা আমি জানি। রাঙামাসী যাতে কোন দোটানায় না পড়ে, তার জন্যে বললুম : পাঁচসিকের ফুল নৈবেদ্য নিন বীরেনদা।

পাণ্ডা আমাদের টাকার অঙ্ক শুনে যেন একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল : মাত্র পাঁচ সিকে! বাবা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে এসে টাকার জন্যে এমন করছেন?

আমি বললুম : পুজোর উপচার বড় নয়, ভক্তি বড়। যা বলছি তাই কর।

পাণ্ডা রাঙামাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন : বুঝবেন মা আপনি, আর বাবা বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথকে যদি পাঁচ সিকের পুজো দিতে চান, তাই হবে।

রাঙামাসী অসহায়ের মত বীরেনদার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম : মাসীমা পাঁচ সিকেতেই হবে। পুজো এখনো অনেক দিতে হবে। কত পাঁচ সিকে যে পার হয়ে পাঁচশতে দাঁড়াবে, বুঝতে পারবে। পাণ্ডার কথায় ধোঁকা খেয়ো না।

অগত্যা পাঁচসিকের ফুল নৈবেদ্য নিয়েই চলল পাণ্ডা। নিতান্ত সরু চাপা গলি। তার মধ্য দিয়ে হেঁটে চললুম। হাঁটছি তো হাঁটছি। হাঁটার আর শেষ নেই। দুই দিকে গগনচুম্বী সব অট্টালিকা। তার মাঝে সরু গলি। চলতে ভয় করে। কোথায় যে বাবা বিশ্বনাথের মন্দির, কে জানে, রাজপথ দিয়ে মন্দিরে না গিয়ে চোরাপথে কেন, সে কথাটা আমার মনে স্ট্রাইক করল। মুহূর্তের মধ্যেই এ প্রশ্নের উত্তরটা যেন আমি পেয়ে গেলুম। এই কাশীর মন্দির আজকের নয়, বহু প্রাচীন দিনের। বাড়ি-ঘরগুলির ডিজাইন দেখে মনে হল, সব মধ্যযুগীয়। প্রাচীনকালে হয়তো এমন ছিল না। মধ্যযুগে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যেই এমন করে মন্দিরের চতুর্দিকে বাড়িঘর তৈরী করেছিল কাশীর লোকেরা। ঘোরতর পৌত্তলিকতা বিরোধী যবনেরা রাজত্ব করেছে মধ্যযুগে ভারতবর্ষের উপর। মন্দির ভাঙা আর বিগ্রহ অপহরণ করা ছিল তাদের পবিত্র কাজ। অহরহ মন্দিরের উপর হামলা হবার সম্ভাবনা ছিল। তাই মন্দিরকে আড়ালে লুকিয়ে রাখবার জন্যে এমন করে বড় বড় বাড়ি দিয়ে তাকে ঘিরে রাখা হয়েছিল, যাতে সহজে আক্রমণকারীর নজরে না পড়ে। আর সহজে যেন যবনেরা সেখানে প্রবেশ করতে না পারে। যবনদের দৃষ্টির আড়ালে রাখবার জন্যেই

কাশীর মন্দিরের উচ্চতাও বুঝি খুব কম করা হয়েছে। "যার ফলে বাইরে থেকে মন্দিরের চূড়া আর ধ্বজা নজরে পড়ে না। এতক্ষণে রহস্যের জটটা আমার কাছে খুলে গেল।

কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস! যে গলিপথ একদিন ধর্মকে রক্ষা করেছে, সেই গলিপথই আজ ধর্মের উপর জোচ্চুরি করছে। ভীড় হয় প্রচুর বিশ্বনাথ দর্শনে। তখন এই পথে গাদাগাদি ঠেলাঠেলি। এবং সেই ভীড়ের ফাঁকে পকেটমারা, ছিনতাই এসব বেশ চলে। একটা মহৎ উদ্দেশ্যের বিকৃত পরিণামের কথা ভেবে নিজের মনেই হাসি পেল। ফিক্ করে হেসেও ফেললুম।

মিনু বোধহয় আমাকে চোখে চোখেই রাখছিল। হাসিটা সে ধরে ফেলল। বলল: হাসলে যে?

আমি বললুম: হাসির একটা কারণ ঘটল, তাই।

—কি শুনি?

আমার চিন্তার কথাটা মিনুকে ভেঙে বললুম। মিনু শুনে বলল: ইতিহাস পড়ে পড়ে এমন প্যাঁচালোভাবে চিন্তা করতে শিখেছ সব!

আমি বললুম: গলিটা এখানে যেমনভাবে প্যাঁচালো, তাতে সরলভাবে চিন্তা করলে এর জট খোলা যেত না।

মিনু বলল: সরল যারা, তারা সরলভাবেই একে খোলে। রাঙামাসীকে জিজ্ঞেস করে দেখ ও'র কাছে গলিপথটা কত সরল। এতটুকু প্যাঁচ উনি দেখতে পান নি।

—প্যাঁচ দেখতে পান না বলেই তো ও'রা প্যাঁচে পড়েন। ধর্মের দোহাই দিয়ে প্যাঁচ কষে পাণ্ডারা টাকা নিচ্ছে। রাঙামাসীর মত সরল মানুষেরাই তো যুগ যুগ ধরে সেই প্যাঁচে পড়ে টাকা দিয়ে যাচ্ছেন। শুধু টাকা দিয়ে যাচ্ছেন তা নয়, শান্ত সমাজটাকে একটা ধর্মবিশ্বাসের আফিম খাইয়ে অসাম্যের মধ্যে রেখেছেন। সাধারণ লোকের যা ধর্ম, এক শ্রেণীর মানুষের সেটাই exploitationএর সুযোগ। বিচার করে দেখতে গেলে Religion is opium of the people.

মিনু বলল: তুমি চুপ কর তো, সন্তুদা। ধর্মস্থানে তুমি কম্যুনিজম আওড়াতে এলে নাকি! মার্ক্স নিজে কি রামকৃষ্ণ ছিলেন না শ্রীচৈতন্য ছিলেন, যে ধর্ম বিষয়ে তাঁকে একজন authority বলে মেনে নেব?

আমি বললুম: মার্ক্স বাদ দাও। ইতিহাস ধরলেও এই কাশী আমার কোন সমর্থন পাবে না। আর্যরাই তো হিন্দুধর্মের মূলে। কিন্তু এই আর্যরা কি কখনো বিশ্বেশ্বরের পূজা করেছেন?

মিনু বলল: তাহলে বিশ্বেশ্বর এলেন কোত্থেকে? কাশী তো চিরকালই হিন্দু সংস্কৃতির পাদপীঠ। এই কাশীতেই তো হিন্দুধর্ম রক্ষা পেয়েছে।

আমি বললুম: সে কথা ভেবেই তো আশ্চর্য হচ্ছি যে অনার্য দেবতা আর্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছে!

মিনু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল : অনার্য দেবতা। তুমি কি বলছ সন্তুদা। এসব কথা আর মুখে এনো না।

আমি বললুম : মিনু, তুমি বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী। ইতিহাস না পড়লেও রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা তো পড়েছ নিশ্চয়ই। তাঁর 'ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধের কথা। ভাব না, সেখানে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন?

মিনু আমার দিকে তাকাল : কি?

আমি জানি ভাল ছাত্রী হলেও সর্বগ্রাসী পাঠিকা এখনো সে হতে পারে নি। প্রকৃতপক্ষে ছাত্রজীবনে লেখাপড়া কিছুই হয় না, হয় হাতে খড়ি। যখন কেউ শিক্ষক হয়, তখনই হয় সে প্রকৃত ছাত্র। অধ্যাপিকা হলে মিনুও একদিন এসব জানবে।

আমি বললুম : হিন্দুধর্মটাই আর্যধর্ম নয়, এ কথা জেনো মিনু। আর্যরা উন্নত চরিত্রের কল্পনা করতেন। তারা জগৎ-কারণ শক্তিকে যে দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, তার সঙ্গে পৌত্তলিকতার সম্পর্ক নেই। আর্য চিন্তার সঙ্গে দ্রাবিড় হৃদয় মিশে সৃষ্টি করেছে হিন্দুধর্ম। রবীন্দ্রনাথ তাই সুন্দর বলেছেন—"দ্রাবিড় তত্ত্বজ্ঞানী ছিল না, কিন্তু কল্পনা করিতে, গান করিতে এবং গড়িতে পারিত। কলাবিদ্যায় তাহারা নিপুণ ছিল এবং তাহাদের গণেশ[1] দেবতার বধূ ছিল কলা বধূ। আর্যদের বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে দ্রাবিড়ের রসপ্রবণতা ও রূপোদ্ভাবিনী শক্তির সংমিশ্রণ চেষ্টায় একটি বিচিত্র সামগ্রী গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা সম্পূর্ণ আর্যও নহে, সম্পূর্ণ অনার্যও নহে, তাহাই হিন্দু।"

শিব তো আর্য দেবতা নয়, অনার্য দেবতা। "অনার্য দেবতাকে বেদের প্রাচীন মঞ্চে তুলিয়া লওয়া হইল, বৈদিক রুদ্র উপাধি গ্রহণ করিয়া শিব আর্য দেবতার দলে স্থান পাইলেন।" সামাজিক বিধানের শেষ ধাপে শিব এসেছেন। ব্রহ্মাতে আর্য সমাজের আরম্ভ কাল, বিষ্ণুতে মধ্যাহ্ন কাল, এবং শিবে তাহার শেষ পরিণতির রূপ রহিল।"

মিনু আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি তাকে বললুম : ইতিহাস বলে বার বার তো আমাকে বিদ্রূপ করছ, তোমাদের বাংলা সাহিত্যগগনের যিনি ভাস্বর জ্যোতি, সেই রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কি বলেছেন, শুনলে তো?

মিনু বলল : যাক, তীর্থস্থানে এসে তোমাকে আর বিশ্লেষণ করতে হবে না। এখানে তো আমরা আর্য হয়েও আসি নি, অনার্য হয়েও নয়, এসেছি হিন্দু হয়ে। আমাদের শিব তো সত্য। এ নিয়ে তুমি আর তর্ক কোর না। তার চেয়ে শুদ্ধ মনে বিশ্বনাথ দর্শন করবে চল।

---

১ গণেশ দানবদের সেনাপতি ছিলেন ইতিহাসে সেরকমই বলা হয়েছে। Vide Encyclopoedia of Religion and ethics, Ed. James Hastings, Vol VI, P. 701.

আমি হেসে বললুম : তর্ক আর করব না, চল। বিশ্বাসে সবই সত্য হয়ে ফুটে ওঠে। তোমাদের বিশ্বাসের শিব কারো চেয়ে কম নয়।

মিনু বলল : নয়ই তো।

আমি বললুম : শিবের কাছে তুমি কি প্রার্থনা করবে মিনু ?

মিনু বলল : সেটা আমার নিজের। তোমাকে তা আমি বলতে যাব কেন ?

আমি বললুম : মেয়েরা শিব পুজো করে কেন জান তো ?

মিনু ঝাঁঝিয়ে উঠল : তুমি বাজে কথা বলবে না। মেয়েদের কথা তোমাকে ভাবতে হবে না ! তুমি নিজের কথা ভাব দেখি !

হঠাৎ পাণ্ডার কথা কানে এল : এই আমরা মন্দিরে এসে গেছি। ঐ দেখুন, বিশ্বনাথের মন্দিরের চূড়া। সোনা দিয়ে বাঁধানো। রাজা জয়সিংহ (কোন্ রাজার কথা বলল স্পষ্ট শুনতেও পেলুম না) যুদ্ধযাত্রার পূর্বে সোনা দিয়ে এই মন্দিরের চূড়া বাঁধিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

তাকিয়ে দেখলুম, সত্যি, সোনার পাত দিয়ে মোড়া মন্দিরের চুড়ো।

আমি পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করলুম : রাজা জয়সিংহ কি যুদ্ধে জয়লাভ করে ছিলেন ?

—নিশ্চয়ই। বাবার মন্দিরে চূড়া বাঁধিয়েছেন, যুদ্ধে জয়লাভ করবেন না মানে ? বাবার কাছে যে যা চায়, তাই পূর্ণ হয় যে।

আমি বললুম : বাবার মনস্তুষ্টি করতে হলে যে ভেট দিতে হয়, তা দেখি এলাহি ব্যাপার। মন্দিরের চূড়া বাঁধানো তো দূরস্থান, দু পয়সার স্বর্ণ দান করবার ক্ষমতা আমার নেই। সেক্ষেত্রে বাবাকে মনোস্কামনা জানানো উচিত হবে কি ?

মিনু আমার দিকে চোখ গরম করে তাকাল : দেখ সন্তুদা, মন্দিরের ভেতর ঢুকে একটা বাজে কথা বলবে না। ধর্ম নিয়ে উপহাস করাটা খুব বাহাদুরী ভেবেছ নাকি ?

অগত্যা চুপ করলুম। ওদিকে রাঙামাসীকে দেখি, মন্দিরের দ্বারদেশে সষ্টাঙ্গে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছেন। একে বাড়াবাড়ি বলব, না অন্ধতা বলব ? রাঙামাসীর মনের মধ্যে এত বড় বিরাট একটা আবেগ লুকিয়ে ছিল, বিশ্বনাথ দর্শনের জন্য এত বড় একটা ব্যাকুলতাকে তিনি মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন, আগে টের পাই নি। জীবনে ভাঁটা ধরেছে। আর একটা জীবনের ইঙ্গিত এসেছে এঁদের কাছে। অস্পষ্ট, রহস্যময়, অথচ প্রবল আকর্ষণের সেই জগৎ। নিজেকে একটা স্থির বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে অজ্ঞাত জগতের জন্য নির্ভর হবার চেষ্টা করছেন এঁরা। জ্ঞানে, তর্কে, আলোচনার পথে এরা অগ্রসর হন নি, হয়েছেন বিশ্বাসের পথে। এঁদের বিশ্বাস কি তবে মূল্যহীন ? কে জানে। রাঙামাসীর মনের মধ্যে প্রবেশ করলে তাঁর বিশ্বাসের গভীরতা এবং একান্ত নির্ভরতার জন্য ভারহীন মনের নিশ্চিন্ততা হয় তো

আমি অনুভব করতে পারতুম। হয় তো রাঙামাসীর বিশ্বাসে পরলোকের সঞ্চয় বুঝি তার পূর্ণ হল এই একটি প্রণামেই।

রবীন্দ্রনাথের গানটি মনে পড়ল :

"একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে,
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ পারে।"

পরিপূর্ণ বিশ্বাসে সে নমস্কার করতে পারলে, তেমনি নিবিড়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারলে, হয়তো সবই হয়। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই হয়। সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তো একটা বিরাট শক্তির প্রকাশ মাত্র। যে শক্তি অচেতন পদার্থ থেকে অ্যাটমিক রিয়াকসনে বেরিয়ে এসে জগতে বিপর্যয় আনতে পারে, একটি চেতন মনের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে আরো আশ্চর্যকর কিছু কি সে করতে পারে না? ইচ্ছার মধ্যেই তো সব রয়েছে। সেই ইচ্ছাশক্তিকে জাগরিত করতে পারলেই হয়। অন্ধ ভক্তির রিঅ্যাকটারে ভেঙে সেই ইচ্ছাপরমাণু সর্বব্যাপী বিরাট শক্তিতে পরিণত হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি!

পাণ্ডা ডাকল : আসুন মা, ভেতরে আসুন। আপনারা পুণ্যবান। আজ মন্দিরে তেমন ভীড় নেই। ভাল করে বাবাকে দর্শন করতে পারবেন। স্পর্শ করতে পারবেন।

ফুল আর নৈবেদ্যর ডালা হাতে করে তরতর করে সে ভেতরে ঢুকে গেল। সমস্ত মন্দির প্রাঙ্গণটাই পাথরে বাঁধানো। ফুল বেলপাতা আর গঙ্গাজলে পিচ্ছিল। কত ভক্তের অশ্রুও হয়তো এখানে পড়েছে। কত প্রেমিকের পদরেণু। কত বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা যুগ যুগ ধরে এই মন্দিরপ্রাঙ্গণে তার নিঃশ্বাস ফেলে গেছে।

পাণ্ডার তাড়া পেয়ে রাঙামাসী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে মন্দিরে ঢুকলেন। ছোট্ট কুণ্ডের মধ্যে বসানো পাথরের লিঙ্গ। ফুল বেলপাতা গঙ্গাজলে ঢেকে আছে এই শিব! শিব মানে শিবলিঙ্গ হিন্দু সংস্কৃতির যুগ-যুগান্তরের এক ধারক। একে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে কাশী। এরই জন্য সেই কাটিহার থেকে কাশী ছুটে এসেছেন রাঙামাসী। হাজার হাজার বিধবা এরই জন্যে কাশী বাস করেন শেষ জীবনে। হাজার হাজার বৃদ্ধ এরই জন্যে গঙ্গার তীরে ঘর বাঁধেন কাশীতে। হিন্দুর মোক্ষধাম কাশী। এই সেই কাশীশ্বর বাবা বিশ্বনাথ।

আজ ১৯৯১ খৃষ্টাব্দ। বঙ্গাব্দ ১৩৯৮ সাল। ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর কথা স্মরণ করে ভাবছি মানুষের ইহজন্মেই কিভাবে জন্মান্তর হয়। মানুষ তো তার মননের জন্যই। সেই মননে যদি ক্রমবিকাশের পথে একদিন তার চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়, অতীত দিনের সেই চিন্তাগুলো য়ুঙ-এর collective uncoscious-এর মত মনের গভীর গহনে স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে, আর তাকে যদি খুঁজেই না পাওয়া যায় তাহলে নব বিশ্বাসের ভিতের উপর দাঁড়িয়ে একে জন্মান্তর বলা ছাড়া গতি কি।

সেদিন রবীন্দ্রনাথকে ধ্রুব সত্য বলে ধরে নিয়ে ভেবেছিলুম 'হিন্দুধর্মটাই আর্য ধর্ম নয়। আর্যরা উন্নত চরিত্রের কল্পনা করতেন। তাঁরা জগৎ-কারণ শক্তিকে যে দৃষ্টিতে দেখেছিলেন তার সঙ্গে পৌত্তলিকতার সম্পর্ক নেই। আর্যদের চিন্তার সঙ্গে দ্রাবিড় হৃদয় মিশে সৃষ্টি করেছে হিন্দুধর্ম।' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'দ্রাবিড় তত্ত্বজ্ঞানী ছিল না, কিন্তু কল্পনা করিতে, গান করিতে ও গড়িতে পারিত। কলাবিদ্যায় তাহারা নিপুণ ছিল। তাহাদের গণেশ দেবতার বধূ ছিল কলাবধূ। আর্যদের বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে দ্রাবিড়ের রসপ্রবণতা ও রূপোদ্‌ভাবিনী শক্তির সংমিশ্রণ চেষ্টায় কি বিচিত্র সামগ্রী গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা সম্পূর্ণ আর্যও নহে, সম্পূর্ণ অনার্যও নহে, তাহাই হিন্দু'।

কিন্তু আজ রবীন্দ্রনাথের এ কথাটাকে আর মানতে পারছি না। আর্য আর দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে কেন বহু জাতির ভাবনার সংমিশ্রণেই বর্তমান হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্ম হিসেবে একে বর্ণনা করা শুরু হয় ভারতবর্ষে মুসলমান যুগ থেকে। করে এটা মুসলমানেরাই। 'দ্রাবিড় তত্ত্বজ্ঞানী ছিল না' রবীন্দ্রনাথের একথা আজ আর মানতে রাজি নই। বরং মনে করি আর্যরাই ছিল বর্বর, যত কিছু উচ্চ ভারতীয় ধারণা তা এদেশের অনার্য অধিবাসীদেরই। জাতিভেদ আর সংস্কৃত ভাষা ছাড়া আর্যরা ভারতবর্ষে আর কোন মহান তত্ত্ব রেখেছে এর কোন প্রমাণই নেই। জাতিভেদ বা বর্ণ ব্যবস্থাও যে তাদের তা জোর দিয়ে বলা যায় না। ঋগ্বেদে আদিপুরুষ-এর মস্তিষ্ক থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, জঙ্ঘা থেকে বৈশ্য ও পাদদ্বয় থেকে শূদ্রের জন্ম এ ধরনের কাহিনীর সন্ধান পাওয়া গেলেও—এই আদিপুরুষকে বলি দিয়েছিলেন সাধ্য দেবতারা যাদের উল্লেখ ঋগ্বেদে খুব কম দেখে মনে হয়, তাঁরা আর্য ছিলেন না। তাছাড়া সিন্ধুসভ্যতায়ও শ্রেণীভেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের বহু স্তোত্র রচনাতে অনার্যদের হাত ছিল সন্দেহ নেই। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৪তম সূক্তের রচয়িতা—অগস্ত্যের পিতৃ পরিচয় নেই। জার থেকে জন্ম অর্থাৎ জারজ। বশিষ্ঠের জন্মও জার অর্থাৎ মাতৃগর্ভ থেকে যাঁরও পিতৃ পরিচয় অজ্ঞাত। জামদগ্নিরও বংশ পরিচয় নেই। ভৃগুকে ফ্রিগিয়ান বলে মনে হয়। ঋগ্বেদের উষা মূলত অনার্য। আর্যদের গোত্রের মধ্যেও বহুর উৎসই অনার্য। যেমন—কৃষ্ণহায়ন গোত্র (কৃষ্ণ = কৃষ্ণ, কালো)। বালশিখ গোত্র (হরপ্পার বরশিখদের থেকে আগত)। ঋগ্বেদের দার্শনিক কবষ আইলুষকে 'দাসয়পুত্র' অর্থাৎ দাস মহিলার পুত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর্যদের মহান তত্ত্বকারদের মধ্যে এধরনের ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে যাঁরা মূলত আর্য নন। 'একম সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তির' মত মহতী শ্লোকের উদ্ভাবক দীর্ঘতমস মমতা দাসীর পুত্র। আর্যদের মহান চিন্তাধারা যতই তারা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে, ততই প্রকাশ পেয়েছে। এটাও প্রমাণ করে যে, অনার্যদের সংস্পর্শে আসার পরই তাদের নতুন বোধোদয় হয়েছিল। আর্যদের মহান শব্দ 'ব্রহ্মন্' একেবারে নির্ভেজাল ভারতীয়। সম্ভবত শব্দটির জন্ম এদেশের মাটি থেকেই।

যজ্ঞের যে অগ্নিপূজারী অথর্বন তাঁরা যে অনার্য এটা প্রথম দিকে অথর্ববেদকে গ্রহণ করায় আর্যদের অনীহা থেকেই প্রকাশ পায়। এই যজ্ঞপদ্ধতিও যে আর্যদের সৃষ্টি এরকম ভাববার কারণ নেই। কারণ ঐতিহাসিকদের ধারণামতে আর্যরা যদি ভারতবর্ষে বহিরাগত হয়—তবে তার আগেই গুজরাটের লোথাল অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে শুকনো ইটের যজ্ঞকুণ্ড পাওয়া গেছে। সুতরাং হয় মনে করতে হবে আর্যরা এদেশেরই, বহির্বিশ্বে এদেশ থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল—নয়তো তারা এদেশের চিরকালীন অধিবাসীদের অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের সভ্যতাভুক্ত ছিল।

সেদিন রবীন্দ্র-চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে মনে মনে হিন্দুধর্ম নামে আমাদের সনাতন ধর্মের ধারকদের পৌত্তলিক বলে অবজ্ঞা করতে শিখেছিলুম। আজ বাইশ বছর পরে আমার সেই প্রাক্তন চিন্তাকে প্রচণ্ড উপেক্ষায় অবজ্ঞা করে নির্ভয়ে বলতে পারছি হিন্দুরা পৌত্তলিক নয়। প্রতিমা-পূজারী। প্রতিম শব্দের অর্থ ইংরেজীতে দাঁড়ায় like, অর্থাৎ মতন, যেমন অনুজপ্রতিম অর্থাৎ অনুজের মত। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম তার অভিজ্ঞতায় যে সত্যের সন্ধান পেয়েছিল সেই সত্যের অনুরূপ ভাব মূর্তিতে ব্যক্ত করবার প্রচেষ্টা থেকে যা তৈরী করেছে, তার নাম তাই পুতুল না হয়ে প্রতিমা। এক একটি প্রতিমার মধ্যে রয়েছে মহান তত্ত্ব লুকিয়ে—যে তত্ত্ব বিজ্ঞানের সাধনায় আজ সত্য বলে ধরা পড়েছে। অপরপক্ষে যেসব মূর্তি আমরা প্রতিমা হিসেবে তুলে ধরেছি তা শুধু বিশেষ বিশেষ কোন ভাবনারই প্রতিফলন নয় তাদের যথার্থ সত্যতাও আছে। অবশ্য একটু ভিন্ন আকারে। স্থূলদৃষ্টির আড়ালে এই যে সব সূক্ষ্ম অস্তিত্ব তা দেখবার মত দৃষ্টি চাই। সে দৃষ্টি গঠিত হয় দেহের ত্রিমাত্রার মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করা গেলে। সেটা সম্ভব মানুষের মূলাধারস্থ কুল (শক্তি) কুণ্ড (গর্ত)-লিনীকে জাগ্রত করে উর্ধ্বগতি করা গেলে।

রবীন্দ্রনাথ একটি ক্ষেত্রে অবশ্যই ঠিক কথা বলেছেন যখন তিনি শিব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন 'শিব আর্য দেবতা নন। তাঁর বক্তব্য এই 'অনার্য' দেবতাকে বেদের প্রাচীন মঞ্চে তুলিয়া লওয়া হইল। বৈদিক রুদ্র উপাধি ধারণ করিয়া শিব আর্য দেবতার দলে স্থান পাইলেন।' কিন্তু এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে রুদ্রের ধারণাও আর্যদের নয়। এই চিন্তার উৎপত্তিও অনার্য মস্তিষ্কেই। ঋগ্বেদের রুদ্রও যে আর্য সংস্কৃতিতে স্বয়ম্ভু, অনার্য প্রভাব বহির্ভূত তা নয়। ঋগ্বেদের রুদ্রকে অথর্ববেদেই উল্লেখ করা হয়েছে ভব বা পশুপতি বলে। অথর্ববেদ অনার্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ। সুতরাং হরপ্পা মহেন-জো-দড়োর পশুপতিই হয়তো ঋগ্বেদে এসে রুদ্র হয়েছেন। সংস্কৃতে রুদ্রের অর্থ রক্তবর্ণ, দ্রাবিড় ভাষাতেও শিব মানে রক্তবর্ণ। শিব বা শিবন এই শব্দ তামিল, যার অর্থ রক্তবর্ণ। শ্রেন্দু হিসেবে তিনি তাম্রবর্ণ যা সংস্কৃতে এসে হয়েছে শম্ভু। ব্রাহ্মণ্য চিন্তার রুদ্রকে আর্যদের নিজস্ব উদ্ভাবনা হিসেবে দেখাবার জন্য বলা হয়েছে যে, 'ঋগ্বেদ সংহিতাতে 'রুদ্র' শব্দ অগ্নিবাচক। সেই জন্য ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে অক্ষয়কুমার দত্ত তৃতীয় ভাগে ১৬০ পৃষ্ঠায় ফুট নোটে ঋগ্বেদের

১ অষ্টকে, ২য় অধ্যায়ে, ৪র্থ সূক্তে ১০ ঋকের উল্লেখ করে এই ধরনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন :

'জরাবোধ তিদ্বিবিড্ঢি বিশে বিশে যজ্ঞিয়ায স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকং'।

অর্থাৎ 'অগ্নি তুমি স্তুতি শ্রবণে জাগরিত হইয়া থাক। এখন যজমানের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন ও তাহার অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সিদ্ধার্থে সেই যজ্ঞে প্রবেশ কর। যজমান 'রুদ্রে'র অর্থাৎ তোমার সম্যকরূপে স্তব করিতেছে।' দত্ত মহাশয় যাই বলার চেষ্টা করুন না কেন শিবের বিশেষ অস্তিত্ব তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। শিবলিঙ্গ আরো বেশী উজ্জ্বল তার দুরবগাহ ভাবের জন্য। যে ভাবনা বা চিন্তা দত্ত মশাইয়ের মধ্যে আসা সম্ভব ছিল না দিব্য জগতের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কের অভাবের ফলে। দিব্য জগৎ পাণ্ডিত্যের জগৎ নয়, সরাসরি দর্শনের জগৎ—যে দর্শনে মূর্খ গদাধর ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস হন। যার অভাবে অক্ষয়কুমার দত্ত শুধু মাত্র একজন ইতিহাস লেখক হন।

সেদিন কাশীর বিশ্বনাথ দর্শনে মিনু ছিল আমার চিন্তার অনেক উর্ধ্বে শুধুমাত্র তার বিশ্বাসের জন্য। জানি না আজ মিনু কোথায় আছে। জানি না তার ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাস তেমনই আছে না উনবিংশ শতকের ত্রিমাত্রিক বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রভাবে (যা আজো আমাদের অধিকাংশ লোকের মধ্যেই বর্তমান) তা ভেঙে গেছে কিংবা super-Industrialisation-এর Future Shock-এ আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরছে। কিন্তু আমি। আমার মধ্যে ঘটে গেছে এক জন্মান্তর। মানসজগতের সেই প্রাচীন চিন্তাগুলি অচেতন মনের কোন অতল তলে হয়তো জলের সেডিমেন্টের মত পড়ে আছে—যেগুলি স্বচ্ছ জলকে ঘোলাটে করে আমার দৃষ্টিকে প্রায় সবটাই আচ্ছন্ন করে ছিল। তলের তলানিগুলোর উপর আজ যে স্বচ্ছ সলিল সেখানে আমি অনন্ত আকাশের পরিমাপহীন ছায়া দেখতে পাচ্ছি। হিমালয় থেকে আগত যে মহান সন্ন্যাসী অকারণ করুণায় আমায় সেই স্বচ্ছ সলিলের প্রতিবিম্বে অনাবিল আকাশকে দেখবার সৌভাগ্য দিয়েছেন তাঁকে শতকোটি নমস্কার।

সেই যে বলেছিলুম, জন্মান্তর, পঠনে, পাঠনে, করুণায়, অনুভবে সেই জন্মান্তরের সামান্য ইতিহাস এখানেই বলা যাক শিবকে নিয়েই। ইতিহাস পড়ে যখন শিবকে জানার চেষ্টা করছি তখনও বোধহয় মনটা ছিল আমার বৈদিক সভ্যতার চৌহদ্দিতে আবদ্ধ। সেই জন্য রুদ্রের সন্ধান করেছিলুম সেই সব তথ্য দিয়ে, যেখানে প্রমাণ হয় রুদ্র চিন্তার উদ্ভব ভারতে নয়, ভারতের বাইরে আর্যদের আদি বিচরণ ক্ষেত্রে অর্থাৎ কাস্পীয়ান সাগরের তীর থেকে প্রাচীন গন্ধারের পূর্ব সীমানা পর্যন্ত। ঐ অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন বলেই এ স্থানের নাম দেওয়া হয় ঐর্যান অর্থাৎ গতিশীল। এই ঐর্যান শব্দেরই অপভ্রংশ বর্তমান—ইরান। আর এই ঐর্যান শব্দ থেকেই এসেছে 'আর্য' শব্দ।

বৈদিক আর্যরা প্রথম দিকে রুদ্রকে মনে করতেন সমগ্র সৃষ্টির অধিপতি। কিন্তু

তাঁর স্বভাবের মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন একটা উগ্রতা। ভাবতেন তিনি রুষ্ট হলে পশুপাল বিনষ্ট হবে। সেই জন্য রুদ্রের উপাসনা করতেন তাকে খুশী করার জন্য।

ভারতে প্রবেশ করার পর রুদ্রের উগ্রতা তাদের কাছে এত বেশি বলে মনে হয়েছিল যে, তাঁকে তারা এড়িয়ে চলারই চেষ্টা করেন। সম্ভবত ভারতে সূর্যের গ্রীষ্মকালীন খরতাপ লক্ষ্য করেই আর্যরা তাঁকে রুদ্র বলে কল্পনা করতে থাকেন। এবং তাঁকে ত্রিনরূপে ভাবতে অভ্যস্ত করেন যেমন, সূর্যকিরণ, অগ্নি ও বিদ্যুৎ। যজুর্বেদ যুগের প্রারম্ভে ও ঋগ্বেদ যুগের শেষ পর্যায়ে তাঁরা রুদ্রের মধ্যে মঙ্গলময় রূপের সন্ধান পান। এটাও সম্ভবত অনার্য প্রভাবে প্রভাবিত।

সপ্তসিন্ধুর তীর ছেড়ে এই উপমহাদেশের পূর্বদিকে আর্যরা যখন ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করতে থাকেন ঐ সময় সম্ভবত শিবের লিঙ্গমূর্তি কল্পনা করে তাঁরা তাকে পূজো করতে আরম্ভ করেন। বৈদিক সংস্কৃতে লিঙ্গ অর্থে বোঝাতো কারণ-বস্তুর সূক্ষ্মরূপ। বৈদিক ঋষিরা বিশাল স্থূল দেহের কারণ স্বরূপ অষ্টাদশ সূক্ষ্ম শরীরকে বলতেন লিঙ্গ দেহ। তাদের মতে স্থূল দেহ ধ্বংস হবার পর এই লিঙ্গদেহ বা সূক্ষ্ম শরীর অন্যদেহে প্রবেশ করে। অনার্য প্রভাবে প্রবাহিত হয়ে এই লিঙ্গের অর্থ আরও বিকৃত হয়েছিল বলে ধারণা। লিঙ্গের সঙ্গে যোনিও যুক্ত আছে। লিঙ্গ ও যোনির কল্পনা আর্যদের বহু পূর্বেই সিন্ধু উপত্যকার মানুষের মধ্যে ছিল। পরে আর্যরা তা গ্রহণ করে। যুক্ত লিঙ্গ ও যোনি হল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উন্মেষের প্রথম প্রতীক। যোনি হল উন্মেষের উপাদান কারণ এবং লিঙ্গ হল নিমিত্ত কারণ। শিব যখন অরূপ তখন তাঁর প্রতীক হল লিঙ্গ। যোনিযুক্ত লিঙ্গ এই অর্থ প্রকাশ করে যে, লিঙ্গ থেকে প্রকৃতি-রূপে যোনির উৎপত্তি এবং লিঙ্গের মধ্যেই আবার তার লয়। লিঙ্গম শব্দের ব্যুৎপত্তি হল লি = মিলে যাওয়া। গম = বিকশিত বা বাহির হওয়া। অর্থাৎ শিবলিঙ্গ ও যোনি, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের সূচনা করে। এবং এই লিঙ্গই বিশদ অর্থে নটরাজের মূর্তি ধরে দক্ষিণ ভারতে দেখা দিয়েছিল যে মূর্তির অর্থ বৈজ্ঞানিক ভাবেও অত্যন্ত চমকপ্রদ। নটরাজ নৃত্যরত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন একটি শায়িত মনুষ্য মূর্তির উপর—সে মানুষ হল ভারতীয় ভাস্কর্য ধারণাতে দুষ্টশক্তির প্রতীক। ঊর্ধ্ব দক্ষিণ হস্তের ডম্বরু হল ওঁ শব্দ। সম উচ্চতায় ঊর্ধ্ব বামহস্তধৃত অগ্নি হল ধ্বংসের ইঙ্গিত। দ্বিতীয় মুদ্রাভঙ্গীকৃত দক্ষিণ বাহু হল—বরদানের প্রতীক। দ্বিতীয় বাম হস্ত যা উত্থিত বাম চরণের উপর ঝুঁকে আছে তা হল মায়া থেকে মুক্তি দানের প্রতীক। কিন্তু আধুনিক পদার্থবিদেরা এই মূর্তির মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন নৃত্যায়িত বিশ্বছন্দ। Subatomic জগতের চরিত্র অনুধাবন করতে গিয়ে পদার্থবিদেরা ইদানীং খুঁজে পেয়েছেন বস্তুর অন্তস্থ একটি গতিময় চরিত্র। দেখা গেছে যে অণুর উপাদান subatomic particles হল গতিময় চরিত্রের। তারা যে স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে অবস্থান করে তা নয়। একটি অপরিচ্ছিন্ন কর্মজালের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে পারস্পরিক আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে তারা সর্বদাই কর্মরত। এই যে পারস্পরিক

আদান-প্রদান এর মধ্য দিয়েই একটি অপরিচ্ছিন্ন শক্তিপ্রবাহ চলেছে। এই শক্তিপ্রবাহ হচ্ছে particle-গুলির অনবরত আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে। এই পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে যে শক্তিপ্রবাহ চলেছে তারই মধ্যে ঘটছে অনন্ত বৈচিত্র্যে particle-গুলির সৃষ্টি ও ধ্বংস। কিন্তু প্রতীয়মান হচ্ছে এ যেন নিঃশেষ শক্তির এক অনন্ত প্রবাহ। এই particle-গুলির পারস্পরিক যোগাযোগেই বস্তুর তুলনামূলক স্থায়ী উপাদান যা দিয়েই গঠিত হচ্ছে স্থূল জগৎ। তবে এই স্থূল জগৎও স্থির নয়, শাশ্বত নয়, অনবরত দোলায়িত হচ্ছে ছন্দময় গতিতে। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এইভাবে নিঃশেষ এক কর্মপ্রবাহে শক্তিনৃত্যে নৃত্যায়িত।

কত বৈচিত্র্যে যে এই নৃত্য তা বলার নয়। তবু তা কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীতে যেন বিভক্ত। Subatomic particle চর্চা করতে গিয়ে দেখা গেছে তাদের পারস্পরিক যোগাযোগের মধ্যে বিশৃংখলা নয়, রয়েছে একটি শৃংখলায়িত চরিত্র। সকল প্রকার অণু এবং সকলপ্রকার বস্তু, সবই তিনটি বস্তু গ্রাহ্য পরমাণু দিয়ে গঠিত —proton, neutron ও electron. আর একটি particle রয়েছে যাকে বলে photon—যার মধ্যে বস্তুগ্রাহ্য কোন উপাদান নেই বললেই চলে অর্থাৎ যা massless. Electromagnetic radiation-এ এটি একটি বিশেষ ধরনের একক (unit)। Proton, electron ও photon প্রত্যেকটিই স্থায়ী particle. যতক্ষণ না অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে আসছে ততক্ষণ তারা টিকে থাকে। কিন্তু Neutron নিজে নিজেই ভেঙে যেতে পারে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এই যে পরমাণু লীলা তারই ছন্দময় গতি ফুটে উঠেছে নটরাজের মূর্তির মধ্যে। এই নটরাজ বা শিব হিন্দুদের প্রাচীনতম দেবতাদের মধ্যে একজন। তিনি যে কোন সময় যে কোন মূর্তি ধারণ করতে পারেন। ব্রহ্মের প্রতীক হিসেবে তিনি মহেশ্বর নামে পরিচিত। বিশ্বছন্দের প্রতীক হিসেবে তিনি নটরাজরূপে আবির্ভূত। এইরূপে তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সব কিছু নিজের মধ্যেই ব্যক্ত করেন। শিবের এই বিশ্বনৃত্য শুধু যে সৃষ্টি ও ধ্বংসই সূচনা করে তা নয়, প্রতিনিয়ত জন্ম ও মৃত্যুর ছন্দও রচনা করে। আবার তিনি একথাও বুঝিয়ে দেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে সৃষ্টির নানা বৈচিত্র্য, তা মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এগুলি কোন মৌল ব্যাপার নয়। ভ্রান্তি মাত্র নিত্য পরিবর্তনশীল। হাইনরিশ জিমারের মতে তাঁর ভয়ংকর ভঙ্গী ও প্রশান্ত দর্শন বিশ্বজগতের মায়াকেই প্রকটিত করছে। তার ছন্দায়িত হস্তপদ এবং দোলায়মান দেহ একথাই বোঝাবার চেষ্টা করে যে নটরাজ হলেন নিঃশেষ প্রবাহ মহাজগতিক জন্মমৃত্যুর প্রতীক। মৃত্যু এখানে জীবনের সঙ্গে সাম্য রক্ষা করে। ধ্বংস ইঙ্গিত করে নব প্রজন্মের।

নটরাজের মূর্তির প্রাধান্য দক্ষিণ ভারতে দেখে মনে হয় যে, এ মূর্তি অনার্য মস্তিষ্ক কল্পিত আর্য কল্পনাপ্রসূত নয়। এর সূচনা যে মধ্যযুগের ভারতে তা নয়। এর উৎস সুদূর অতীতে, সেই সিন্ধুসভ্যতার যেখানেই প্রথম পাওয়া

গেছে—লিঙ্গের অস্তিত্ব। যার পূজারীদের ভারতে আগত আর্যরা ঘৃণাভরে বলছে 'শিশ্নেদেবাঃ'। কিন্তু এত সব উন্নত ধারণা প্রাগবৈদিক ভারতে ছিল কিনা এরকম অনেকে ভাবতেও পারেন। তবে ইদানীং প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সিন্ধু উপত্যকার নানা মূর্তি ও সীলমোহরের উৎকর্ষ বিচার করে এমন ধারণাই প্রকাশ করেছেন যে, সু-উন্নত অধ্যাত্ম ধারণার অভাব প্রাগার্য ভারতীয়দের মধ্যে ছিল না। পশুকুল পরিবৃত সিন্ধু উপত্যকার পশুপতি মূর্তিকে তো তাঁরা পাশ দ্বারা আবদ্ধ পরমাত্মা স্বরূপ বলেই মনে করেন। ভারতীয় মন্ত্রেও এই ধারণাই স্থান লাভ করে আছে। এমন একটি উন্নত ধারণা যদি প্রাগার্য ভারতীয়দের মধ্যে থাকতে পারে তাহলে আর একটি যে থাকবে না—তা বলা যায় কি করে! সুতরাং লিঙ্গ শব্দের তাৎপর্য সিন্ধু উপত্যকার মানুষের কাছেও জ্ঞাত ছিল বলেই ধারণা। এই ধরনের জ্ঞান শুধু অর্জিত হতে পারে যোগ সাধনার দ্বারা। সিন্ধুসভ্যতায় যে যোগসাধনার ধারা প্রচলিত ছিল তার পরিচয় কূর্মাসনে উপবিষ্ট পশুপতির মূর্তি। তা ছাড়া সেখানে ধ্যানরত ভাস্কর্য শিল্পও পাওয়া গেছে। প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতার প্রাপ্তি পরবর্তীকালের মানুষের কাছে চাপা পড়ে গিয়েছিল বলে সেই প্রাপ্তি তাদের কাছে এসেছিল Myth-এর আকারে। যা থেকে পুরাণ কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়ে—সমগ্র ব্যাপারটাকেই অত্যন্ত স্থূল পর্যায়ে টেনে এনে বিকৃত করেছে। বস্তুবাদী ঐতিহাসিকেরা একে ধরেছেন প্রজননের প্রতীক হিসেবে, যথার্থই পুরুষের লিঙ্গ ও রমণীর যোনি হিসাবে যা থেকে অর্থাৎ যে যৌন সঙ্গম থেকে সৃষ্টি হয়।

কিন্তু শিবলিঙ্গের কল্পনা আদৌ এই পার্থিব ঘটনা দেখে হয় নি। হয়েছে যোগীদের যোগদৃষ্টে বিন্দু দেখে। যোগী যখন যোগে বসে চোখ বুজে নিজের কাছ থেকে বহু দূরে দিগন্তের কোণ ঘেঁষে মনকে ছুঁড়ে দেন সেখানে এক ধরনের বিন্দু রূপ আলো দেখতে পান। এই বিন্দুই হল Bla khole নির্গত আলো যা অনবরত ফুটে উঠে দেশে একের পর এক গোলকাকার জগৎ সৃষ্টি করে চলেছে। এই আলো কৃষ্ণ গহ্বর থেকে নির্গত হয়ে প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে ঘুরতে অনবরত ছড়িয়ে পড়ে। মাঝখানের শূন্যতাকে তখন একটি উৎক্ষেপের মত মনে হয়, ঠিক যেন শিবলিঙ্গ। আর তার চতুষ্পার্শ্বে ঘূর্ণায়মান জ্যোতিকে মনে হয় গৌরীপট্ট ধরনের। ভারতীয় মতে শূন্যতাজাত শক্তি স্ত্রী ও শূন্যতা পুরুষ হিসেবে কল্পিত। সেই সূত্রে শিবলিঙ্গ পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন তো বটেই।

যোগীদের ধ্যানদৃষ্ট সেই শিবলিঙ্গকেই সেদিন ১৩১৬ বঙ্গাব্দে মিনুদের সঙ্গে কাশীতে এসে আমি দেখেছিলুম। সেদিন না পঠন-পাঠনে, না মননে, না সন্তপুরুষদের করুণায়, কোন রকমেই শিবলিঙ্গের অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না। মহাপুরুষদের করুণায় ধ্যানদৃষ্ট বিন্দুতে ঘূর্ণায়মান শিবলিঙ্গ আমি দর্শন করেছি। বিজ্ঞান পড়ে এর অন্তর্নিহিত অর্থ আমি জেনেছি। আজ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে ঠিক সেখানে দাঁড়িয়েই আরো অবাক হচ্ছি আর একটি দৃশ্য দেখে। অর্থাৎ যে কুণ্ডে এই লিঙ্গ স্থাপিত হয়েছে

সেই কুণ্ড দেখে। এও কি ভারতের মহান সাধকবৃন্দের ধ্যানজাত পরাবিজ্ঞানের ভিত্তিতে রচিত? আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানী। তাঁদের বহুদিনের সাধনা দ্বারা যে কথা আজ জানতে পেরেছেন? এই কুণ্ড কি পদার্থ-বিজ্ঞানের শূন্যতাজাত চার্জের চতুষ্পার্শ্বস্থ বেঁকে যাওয়া অলোড়িত দেশ, যার পাশে ভিন্ন চার্জের উদয় হলেই সে তার শক্তি অনুভব করতে পারে? দেশের এই যে অবস্থা যার মধ্যে রয়েছে শক্তি তৈরী করবার ক্ষমতা, বিজ্ঞানে তাকেই বলা হয়েছে field

দেশের ত্রিমাত্রিক নিউটনিয়ান ধারণা সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিয়েছেন আইনস্টাইন। তাঁর মতে দেশ ত্রিমাত্রিক নয়, তার মধ্যে রয়েছে আর এক মাত্রা যার নাম কাল (space-time continuum)। এই চতুর্মাত্রিক দেশকালে কোন মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই বক্রতা সৃষ্টি করতে পারে। আইনস্টাইনের মতে ত্রিমাত্রিক দেশ বলতে আমরা যা নিউটনিয়ান অর্থে বুঝি তা হল আদবে বাঁক খাওয়া। দেশ-কালে যে-কোন পদার্থযুক্ত বিষয়ের উদ্ভবেই যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সৃষ্টি হয় তাতেই দেশ বেঁকে যায়। কতটা বাঁকবে তা অবশ্য নির্ভর করে বিষয় অর্থাৎ object কতটা ভারি এবং বড় তার উপর। কিন্তু বিষয়ের উদ্ভবে দেশ যে বেঁকে যায় তাতে সন্দেহ নেই। কাশীর শিবলিঙ্গের কুণ্ড কি সেই curved space! আশ্চর্য! বিজ্ঞানের এই মহান সত্যের মহৎ তত্ত্ব কি ভারতীয় ঋষিরা সহস্র বৎসর পূর্বে ধ্যানযোগেই লাভ করেছিলেন?

কত তফাৎ ১৩৭৩ আর ১৩৯৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে। সেই একই লিঙ্গ সেদিন কি ভাব জাগিয়েছিল আমার মধ্যে, আবার আজই বা কি ভাব জাগাচ্ছে! আজকের এই চিন্তাপটের পরিপ্রেক্ষিতে সেদিনের সেই আমার কথা মনে ভাবতে গেলে যেন মনে হয়, এ-জন্মের নয়, সে আমার পূর্বজন্মের কাহিনী! সত্যিই কি একে জন্মান্তরই বলা যেতে পারে না?

থাক, বর্তমান আবার একটু আড়ালে পড়ে থাক। আবার ফিরে যাওয়া যাক সেই পঁচিশ বছর আগে যেখান থেকে আবার জন্মান্তরের সূত্র খুঁজে পাব একটু পরেই।

পাণ্ডা রাঙামাসীকে টেনে নিয়ে গেল কুণ্ডের ধারে। হাত রেখে স্পর্শ করাল শিবলিঙ্গ। তড়তড় করে কি মন্ত্র পড়ল সেই জানে। রাঙামাসীকে বলল: বল...

বুঝে না বুঝে রাঙামাসী শুদ্ধ অশুদ্ধ উচ্চারণে শিব স্পর্শ করলেন। কি পেলেন রাঙামাসী কে জানে! হয় তো পেলেন পরকালের জন্য নিশ্চিন্ত বিশ্বাস। রাঙামাসীর পর বীরেনদা মিনু সবাইকেই পাণ্ডা লিঙ্গ স্পর্শ করাল। এক অতীন্দ্রিয় পরিবেশ। তর্ক-বিতর্কের অবকাশ নেই যেন। বিশ্বাস অবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে মনকে সে চমকিত করে দেয়। পাণ্ডা আমার দিকে তাকিয়ে বলল: নিন বাবুজী লিঙ্গ স্পর্শ করুন।

কোনো দ্বিরুক্তি না করে লিঙ্গ স্পর্শ করলুম আমি। এমন এক আশ্চর্য পরিবেশ যে, মনের মধ্যে কোন প্রার্থনা থাকল না আমার। শুধু স্পর্শ করলুম। যেন স্পর্শ করতে বাধ্য হলুম।

অপলক চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখলুম শিবকে। পাণ্ডা তাড়া দিল: চলুন,

আরো অনেক মন্দির আছে। এই সরস্বতী, ইনি গণেশ, প্রণাম করুন। ইনি অমুক শিব, এঁকে পুজো দিতেই হয়। এ অমুক সবাই এখানে মাথা নোয়ায়। নইতে নইতে ঘাড়ে ব্যথা। একটু চরণামৃত। নিদেনপক্ষে দু' আনা পয়সা। পাণ্ডা অবশ্য সব জায়গাকে গুরুত্ব দিল না। কিন্তু দু' এক জায়গায় থেমে বললে: এখানে দিন, কিছু দিতে হয়। বুঝলুম এখানে আছে কমিশনের ব্যাপার, যার সঙ্গে যার ব্যবস্থা।

আমি বললুম: পাণ্ডা ঠাকুর, শিব তো অনেক দেখলুম। এখন মনে হচ্ছে এখানে প্রত্যেকটা পাথরই শিব। এবার অন্নপূর্ণা দর্শন করাও দেখি। কাশী তো তাঁরই জন্য বিখ্যাত। জরতির বেশে ব্যাসদেবকে ছলনা করে ব্যাস কাশীর হাত থেকে তিনিই তো কাশীর মাহাত্ম্যকে রক্ষা করেছেন! চল, মা অন্নপূর্ণাকে দেখব।

পাণ্ডা বলল: নিশ্চয়ই। মা অন্নপূর্ণা দর্শন না হলে কাশী দর্শন হয় না কি। তার আগে বুড়ো শিবকে একটু দর্শন করতে হয়।

আমি বললুম: আর শিব দেখাতে হবে না। আসল বাবাকে তো দেখে এলুম। ওতেই হয়েছে।

জিব্ কেটে পাণ্ডা বলল: ও কথা বলবেন না। বুড়ো শিব না দেখলে কাশী আসা বৃথা। আসুন।

এ মন্দিরের আড়াল দিয়ে, ও মন্দিরের ফাঁক দিয়ে বুড়ো শিবের আস্তানার দিকে আমাদের নিয়ে চলল সে। হাজারে হাজারে ঠাকুর। হনুমান থেকে শিব কত যে, তার শেষ নেই। সর্বত্রই আহ্বান, এই যে আসুন।

অবশেষে বুড়ো শিবের মন্দিরে ঢুকলুম। ক্যাশবাক্সের উপর খাতা মেলে বসে আছেন এক পাণ্ডা। নমস্কার করে বসতে হল সেখানে।

পাণ্ডা বলল: যজ্ঞ করুন, হোম করুন, পুজো দিন। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

বললুম: যাগযজ্ঞ কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। কোথায় বুড়ো শিব তাই দেখাও।

পাণ্ডা বলল: সে দেখবেন'খন। কত পুজো দেবেন, তাই বলুন।

এতক্ষণে ধর্মের ভণ্ডামীটা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মাসী কতটুকু বুঝলেন জানি না। কিন্তু বীরেনদা গরম হয়ে উঠলেন: 'বলেছি তো পুজো করব না।' তাঁর অবশ্য গরম হবার কারণ ছিল। মন্দিরে ঢুকে তাঁর দশ পনের টাকা ইতিমধ্যে ব্যয় হয়ে গেছে। তাই আর কোথাও এক পয়সা ছোঁয়াতে তিনি রাজী নন।

অসহিষ্ণু বীরেনদাকে পাণ্ডা বলল: ঠিক আছে, এবার শিব দর্শন করবেন আসুন।

আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালুম। পাণ্ডা বলল: না, সবাই নয়। একজন একজন করে দেখতে হয়।

সুতরাং বীরেনদা একা উঠলেন। ব্যাপারটা ঘটছে দোতলায়। হলের মধ্যেটা

ফাঁকা। নিচ পর্যন্ত দেখা যায়। নিচে একটা কুয়োর মত। সেখানে আছেন শিব। নাট-মন্দিরের মত চারটে থাম। রেলিং দিয়ে থামগুলো চারধারে যুক্ত। পান্ডা সেই রেলিং-এর ধারে বীরেনদাকে ঘুরিয়ে আনল। একটা থামের ধারে বীরেনদাকে বসিয়ে বিড়বিড় করে কি বলল। তারপর সমস্ত চতুষ্কোণ পরিভ্রমণ করে এসে ক্যাশবাক্সের কাছে বীরেনদাকে আসনে বসাল। ডান হাত বীরেনদার মাথার উপর রেখে বাঁ হাতে প্রায় ঘাড় ধরে সে বীরেনদার মাথা নত করে প্রণাম করাল। বীরেনদার মাথার উপর থেকে যেন জাদুমন্ত্রবলে ঝুপ করে একটা দশ টাকার নোট পড়ল।

আমি ভাবলুম, যাঃ বাবা! বীরেনদা বুড়ো শিবকে দশটা টাকা দিয়ে দিলেন? কি জানি, পান্ডা ব্যাটা আড়ালে নিয়ে গিয়ে কানে কি মন্ত্র দিল?

এল আমার পালা। চারদিক প্রদক্ষিণ করতে হবে। এই প্রথম আমার কাছে এসে আমাকে নিয়ে পান্ডা বসল। নাম গোত্র জিজ্ঞেস করে বিড়বিড় করে কি সব বলল। তারপর বলল: কত দেবে বাবাকে, বল।

আমি বললুম: কি দেব আবার? যা দেবার বীরেনদা তো দিলেন। আমরা সব এক জায়গার লোক। ভিন্ন ভিন্ন দেব নাকি?

পান্ডা আর বাড়াবাড়ি করল না। সমস্ত স্থানটি প্রদক্ষিণ করিয়ে বলল: নিচে তাকিয়ে দেখুন, বাবা বুড়ো শিব। অতি পবিত্র। প্রকৃতপক্ষে ইনিই শিব। ঔরংজীব যখন মন্দির আক্রমণ করেন, তখন পূজারী ব্রাহ্মণরা আসল শিবকে নিচের ঐ কুয়োতে ফেলে দিয়েছিল। মুসলমানেরা তাঁকে অপবিত্র করতে পারে নি। শিব প্রকৃতপক্ষে এখানেই আছেন।

এমন এক ধাঁধা যে কোনটা আসল আর কোনটা নকল শিব, বের করে কার সাধ্যি। বিরক্ত হয়ে বললুম: কাশীর সমস্ত শিবকে একবারে নমস্কার জানাচ্ছি। আমার আর শিব দর্শনে কাজ নেই। এবার শেষ কর।

বীরেনদার পাশে আমাকেও বসিয়ে দিলে পান্ডা। তারপর রাঙামাসী আর মিনুকেও অনুরূপভাবে ঘুরিয়ে আনল সে। তারপর সবাইকে এক জায়গায় বসিয়ে বীরেনদার হাতে সেই দশটা টাকা গুঁজে দিয়ে বললে: এই টাকাটা পান্ডার হাতে জমা দিন। বলুন, আমি খুশি মনে বুড়ো শিবের পূজার জন্য দশ টাকা দিলাম।

বীরেনদা প্রায় লাফিয়ে উঠলেন: দশ টাকা! সে কি! আমি তো বলি নি।

পান্ডা বলল: আপনি বলেছেন। আপনার হাত থেকে দশ টাকা পড়ল, সেকি মিথ্যা হতে পারে।

আমি বীরেনদার দিকে তাকালুম: সে কি, আপনি দশ টাকা দিতে রাজী হন নি।

—না তো!

মনে মনে এমন রাগ হল যে কি বলব। পান্ডা তো নয়, কতগুলো ধূর্ত ঠাকছে

যেন মন্দিরকে ঘিরে বসে রয়েছে। সেই মুহূর্তে মন্দিরে থাকতে যেন ঘৃণা বোধ হল। বীরেনদাকে বললুম, দিয়ে দিন দশটা টাকা। কথা বাড়িয়ে আর লাভ নেই।

অগত্যা বীরেনদা দশটা টাকাই পকেট থেকে বের করে দিলেন। রসিদ কাটতে কাটতে বুড়ো শিবের ক্যাশিয়ার-পাণ্ডা বললে: এখানে ঠক্ জোচ্চুরী পাবেন না বাবু। রসিদ দিয়ে কাজ করি। দশটা টাকা নিয়ে সে একটা রসিদ লিখে দিলে বীরেনদার হাতে।

আর দেরী নয় বীরেনদা উঠে দাঁড়ালেন। পাণ্ডা বলল: এখানে প্রতিজ্ঞা করে যান এ কথা বাইরে কাউকে বলবেন না। বুড়ো শিবের কাছে দানের কথা বাইরে প্রকাশ করলে কোন ফল হয় না।

বুঝলুম, ট্রেড-সিক্রেট যাতে প্রকাশ হয়ে না পড়ে সে জন্যে এই সতর্কতা। কিন্তু আমাদের সে কি বোঝাবে?

পাণ্ডা বলল: চলুন, এবার মা অন্নপূর্ণাকে দেখি।

আমি বললুম: দেখো, সেখানেও আবার এমনি ঠক্‌বাজী নেই তো! নইলে অন্নপূর্ণা মাথায় থাক।

এইবার রাঙামাসী একটু বিরক্ত হলেন: সন্তু, অমন কথা বোলো না। কাশীতে এসে অন্নপূর্ণার দর্শন না পেলে কাশী এসে লাভ কি?

আমি আর সে বিষয়ে কোন উত্তর করলুম না।

মিনু আমাকে আড়ালে ডেকে বলল: তোমাকে বলি নি সন্তুদা, আজে বাজে কথা বোল না। ওতে রাঙামাসী ব্যথা পান। ব্যাপারটাকে তুমি জোচ্চুরী বলে উড়িয়ে দিতে পার, কিন্তু ওঁর বয়স ও সংস্কার সেটা মানবে না। দেখ নি, প্রত্যেক ঠাকুর-দেবতাকে প্রণাম করতে করতে ওঁর চোখ মুখ কেমন হয়ে ওঠে?

আমি বললুম: কিন্তু বুড়ো শিবের মন্দির মাথাটা গরম করে দিয়েছে মিনু।

মিনু বলল: এতে ঠকেছ বলে মনে করছ কেন? দশ টাকার বিনিময়ে তুমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করলে, ঘরে বসে একশ টাকা দিয়েও কি তা পেতে? এ অভিজ্ঞতা-টাকে কি একেবারেই মূল্যহীন মনে কর নাকি তুমি?

মিনুকে আমি কথা দিলুম: মন্দিরের ভেতর এ নিয়ে আমি আর কোন কথা বলব না। রাঙামাসী যাতে ব্যথা না পান, সে কথাও মনে রাখব।

গেলুম অন্নপূর্ণার মন্দিরে। লাল কাপড়ে ঘেরা সোনার অন্নপূর্ণা। হঠাৎ কিন্তু একটা জিনিসে আমার আশ্চর্য লাগল। অন্নপূর্ণা দেখে আমি কেমন অবাক বোধ করলুম। সে কথাটা এতক্ষণ বলি নি। গভীর ভিতর শুয়ে শুয়ে রাত্রিবেলা স্বপ্ন দেখছিলুম, শিব হাতী আর অন্নপূর্ণা। শিবের মূর্তি আমার কাছে পরিচিত। ভাবলুম, ওটা মানসিক চিন্তার ফল। কিন্তু হাতী কেন দেখব, ভেবে পাইনি। অথচ কাশীতে ঢুকতেই বহু দেয়ালে দেয়ালে আমি হাতীর ছবি আঁকা দেখেছি। আর মন্দিরে ঢুকে দেখলুম, গণেশ আছেন অনেক জায়গায়। এতক্ষণও কিন্তু স্বপ্নের

সঙ্গে বাস্তবের এই সাদৃশ্যকে আমি ততটা আমল দিই নি। এবার কেমন যেন আশ্চর্য বোধ হল। অন্নপূর্ণার মূর্তির সঙ্গে আমি মোটেই পরিচিত নই। তার কি মূর্তি, কি রঙ, কি বেশ, আগে আমি জানতুম না। কিন্তু হঠাৎ অন্নপূর্ণার দিকে তাকিয়ে দেখলুম, একেবারে হুবহু এই মূর্তিই স্বপ্নে দেখেছি গতকাল গাড়ীতে। তাহলে এই স্বপ্নের কি কোন ইঙ্গিত আছে। শিক্ষার যত বড়াই-ই করি না কেন, মনের মধ্যে রয়েছে পুরুষপরম্পরায় এক সংস্কারাশ্রয়ী বিশ্বাস। হঠাৎ সেই সংস্কার আমার মধ্যে বিরাট এক সন্দেহের দোলা লাগাল। মা কি তবে আমার কাছে পুজো চান? যা আমি পূর্বে দেখি নি, তা আমি স্বপ্নেই বা দেখলুম কি করে? তবে কি স্বপ্নে একটি সূক্ষ্ম আত্মা সত্যি সত্যি দেহ ছেড়ে বাইরে গিয়ে সব কিছু দেখতে পারে? কিংবা এটি পূর্ব জন্মের অভিজ্ঞতা যা সূক্ষ্ম মানসিকতা নিয়ে জন্ম জন্মান্তর ধরে জীবের মধ্য দিয়ে বয়ে আসছে? পঁচিশ বছর আগে এ বিষয়ে আমার নিশ্চিন্ত কোন ধারণা ছিল না। পঁচিশ বছর পরে অধিমনোবিজ্ঞান চর্চা করে জেনেছি যে, একটি সূক্ষ্ম সত্তা স্বপ্নের মধ্যে দেহ ছেড়ে বাইরে যেতে পারে। আবার সুদূর অতীতের স্মৃতিও জন্মান্তরে য়ুঙের Collective unconscious-এর মত স্বপ্নপটে ছবি তুলে ধরতে পারে। দুইই সত্য। ঘটনা যাই হোক—পাণ্ডাকে বললুম: পাণ্ডা ঠাকুর, এই নাও পাঁচসিকে পয়সা। অন্নপূর্ণা মায়ের পুজো দাও।

রাঙামাসী আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। আমার মত একটা নাস্তিক হঠাৎ পুজো দিতে এমন করে কেন এগিয়ে এল, এটা যেন তিনি বুঝতে পারলেন না। তাঁর মনের ভাব আমার কাছে অস্পষ্ট থাকল না। আমি বললুম: রাঙামাসী, তুমি অবাক হচ্ছ, না? এখানে পুজো দেব, এটা তুমি ভাবতে পার নি তো? কিন্তু কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছিলুম ঠিক এই মূর্তি, মা অন্নপূর্ণাকে।

দুটো চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল রাঙামাসীর: সত্যি!

—সত্যি মাসী।

রাঙামাসী আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে: তুই ভাগ্যবান।

অন্নপূর্ণার পুজো দিয়ে বেরিয়ে আসব, হঠাৎ আমি পাণ্ডা ঠাকুরকে ধরলুম: এখানে মা কালীর মূর্তি আছে?

—আছে বাবুজী।

—তবে যে বড় বেঁধিয়ে যাচ্ছ? চল, মাকে দেখে আসি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাণ্ডা আমাদের মায়ের মন্দিরে নিয়ে এল। এক কোণে মা। কালীঘাটের কালীর সেই মূর্তি। চতুর্দিকে রাম লক্ষ্মণ সীতা ও অন্যান্য দেবতার বিগ্রহ। এখানে পাওনা টাওনার প্রশ্ন তেমন নেই। যার যেমন ইচ্ছে দেয়। ঘট আছে, ঘট রাখলেই চলে। টাকা পয়সার সঙ্গে সম্পর্ক কম বলে পাণ্ডাদের এখানে তেমন আগ্রহ নেই। আমি দুবার কপালে কর যুক্ত করে মাকে প্রণাম করলুম। কেন জানি না, ঐ ভয়ঙ্কর মূর্তির মধ্যে আমি স্নেহের স্পর্শ খুঁজি।

বেরিয়ে আসতে জনান্তিকে মিনু আমাকে বললে : সত্যি সন্তুদা, তুমি স্বপ্ন দেখেছিলে ?

মিনুর বোধ হয় ধারণা ছিল, তার কথামত রাঙামাসীকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই আমি এ অভিনয় করেছি।

আমি বললুম : সত্যি আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম মিনু।

মিনু কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে ফিক্ করে হেসে ফেলল।

আমি বললুম : হাসলে যে বড় ?

ও বলল : খুব বড় বড় কথা বলছিলে তখন, মা তোমার দর্প চূর্ণ করে দিয়েছেন।

মন্দিরপ্রাঙ্গণ থেকে অনেক ধস্তাধস্তির পর যখন বেরিয়ে এলুম, তখন সূর্য্যি-ঠাকুর পাটে বসেছেন। কিন্তু ঘড়িতে তাই বলে সময় বেশী হয় নি। কারণ বেলাটা কার্তিক মাসের। বীরেনদার দিকে তাকিয়ে বললুম : কি করবেন, বাসায় ফিরবেন, না ঘাটে যাবেন ?

মাথাটা গরম হয়ে আছে বীরেনদার। এই মুহূর্তে ঘরে ফিরে আবদ্ধ হলে সেটা আরো বেড়ে যেতে পারে। তাই তিনি বললেন : চল ঘাটে যাই। মাত্র তো সাড়ে পাঁচটা বাজে। ঘরে ফিরে কি করব ?

তীর্থস্থানে রাঙামাসীর মনের এক অফুরন্ত বিশ্বাসই যে তাকে সমস্ত ক্লান্তির হাত থেকে রক্ষা করবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মিনু এসেছে বেড়াতে। নতুনের আকর্ষণ নিশ্চয়ই ক্লান্তির তুলনায় তার কাছে বড় হবে না। ঘাটের একটা মোহ আমার মনে সিনেমায় একবার কাশীর ঘাট দেখে জাগে। সেই মোহ দুর্নিবার আকর্ষণে আমাকে টানছিল। মন যেন বলেছিল : মন্দিরের চাইতেও বড় কিছু ঘটে পাব। সুতরাং আমরা সবাই রাজী হয়ে গেলুম।

জিজ্ঞেস করে জানলুম, ঘাট বেশী দূরে নয়। কয়েক মিনিট হাঁটলেই গিয়ে পৌঁছুব। মন্দিরের এই দিকটাতে ঘাটের পথে লোকে লোকারণ্য। অধিকাংশই বাঙালী। পুজোর মরশুমে বেড়াতে এসেছে। সবাই তীর্থ করতে আসে নি, এটা বেশ বোঝা যায়। আমার আর মিনুর মত যাত্রীই বুঝি বেশী। নতুনকে জানবার, দেখবার আগ্রহ।

জনারণ্যের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ঘাটে এসে পৌঁছুলুম। দুই ধারে সারি সারি ভিখারীর দল বসে আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, এদের দেখে বিরক্তি এল না, বেমানানও বোধ হল না। মনে হল, এই মহাতীর্থে এই সব ভিখারীর অস্তিত্ব যদি না থাকতো, তবে যেন এর অঙ্গহানি ঘটতো।

আসবার সময় কিছু খুচরো পয়সা এনেছিলেন রাঙামাসী। প্রতিবেশী বৌ-ঝিয়েরাও কিছু কিছু পয়সা দিয়েছিল দান করবার জন্যে। ভিখারীকে দান করবার জন্যে তীর্থযাত্রীর হাতে এমন করে নাকি পয়সা দিতে হয়।

রাঙামাসী দু'দিকের সকলকেই একটা দুটো পয়সা দিয়ে যেতে লাগলেন।

এ দৃশ্যটা দেখবার মত। শুধু রাঙামাসী নয়, রাঙামাসীর মত আরো অনেকেই এমন দিয়ে যাচ্ছেন। এ দৃশ্য ভারতবর্ষের অতীত সমাজব্যবস্থার ক্ষীণধারা ব্যতীত আর কিছু নয়। কী আশ্চর্য এক প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল আমাদের সমাজ, যেখানে নীতি ছিল, 'দিয়তং ভুজ্যতাং'। শুধু মানুষকে কেন, পশুকে পর্যন্ত দিয়ে খাবার নীতি ছিল আমাদের সমাজে।

সেই ভারতবর্ষ আজ তার প্রাণস্রোতকে হারিয়েছে। সমাজে দেখা দিয়েছে আত্মকেন্দ্রিকতা। একে অপরকে লুটে খাবার প্রবৃত্তি এসেছে। আবার নিজের দেশের সবকিছুকে হারিয়ে দীন দরিদ্রের মত পশ্চিমের দরজায় হাত পেতে দাঁড়িয়েছি আমরা। সমাজের অনাচার দূর করতে আজ আমরা সাম্যবাদের জন্যে বিদেশের কাছে হাত পাতি। অথচ আমাদের সমাজে সপ্রেম যে সাম্যবাদ ছিল, তা খোঁজ করেও দেখি না। পশ্চিমী ধনতন্ত্রবাদের অনুকরণে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে দেশের লোককে লুণ্ঠন করি। পরিণামে কি ভয়াবহ অমঙ্গলকে ডেকে আনছি, সেদিকে লক্ষ্য রাখি না। আমরা নিজেদের ঐশ্বর্যকে যদি না হারাতুম, তবে এমন দুর্দশা আমাদের হত না।

ঘাটে এসে পৌঁছলুম। দিনের স্পষ্ট আলো নেই। সন্ধ্যা নেমেছে। ঘাটের ধারে ইতস্তত প্রদীপ জ্বলছে। সমস্ত কাশীর ঘাটের ধারটাই যেন বাঁধানো। ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঁচু পার থেকে নিচে নেমে গেছে। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী স্নান করে রোজ এখানে।

দশাশ্বমেধ ঘাট। গোল তালপাতার বা কাঠের ছাতা দাঁড়িয়ে আছে মাঝে মাঝে। ওর নিচে ব্রাহ্মণেরা বসেন। পুজো হয়, বেদপাঠ হয়। তখনো কেউ বেদ পাঠ করছিলেন, কেউ মহাভারত কেউ বা তার ইচ্ছানুরূপ ধর্মগ্রন্থ। ঠিক ঘাটের সিঁড়ির উপর একটা বড় ছাতার নিচে আলো জেলে একজন ফুল বেলপাতা বিক্রী করছে। এখানে এসে গঙ্গাকেও তো পুজো দেন কতজনে। ব্যাপারটা হয়তো হাস্যাস্পদ। কিন্তু প্রাচীন সর্বপ্রাণবাদ বা animism-এর ধারা বেয়ে এটা আজো আমাদের মধ্যে চলে আসছে। সত্য কি মিথ্যা, এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। তবে একথা আজ বিজ্ঞানকেও স্বীকার করতে হবে যে প্রাণ নেই হেন কোন বস্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও পাওয়া যাবে না। সেই প্রাণকে জাগ্রত করার আত্মশক্তি জানা থাকলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় বৈকি! কিন্তু সে কথা থাক, যা বলছিলুম তাই বলা যাক: সারি সারি নৌকা বাঁধা রয়েছে ঘাটে। কেউবা নৌকোয় চড়ে ঘুরে দেখছে কাশীর ঘাটের দৃশ্য। যা দেখেছিলুম চিত্রে, তার চেয়েও অনেক অনেক মনোহারী এই ঘাটের দৃশ্য।

সমস্ত কাশীর পরিচয় বুঝি এই ঘাটের মধ্যে। তার তীর্থের কি মাহাত্ম্য, এখানে না এলে বোঝা যাবে না।

রাঙামাসী, ধীরেনদা আর মিনু নেমে গেলেন জলের কাছে। গঙ্গার জল মস্তকে স্পর্শ করতে হয়। আমি কিন্তু নামলুম না। ঘাটের এদিকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে

দেখতে লাগলুম। কখনো জলের দিকে, কখনো উর্ধ্বে কাশীর দিকে, কখনো পূবে, কখনও বা পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম।

অনেক অনেক দিনের পুরানো ভারতবর্ষ যেন এই কাশীর ঘাটে বসে আছে। নিজের মনটাকে মেলে দিলে, সেই মনের উপর তার সাড়া অনুভব করা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষ, তপোবনের ভারতবর্ষ, সে আমার জ্ঞানে সদা জাগ্রত। তাকে যদি পাই, ভুলে যেতে পারি বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের দান, ভুলে যেতে পারি বিলাস-ব্যসন। সেই ভারতবর্ষের সামান্য মাত্র গন্ধ আমি যেন এই ঘাটে এসে পেলুম। সেই সামান্যই যেন আমাকে বিহ্বল করে দিল। আমি তন্ময় হয়ে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটকে দেখতে লাগলুম।

ওদিকে ঘাটে নেমে মিনু রাঙামাসী আর বীরেনদা আমাকে না দেখে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। মিনু তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে দূর থেকে আমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল। কিন্তু সে যে কখন আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, টেরও পাই নি।

একেবারে ঠিক পিঠের কাছে এসে মিনু ডাকল : সন্তুদা! তুমি এখানে? আমরা খুঁজে মরছি।

আমার যেন ধ্যান ভাঙল। চমকে ফিরে তাকালুম।

আমার এই বিহ্বল ভাব মিনুর দৃষ্টি এড়াল না। সে জিজ্ঞাসা করল : কি দেখছিলে তুমি?

আমি বললুম : জান মিনু, আমার অতীতের ভারতবর্ষকে যেন এখানে অনেকটা দেখতে পেলুম। কাশীর এই ঘাটে দাঁড়িয়ে মনে হয় না এই ভারতবর্ষ সেই তপোবনের ভারতবর্ষ?

মিনু বলল : তোমার মত অতদূর ভাবতে পারি নে। কিন্তু ভাল লাগছে। কেমন যেন আমারও ভাল লাগছে। কেমন একটা গাম্ভীর্য আছে, যাকে বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এটাই বুঝি তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য।

আমি বললুম : আছে হয় তো কিছু, তাকে আমরা জানি না, বুঝি না বলে অবিশ্বাস করতে চাই।

মিনু বলল : চল।

—কোথায়?

—নৌকায় করে ঘুরব একটু। নদীর মাঝখানে থেকে এই ঘাটকে দেখতে বোধহয় আরো ভাল লাগবে। ঘাট ঘুরিয়ে দেখাতে দু'টাকা করে নেয়। ও দিকে মাইল খানেক দক্ষিণে গিয়ে উত্তরে মণিকর্ণিকার ঘাট পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনবে।

আমি বললুম : চল, গঙ্গা থেকে দেখতে বোধহয় আরো ভালই লাগবে ঘাটকে।

ঘাটে নেমে দেখি, বীরেনদা আর রাঙামাসী ইতিমধ্যেই নৌকোয় গিয়ে বসেছেন। মিনু আর আমিও উঠলুম। ছোট ডিঙি নৌকো, মাঝি একা। নৌকো চালানো

প্রথমে দক্ষিণে, উজানে। কারণ কাশীর ঘাটে গঙ্গা উত্তর বাহিনী। পশ্চিমে কাশীর ঘাটের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম। গঙ্গার বুক থেকে ধাপে ধাপে কিনার বাঁধিয়ে নদীর ধার ঘেঁষে বড় বড় ঘর বাড়ি। পুণ্যার্থীরাই এইসব গৃহ তৈরী করেছেন। এইসব গৃহের প্রাঙ্গণ থেকে আলোর আভাস ভেসে আসছে। গঙ্গার বুক থেকে দেখা কলকাতার আলোর মত অত ঝলমলে না। এ আলোর সংকেত ঠিক যেন গোধূলি লগ্নের আকাশে নক্ষত্রের মত। মাঝি শুধু তো মাঝি নয়, গাইডও। মণিকর্ণিকার ঘাট থেকে দক্ষিণে দু'মাইল পথ ও সবগুলো বাড়ীর ইতিহাস তার জানা। নৌকো চালাতে চালাতে সে বলে যেতে লাগল: এটা ইন্দোরের মহারাজার বাড়ী, এটা বরোদার, এটা অমুক, ওটা অমুকের ইত্যাদি।

ওকে বললুম: সবগুলো বাড়ীই রাজা মহারাজাদের?

মিনুকে বললুম: বাড়ীর পরিসংখ্যানটা নিলে তো?

—কেন?

—কি বুঝলে এতে?

—হেঁয়ালী ছেড়ে স্পষ্ট করে বল না।

আমি বললুম: এই যে সমস্ত বাড়ী, এদের মালিকরা নিশ্চিতই কেউ পুণ্যবান নন। সচেতনভাবেই তাঁরা পাপ করতেন এবং পাপ খণ্ডাবার জন্যে পার্মানেন্ট ব্যবস্থা করতেন। এইটুকু এখন মনে হচ্ছে, পাপ এবং পুণ্যের অধিকার একমাত্র লক্ষ্মীর বরপুত্রদেরই। আমি ভাবছি মিনু, ধর্ম পাপকেও প্রশ্রয় দিয়েছে কি না?

মিনু আর বীরেনদা আমার দিকে তাকাল: কি রকম?

বললুম: একবার কাশীর বাবা বিশ্বনাথের দর্শনে যদি সমস্ত পাপ কেটে যায়, কাশীতে মৃত্যু হলে যদি পুনর্জন্ম না থাকে তবে যোগসাধনা ধর্মকর্ম করে সে পুণ্য আর মুক্তি অর্জনের কি প্রয়োজন আছে। একবার কাশী এলেই হল। এইসব রাজা মহারাজারা সারাজীবন ভরে পাপ করেন এবং শেষ জীবনে পাপ খণ্ডাবার জন্যে কাশী এসে বাস করেন। পাপের জন্য তাঁদের মনে এতটুকু সংকোচ পর্যন্ত বোধ হয় না। কারণ, তারা জানেন মোক্ষধাম কাশী আছে তাঁদের হাতের নাগালের মধ্যেই। আমি ভাবি, তীর্থস্থানের এইসব মাহাত্ম্য নিয়ে যে গালগল্প তা প্রকৃতপক্ষে তার মাহাত্ম্যকে নষ্ট করেছে কিনা।

মিনু আমাকে বলল: এইসব উদ্ভট কল্পনা তোমার মাথাতেই কেন আসে, ভেবে পাই নে। এই বিরাট বিরাট অট্টালিকাগুলো দাঁড়িয়ে আছে ঘাট জুড়ে, উত্তর থেকে দক্ষিণে—বহুদূরব্যাপী। ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে'ছ জলের বুক থেকে কত উঁচুতে। এমন একটা বিরাট ব্যাপারকে তাকিয়ে দেখতে ভাল লাগে। এর মধ্যে যে সৌন্দর্যের দ্যোতনা তা গভীর। এইটুকু দেখ, ভাল লাগবে। অপ্রয়োজনীয় কল্পনা করে নিজেকেই মাঝে মাঝে তুমি ক্ষতবিক্ষত কর সত্যুদা।

আমি বললুম ঃ কি করি বল। কেন যে আমার মধ্যে এইসব কল্পনাগুলো এসে যায়, কে জানে।

বীরেনবাবু ধর্মের মূল রহস্য কি, আমি জানি নে। সাধনমার্গে কোন্ পথে তিনি মুক্তি চান, সেটা তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। তবে হাবেভাবে যেটুকু বুঝি, তিনিও রাজা মহারাজাদের মত সংস্কার কিঞ্চিতমাত্র করতে চান। তীর্থস্থান ঘুরতে এসে হঠাৎ অলৌকিক একটা কিছু হয়ে যাবে, এমন ইচ্ছাও তাঁর মনে গোপনে গোপনে আছে বোধ হয়।

তিনি মাঝিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আচ্ছা মাঝি, ঘাটে কোন সাধু সন্ন্যাসী তো দেখলুম না। ওরা কোথায় থাকেন ?

দক্ষিণে কি একটা জায়গার নাম করে মাঝি বলল ঃ ওখানে বড় একজন সাধু থাকেন। যেতে হলে দিনের বেলা যেতে হয়।

বীরেনবাবু কৌতূহলটা স্বাভাবিক। কাশীর ঘাটে বড় কেন সাধু দেখতে না পাওয়া রীতিমত আশ্চর্য ঘটনা বৈ কি। সত্যি বলতে কি, ভাল গেরুয়া-পরা একটা মানুষই নজরে পড়ে নি। জটাজুট রুদ্রাক্ষ তো দূরের কথা। অথচ এই কাশীর ঘাটেই না কত অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছেন তৈলঙ্গস্বামী। মণিকর্ণিকার ঘাটে মৃতকে জীবন্ত করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন স্বামী নিগমানন্দ। এমন আশ্চর্য দু'একজন সন্ন্যাসী দেখবার আগ্রহ প্রত্যেক তীর্থযাত্রীরই থাকে। সেই জন্যেই তো এত কষ্ট স্বীকার করে দূর দূরান্ত থেকে তীর্থস্থানে আসা। এই যে আমি আর মিনু এসেছি শুধু বেড়াবার জন্যে—এই আমরাও কি মন্দিরে ঢুকে অভিভূত হই নি ? পুজো দিই নি ? মনে মনে কিছু প্রার্থনা করি নি ? অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোন সাধুর দর্শন পেলে, তাঁর সিদ্ধবাক্যে আমাদের জীবনেও অভূতপূর্ব সাফল্যের দুয়ার খুলে যাক, এমন সব গোপন আশা মনের মধ্যে নেই কি ? বীরেনদাকে আর দোষ দিয়ে লাভ কি। তিনি তাঁর মনের ভাবটাকে প্রকাশ করেছেন. আমরা রেখেছি অপ্রকাশ এই যা।

নৌকো উজান ঠেলে এগিয়ে চলেছে। কার্তিক মাস। কলকাতায় বিন্দুমাত্র শীত অনুভব করিনি। কাটিহারেও নয়। একটু সিরসিরে শীত এখানে যেন অনুভব করা যাচ্ছে। সেটা মন্দ লাগছে না। এই কাশীর ইতিহাসে কিংবদন্তীর অভাব নেই। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ভারতচন্দ্রের সেই লাইন কয়টি ঃ

> মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
> ডানে করে ভাঙা লড়ি বাম কক্ষে ঝুড়ি ॥
> ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আদি সাঁদি।
> হাত দিলে ধুলা উড়ে যেন কেয়া কাঁদি।

অন্নদার জরতীবেশে ব্যাস-ছলনা। কাশী ছেড়ে ব্যাস-কাশীতে যাবেন না অন্নদা। বুড়ীবেশে ছলনা করলেন ব্যাসকে। বারবার জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাস-কাশীতে মরলে কি

হয় ? যতবারই ব্যাস বলেন, মরলে মোক্ষ, ততবারই বুড়ী আবার জিজ্ঞেস করেন। শেষে বিরক্ত হয়ে ব্যাস বললেন : এখানে মরলে হয় গর্দভ। 'তথাস্তু' বলে বুড়ী অন্তর্ধান করলেন। ব্যাস কাশী আর মোক্ষধাম হয়ে উঠল না।

কিন্তু কোথায় ? কত দূরে সেই ব্যাস-কাশী ? নিশ্চয়ই কাছে পিঠে কোথাও ? মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলুম : হ্যাঁ গো মাঝি, ব্যাস-কাশী কোথায় ?

পূব পাবে নদীর বাঁক ঘুরে একটা ধূসর গ্রাম। সন্ধ্যায় সেই গ্রামের বুকে কিছু কিছু আলো ঝলমল করছে। মাঝি বলল, ঐ ব্যাস-কাশী।

—কতক্ষণ লাগে ওখানে যেতে ?

—দু ঘণ্টা লাগবে বাবু। দিনেব বেলা যেতে হয়। যেতে চান তো কাল বেলা দশটায় আসবেন। কাশীরাজার বাড়ী আছে ওখানে।

মিন কে বললুম : মিনু কাশীর বাজা আসলে একটি গর্দভ।

মিনু বলল : ছি, ছি, কি যে বলছ।

—মিছে বলি নি। নইলে মোক্ষধাম কাশী ছেড়ে কেউ ব্যাস-কাশীতে গর্দভ হবার জন্য বাস করে। ভারতচন্দ্রের কবিতা তোমার মনে নেই ? তুমি তো বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী।

মিনু বলল : হ্যাঁ, এ কথাটা কিন্তু আমার মনেই পড়ছিল না।

আমি বললুম : কোচবিহারের রাজাবা কামরূপ কামাখ্যার মন্দিরে যেতে পারেন না, এমন কি মন্দিবের চূড়া পর্যন্ত দর্শন কবেন না। দেবীব অভিশাপ আছে। কাশীর রাজাব ক্ষেত্রে তেমন কোন কিছু আছে বোধ হয়, যে জন্য তিনি কাশী ছেড়ে ব্যাস-কাশীতে তাঁর প্রাসাদ তৈবী কবেছেন।

মাঝি বলল : বাবুজী, কাল যাবেন কি ব্যাস-কাশীতে ?

বীবেনদার মুখের দিকে তাকালুম। বীরেনদা বললেন : দেখি রাতে প্রোগ্রাম ঠিক করা যাবে। যদি যাই, কাল দশটায় ঘাটে আসব।

মাঝি বলল : ব্যাস-কাশী দর্শন না করলে কাশী দর্শনের পুণ্য হয় না। তীর্থযাত্রীদের ব্যাস-কাশী দেখতেই হয়।

একটা ব্যাকুল দৃষ্টিতে রাঙামাসী আমাদের সকলের দিকে তাকালেন। সে দৃষ্টির অর্থ তাঁকে ব্যাস-কাশীটা যেন দেখানো হয়।

আমি রাঙামাসীকে বোঝালুম : এটা মাঝিদের মনগড়া কথা। ব্যাস কাশী দর্শন করানো মানে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নেওয়া। নইলে ব্যাস-কাশীর কাহিনী নিশ্চয় জান তো ?

রাঙামাসী আমার দিকে তাকালেন।

অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসদেবকে ছলনার কাহিনী তাঁকে ভেঙে শোনালুম।

রাঙামাসী শুনে বললেন : সত্যি ?

—সত্যি মাসী। মিনুর কাছে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী আছে, পড়ে দেখো।

রাঙামাসী বললেন : তাহলে আর ব্যাস-কাশী গিয়ে কি হবে ?

নৌকো ততক্ষণ দক্ষিণে তার নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরতে আরম্ভ করেছে। উত্তরে মণিকর্ণিকার ঘাট দেখিয়েই দশাশ্বমেধ ঘাটে নামিয়ে দেবে আমাদের। বারবার কাশীর ঘাটের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম। দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড়ে যাবার পথে কলকাতার এ পারে দেখেছি মহানগরীর এ প্রান্তকে। সেখানেও আছে অলৌকিকতার একটা স্পর্শ। আছে সেই পর্তুগীজ বোম্বেটেদের বাংলা লুণ্ঠনের স্মৃতি। কিন্তু এমন বিপুল এক দীর্ঘ প্রবাহিণী ঐতিহ্যে যেন সে গম্ভীর নয়। কাশী কাশীই। এর তুলনা নেই। ভাবতে ভাবতেই নৌকো এসে ভিড়ল মণিকর্ণিকা ঘাটে।

আজ ২৫ বৎসর পরে আবার এসে দাঁড়িয়েছি সেই মণিকর্ণিকা ঘাটে। সেদিনের সেই কাহিনীর সঙ্গে পরবর্তী আরো কত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে আমার। বছর আটেক আগে আর একবার এসেছিলুম কাশীতে। একা। দশাশ্বমেধ ঘাটে এক বাস্তববাদী ভদ্রলোকের সঙ্গে সামান্য তর্কাতর্কি করে মনটা এত বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে, তার কাছ থেকে সরে এসে হাঁটতে হাঁটতে উপস্থিত হই মণিকর্ণিকা ঘাটে। সেদিনও এমনই অনির্বাণ চিতা জ্বলছিল সেখানে। আপন মনে বহ্নিমান চিতার অনির্বাণ অগ্নিশিখা দেখে নিজের মনেই একা একা মৃত্যু নিয়ে ভাবছিলুম। হঠাৎ এমন সময় চোখে পড়ল উলঙ্গ ভিখারী গোছের একটা লোককে। ভেবেছিলুম, পাগল-টাগল হবে বোধ হয়। এক চিতা থেকে আরেক চিতায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল লোকটি। কি যেন কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাচ্ছিল। খাচ্ছিল আর আপন মনে হাসছিল। দেখতে কলকাতার ডাস্টবিনে খুঁটে খাওয়া লোকের মত অনেকটা। লোকটা আমাকে দেখতে পেয়ে সজোরে হেসে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমার গা যেন ঘিনঘিন করে উঠল। ভাবলুম সরে যাব, কিন্তু সরতে পারলুম না। লোকটি প্রায় আমার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। তারপর স্পষ্ট বাংলায় বলল, এখানে কি দেখতে এয়েছিস র‍্যা ?

লোকটির চিন্তাধারা সুশৃঙ্খল আছে কিনা ভাবছি, এমন সময় আপন মনেই সে বিড়বিড় করে বলে উঠল, আসল পাগল যে, লোক তাকে চেনে না।

ভারি কৌতূহল হল। আশ্চর্য তো। আমি মনে মনে যা ভাবছি লোকটি কি করে তা বুঝতে পেরেছে! এবার কথা বলতে ইচ্ছে হল। বললুম, আসল পাগল কে ?

লোকটি বলল, যে পাগল নয় সেই আসল পাগল।

সে আবার কেমনতর কথা! আমি আবার নিজেকে গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করলুম। লোকটি বোধ হয় যথার্থই পাগল। এর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। কিন্তু লোকটি আমাকে অব্যাহতি দিল না, বলল, কিরে। আমার কথা বুঝতে পারিসনি ?

বললুম, না।

সে বলল, এই যে তুই নিজেকে সুস্থ বলে চিন্তা করিস, তুই কি সুস্থ ?

বললুম, আমি অসুস্থ হতে যাব কেন।

লোকটি বলল, অসুস্থ মনের নির্দেশে যে কাজ করে সে অসুস্থ নয়বে ?

বললুম, তা হতে পারে। কিন্তু আমার মন অসুস্থ হতে যাবে কেন ?

সে বলল, তোরা সব একালের লোক, তোদের নানা বিদ্যাবুদ্ধি। তোদের পশ্চিমী বিদ্যা দিয়েই বল্ না।

আশ্চর্য ! লোকটির কথা বলার ঢং দেখে চমকে গেলুম। এ যে রীতিমত শিক্ষিত মনে হচ্ছে! এবার তার সম্পর্কে মনে সমীহ এল। জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি কি বলতে চান ?

সে বলল মনের কয়টি স্তর আছে বল ?

—ফ্রয়েড যুঙ-এর মতে তিনটি।

—যথার্থ খাঁটি মন কোনটি ?

—বোধহয় অচেতন মন, য়ুঙ যাকে বলেছেন collective unconscious.

—সে মনের খবর রাখিস ?

—না।

—কোন্ মনের নির্দেশে চলিস ?

—চেতন মন।

—চেতন মন তো যথার্থ ইচ্ছাতে কাজ করতে পারে না। সমাজের ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিয়ে যে ইচ্ছাটুকু বাকী থাকে সেই ইচ্ছার বশে চলে। সামাজিক মনটাই তো মেকি মন রে! সুতরাং সেই মেকি মন নিয়ে যে কাজ করে সে পাগল না হয়ে, তাকে পাগল না বলে যারা খাঁটি মন নিয়ে কাজ করে তাদেরই তোরা পাগল বলিস ? তাছাড়া ফ্রয়েড য়ুঙও খাঁটি নয় রে। মনের স্তর অসংখ্য। শক্তির মাত্রার তারতম্যে তার কার্যকলাপ। আজকের যে মন নিয়ে তোরা কাজ করিস তার মাত্র তিন মাত্রা। যদি চার মাত্রা হোত তাহলে দেখতিস যেমনভাবে যা দেখছিস, তেমনভাবে তা সব নেই। তখন নিজের ভেতর চোখ বুজলেই দেখতিস অনন্ত আকাশ। মন, বুদ্ধি, চিত্তবৃত্তি, অহংকার—মনের কত স্তর আছে ভারতীয়দের মতে, সেটাও ঠিক নয় জানবি। মনের চালিকাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী। তিনি যেমনি চলেন তেমনি হয় মনের গতি। কুল-কুণ্ডলিনী অর্থ জানিস ?

—না। শুনেছি সাপ জাতীয় কোন জিনিস।

—'সাপ !' হোহো করে হেসে উঠল লোকটি। বলল, 'হ্যাঁ, সাপই বটে।'

তারপর অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কি দেখল।

বললুম, কি দেখছেন ?

সে বলল, দেখছি অসীম কেমন সীমায় পড়ে আছে।

—তার অর্থ ?

—এখন বুঝবি নে, এখন বুঝবি নে।

—কুলকুণ্ডলিনী অর্থ ?

লোকটি বলল, এখন নয়, এখন নয়। পরে। হিমালয় থেকে লোক আসবে তখন বুঝবি। এখন তোর মনের তিনটি স্তর নিয়েই থাক। এবার ভেবে দ্যাখ্ কোন্ মনটা খাঁটি, কোন লোকটা পাগল, আর কে পাগল নয়।

কথাগুলির তাৎপর্য নিজের মনে বিচার করে দেখলুম। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে পাগল কাজ করে অবচেতন মনে অবদমিত আকাঙ্ক্ষার তাড়নায়। তাই তার কথাবার্তা আপাত অসংলগ্ন। অথচ লজ অব অ্যাসোসিয়েশন কাজ করে চলেছে। ঠিক যেন আধুনিক কবিতা বা স্বপ্ন। অসংলগ্নতাকেই যদি পাগলামি বলতে হয়, তাহলে আধুনিক কবিরা পাগল। তাহলে রাত্রিবেলা লোকে পাগল হয়ে যায় যখন সে স্বপ্ন দেখে। অথচ এখানেই তার যথার্থ চরিত্রের অনেকটাই ধরা পড়ে। 'অনেকটাই' ভাবলুম এই কারণে যে, অবচেতন মনের নীচেও তো স্তর আছে, যাকে বলে অচেতন। এ যেন ডাঃ গ্রোডেকের সেই 'The It'-এর মতন। এ এমন একটি শব্দ যার মধ্যে কোন connotation বা অর্থ প্রকরণ ঢুকিয়ে দেওয়াই দায়। হয়তো এই অচেতন মন বা 'The It'-টাই আসল মন। আমি অবাক হয়ে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলুম।

লোকটি জিজ্ঞাসা করল, অহংকার হয় কোন কোন বিদ্যায় জানিস ?

কিছুই বলতে পারলুম না। চুপ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলুম। লোকটি ততক্ষণে আরো মাননীয় হয়ে উঠেছে। সুতরাং 'তুমি' থেকে তখন সে আমার নিজের মনেও 'তিনি' হয়ে উঠেছেন।

আমাকে চুপ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি বললেন, অহংকার হয় অবিদ্যা থেকে, জানিস ? তোর অহংকার আছে ?

আমার বুকের ভেতর তখন কিছুটা কাঁপুনি ধরেছে। বললুম, তা নিশ্চয়ই আছে।

—সেই অহংকারের বশে দেবতা-টেবতা মানিস না, তাই না ?

তখনও মনের ভিতর সংশয় ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই চুপ করে থাকলুম।

তিনি বললেন, দেবতা-টেবতা আছেরে, আছে। মনকে উপরে ওঠা—তিন মাত্রার বদলে চার মাত্রা বা আরও বেশি মাত্রা কর, দেখতে পাবি।

কেন যে তিনি তখন একথাটা বলেছিলেন আজ বুঝতে পারি। আজ তাঁর 'কুল-কুণ্ডলিনী' শব্দের অর্থও বুঝতে পেরেছি। আর এই মাত্রার অর্থও জানতে পেরেছি। সত্যিই তা সম্ভব হয়েছে হিমালয় থেকে আগত এক মহাপুরুষের কল্যাণে। তাঁর নাম করছি না, কারণ তাঁর নাম করলে সেই নাম ভাঙিয়ে যারা খায় তাদের মধ্যে চেঁচামেচি পড়ে যাবে। এই ঘটনার পরই কাশী থেকে ফিরে যাবার কিছুদিন পরে অকস্মাৎ তিনি একদিন হিমালয় থেকে নেমে সুদূর কলকাতায় আমার গৃহে এসে বললেন, ধর্মের উপর বই লেখ।

বললুম, ধর্ম সম্পর্কে তো কিছুই জানি না।

—জানার প্রয়োজন নেই। কলম ধরলেই সব এমনি আসবে।

—এমনিই?

—হ্যাঁ।

আর কিছু না বলে কিছুক্ষণ তিনি আমার ঘরে থাকলেন, তারপরই চলে গেলেন। আশ্চর্য! তার দু-এক দিন পরেই আমার মনে হল—ধ্যান করলে কেমন হয়? গুরু নেই, কেউ নেই, লেখাপড়াও নেই। শুধু জানতুম পদ্মাসনে কি করে বসতে হয়। সেই পদ্মাসনে বসে চোখ বুজলুম। তারপরই এক আশ্চর্য কাণ্ড। দিন কয়েক পরেই দেখি আমার মধ্যে রয়েছে অনন্ত অপরিসীম আকাশ। আমার মধ্যেই রয়েছে মহা বিশ্ব জগতের অনন্ত গ্রহনক্ষত্রাদি। শুধু দেশ নয়, রয়েছে দেশের (space) মধ্যে অসংখ্য সূক্ষ্ম প্রাণী, আমরা যাদের দেব-দেবী বলি, তা ছাড়া রয়েছে আমাদের মৃত পূর্ব-পুরুষদের সূক্ষ্ম দেহ, ভিন্ন গ্রহে রক্তমাংসের অসংখ্য জীব, কত কিছু।

অল্প দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলুম 'কুলকুণ্ডলিনী' শব্দের অর্থ কি। কুল মানে শক্তি, কুণ্ড মানে গর্ত। লিঙ্গমূল ও গুহ্যদ্বারের মাঝখানে কোন এক গর্ত জাতীয় স্থানে কার্বন জাতীয় কোন পদার্থ আছে, যাকে শ্বাসের বায়ু স্পর্শ করলেই জেগে ওঠে তেজ। সেই তেজ মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে যত উপরে উঠে, দেহের মধ্যে ততই এক ধরনের electromagnetic wave তৈরী হয়, তাই হল মাত্রা। যে তেজ উপরে উঠে এই wave তৈরী করে তাই কুলকুণ্ডলিনী। যে মাত্রায় সে অবস্থান করে বিশ্বজগতের সেই মাত্রার চিত্র তার মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রীতে ধরা পড়ে টি. ভি-র ছবির মত। তবে তেজকে তিন মাত্রার উপরে ওঠাতে গেলে কুলকুণ্ডতে বায়ুর দ্বারা প্রবলতর আঘাত হানা প্রয়োজন। সেটা সম্ভব বায়ুকে যদি সূক্ষ্ম করা যায়। বায়ু সূক্ষ্ম হয় কোন বিষয়ে নিবিড়ভাবে মনঃসংযোগ করলে, তারই নাম যোগ। বায়ু যত নিয়ন্ত্রিত হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস যত কম পড়ে ততই তার potency বাড়ে। সেই বায়ু কুলকুণ্ডে আঘাত করলেই শক্তির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তখন মনেরও ব্যাপ্তি ঘটে, কারণ মন চলে বায়ুর সাহায্যে। মানুষের দেহে শক্তির মাত্রা সাধারণ তিন মাত্রার বেশি হলেই Astrophysicist Carl Sagan-এর মতে 'Inside turns out' অর্থাৎ ভেতর বাইরে চলে আসে। তখন চোখ বুজেও নিজের মধ্যে বহির্বিশ্ব দেখা যায়। এই মাত্রা বৃদ্ধিই আজ আমার মধ্যে এনে দিয়েছে মানসিক স্তরের পরিবর্তন, যাকেই আমি বলছি এ জন্মেই আমার জন্মান্তর।

একথা থাক। আট বছর পূর্বেকার মণিকর্ণিকার ঘাটের সেই পাগল ব্যক্তিটির যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম তাই আবার বলা যাক। 'দেবতা-টেবতা আছে', একথা বলার পর তিনি বললেন, এখন হয়তো এঁদের অস্তিত্বের সত্যতা সম্পর্কে ভাবতে পারবি না, কিন্তু একদিন পারবি। সত্য বাদ দিয়ে এখন একবার এর তত্ত্বটাই ভেবে দ্যাখ না।

—যেমন?

—এটা কোন মাস রে?

—আশ্বিন। .

—শরৎকাল ?

—হ্যাঁ।

—বাংলায় কি উৎসব হচ্ছে ?

—দুর্গা পুজো।

—দুর্গা শব্দের অর্থ জানিস ?

—না।

—দুর্গ শব্দের ?

—যা রক্ষা করে।

—নারে না, আসল অর্থ—যা দুর্ভেদ্য। দুর্গম-এর 'ম' বাদ দিলেই দুর্গ। এরই স্ত্রীলিঙ্গ দুর্গা। অর্থাৎ সাধারণ বুদ্ধির কাছে ইনি বোধের প্রায় অতীত। দুর্গা আছেন কি মূর্তিতে ? অর্থাৎ কি রূপে ?

—মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিতে।

—এই মহিষাসুর কে ?

—পুরাণের ভাষ্য অনুযায়ী একজন অসুর। দেবতাদের যিনি বিশেষ অসুবিধা তৈরী করেছিলেন।

—এটা কি বিশ্বাস করিস ?

—মার্কণ্ডেয় পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী ধরতে গেলে বিশ্বাসযোগ্যতার পর্যায়ে পড়ে না, পড়ে অবিশ্বাস্যের পর্যায়ে, ইংরেজিতে যাকে বলে 'মিথোলজি' অর্থাৎ অবিশ্বাস্য কাহিনী।

—কিন্তু এর একটা ভাবার্থ তো থাকতে পারে ?

—তা পারে।

—সে ভাবার্থটা কি জানিস ?

—দুর্গাকে দশদিকব্যাপী প্রসারিতা মহাশক্তি বলে ভাবতে পারি তার দশ হাত দেখে। কিন্তু মহিষাসুরের তাৎপর্য বলতে পারব না।

তিনি বললেন, এই মহিষ কিন্তু মোষ নয় রে, এ হল মহ+ঈষ্=মহিষ। ঈষ্ হল ঈশের (ঈশ্বরের) 'মূর্ধ্বা উষ্মা' অবস্থা। শিব হলেন মহা+ঈশ বিশ্ব সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ ক্রিয়ার (ঈশ) মহা বা শ্রেষ্ঠ দেবতা মহেশ বা মহেশ্বর। এই ঈশ-ক্রিয়া যখন মূর্ধ্বা উষ্মা (kinetic energy level) প্রাপ্ত হয় তখন হয় ঈষ্। আর তখনই তা রুদ্ধ না থেকে ইষু হয়ে ছুটে যায়। এই ঈশের মহত্ত্বযুক্ত ভাব মহিষ সর্বদা অস্থির, ছুটে যাবার জন্য উন্মুখ (অস+উ) এবং অগ্নিশক্তি (র) যুক্ত অর্থাৎ অসুর। প্রকৃতি যখন এই অতিরিক্ত বহির্মুখী শক্তির জন্য সাম্য হারিয়ে বিশৃঙ্খল হতে চান না, তখন স্বতই তাতে গুণসাম্য স্থাপন করেন—অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের মধ্যে সাম্য আনেন। অসুরের মধ্যে রয়েছে রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্য বিশেষ করে তমোগুণের।

ত্রিশূলের তিন কোণ বা তিন শূল হল সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ স্বরূপ। তাই তমোগুণ-সম্পন্ন জগতের (অসুরের) বুকে ত্রিশূল ঠেকিয়ে তিনি প্রকৃতিতে আবার সাম্য আনেন —ইংরেজীতে তোরা যাকে বলিস ecologic al balance. আধুনিক Autrophysics পড়েছিস ? দেখবি শক্তির বহু মাত্রা আছে। পঞ্চম মাত্রায় শক্তি বিন্দুর মত ক্ষুদ্রায়ত বস্তু রচনা করে। তার উপর দশ মাত্রার শক্তি বিন্দু ভেদ করে নিচে চতুর্মাত্রিক বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার জন্য ব্যস্ত থাকে। যেমন গিরিশৃঙ্গে বরফের মধ্যে নদীর আবেগ নিচে নামার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকে। সেই অর্থে শক্তি গিরিকন্যা অর্থাৎ পার্বতীও। আর শক্তির দশমাত্রা হল দুর্গার দশ হাত। তবে পার্বতী অর্থ আমাদের কাছে ভিন্ন।

ব্যাখ্যা শুনে সত্যিই আমি চমকে গিয়েছিলুম। তার উপর তাঁর মুখে ইংরেজী শব্দ শুনে প্রচণ্ড কৌতূহল বোধ হচ্ছিল এঁর সম্পর্কে জানতে। জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলুম, আচ্ছা, আপনার······

কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করার কোন অবকাশ না দিয়ে তিনিই আবার জিজ্ঞেস করলেন,

—এই দুর্গাকে পার্বতী বলা হয় কেন জানিস ?

—পর্বতের কন্যা বলে।

—এটা কি বিশ্বাস্য ?

—না। পর্বতের আবার কন্যা হবে কি করে। পর্বতবাসী কোন মানুষের কন্যা হিসেবে পার্বতী হতে পারেন।

আমার জবাব শুনে, তিনি একটু হাসলেন। বললেন, পর্বত কাকে বলে জানিস ?

—হ্যাঁ। উত্তুঙ্গ স্থানকে।

—মানুষের দেহের মধ্যে উত্তুঙ্গ স্থান কোনটি ?

ব্রহ্মরন্ধ্রে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলুম, এইখানটায়।

—হুঁ।

—তাহলে এই স্থানকেই আপনি পর্বত বলতে চান ?

—হ্যাঁ। আর কেন তা বলতে চাই বুঝিয়ে দিচ্ছি।

—বলুন।

—মানুষের দেহে শক্তি কোথায় স্থির হয়ে আছে জানিস ?

—না।

তিনি গুহ্যদ্বার ও লিঙ্গমূলে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন—এখানে।

একথা একটু আগেই আমার পরবর্তী অভিজ্ঞতা স্মরণকালে বর্ণনা করেছি। কিন্তু আট বছর আগে মণিকর্ণিকা ঘাটে দাঁড়িয়ে সেকথা জানতুম না।

তিনি বললেন, দেহের এই অংশটির নাম জানিস ?

—না।

—মূলাধার। অর্থাৎ দেহের শক্তির মূল আধার, অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনীর মূল স্থান। এখানে যে শক্তি থাকে তারই নাম কুলকুণ্ডলিনী। ধর সেই শক্তি যদি এখান থেকে·

(মূলাধারে হাত দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন) এখানে (ব্রহ্মরন্ধ্র স্পর্শ করে দেখালেন) আসে, তাহলে তাকে কি পার্বতী বলা যায় না ?

সত্যিই অপূর্ব ব্যাখ্যা। শুনে যেন নতুন জ্ঞান হল। বললুম, হ্যাঁ, যায়।

— এই হল পার্বতী, বুঝলি ?

—হ্যাঁ।

—এবার বলতো তিনি সিংহবাহিনী কেন ?

—সিংহ খুব শক্তিশালী কিনা। দেবীর মহাশক্তি বোঝাবার জন্য সেই কারণেই বোধহয় তাঁকে সিংহবাহিনী করা হয়েছে।

তিনি বললেন, কিছুটা ঠিক বলেছিস বটে, তবে অর্থ আরও গভীরে।

—কি রকম ?

—সিংহকে আর কি বলে ?

—পশুরাজ।

—মানুষকে কি বলে ?

—মান সম্পর্কে যার হুঁশ আছে তিনিই মানুষ।

তিনি হেসে বললেন, তোর বুদ্ধি আছেরে, বুদ্ধি আছে। এই মানকেই বলে Rationality. Animal quality-র উপর Rationality. কিন্তু কয়জন মানুষের মধ্যে Rationality আছে বল ? অধিকাংশের মধ্যেই রয়েছে animality. দেহটা মানুষের বটে, কিন্তু মনটা পশুর। সেই জন্য Rational animal না হয়ে মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই animal. যার মধ্যে Rationality-র প্রভাব বেশী, সেই মানুষই পশুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পশুরাজ। এই মানুষই আপন চেষ্টায় মূলাধারের কুলকুণ্ডলিনীকে সহস্রারে নিয়ে যেতে পারেন। আর দেবী দাঁড়াতে পারেন সেই পশুরাজ মানুষের উপরই। সেই জন্য তাঁর বাহন পশুরাজ।

অভিনব ব্যাখ্যা সন্দেহ নেই। আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলুম।

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বল্‌তো পার্বতীর চারদিকে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ ইত্যাদি কেন ?

—এরা সব দুর্গার পুত্র কন্যা হিসেবে তাঁর সঙ্গে আছেন।

তিনি একটু হেসে বললেন, এতো গল্প কথা। এর পেছনে আছে ভিন্ন অর্থ।

—যেমন।

—কার্তিক কে ?

—দেব সেনাপতি।

—তিনি কিসের প্রতীক ?

—বীর্যের।

—গণেশ কে ?

—সিদ্ধিদাতা।
—তিনি আর কিসের প্রতীক ?
—জ্ঞানের।
—সরস্বতী কে ?
—বিদ্যাদেবী।
—কি ধরনের দেবী ?
—বললুম তো বিদ্যার।
— না, তিনি অবিদ্যানাশিনী।
—লক্ষ্মী কে ?
—ঐশ্বর্যের দেবী।
—কি ধরনের ঐশ্বর্য ?
—ঐশ্বর্য বলতে যা বোঝায়।
—অর্থাৎ টাকা পয়সা ?
—হ্যাঁ।

তিনি হেসে বললেন, নারে। এ ঐশ্বর্য সে ঐশ্বর্য নয়। এ হল মহা ঐশ্বর্য। যে ঐশ্বর্য হল ঈশ্বরের পরম বিদ্যারূপ গুণ। এঁদের দেবী দুর্গার চতুষ্পার্শ্বে দেওয়া হয়েছে কেন বলতো ?

—কেন ?

—কুলকুণ্ডলিনী সহস্রারে উঠলে জীবের মধ্যে পরাবীর্য, পরম জ্ঞান, পরাবিদ্যা, পরা ঐশ্বর্য ইত্যাদি দেখা দেয়। সেটা বোঝাবার জন্যই এই সব দেবদেবীর একই বৃত্তে অবস্থান।

জিজ্ঞেস করলুম, দুর্গা প্রতিমার চালিতে এই মহাপ্রকৃতির পেছনে শিবের মূর্তি রাখা হয়েছে কেন ?

—এটা মার্কণ্ডেয় পুরাণের মধ্যে নেই, পরের সংযোজনা। দুর্গারূপ মহাপ্রকৃতি যে নির্গুণ পুরুষ থেকে উদ্ভূত তাঁকে বোঝাবার জন্যই এই শিবের অধিষ্ঠান। প্রকৃতির লীলা শেষে আবার তিনি এতেই লয় প্রাপ্ত হবেন। প্রকৃতির লীলার অবসান হলে মায়ার অবসান ঘটে—পাশের অবসান ঘটে. তখন ভেদাভেদ বলতে কিছুই থাকে না। সেই জন্যই দশমীতে প্রতিমা বিসর্জন দেবার পর ভেদাভেদ ভুলে কোলাকুলির ব্যবস্থা।

—আচ্ছা দেবী দুর্গার দশ হাতের আর কোন ব্যাখ্যা আছে ?

—এ হল আসলে দশটি মাত্রা—ইংরেজীতে তোরা যাকে Dimension বলিস। এই যে মহাশক্তি, আদিতে দশটি মাত্রা নিয়ে তিনি ছিলেন শূন্যাকার। সেই জন্য বিজ্ঞানে বলা হয়েছে—original ten dimensional universe started out with zero energy. এই দশটি মাত্রা কি জানিস তো ?

বিজ্ঞানে আমার তেমন জ্ঞান না থাকার জন্য বললুম, না।

তিনি বললেন, এর নাম হল—(1) Length, (2) breadth, (3) Depth, (4) Space-time continuum, (5) Gravity, (6) Electromagnetic force, (7) Strong Nuclear force, (8) Weak Nuclear force, (9) Consciousness (10) Void

লোকটির বিজ্ঞানের জ্ঞান দেখে বিস্ময়ের আমার অন্ত থাকল না। শুধু অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলুম। তিনি বললেন, যার মধ্যে এই দশটি মাত্রা আছে তাঁর শক্তি কিরকম ভাবতে পারিস ?

না।

—সে যদি উপর থেকে নিজে আমাদের বিশ্বজগতের দিকে তাকায়, তাহলে সব কিছুরই অভ্যন্তর ভাগ দেখতে পাবে। একটা মানুষের যদি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় চামড়া না কেটেও এই শক্তি তা করতে পারে।

হেন অবিশ্বাস্য কথার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না আমি ভাবতে পারিনি। পরে যখন Dr Michio Kaku ও Jennifer Trainer-এর Beyond Einstein গ্রন্থ পড়ি তখন একটি লাইনের উপর চোখ পড়তে চমকে উঠি, যেমন, A ten dimensional being looking down on our universe, could see all our internal organs and could even perform surgery on us without cutting our skin আরও পরে হিমালয়ের সেই মহাপুরুষের কল্যাণে আমি যখন কুলকুণ্ডলিনীকে ঊর্ধ্বে ওঠাতে পারি, অবাক হয়ে দেখেছি যে বহু মানুষেরই বহিরঙ্গের অভ্যন্তরস্থ organ-গুলি আমার নিমীলিত তৃতীয় নেত্রে ধরা পড়ছে। এই-ভাবেই সল্টলেকের মিঃ এ কে ঘোষের [অধুনা ভারতীয় আয়কর বোর্ডের (দিল্লী) চেয়ারম্যান] প্রতিবেশী মিঃ মুখার্জীর কন্যার কিডনীতে পুঁজ জমেছে একথা বলে দিতে পেরেছিলুম। অপারেশনের পর সে কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। নবপত্র প্রকাশনের মালিক প্রসূন বসুর সহধর্মিণীর Appendix কতটা কিভাবে পেকে আছে বলে দিয়েছিলুম এবং এসব কোন ক্ষেত্রেই এ ব্যাপারে যুক্ত ব্যক্তিদের কাউকে সামনে থাকতে হয় নি। প্রয়োজনও হয় না। এই কারণে Income tax commissioner মিঃ শর্মা (বর্তমানে শিলং-এ আছেন) তাঁর মাকে নিয়ে অকস্মাৎ বোম্বে চলে গেলে মিঃ এ. কে ঘোষ যখন দিল্লী থেকে তাঁর কারণ জানতে চেয়ে লেখককে কলকাতায় ফোন করেন তিনি বলে দিয়েছিলেন যে তার বুকের কোথায় দুটো স্পট পড়েছে, এবং রোগ কি ? অনুসন্ধানে ঘটনা পরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। মানুষের শক্তির মধ্যে মাত্রা বৃদ্ধি পেলে এইভাবে কোন দেয়ালের বাধা, দেহের চর্মশাসন, দূরবর্তী কোন স্থান, কিছুই অধিক মাত্রা লাভ করা ব্যক্তির কাছে অজ্ঞাত থাকে না।

এই শক্তিবলেই ব্রেজিলে এক ধরনের চিকিৎসক চিকিৎসা করেন। সেখানে স্থূল দেহের উপর অস্ত্রপ্রয়োগ না করেও যথার্থ অস্ত্রোপচার করা যায়। ইংরেজ মনস্তত্ত্ববিদ গাই প্লে-ফেয়ার ব্রেজিলে অবস্থান কালে এধরনের বহু অস্ত্রোপচার লক্ষ্য করেছিলেন।

তার 'ক্লাইকাও' নামক গ্রন্থে তিনি এডিভালডো সিলভা নামে এক স্কুল শিক্ষকের উল্লেখ করেছেন যিনি দশ বছরে প'য়ষট্টি হাজার রোগীর চিকিৎসা করেছেন। আমাদের দেশে যে সাধুসন্তরা হস্তদ্বারা দেহ স্পর্শ করে রোগ নিরাময় করেন এও সেই অতিমাত্রিক শক্তি অর্জনের জন্যই। বহু সাধুসন্তের ফটো তুলতে গিয়ে দেখা যায় যে, তাঁদের ফটো উঠছে না। এর কারণ, তাঁদের শক্তিমাত্রা অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনীর স্তর বৃদ্ধি। অতিমাত্রিক জীব যে এরকম করতে পারে Astrophysics তারও উল্লেখ করেছে।

মণিকর্ণিকা ঘাটের সেই অদ্ভুত ব্যক্তিটিকে দেবী-দুর্গা প্রসঙ্গে আমি একটি প্রশ্ন করে যে জবাব পেয়েছিলুম তাও রীতিমত বিস্ময়কর। বলেছিলুম, দুর্গাপুজোর আগে মহালয়া হয় কেন?

তিনি বলেছিলেন, মহা আলয় (বাসস্থান অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি হয় বলেই মহালয়া)।

—মানে?

—মহালয়া কোন তিথিতে হয় জানিস?

—অমাবস্যাতে।

—এই অমাবস্যাকেই বিজ্ঞানের ভাষায় বলে false vacuum. এই false vacuum অদৃশ্য অর্থাৎ অন্ধকার, অমাবস্যা তুল্য। এই false vacuum স্তরে শক্তি সাধারণত আবদ্ধ থাকতে চায় না। আমাদের জ্ঞানের জগতের চতুর্মাত্রায় বেরিয়ে আসে (বিজ্ঞানের ভাষায়—'Ten-dimensional universe was actually a false vacuum and made the quantum leap to our known four dimensional universe)। এই চার মাত্রারই আমরা পুজো করি ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে। এই চার মাত্রাই হল আমাদের বুদ্ধির কাছে ধৃত জগৎ—মহাআলয়। মহা আলয় সৃষ্টির এই প্রক্রিয়ার নামই মহালয়া।

পরে বুঝেছি চতুর্মাত্রিক জগৎ ভেদ করে উৎসে যাবার সাধনার কথাই সমগ্র চণ্ডীতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কুলকুণ্ডলিনীর শক্তিমাত্রা বৃদ্ধি করার সাধনাই চণ্ডী-সাধনা। কুল-কুণ্ডলিনী দেহের মেরুদণ্ডপথের তিনটি গ্রন্থিতে ব্রহ্মরন্ধ্রগত হতে বেশি বাধা পায়। এই তিনটি গ্রন্থির নাম ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি। এই তিনটি অতিক্রমণের কাহিনীই হল পাঁচটি অসুর বধের কাহিনী। মধুকৈটভ, মহিষাসুর ও শুম্ভনিশুম্ভ। মধু-কৈটভ বধের গল্প হল ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদের কাহিনী। মহিষাসুর বধের কথা হল বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদের কাহিনী এবং শুম্ভনিশুম্ভ বধের কাহিনী হল রুদ্রগ্রন্থি ভেদের অর্থাৎ সাধনার শেষ স্তরের কাহিনী, যেখানে জয়লাভ করা গেলে সাধক পুরুষের গুণ অর্থাৎ নির্গুণত্ব লাভ করেন এবং দেবী দুর্গা অর্থাৎ জগৎশক্তি তাঁর গুণে অর্থাৎ স্ত্রীতে পরিণত হন। সে জন্য চণ্ডীতে বলা হয়েছে ঃ

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যাপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি॥

অর্থাৎ যিনি আমাকে সংগ্রামে পরাজিত করবেন, যিনি আমার দর্প (মায়ারূপ

কার্বোন্ডিত বিশ্বজয়ী প্রতিভা) চূর্ণ করবেন এবং যিনি জগতে আমার তুল্য বলশালী (অব্যক্ত মায়া পুরুষেরই সমার্থবোধক) তিনি আমার পতি হবেন।

মণিকর্ণিকা ঘাটের সেই মহাপুরুষ ব্যক্তিটির কাছ থেকেই আমি দেবী সরস্বতীরও অপূর্ব ব্যাখ্যা পেয়েছিলুম। যা অদ্যাবধি কোথাও পাইনি। সরস্বতী মূর্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—Physics-এ Superstring তত্ত্বের কথা শুনেছিস ?

বললুম, না।

তিনি বললেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মৌল উপাদান কোন পরমাণু বা particle নয়, যা নাকি দেশের বিশেষ কোন অংশ অধিকার করে থাকে। এই মৌল উপাদান হল এমন জিনিস যার দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ নেই। কোথাও কোথাও এর শেষ থাকলেও আবার কোথাও তা গুটিয়ে loop তৈরী করে। কিন্তু এর সার্বিক বিস্তার এমনই যে, পরস্পরের সঙ্গে নিকট সম্পর্কে যুক্ত। এই সূক্ষ্মতারের কোথাও কোন সাড়া পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তা ঢেউয়ের মত তরঙ্গায়িত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। আর এই ঢেউ-গুলিকেই মনেহয় পরমাণু অথবা particle হিসেবে। যেখানেই এই তার (string) গুটিয়ে গিয়ে ক্ষীণতম vibration তৈরী করে সেখানেই হয় মাধ্যাকর্ষণ। যে তার string ক্ষীণ vibration যুক্ত সেখানে তা photon তুল্য। এই যে তার, তা কিছুটা আঠাজাতীয়। তারই নাম আত্মা। অবশ্য সর্বাতীত পরমাত্মা নয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন quark নামক অদৃশ্য particle দিয়ে তা গঠিত। সে যাই হোক, এই যে সর্বব্যাপ্ত তার তাই সরস্বতীর বীণার তার। তারের যেখানে যে সাড়া পড়ুক না কেন যে ব্যক্তি এই তারের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছেন তাঁর হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ সেই সাড়ার অনুরণন জাগবে। বিশ্বের যে কোন ঘটনার এই যে অনুরণন, তারই নাম পরম জ্ঞান, পরাবিদ্যা। মানুষ তার নিজের জীবনে এই বিশ্বাত্মা পর্যায়ে পেঁছুতে পারে শ্বাস (হং) ও প্রশ্বাস (স) কে একত্র যুক্ত করতে পারলে, কুম্ভক করতে পারলে, অর্থাৎ নিজেকে হংসে স্থিত করতে পারলে। এই জন্য হংসই হল জ্ঞানের বাহন, যে কারণে দেবী সরস্বতী হংসারূঢ়া। জ্ঞানের প্রতীক শ্বেতবর্ণ বলে দেবীর রঙও সাদা।

সরস্বতীর এই আশ্চর্য ব্যাখ্যা শুনে অবাক হয়ে সেই রহস্যময় পুরুষের দিকে এক পলক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিলুম শুধু।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি দেখছিস ?

বললুম, নিজের বিস্ময়কে ধরে রাখতে পারছি না।

তিনি জ্বলজ্বলে চোখে মর্মভেদ করে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, একদিন এ সব তুই নিজেই জানবি।

হঠাৎ তখন আমার মনে আর একটি কৌতূহল জেগেছিল। জেগেছিল মণি-কর্ণিকা ঘাট সম্পর্কে। বলেছিলুম। আচ্ছা, এখানে মৃতের দাহ হলে সত্যিই কি সে মুক্তি পায় ?

তিনি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে কি একটু ভেবেছিলেন। তারপর আরো কাছে

এগিয়ে এসে আমাকে স্পর্শ করেছিলেন। অদ্ভুত সেই স্পর্শ। যেন সারা দেহে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ চমক দিয়ে ওঠে। আমি তড়িতাহত ব্যক্তির ন্যায় চমকে উঠতেই তিনি বললেন উপরের দিকে তাকা দেখি।

বহ্নিমান চিতার ধোঁয়া উপরে উঠছে। আমি তাই লক্ষ্য করে উপরে তাকিয়ে দেখি Black and white-এ চলচ্চিত্রের ছবির মত অসংখ্য সূক্ষ্ম দেহ উপরে ভাসমান অবস্থায় কিলবিল করছে। বললুম এরা কারা ?

—এরাই জীবের সূক্ষ্ম দেহ।

—এখানে কেন ?

· মুক্তি পায়নি তাই।

—মণিকর্ণিকা ঘাটে দাহ হল তবু মুক্তি পেল না কেন ?

—সে কথা পরে বুঝবি। শুধু মনে রাখিস সংস্কারের বন্ধন না কাটলে অর্থাৎ কামনা-বাসনার ভার না কাটলে যেখানেই দাহ করা হোক না কেন মুক্তি কারোই নেই।

—মৃত্যুর পর সত্যিই কি এমনতর সূক্ষ্মদেহ থাকে ?

—নিজের চোখে দেখলি তো ?

—আপনার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ভ্রান্ত কিছু দেখছি না তো ?

তিনি হেসে বললেন, পরে নিজেই এসব বুঝবি।

হঠাৎ এই সময় আর একটি প্রশ্ন এসেছিল আমার মনে—অর্থাৎ দুর্গাপুজোতে বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকা প্রয়োজন হয় কেন ? কিন্তু সে কথা জিজ্ঞেস করতে যেই ফিরে তাকিয়েছি, দেখি তিনি নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আর তাঁর দেখা পেলুম না। হয়তো কুলকুণ্ডলিনীতে দশমাত্রা যুক্ত করে তিনি আপন সহজাত শক্তিতে আমার কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

এই প্রশ্নটির উত্তর পাবার জন্য বহুজনকে জিজ্ঞাসা করেছি। বহু পুস্তক ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। কিন্তু তার জবাব পাইনি। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীসহ ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণে তো অতীন্দ্রিয় এই সত্য ধরা দেবার নয়। তারা সমগ্র দুর্গাপুজোকেই নবপত্রিকা পুজো থেকে fertility cult বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সেটা তো আর সত্য নয়, তার কারণ, আমি নিজে পরবর্তী কালে "ধ্যাননেত্রে দেশে (space) এই সব দেব-দেবীকে চলমান অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছি। ভিন্ন গ্রহে রক্তমাংসের জীবরূপে অন্যরূপে তাঁদের দেখেছি। তাহলে হঠাৎ এ রীতিটি এল কেন ? ইতিহাস পড়ে এইটুকু শুধু বুঝতে পেরেছিলুম, এই মহাশক্তির পুজো শুধু ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না. ইউরোপ থেকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, এশিয়া মাইনর, আরব ভূখণ্ড, এমন কি চীন জাপানেও রূপান্তরে এর পুজাপদ্ধতি চালু ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের নানাস্থানে দেবী ইস্তারের যে পুজো হত, তাতে দেখা যায় দেবী 'স্বর্গীয় বেশ্যা' নামে আখ্যাতা। তাঁর মন্দিরের দেবদাসীরা পর্যন্ত ছিলেন বারবনিতা। প্রতিটি মহিলাকেই জীবনে একবার তাঁর মন্দিরে বিবাহের পূর্বে পরপুরুষের সংসর্গ করতে

হত। কেন হত, তা আজ জানার উপায় নেই। অজ্ঞাতে তারই একটি ক্ষীণ ধারা আজও চলে আসছে আমাদের দেবী দুর্গার মধ্যে যে জন্য তাঁর পূজাতে বেশ্যাম্বারের মৃত্তিকা অপরিহার্য।

পঁচিশ বছর পূর্বের সাধারণ একটি ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে এরই মধ্যে কিভাবে আমার জীবনে নানা অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ এক নতুন চৈতন্যের জন্ম হয়েছে একথাটা বোঝাবার জন্য এতক্ষণ মূল কাহিনী থেকে সরে এসে কাহিনীর যে বিরাট প্রশাখা ছড়িয়ে দিয়েছিলুম তাকে আবার গুটিয়ে নিয়ে পুনরায় সেই আবেগময় পঁচিশ বছর আগেই ফিরে যাওয়া যাক ঃ

নৌকা এসে মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছে থামল। চার পাঁচটি চিতা জ্বলছে। মাঝি বলল ঃ দিনে রাতে এ ঘাটে কখনো চিতা নেভে না।

তাহলে কি ভয়াবহ শ্মশান এটা! কিন্তু ভয় যেন করল না এতটুকু। দুই কর যুক্ত করে প্রণাম করলুম মণিকর্ণিকার ঘাটে প্রজ্বলিত শ্মশানকে। এখানেই তো মুক্তি। বহু সৌভাগ্য এইসব মানুষের, যারা এখানে এসে তাদের মরদেহকে ভস্মীভূত করবার সৌভাগ্য অর্জন করে।

মিনু এই চিরন্তন চিতা-বহ্নির কথা চিন্তা করে যেন শিউরে উঠল। বলল ঃ কখনো এ চিতা নেভে না? এত লোক মরে নাকি কাশীতে?

আমি বললুম ঃ শুধু কাশীর মড়া কেন, দেশ-বিদেশ থেকে মৃতদেহ আসে এখানে সৎকারের জন্য। মণিকর্ণিকার ঘাটে দেহ ভস্মীভূত হলে যে তার চিরকালের জন্য মুক্তি। তাই মৃতের ইচ্ছানুসারে ও তার আত্মীয়স্বজনদের কল্যাণে আশেপাশের সব মৃতদেহই এখানে আসে। এ চিতা তাই থামবার অবসর পায় না। মিনু, অনেক অতীতের দিকে তাকাও, রাজা হরিশচন্দ্রের ছবিও তুমি এখানে দেখতে পাবে। যদিও তাঁর ঘটনাটা ঘটেছিল কেদারঘাটে। বিশ্বামিত্রের ক্রোধানলে রাজ্য হারিয়ে তিনি এই কাশীতেই ডোমরূপে আশ্রয় নিয়েছিলেন। একদা অন্ধকার রাত্রিতে নিজের পুত্র রোহিতাশ্বের দেহ সৎকারের জন্য সর্বহারা শৈব্যার কাছে তিনি কড়ি দাবী করেছিলেন। মনে কর, সেই অন্ধকার রাত্রি, যাকে কবি কুমুদরঞ্জন বর্ণনা করেছেন এই বলে ঃ

"বুঝি সেদিনও এমনি ধাঁধায় বিজলি দু'নয়ন
আঁধার নিশার আঁধার বাড়ায়ে অণুক্ষণ
বারাণসী ধামে গঙ্গার তীরে
ধূলি লুণ্ঠিতা শৈব্যার ক্রোড়ে
চণ্ডাল বেশী নৃপতি নেহারে
মৃত পুত্রের সে বদন।
বুঝি, সেদিনও এমনি ঝলকে বিজলি ক্ষনে ক্ষন।"

সেই অন্ধকার রাত্রিকে অনুভব করতে পারলে অতীতের ভারতবর্ষকে বর্তমানের মধ্যেও দেখতে পাবে।

মিনু শুধু তার দুটি বিস্ফারিত চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। নৌকো আবার ফিরতে লাগল। সামান্য ব্যবধানের মধ্যে দশাশ্বমেধ ঘাট। আবার ঘাটে ফিরে এলুম আমরা। যে কাশীকে মন্দিরের মধ্যেও দেখি নি, সে কাশীকে এই ঘাটে প্রত্যক্ষ করলুম যেন। একটা আচ্ছন্ন ভাব নিয়ে ঘাটে নামলুম। বীরেনদা আর রাঙামাসীও নেমে এলেন। এবার ফেরার পালা। সারা দিন গাড়ীর ঝাঁকুনী গেছে। তারপর না ঘুমিয়ে এই পরিশ্রম। দেহে সবারই একটু ক্লান্তি। কিন্তু মনের উত্তেজনায় সে ক্লান্তিকে কেউ স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি না। বীরেনদা হাতঘড়ি দেখলেন। সাতটা। মিশনে খাবার দেবে ন'টায়। এখন কোথায় যাবেন, সেটাই ভাবনা। ঘাটের তীরে জনস্রোত তরল হয়ে এসেছে। রাতে আর নতুন কি দেখব, তাই ফিরে আসাই ঠিক হল।

মিনু আসছিল আমার গা ঘেঁষে। আমাকে বলল: তুমি যে ইতিহাসের ছাত্র, এ কথা কাশীতে এসে আব যেন মনেই হচ্ছে না। ভাবছ একটা দার্শনিকের মত। কথা বলছ কবির মত। ইতিহাস পড়ে এত বাংলা কবিতা তুমি মনে রাখ কি করে? সত্যি, তোমার স্মৃতিশক্তিকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। ঠিক জায়গায় এ সব কবিতা আমার কিন্তু একবারও মনে পড়ছিল না।

আমি বললুম: তাহলে দেখ, ইতিহাসের ছাত্রের কাছে সাহিত্যের ছাত্রী হয়েও তুমি সাহিত্য বিষয়ে হেরে যাচ্ছ।

মিনু চোখে একটা মিষ্টি দৃষ্টি ফুটিয়ে বলল: তোমার কাছে হারতে আমার লজ্জা নেই। আব তা ছাডা তুমি তো আমার গুরু বটেই।

আমি বললুম: সে কথা আর স্বীকার করলে কই। হঠাৎ এক নাটকীয় পরিবেশে সেই যে পড়া ছেড়ে দিলে, তারপর আর তো পড়লেই না।

মিনু বলল: পড়া আমি ছাড়িনি। তুমিই ছাড়িয়ে দিয়েছিলে।

আমি বললুম: 'স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম' বলে শাস্ত্রে একটা কথা আছে। কিন্তু 'পুরুষ চরিত্রম' বলে কেউ তো কিছু বলে নি। আমার মনের মধ্যে সেই মুহূর্তে প্রবেশ করলে আমার সত্যিকারের মনটাকে নিশ্চয়ই তুমি চিনতে পারতে।

মিনু বলল: তুমি কি করে ভাবলে যে সত্যিই আমি তোমার উপর রাগ করেছিলুম?

আমি বললুম: এই মুহূর্ত পর্যন্ত তো সেই ধারণাই ছিল আমার।

—তোমার ধারণার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

আমি বললুম: এই দেখ, আবার তুমি মুখ ভার করছ।

মিনু বলল: তোমার দৃষ্টি যে এত দুর্বল,, সেটা ভাবতেও পারি নি।

আমি বললুম: আমার দৃষ্টি যে দুর্বল, সেটা আমি স্বীকার করছি। এই মুহূর্তে সত্যের যতটুকু ইঙ্গিত পেলুম, আমার কাশী আসার পুণ্যে বুঝি সেটুকু লাভ হল। এই মুহূর্তের কথাটুকু কোন দিন ভুলব না জেন।

মিনু আড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বলল : সত্য দর্শন তোমার মনে কতক্ষণ থাকবে সেটাই চিন্তার বিষয়। দুটো টুকটুকে মেয়ে তোমার দিকে তাকালেই তো…

আমি বাধা দিয়ে বললুম : ঐ জায়গাটাতেই তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ মিনু।

মিনু প্রায় ধমকে উঠল : যাক, ও নিয়ে আর তর্ক করতে চাই না। এবার চল।

সুতরাং চুপ করে চলতে লাগলুম। রাস্তার ক্রসিংয়ে একটু ভীড়। সে ভীড় এড়িয়ে আবাব নির্ঝঞ্ঝাটে এগোতো লাগলুম। দশ পনেব মিনিট হাঁটলুম। কিন্তু সেটা যেন গায়ে লাগল না। ঘরে ফিরে সবাই গা এলিয়ে দিলুম।

ও ধারের বিধবা মহিলাদের মধ্যে একজন নতুন তীর্থযাত্রীদের খবর নিতে এলেন। রাঙামাসীকে লক্ষ্য করে বললেন : এই যে দিদি, বিশ্বনাথ দর্শন হল ?

রাঙামাসী বললেন : হ্যাঁ ভাই, দেখে এলুম। তবে মাথায় গঙ্গাজল দিতে পারি নি। কাল আবার যাব।

প্রৌঢ়া বললেন : শুধু মন্দির দেখলেন ? না…

আমি বললুম : না, ঘাটের ধারেও একটু বেড়িয়ে এলুম। নৌকো করে কাশীকে দেখলুম। জানেন, কাশীর ঘাটের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। কাশীর সমস্ত মাহাত্ম্য যেন ঘাটের মধ্যেই।

প্রৌঢ়া দুই কর কপালে ঠেকিয়ে বললেন : বাবার সেই মাহাত্ম্য আর ক'জন বোঝে বল। তাঁর কৃপা হলে তবেই বোঝা যায়।

মিনু শুয়ে ছিল, উঠে বসল : এই যে মাসীমা, আসুন, ভেতরে এসে বসুন। বাইবে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

উনি বললেন : না মা, কাজ করছি। এই ফাঁকে একটু দেখতে এলুম। তীর্থযাত্রী দর্শনেও পুণ্যি। তোমাদের কি ভাগ্যি এত অল্প বয়সে তীর্থে আসতে পেরেছ।

মিনু দুষ্টু ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকাল। তারপর বৃদ্ধাকে বলল : পুণ্যবান সন্তুদা, মাসীমা। রাস্তায় ওকে বিশ্বেশ্বর আর মা অন্নপূর্ণা স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন। ও তাই পুজো করে এল।

—তাই নাকি! বৃদ্ধা আশ্চর্য চোখে আমার দিকে তাকালেন। তার পর দুই কর যুক্ত করে অদৃশ্য মাকে প্রণাম করলেন। বললেন : বহু ভাগ্যবান তুমি বাবা। বহু ভাগ্য তোমার। বাবা বিশ্বনাথ আর মা অন্নপূর্ণা কি সকলকে স্বপ্ন দেন। তোমার ভাল হবে বাবা।

হঠাৎ দেয়ালের গায়ে একটা বড় টিকটিকি দেখে বীরেনদা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন : ওরে বাবা, কি বিরাট টিকটিকি।

প্রৌঢ়া হেসে বললেন : কিন্তু কাশীর টিকটিকি কখনো ডাকে না বাবা।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। কাশীতে কতগুলি আশ্চর্য জিনিস আছে। এখানে কখনো ভূমিকম্প হয় না। সাপ দেখতে পাবে না কোথাও। বাবা বিশ্বেশ্বরের এটাই মাহাত্ম্য।

আমি আশ্চর্য হয়ে তাঁর দিকে তাকালুম: তাই নাকি!

রাঙামাসী বললেন: হ্যাঁ। কাশীতে কখনো ভূমিকম্প হয় না। ভূমিকম্প হবে কোত্থেকে। তুই শুনিস নি সন্তু? কাশী যে পৃথিবীর বাইরে। রাজা হরিশ-চন্দ্র যখন বিশ্বামিত্রকে পৃথিবী দান করলেন, তখন নিজের থাকবার জায়গা থাকল না। তাই এসে আশ্রয় নিলেন কাশীতে।

ভূগোল যাঁরা পড়েন, তারা রাঙামাসীর ঐ জিওগ্রাফির জ্ঞানকে কি বলবেন জানি নে। তবে অনেক মানুষ থাকেন, যাদের মনের ভূগোলের নক্শা আলাদা। কিন্তু আমি জানি, সত্যি যদি কাশীতে টিকটিকি না ডাকে, সাপ না থাকে, আর কদাচ ভূমিকম্প না হয়, তবে মানচিত্রে কাশী উত্তর প্রদেশের একটি জেলা হল কি করে? কিন্তু এখানে স্বীকাব কবতেই হবে যে, সে পৃথিবীর নিয়মের বাইরে।

অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বললেন প্রৌঢ়া বিধবা মহিলাটি।

রাঙামাসী ডাকলেন: দিদি, অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। আসুন, ভেতরে বসুন।

উনি ব্যস্ত হয়ে বললেন: না, এবার যাই। রুটি তৈরী হয়ে গেছে। মাকে খেতে দিতে হবে।

ও ধারের ঘরে ওরা দু'জন বিধবা মহিলা থাকেন। আর একজনের বয়েস সত্তরের কাছাকাছি।

রাঙামাসী বললেন: উনি আপনার মা?

—হ্যাঁ। ঐ যে ব্রহ্মানন্দ স্বামীজী আছেন, উনি ও'র ছেলে। রোজই একবাব করে আসেন।

তাই নাকি? সত্যি উনি পুণ্যবতী রমণী।

প্রৌঢ়া বললেন: পাপ-পুণ্য কি বুঝি। সবই বাবা বিশ্বনাথের দয়া। কাশীতে তিনি দয়া করে স্থান দিয়েছেন, এই যা। আচ্ছা দিদি, আমি এবার আসি। হ্যাঁ, আপনারা মিশনেই খাবেন তো?

বীরেনদা বললেন: হ্যাঁ।

—তাহলে সময় মত যাবেন। ও'রা ঠিক ন'টার সময় খেতে দেয় কিনা। অবশ্য খাবার আগে ঘন্টা বাজবে। কান পেতে থাকলে এখান থেকেও শুনতে পাবেন।

খাওয়া এবং শোওয়ার ব্যাপারে বীরেনদা অত্যন্ত তৎপর। সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে উঠে ঘড়ি দেখলেন: ওরে বাবা! এ যে সাড়ে আটটা বাজে। এবার যেতে হয়।

মিনু বলল: ন'টায় সময় তো খাবার দেবে। এখান থেকে কতটুকু আর।

বীরেনদা বললেন ঃ সব কিছুই নতুন। আগে থাকতে যাওয়া ভাল।

প্রৌঢ়া মহিলাটি বললেন ঃ হ্যাঁ, আগেই যান না, তাতে ক্ষতি কি? মন্দিরের আরতিটা দেখা হয়ে যাবে।

মহিলাটি চলে গেলেন। বীরেনদা আর এক মুহূর্ত দেরী না করে জামা গায়ে দিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিলেন। অগত্যা আমাদেরও উঠতে হল। আধ ঘণ্টা আগেই মিশনের দিকে রওনা হলুম। মিশনের দূরত্ব আমাদের ঘর থেকে ফুটপাতের এপার আর ওপার।

মিশনপ্রাঙ্গণের এখানে ওখানে দেখি আরও কয়েকজন ভদ্রলোক ঘুরছেন। বুঝলুম, এঁরাও আমাদের মত তীর্থযাত্রী হবেন। এঁরা কোথায় উঠেছেন কে জানে। এই মিশনের মধ্যেই হয় তো কোথাও যাত্রীনিবাস আছে। অনেক স্বামীজীকেও দেখলুম ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক ছুটছেন। একজন প্রৌঢ়মত স্বামীজী রোয়াকে বসে। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। কাশীর মিশন বিরাট স্থান জুড়ে। পশ্চিমে অফিস, খাবারঘর আর হাসপাতাল। পূবে মন্দির। স্বামীজীদের থাকবার পূর্ব অংশ বাকি অংশের সঙ্গে দেয়াল দিয়ে বিচ্ছিন্ন করা। গেটের মধ্য দিয়ে যেখানে ভেতরে ঢুকতে হয়, সেখানেই মন্দির। মন্দিরের মধ্যে স্বয়ং রামকৃষ্ণ দেবের মূর্তি। মিশনের স্বামীজীদের তিনিই আরাধ্য।

রোয়াকে আসীন প্রৌঢ় স্বামীজীটি বললেন ঃ এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে যাও। আরতি দেখ। ঠাকুরকে দেখ।

রাঙামাসীকে নিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকলুম। তখন ভোগ দেওয়া হচ্ছে বলে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। বসবার জন্যে বারান্দায়, আঙিনাতে বেঞ্চ আছে। আমি আশ্চর্য হয়ে স্বামীজীদের সৌজন্যবোধ লক্ষ্য করলুম। সকলেই ভদ্র, মার্জিত ও রুচিসম্পন্ন। সর্বত্রই মার্জিত রুচির ছাপ। ঘনিষ্ঠভাবে মিশনের সঙ্গে আমার এর আগে কোনদিন পরিচয় হয় নি। এদের সম্পর্কে আমার যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, মুহূর্তে যেন তা দূরীভূত হল। স্বামী বিবেকানন্দ যে আদর্শে মিশন স্থাপন করে-ছিলেন, তাঁর সেই সঞ্জীবনী ব্যক্তিত্ব মিশনের মধ্যে দিয়ে আজো বেঁচে আছে দেখলুম।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে মন্দিরের দরজা খুলল। রাঙামাসী বারান্দায় উঠে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন, আমরাও নমস্কার জানালুম তাঁকে। বেদীতে বসে আছেন ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। ধূপ-দীপের এক পবিত্র পরিবেশ। স্বামীজীরা ভারত সংস্কৃতির আর এক দিক্‌কে ধরে রেখেছেন।

মন্দিরের ভেতর থেকে বাইরে এসে আবার সেই রোয়াকের ধারে স্বামীজীর পাশে দাঁড়ালুম। দেখলুম, কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। একজন পককেশ ভদ্রলোক স্বামীজীর পা জড়িয়ে ধরে তাঁকে প্রণাম করে করুণা ভিক্ষা করলেন।

স্বামীজী বললেন ঃ আমি কি জানি। সব তিনি। যা চাইবার তাঁর কাছে চাও।

ভদ্রলোক বললেন : আপনি বলুন, আপনি প্রার্থনা করুন, মুক্তি যেন পাই।

স্বামীজী বললেন : এক মনে ডাক, সাধনা কর, নিশ্চয়ই মনের অভিলাষ পূর্ণ হবে।

কথায় কথায় বুঝতে পারলুম, ইনিই এখানকার সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী। বর্তমানে ব্লাডপ্রেসারে ভুগছেন। কিন্তু সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে, সমীহ করে। ভীড় থামলে বীরেনদা এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। রাঙামাসী, মিনু আর আমিও প্রণাম করলুম।

স্বামীজী বললেন : কোত্থেকে আসছ তোমরা ?

বললুম : কলকাতা থেকে। ওরা এসেছে কাটিহার থেকে।

—ভাল, ভাল। তীর্থ দর্শনে বেরিয়েছ, সব দেখে যাও।

বীরেনদা হঠাৎ তাঁকে পথনির্দেশের জন্য হরিদ্বারের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কখন গাড়ি, কিভাবে যেতে হবে, এই সব।

অম্লান বদনে স্বামীজী আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে বললেন : কবে যাবে ?

বীরেনদা বললেন : কাল পরশুই যাব।

—কাশীতে কবে এসেছে ?

—আজ।

স্বামীজী বললেন : তবে কাল পরশুই যাবে কি ? কাশী ভাল করে দেখ'। অনেক দেখবার জিনিস আছে এখানে। তাছাড়া কাশীতে তিন রাত্রি বাস করতে হয়, জান তো ? বার বার তীর্থস্থানে আসা হয়ে ওঠে না। সব দেখে তবে যাবে।

মিনুর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন : তুমিও তীর্থ করতে এসেছ ?

সলজ্জভাবে মিনু বলল : এলুম।

—ভাল কথা। তীর্থ ভ্রমণ ভাল। তা তুমি কি কর মা ?

মিনু বলল : বাংলা নিয়ে এম এ. পড়ছি।

স্বামীজী বললেন : ভাল ভাল। মুক্তির জন্য জ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে।

হঠাৎ ঢং ঢং করে বেল বেজে উঠল। স্বামীজী বললেন : তোমরা এখানেই খাবে তো ? তবে চলে যাও। এখনই খাবার দেবে। খাবারঘর চেন তো ? চলে যাও, বাঁদিকে।

স্বামীজীকে আবার প্রণাম করে আমরা খাবারঘরের দিকে চললুম। স্বামীজীদের ভদ্রতা আর সৌজন্য এত ভাল লাগল যে, দুপুরবেলায় এখানে স্থান পাবার আগে তাদের সম্পর্কে সাময়িককালের জন্য যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল, সেজন্য মনে মনে অনুতপ্ত হলুম।

একটা বিরাট দালানে খাবার ব্যবস্থা। সারি সারি আসন পাতা হয়েছে। এনামেলের থালা গ্লাস সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সব ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে।

উঠানে দাঁড়াতেই একজন মহারাজ বললেন : যান, বসে পড়ুন।

আমরা গিয়ে বসলুম। মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। যার যার থালা বাসন ধুয়ে প্রত্যেক গ্লাসে জল নিচ্ছে। আমরাও নিলুম! সবাইকে নিজের মনে করে চলতে হয় এখানে। সঙ্কোচের কোন প্রশ্ন নেই।

খাবার এল। মিহি আতপ চালের ভাত। দুটো তরকারী। নুন ও কাঁচা লঙ্কা আলাদা। যার ইচ্ছে নিতে পারে। একটা প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণের পর খাওয়া আরম্ভ হল। অনেককেই দেখলুম বেশ স্বচ্ছন্দে খাচ্ছে এখানে। অবশ্য পরে বুঝতে পারলুম, এরা অধিকাংশই এখানকার লোক। এই মিশনে আছে বিরাট হাসপাতাল। বহুজন কাজ করে। তারাই এখানে খায়। অনেক মহারাজও আমাদের সঙ্গে বসলেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে খাবার প্রস্তুত। খেলে অসুখ করবার সম্ভাবনা খুব কম। সব শেষে এল দই। আর প্রসাদের একটু মিষ্টি। আহার শেষে থালা ও গ্লাস ওধারের ছোট একটি ঘরে রেখে আসতে হয়। সেখানে ধোবার লোক রয়েছে। এর মধ্যে স্বয়ংনির্ভরতার অনেক ব্যবস্থা রয়েছে। খুবই ভাল লাগল। হোটেলের যাবনিক আচারের পাশে এ যেন দেব-পরিবেশ। ভাগ্য নিশ্চয়ই প্রসন্ন ছিল। নইলে কাশী এসে রামকৃষ্ণ মিশনে আশ্রয় পেতুম না।

রাস্তায় যেতে যেতে রাঙামাসী বললেন : সুন্দর সব মহারাজেরা, এত মিষ্টি ব্যবহার।

সেটা লক্ষ্য করেছি আমরাও। আমি তাই ভাবলুম, আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করে এই সব ছেলেরা এসেছে মিশনে কিসের জন্য? সেবা করবার অধিকার লাভের জন্যই তো! সেবা করে যাচ্ছে এরা। মুখে হাসি। পরকে আপন করে নিয়েছেন স্বামীজী আর মহারাজেরা! স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের সঞ্জীবনী শক্তি গৃহত্যাগী এই সব সন্ন্যাসীদের জীবনকে বিরাট এক শক্তিতে প্রাণবন্ত করে রেখেছে।

মিনু বলল : মিশন সম্পর্কে বিরাট এক অভিজ্ঞতা হল। সেটা ভোলবার নয়।

আমি বললুম : রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে আমার ভুল ধারণা ভেঙে গেল। পরের মুখে কথা শুনে কিছু বিশ্বাস করতে নেই।

ভোজনবিলাসী বীরেনদা কিন্তু সমস্ত কিছুকে অন্য চোখে দেখেছিলেন। তিনি বললেন : কিন্তু খাবার ব্যবস্থা দু'টো দেখেছ? ওধারে মন্দিরের বারান্দাতে স্বামীজী আর বিশিষ্ট অতিথিদের ব্যবস্থা। সেখানকার খাবারের চার্টটা আলাদা। দুধ মিষ্টির ভাগটা এখানে বেশী।

বুঝলুম, উৎকৃষ্ট খাবারটা বীরেনদার পাতে পড়েনি বলে এটা তাঁর অভিমান। বললুম : মনে রাখবেন, এক টাকায় যা দিয়েছে, এত কোথাও পাবেন না। আর এই সহৃদয়তাও পাবেন না। বিশেষ জনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবেই। সেটা ভেবে ক্ষুণ্ণ হবেন না। তাছাড়া সব স্বামীজীদের নিজস্ব টাকা পয়সা নেই! অপরের দানেই সবকিছু। যাদের জন্য আপনি বিশেষ ব্যবস্থা দেখেছেন, অনুসন্ধান করলে দেখবেন,

এরা সবাই মিশনের প্যাট্রন। তাঁদের যদি একটু বিশেষ যত্ন করা হয়, তা নিয়ে মনে কিছু করতে পারেন না।

রাঙামাসী বললেন ঃ ছি, ছি। কি বলছ বীরেন। মহারাজেরা বড় ভাল লোক। সুন্দর ব্যবহার করলেন। আমাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে শুনে খাইয়েছেন।

আমি মিনুকে বললুম ঃ তোমার কি মত?

মিনু বলল ঃ না সন্তুদা, মিশনের বিরুদ্ধে সামান্য অভিযোগও আনা যায় না।

বীরেনদা দেখলেন, ভোটাভুটিতে তিনি মাইনরিটির দলে পড়ে গেছেন। সুতরাং কোন কথা না বলে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

এ বাড়ীতে এসে আমরা ঘরে ঢুকলুম। রাঙামাসী গেলেন সেই বিধবা মহিলাদের ওখানে। তখনো ওদের ঘরে আলো জ্বলছিল।

খাবার পর বীরেনদা এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে রাজি নন। তিনি তাঁর সদ্য কেনা তোসটা আপাদমস্তক চাপিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। খাবার পর শরীরটার মধ্যে ক্লান্তি এই যেন প্রথম অনুভব করলুম আমি। শোবার কথা চিন্তা করতে লাগলুম।

মিনু বলল ঃ কালকের কি প্রোগ্রাম করলে সন্তুদা?

আমি বললুম ঃ দেখি কি হয়। এগারটার মধ্যে এরা খাবার দেবে। আগে সেটা সেরে নিতে হবে। তারপর কাশী শহরে দেখবার মত জিনিস ঘুরে ঘুরে দেখব। এখানে দর্শনীয় জিনিস কি আছে, সেটা তো জানিও না। তবে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দেখবার মত জিনিস হবে নিশ্চয়ই!

মিনু বলল ঃ স্বামীজীর কাছে জিজ্ঞেস করে জানলুম, দুর্গা বাড়ী, মানস মন্দির, সংকট মোচন, বিড়লা মন্দির, এই সব দেখবার মত জায়গা এখানে। এখান থেকে সারনাথ বেশী দূর নয়, সেটাও বার বার দেখতে বললেন তিনি।

বীরেনদা শোবা মাত্রই ঘুমিয়ে পড়েন। আজো ঘুমিয়ে পড়েছেন কিনা জানি না। মিনুকে বললুম ঃ কাল বীরেনদার সঙ্গে পরামর্শ করে যাহোক করব। তবে বিকেলে আর একবার ঘাটে যাব নিশ্চয়ই।

মিনু হেসে আমার দিকে তাকাল। আস্তে করে বলল ঃ দেখো, আবার সংসার বিরাগী হয়ো না যেন।

আমি বললুম ঃ সংসার ধার নেই, সংসার বিরাগী হলে তার ক্ষতি কি?

মিনু দুই চোখে দুষ্টুমি ফুটিয়ে বলল ঃ তীর্থ থেকে ফের, তারপর যা হয় ব্যবস্থা এবার করে দেব। রাঙামাসীর কাছে শুনলে না, নমিতার মা মেয়ে সম্প্রদানের জন্য বসে আছেন। শুধু সম্মতির অপেক্ষা।

আমি কোন কথা না বলে মিনুর দিকে গম্ভীরভাবে লক্ষ্য করে তাকিয়ে দেখলুম। মিনু দুই পায়ের উপর চাদরটা আরো বেশী করে টেনে দিয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

ইতিমধ্যে বাইরে দরজার কাছে মাসীমার কণ্ঠ শুনলুম। কাকে যেন বলছেন ঃ আসুন, ভেতরে আসুন।

আমরা সজাগ হলুম। বীরেনদা বোধহয় ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন। মাসীমা মধ্য বয়সের একজন বিধবা মহিলাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন : আসুন দিদি।

বিধবা মহিলাটি আমার আর মিনুর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন : এরা কে ?

রাঙামাসী মিনুকে দেখিয়ে বললেন : আমার বোনঝি।

–আর ওটি ?

—সন্তু ? ও আমার এক ছেলে। আর এক বোন্‌পো ঐ পাশে ঘুমিয়ে আছে।

উনি সকলকে একবার দেখে নিয়ে বললেন : ভাল, ভাল। তীর্থস্থানে এসেছেন, পুণ্যের কাজ।

রাঙামাসী আমাকে বললেন : সন্তু, দিদি রোজ ভোরে গঙ্গাস্নানে যান। কাল আমি ওঁর সঙ্গে যাব। ওঁর সঙ্গেই মন্দিরটা ঘুরে আসব। শিবের মাথায় আজ তো গঙ্গাজল দেওয়া হয়নি।

আমি বললুম : নিশ্চয়ই যাবে। তবে পাণ্ডা সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকবে।

বিধবাটি বললেন : বাবা, আমার সঙ্গে গেলে পাণ্ডারা ধরবে না। আমরা রোজ মন্দিরে যাই, ওরা আমাদের চেনে।

বললুম : তাহলে তো খুবই ভাল। পাণ্ডার উৎপাতের হাত থেকে রাঙামাসী বাঁচবে।

মিনু বলল : মাসী, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

আমি হেসে মিনুর দিকে তাকালুম। সে হাসির মধ্যে যে কি অর্থ ছিল, মিনু সেটা স্পষ্ট করেই বুঝল। সে তাই মুখ ফিরিয়ে নিল।

বিধবা মহিলাটি উঠলেন : আচ্ছা দিদি, আমি তবে উঠি। ভোর চারটেয় উঠে কলতলা সেরে প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। সাড়ে চারটেয় স্নানে যাব। আমি এসে ডাকব'খন। তিনি চলে গেলেন।

রাঙামাসীকে বললুম : উনিও কি এ বাড়ীতেই থাকেন নাকি ?

রাঙামাসী বললেন : না। উনি পাশের বাড়ীতে থাকেন। স্বামীজীর মা ক'দিন অসুস্থ ছিলেন। তাকে দেখাশোনা করবার জন্যে এখানে থাকতেন। বাড়ী বাড়ী কাজ করে খান। কেউ নেই। বাল্যকালে বিধবা হয়েছেন! ভাইয়েদের কাছে থাকতেন। ভাইয়েরা মরা যাবার পর ভাইয়ের ছেলেরা আর দেখতো না। শ্বশুরবাড়ীতেও কেউ নেয় নি। কষ্টে-সিষ্টে কিছু টাকা সংগ্রহ করে কাশী এসেছেন। বাবা বিশ্বনাথের কাশীতে অনাহারে তো কারও জীবন যায় না। বাড়ী বাড়ী খেটে খান।

শুনে মনটার মধ্যে আঘাত লাগল। মানুষের ভাগ্য কত না বিচিত্র। আমাদের সমাজব্যবস্থায় একটা অসহায় মেয়ের জন্য আশ্রয় নেই। আত্মীয়স্বজনকে বিশ্বাস করতে পারে নি এ। আশ্রয় পায় নি সেখানে। অথচ কী নিবিড় বিশ্বাস বিশ্বনাথের উপর! কোন রকমে পথের সম্বল জুটিয়ে এসেছেন কাশীতে। বিশ্বনাথ কি একে

আশ্রয় দিয়েছেন? দিয়েছেন নিশ্চয়ই। আজো তো উনি বেঁচে আছেন। দু'বেলা দু'মুঠো আহার তো জুটেছে। জানি না অতিপ্রাকৃত কোন শক্তি, অলৌকিক কোন দেবতা আছেন কিনা? যদি থাকেন, তিনি যেন মানুষের নিবিড় বিশ্বাসকে কখনো বঞ্চনা না করেন। আর কোন কথা বলতে পারলুম না। মনটা ভার ভার লাগল। শুয়ে পড়লুম। রাঙামাসী আর কিন্তু শুয়ে পড়ল।

হঠাৎ আমার কি মনে হল মাসীকে ডাকলুম? রাঙামাসী!

—কি রে?

—কাল ঘাটে স্নান সেরে, মন্দিরে পুজো দিয়ে, ঐ মহিলাকে দু'টো টাকা দিও।

—কেন?

—পাণ্ডার সঙ্গে গেলে, পাণ্ডাকে তো দিতে হত। ওকে কেন দেবে না? ঐ দু'টো টাকার এত সদ্ব্যবহার হবে যে তুমি কল্পনা করতে পারবে না। পুণ্যের আশায় যে তীর্থ দর্শনে এসেছ, তা তোমার সফল হবে।

আমার মনে পড়ল, আমার পিসিমার কথা। তিনিও বাল্যে বিধবা হয়েছিলেন। আমাদের সংসারে মানুষ। ভাইয়েরা অবশ্য তাকে অনাদর করেন নি। সংসারের সর্বময় কর্ত্রী ছিলেন তিনি। সেই পিসিমা থাকতেন পুজো-আর্চা নিয়ে। হেন তীর্থ ভারতবর্ষে নেই, যা তিনি ঘোরেন নি। ছোটবেলায় যখন মাকে হারিয়েছি এই পিসিমার অসীম স্নেহে মানুষ হয়েছি। আমার মনে হল, যদি আমার পিসিমা কখনো এমন অসহায়ভাবে কাশীতে এসে পড়তেন? তাঁকে যদি কেউ না দেখতো। এরা কি আমার সেই পিসিমা নন? ভাগ্যের পরিহাসে সর্বস্ব বঞ্চিতা, রিক্তা। শুধু এক নিবিড় বিশ্বাসে কাশীতে এসে আছেন, বিশ্বনাথ তাদের চরণে স্থান দেবেন বলে। মানুষ শ্রবণেন্দ্রিয় থাকতে যে আর্ত হৃদয়ের কান্না শুনতে পেল না ইন্দ্রিয়াতীত সেই দেবতা কি তা শুনতে পাবেন? আমার দুই চোখে একটা অশ্রুর আবেগ ছুটে বেরিয়ে আসতে চাইল। আমার পরিবর্তিত জীবন এখন আমি জানি ভিন্ন তরঙ্গে ভিন্ন মাত্রার দেশে (space) তাঁদের বাস। কেউ যদি তার জীবনতরঙ্গের মাত্রা বৃদ্ধি করে সেই দিব্যমাত্রায় পৌঁছুতে পারেন তবে তাঁরা মানুষের আবেদন শুনতে পান বৈকি; মানুষ যদি তার নিজের মূলাধারের কুলকুণ্ডলিনীকে নতুন মাত্রায় ওঠাতে পারে তবে সূক্ষ্মজগতে এই সব সূক্ষ্ম প্রাণীদের দর্শন হয়। এ দর্শন কারো হয় খোলা চোখে, কারো হয় মুদ্রিত নয়নে। মুদ্রিত নয়নে মহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোন প্রান্তেই বোধহয় মানুষের অন্তর্দৃষ্টি চলে যেতে পারে। মানুষ তার নিজের যথার্থ সত্তার কথা জানে না বলেই সীমিত মাত্রার জগতে জন্মমৃত্যুর আবর্তে বদ্ধ একটা সাধারণ জীবের মত বাস করে। কিন্তু সে কথা থাক। যা বলছিলুম তাই বলা যাক :—

সকালে বীরেনদার ডাকে ঘুম ভাঙল। বরাবর তিনি সূর্য ওঠবার আগে ওঠেন। আমি চিরকালই দেরি করে উঠি। সারাদিন ক্লান্তির পর গত রাত্রিতে নিদ্রা হয়েছিল

গভীর। কখন যে সবকিছু চোখের উপর থেকে, চেতনার স্পর্শ থেকে হারিয়ে গেছে জানতেও পারি নি। বীরেনদার ডাকে উঠে বসলুম। চোখ কচলে দেখলুম, রাঙামাসী আর মিনু নেই। বুঝলুম, ওরা তাহলে ঘাটে গেছে স্নান করতে।

বীরেনদা বললেন: হাত মুখ ধুয়ে স্নানটা সেরে নাও। চল, সকালবেলা একটু বেড়িয়ে আসি।

গভীর নিদ্রায় কাল সারা দিনের ক্লান্তি মুছে গেছে। তাই বীরেনদা এত সকালে ডেকে ওঠালেও খারাপ লাগল না। সূর্য তখনো ওঠেনি। সকালবেলা কাশীর রূপটা দেখতে পেলে মন্দ হয় না। রাতে, দিনে, সকালে কাশী না জানি কত বিচিত্র রূপে, বিচিত্র ভাবে প্রকাশ পায়।

আমি উঠে পড়লুম। বীরেনদা ইতিমধ্যে হাত মুখ ধুয়ে এসেছেন। খালি গায়ে তিনি তেল মালিশ করছেন। টুথপেস্ট আর ব্রাস নিয়ে আমিও কলতলায় গেলুম। হাত-মুখ ধুয়ে এসে বীরেনদার সঙ্গে আমিও স্নানটা সেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। গঙ্গার হাওয়া ছেড়েছে। একটু শীত বোধ হচ্ছে। কাল এই শীত অনুভব করি নি। পথে এখনো জনস্রোত নামে নি। কিন্তু পুণ্য স্নানার্থী লোকেরা চলেছে নগ্নপদে গঙ্গার দিকে। কেউবা ফিরে আসছেন। সমস্ত কাশীর দেহের উপর একটা পবিত্র ভাব ছড়িয়ে আছে। গঙ্গার পথে স্নিগ্ধ মধুর কাশীকে বেশ ভাল লাগল।

শীতটা বেশ অনুভব করছি। গরম জামা কাপড় নিয়ে বাড়ী থেকে বেরুই নি। আশ্বিনে কলকাতা থেকে শীতের কথা ভাবাই যায় না। অথচ এখানে সকালবেলা বেশ শীত দেখছি। একটু গরম চা খেতে পেলে ভাল হত বোধহয়।

বীরেনদাকে বললুম: চলুন, একটু চায়ের খোঁজ করি। পাশের খাবারের দোকানগুলো কেবল মাত্র ঝাঁপ খুলেছে। চায়ের দোকানে বেঞ্চিতে চা খাবার লোকদের আড্ডা জমেছে।

বীরেনদা বললেন: চা পরে খাব। চল, স্নানটা যখন হয়েই গেছে, মন্দিরটা ঘুরে আসি।

বললুম: চলুন। তবে ভয় হচ্ছে আবার পাণ্ডার হাতে না পড়ি।

বীরেনদা বললেন: আজ আর পাণ্ডা নেব কেন। মন্দির তো চিনেই এলুম। চল, বাবাকে দর্শন করে আসি।

—চলুন।

হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরের গলির কাছে এসে দাঁড়ালুম।

গলির মুখে মুখে পাণ্ডা। এগুতেই ঘিরে ধরল। কিন্তু কারো কথাতে কান দিলুম না আমরা। অনুরোধ, অনুনয়ের পর গালাগালি দিতে লাগল ওরা। সে সব গ্রাহ্য না করে মন্দিরের দিকে এগুলাম। কিন্তু একজন পাণ্ডা, অল্প বয়স, তাগড়াই চেহারা, কানে মাকড়ি, গলায় সোনার পাটা, সদ্য ভাঙা ধুতি পাঞ্জাবি পরা, আমাদের কিছুতেই ছাড়ল না। যত বলি, পাণ্ডার দরকার নেই, সে তত বলে, আছে।

আমি বললুম ঃ পুজো দিতে তো যাচ্ছি না, যাচ্ছি বিশ্বেশ্বর দর্শনে। পুজো দেওয়া হয়ে গেছে কাল।

পাণ্ডা বলল ঃ মন্দিরে গিয়ে পুজো দেবেন না, এটা হয় নাকি। পুজো দিতেই হয়, চলুন।

বীরেনদাকে বললুম : চলুন ফিরি। নইলে কালকের মত ঠকতে হবে।

কিন্তু বীরেনদার মনে ছিল অন্য ভাবনা। গতকাল রাঙামাসী পুজো দিয়েছেন। নাম গোত্র উল্লেখ করে বীরেনদা নিজে দেন নি। ঘরে তার ছেলেপিলে আছে। তাদের জন্য পুজোর প্রসাদ তো কিছু নিয়ে যেতে হবে? সুতরাং পুজো দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই বীরেনদা এসেছিলেন।

অগত্যা সেই না-ছোড় বান্দা পাণ্ডার সঙ্গে বীরেনদা চুক্তি করলেন, বললেন ঃ কত নেবে?

—তিন টাকা দেবেন।

বীরেনদা বললেন ঃ তিন টাকা নয়। একটি টাকা দিতে পারি। যাবে যদি চল। অন্য কোথাও আর পুজো দেব না।

পাণ্ডা বলল ঃ বেশ, চলুন, তাই দেবেন। তাই বলে মন্দিরে পাণ্ডা নেবেন না, এটা হয়?

সুতরাং সেই তরুণ পাণ্ডাকে নিয়ে এগুতে থাকলুম। বীরেনদা পাঁচ সিকে পয়সার ফুল নৈবেদ্য কিনলেন।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের কাছে গিয়ে দেখি প্রচণ্ড ভীড়। কাল বিকেলে এ ভীড় ছিল না। বুঝলুম, পুজো-আর্চা যা কিছু সকালে গঙ্গাস্নানের পরেই হয়।

ভীড় দেখে বিশ্বনাথ দর্শনের ইচ্ছা আমার আর থাকল না। বীরেনদাকে বললুম ঃ যান, পুজো দিন। আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি। ভীড়ের মধ্যে আমি যাচ্ছি না।

পাণ্ডাটি বলল ঃ সে কি, বিশ্বনাথ দর্শন করবেন না। আসুন, ভীড় আপনার গায়ে লাগবে না।

তার সে আশ্বাসে আমি নির্ভর করতে পারলুম না। বললুম ঃ যাব না। আমি সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করলুম।

পাণ্ডাটি হঠাৎ আমাকে জাপটে ধরল ঃ ইয়ে কিয়া হ্যায়, আইয়ে না। ভীড় কাঁহা হ্যায়?

এমন প্রচণ্ড থাবাতে সে আমাকে ধরে ফেলল যে, আর এড়িয়ে যাবার উপায় থাকল না। একটা প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে সে ভীড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভীড়ের দিকে পিছন ফিরে আমাকে সে বুকের মধ্যে আগলে নিল। তারপর তার সেই অসুরতুল্য দেহ দিয়ে ভীড়ের উপর এমন চাপ দিল যে সমস্ত ভীড়ের মধ্যে একটা আর্ত চিৎকার উঠল। দু' একজন পাণ্ডা পড়েই গেল। কিন্তু পড়বে কোথায়, পড়ল অপরের গায়ে হুমড়ি খেয়ে। দু একজন তীর্থপুণ্যপ্রত্যাশী মহিলা ক'কিয়ে

উঠলেন। পাণ্ডার দুই পাশ থেকে সমস্ত লোক সরে গেল। জাদুবলে যেন জল সমুদ্রকে দুই ভাগ করে তার মধ্য দিয়ে সে পথ বের করে নিয়ে চলল। দু একজন অন্য পাণ্ডা প্রতিবাদ করতে গেলে, আমাদের পাণ্ডার ধমক খেয়ে চুপ করে গেল। বিশ্বনাথের কাছে আমাকে হাজির করে নিয়ে সে বলল : স্পর্শ করুন।

করলুম স্পর্শ।

আজ ভাবি একটা প্রতিমাকে স্পর্শ করলুম। অনন্ত দেশে বিন্দুর মধ্যে ফুটে ওঠা পুরুষ প্রকৃতির যে চিরন্তন সত্য রয়েছে, তার স্থূলরূপের বিগ্রহকে স্পর্শ করলুম। না বুঝে এই স্পর্শ করার কোন মূল্য আছে কিনা জানি না। না বুঝে মন্ত্র উচ্চারণ করার কোন ফল আছে কিনা বুঝি না। কারণ, মন্ত্র শব্দের অর্থই মনন করে শব্দ উচ্চারণ করলে যা 'ত্র' অর্থাৎ তাড়ন করে তাই মন্ত্র। কজন মহা পণ্ডিতও যে এই মন্ত্রের অর্থ বোঝেন জানি না। কোন এক মহা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে কালী মন্ত্রের এ-বাক্যটির অর্থ জিজ্ঞেস করেছিলুম 'বিপরীত রতাতুরাম' তিনি এর বাচ্যার্থ করেছিলেন। ভাবার্থ করতে পারেন নি। দিব্যজগতে প্রবেশ না করতে পারলে এর যথার্থ তাৎপর্য ধরা যায় না। তথাপি যুগ যুগান্তর ধরে মানুষ এই প্রতিমা বা বিগ্রহের পুজোও করছে, মন্ত্রও উচ্চারণ করে যাচ্ছে। তাতে যে সে কি ফল লাভ করছে বুঝি না। অথচ তা তো করেই চলেছে। হয়তো তার আত্মশক্তি বা psycho kinesis-ই তাকে নতুন এক ডাইমেনশন দিচ্ছে। পুরাণ কাহিনী মনের projection হয়ে পরমাত্মায় রূপ ধরে ফুটে থাকছে। কারণ পরে নিজে দেখেছি ধ্যাননেত্রে চলচ্চিত্রের ছবির মত পৌরাণিক কাহিনীর ছবিগুলি ঠিক অনুরূপভাবে দেখা যায়। মানুষের মনের সৃষ্টি তো ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। সেই জন্যই তারা বোধ হয় সত্য হয়ে দেখা দেয়।

পুজো দিয়ে ভীড় ঠেলে পাণ্ডা আমাদের নিরাপদে বাইরে নিয়ে এল।

বলল : এতনা ঘাবড়াতা হ্যায় কাহে। ভীড় লাগল ?

ভয়ে ভয়ে আমি বললুম : না।

পাণ্ডাটি বলল : আইয়ে ইধার।

দেখি সে অন্য মন্দিরের দিকে চলেছে। কালকের খেলা আবার আরম্ভ হবে নাকি ? বললুম : আর কোথাও যাব না। কাল সব ঘুরে দেখেছি।

—কে দেখাল ?

—আর এক পাণ্ডা।

—ওসব পাণ্ডা কিছু জানে নাকি ! আসুন, আমার সঙ্গে।

জোর করে সে আমাদের নিয়ে গেল। আরো বহু শিব, হনুমান, গণেশ দেখাল। দেখাল মা অন্নপূর্ণাকে। দু একটা সে নতুনও দেখাল।

সব শেষে এল বুড়ো শিবের কাছে। বলল : প্রদক্ষিণ করুন।

আমার বুকটা কেঁপে উঠল। আবার সেই জোচ্চুরীর পাল্লায় পড়তে হবে

দেখছি। মন্দিরের চারদিকে চার ক্যাশিয়ার পান্ডা। নতুন এক ক্যাশিয়ার পান্ডার কাছে গেল সে। কত পুজো দেবেন বলুন?

বললুম: কাল তো এখানে পুজো দিয়েছি, আজ আর দেব না।

—এখানে পুজো দিতে হয়।

—না, আর দেব না।

—দিন পাঁচটি টাকা।

—মাথা খারাপ নাকি, কিছুতেই দেব না। কাল দশ টাকা দিয়ে গেছি।

আমাদের পান্ডাটি চোখ কপালে তুলে বলল: তাই নাকি? ভয়ানক আফসোস হল তার এই জন্য যে, কাল কেন সে আমাদের পাকড়াও করতে পারে নি।

তখন আর পেড়াপীড়ি না করে বলল: আপকো যো খুসী দিজিয়ে।

বীরেনদাকে বললুম: না দিয়ে উপায় নেই, দিন একটি টাকা।

কিন্তু এক টাকা দিতে ক্যাশিয়ার পান্ডা গ্রহণই করলে না। বলল: পয়সা লাগবে না, আপনি এমনিই পুজো দিয়ে যান। অগত্যা তিনটে টাকা ফেলতে হল।

বুড়ো শিবের মন্দির থেকে বেরিয়ে পান্ডা আমাদের আর একটি জিনিস দেখাল, যা কাল দেখি নি। একটি মসজিদ। হিন্দুর পবিত্র মন্দিরের গায়ে লাগানো এই মসজিদ। আশ্চর্য হয়ে তাকালুম।

পান্ডা বলল: বাদশা ঔরঙ্গজেব এই মসজিদ তৈরী করেন। তিনি কাশীর মন্দির ভেঙে দিয়ে অপবিত্র করেছিলেন।

মধ্যযুগে ধর্মান্ধতার এক প্রতীক কাশীর বিশ্বেশ্বর মন্দিরের পাশে আজো দাঁড়িয়ে আছে। কাশীর মন্দিরের পথ সেই জন্যেই গলি হয়েছে, আর পারিপার্শ্বিক অট্টালিকা শ্রেণীর আড়ালে মহাদেবতা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের চূড়া নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। অত্যাচার পান্ডাদের আজ যতই হোক না কেন, এরাই এই হিন্দুধর্মকে সেদিন রক্ষা করেছে তার বিপর্যয়ের মুখে। পান্ডাদের অত্যাচারের কথাও যেন মুহূর্তে ভুলে গেলুম আমি।

মন্দির দর্শন করিয়ে আবার সেই গোলকধাঁধা থেকে আমাদের বের করে নিয়ে এল পান্ডা। বীরেনদা কথামত তার হাতে একটা টাকা দিলেন।

পান্ডা বলল: ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য আর কিছু দিন।

বীরেনদা বললেন: আর দিতে পারব না, সে তো আগেই বলেছি।

পান্ডা বীরেনদার দুই কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল: ঠিক আছে বাবুজী, আমার দক্ষিণা লাগবে না।

—সে কি, এই নাও!

—না বাবুজী, থাক। আমি কিছু মনে করব না। এই বলে সেই পান্ডা বীরেনদাকে দুই হাতে একেবারে শূন্যে তুলে নিয়ে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। তারপর মাটিতে নামিয়ে দিয়ে বলল: আপনার ভাল হোক বাবুজী।

সেই বিরাট শক্তির কাছে বীরেনদা এতক্ষণে তাঁর নিজের ক্ষুদ্রতাকে বুঝতে পারলেন। বিনা বাক্যব্যয়ে তিনটি টাকা বের করে দিলেন তার হাতে।

পাণ্ডা সন্তুষ্ট হয়ে হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে প্রসাদের ঝুড়ি বীরেনদার হাতে তুলে দিয়ে বলল: নমস্কার বাবুজী। আবার কাশী এলে আমার খোঁজ নেবেন। আমার নাম ব্রিজলাল পাণ্ডা।

দ্রুত পায়ে বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম: বাবা, এই হল পাণ্ডা! চম্বলের বিভীষিকা সেই সব দস্যুদেরও এমন চেহারা হয় কিনা কে জানে। ব্যাটার দেহে যেন অসুরের শক্তি। বীরেনদাকে বললুম: পুজোর সাধ মিটল?

বীরেনদা পকেটটা হাতড়ে ভাল করে দেখে নিলেন, টাকা পয়সা ঠিক আছে কিনা। তারপর বললেন: বিশেশ্বরকে খুঁরে খুঁরে নমস্কার। যা সব চেলা-চামুণ্ডা, নন্দি-ভৃঙ্গি লাগে কোন কাজে। পাণ্ডা না গুণ্ডা!

ঘরে এসে দেখি, রাঙামাসী আর মিনু ফিরে এসেছে। রাঙামাসীকে বললুম: কি মাসী, পাণ্ডার পাল্লায় পড় নি তো আজ?

—না বাবা। খুব ভালভাবে বিশ্বনাথ দর্শন করেছি আজ। প্রাণ ভরে বাবার মাথায় গঙ্গাজল ঢেলেছি।

মনে মনে ভাবলুম কারণসমুদ্রের বারিতে যিনি নিত্য স্নান করেন। ছায়াপথের দুগ্ধফেননিভ আস্তছায়াপথীয় যে মেঘ মাঝে মাঝে তাঁকে আড়াল করে যায় পার্থিব কৃত্রিম বারি এবং স্থূল গাভীর দুগ্ধ কতটুকু তার তৃপ্তি বিধান করে কে জানে। মাসীমার গঙ্গাজল আর কাঁচা দুধে সৎ+চিৎ+আনন্দের এই আনন্দ অংশ কতটুকু তৃপ্ত হয়েছেন তা তিনিই জানেন। তাকিয়ে দেখি, মিনুর কপাল লাল হয়ে আছে। সিঁদুর লেপে দিয়েছে যেন। ওর তপ্ত গৌরবর্ণের ওপর রক্তরঙ যেন ওর আভাকে আরো ফুটিয়ে তুলেছে। সেদিকে কিছুকাল তাকিয়ে রইলুম।

রাঙামাসী গল্প করতে গেলেন ওপাশে বিধবা মহিলাদের সঙ্গে। মুহূর্তের মধ্যে ওদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছেন তিনি। বীরেনদা গেলেন পা ধুতে কলতলায়। মিনু আমার দিকে একটা সলজ্জ দৃষ্টি হেনে বলল: হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিলে কি?

আমি বললুম: তোমার কপালে যেন সূর্য ঠিকরে বেরুচ্ছে। সমস্ত মুখমণ্ডল এক জ্যোতির আভার ভরে উঠেছে। ভাবছি, এ সিঁদুরের ফোঁটা যখন কপালে আজীবনের সঙ্গী হবে, তখন না জানি কত সুন্দর দেখাবে তোমাকে।

একটু লাল হয়ে উঠল মিনু। ওর ভরা যৌবনের স্বাদ মাখানো চোখ দুটিতে অদ্ভুত এক যৌবন-রসের আভাস লক্ষ্য করলুম। গ্রীবা বাঁকিয়ে ও বলল: তোমারই বা কম হয়েছে কি। কপালে তো বিরাট আগুনের রেখা টেনে দিয়ে বসে আছ। ঠিক যেন একজন ভৈরব সেজেছ।

ব্যাপারটা আমি খেয়ালই করি নি। মন্দিরের মধ্যে গুণ্ডামার্কা এক পাণ্ডার পাল্লায় পড়ে হিমসিম খেয়েছি এতক্ষণ। কোন্ ফাঁকে যে সে কপালে সিঁদুরের দীর্ঘ রেখা

এঁকে দিয়েছে, টেরও পাই নি। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বের করে সিঁদুরের রেখাটা মুছে ফেললুম।

মিনু বলল : কৈ, মন্দিরে যাবে এ কথাটা তো বল নি আমাকে ?

আমি বললুম : সময় পেলুম কৈ ? ঘুম থেকে উঠে দেখি তোমরা চলে গেছ।

মিনু কটাক্ষপাত করে আমার দিকে তাকাল : বাইরে তো খুব নাস্তিকতা দেখাও। মনের দুর্বলতাটা বাইরে থেকে ঢাকতে চাও কেন শুনি ?

আমি বললুম : আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। এটা আগাগোড়া বীরেনদার ব্যাপার।

ধমকে উঠল মিনু : যাও, আবার মিথ্যে বলছ। সত্যকে ঢাকতে চাও কেন ?

—সত্যি মিনু...

—থাক ওকথা। তুমি আজ বিশ্বনাথের কাছে কি চাইলে শুনি ?

একটু হেসে তাকালুম মিনুর দিকে। বললুম : চাইলুম, একটি মেয়ের মনকে তুমি ঠিক করে দাও প্রভু। সে যেন কখনো আমাকে ভুল না বোঝে। একবার সে রাগ করে আমাকে পরিত্যাগ করেছিল।

মিনু বলল : ঐ প্রার্থনা করেছ না ঘোড়ার ডিম। আমি জানি, তুমি কি চেয়েছ ?

—কি শুনি ?

—চেয়েছ সুন্দরী একটা মেয়ের সঙ্গে যেন বিয়ে হয়।

আমি বললুম : কথাটা একরকম মিথ্যে নয়। যাকে চেয়েছি, সে তো সুন্দরী বটেই, বিদুষীও। তার কপালে সিঁদুরের ফোঁটা পড়লে তার সৌন্দর্য যেন আলোর আভায় ঝলমল করে ওঠে।

মিনু বলল : নাও, আর বক্‌বক্‌ করতে হবে না। তোমাকে আমি চিনি। কত ক্ষমতা দু'দিনেই তার পরীক্ষা হয়ে যাবে।

বীরেনদা কাশতে কাশতে ঘরে ঢুকলেন। বললেন : বাবা, তীর্থ মাথায় থাক। এমন পাণ্ডার পাল্লায় পড়ে ? সন্তুর মত আগ্রা দিল্লী বরং ঘুরব, তীর্থস্থানে আর নয়।

মিনু হেসে বলল : কেন ?

বীরেনদা আগাগোড়া সমস্ত কাহিনীটা তাকে খুলে বললেন। শুনে মিনুর কি হাসি। ও বলল : সন্তুদাকে যদি দু'হাতে অমন করে তুলে নিত পাণ্ডাটা, তাহলে আরো খুশি হতুম।

বেলা এগারটায় মিশনের খাওয়া-দাওয়া শেষ হল। এখানে সব কিছু একটা কঠিন নিয়মের অধীনে ঘড়ির কাঁটার মত চলে। ঘরে এসে আমি একটা চৌকিতে আরাম করে গা এলিয়ে দিলুম।

মিনু বলল : বারে, শুয়ে পড়লে যে ? দুর্গাবাড়ী, মানস মন্দির, সঙ্কটমোচন, বিশ্ববিদ্যালয় এসব ঘুরে দেখবে না ?

বীরেনদা বললেন : হ্যাঁ, এক্ষুনি বেরুতে হবে। চল সন্তু, বাইরে গিয়ে দুটো রিক্শা ঠিক করে নিয়ে আসি।

কার্তিকের দিন ছোট। ঘুমিয়ে উঠে বেড়াতে গেলে কিছুই দেখা যাবে না। অথচ একটু বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু বীরেনদা আর মিনুর তাগাদায় উঠে পড়তে হল। বীরেনদা আজই কাশী দর্শন শেষ করতে চান। কেন যে তাঁর এই তাড়াহুড়ো সেটা বুঝলুম রাত্রিবেলা।

মিশনের কাছে কয়েকটি রিক্শা দাঁড়িয়ে ছিল এখানে প্রায়ই রিক্শা দাঁড়িয়ে থাকে। রিক্শাওয়ালারা জানে যে তীর্থযাত্রীরা অনেকেই মিশনে আসে, রিক্শার দরকার হয় অনেকেরই। আগেই শুনেছিলুম, উল্লেখিত স্থানগুলি ঘুরে দেখতে রিক্শা প্রতি তিন টাকা করে লাগে। রিক্শাওয়ালারা প্রথমে একটু বেশী হাঁকল বটে, কিন্তু অল্পেতেই তিন টাকাতে নেমে এল। বীরেনদা সুযোগ বুঝে আর একটু দর কষাকষি করে দর নামানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমি বুঝলুম, সে চেষ্টা সফল হবে না। সুতরাং তিন টাকাতেই রাজী হলুম।

বারটা নাগাদ রওনা হলুম। দেখলুম দুর্গাবাড়ী। পাথরের মন্দির। পাশে বিরাট স্নানাগার। আর মন্দিরপ্রবাসী কয়েকটা তাগড়াই বাঁদর। সামনে ফুলওয়ালার দল মালা বিক্রি করবার জন্যে ঝুলোঝুলি করছে। কিন্তু পুজো দিতে আসিনি কেউ-ই। সুতরাং টলাতে পারল না। বিগ্রহের মধ্যে জাঁকজমক কিছু নেই। ভাস্কর্যের কৌশলও নেই কিছু। কিন্তু মূর্তি প্রাচীন। লোকের বিশ্বাস, জাগ্রত। তা হতে পারে। লোকের আত্মবিশ্বাস স্থূল বস্তুতে স্থাপিত হলে তাতেও প্রাণের সঞ্চার হতে পারে বৈকি !

দুর্গাবাড়ী থেকে সঙ্কটমোচনের মন্দির। মানস মন্দিরের পাশ দিয়ে গিয়েও রিক্শা থামল না। প্রথম সঙ্কটমোচন দেখে ফেরার পথে দেখাবে মানস মন্দির। বিধবা মহিলাটি বলে দিয়েছিলেন, সঙ্কটমোচনের মন্দির জাগ্রত। বিরাট একটা কৌতূহল ছিল মনের মধ্যে। রাস্তায় রিক্শা থেকে নেমে একটা বাগানবাড়ীর ভেতরে প্রায় আধ মাইলখানেক হাঁটলে তবে সঙ্কটমোচনের মন্দির। গিয়ে দেখলাম, মন্দিরের দুয়ার তখনো খোলে নি। বহু ভক্ত ইতিমধ্যেই জড় হয়েছে। কয়েকজন একাগ্র মনে মন্দিরের সামনে দালানে বসে অদৃশ্য বিগ্রহের দিকে মুখ করে কি সব হিন্দি পুস্তক পড়ছে। দু একজনকে দেখে ব্যাধিক্লিষ্ট মনে হল। কেউ কেউ অনশনে হত্যা দিয়ে আছে।

বুঝলুম, এ মন্দিরের দেবতা বা দেবী জাগ্রত হবেন নিশ্চয়ই। খবর নিয়ে জানতে পারলুম, মন্দিরের দুয়ার খুলতে আধঘণ্টা দেরি। কি করা যায় ! যদিও দালান আছে, সেখানে বসবার উপায় নেই। অবশ্য চতুর্দিকে গাছগাছালী, ছায়া প্রচুর। সেই ছায়াতে দাঁড়ানো যায়।

কে এই সংকটমোচন? নাম তো শুনি নি কখনো? মন্দির ঘুরে দু একটা চিত্র দেখে কিছু বুঝতে পারলুম না। এক জায়গায় রামচন্দ্র হাত তুলে সীতাদেবীকে সঙ্কটমোচনের মন্দির দেখাচ্ছেন। কিন্তু সংকটমোচনের আকৃতি সম্বন্ধে কোন ধারণাই জন্মাল না। ফলে আমাদেরও কৌতূহল বাড়ল। মিনু আর রাঙামাসী গিয়ে দালানে দাঁড়ালেন মন্দিরের দিকে মুখ করে। আমিও বীরেনদাকে জুতো পাহারায় রেখে গিয়ে দালানে উঠলুম।

একটা উৎকণ্ঠ অপেক্ষার পর মন্দিরের দুয়ার খুলল। সংকটমোচনের মন্দিরের ঠিক উল্টো দিকেই শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী ও লক্ষ্মণের মূর্তি। পর্দা টাঙানো। ঘণ্টা বাজলে মন্দিরের দরজা খুলল। উৎকণ্ঠ আগ্রহে সকলেই অধীর। ভক্তজনের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন শোনা গেল।

পর্দা খুলে গেল। রাম-সীতার মন্দিরের মধ্যে দেখা গেল, একজন পুরোহিত আরতি করছেন। তার আরতি শেষ হলে আবার ঘণ্টা বাজল। এবার পর্দা খুলল সংকট-মোচনের। হুমড়ি খেয়ে সব লোক পড়ল মন্দিরের সামনে! এই ভীড়ের মধ্যে কিছুই দেখা যাবে না বুঝে, দালানের উঁচু মেঝেতেই দাঁড়িয়ে রইলুম। প্রথমটা কিছু ঠাহর করতে পারলুম না, মন্দিরের ভেতর কি আছে! বিরাট জাগ্রত দেবতা, সেইজন্য বুঝি আমার পাপ চক্ষুতে তিনি ধরা দিলেন না? খুব মর্মাহত হবার উপক্রম হল। এমন সময় আসল বস্তুটি লক্ষ্য করলুম। এক খণ্ড পাথর। স্বাভাবিক পাথর হয় তো। এ পাথর কেউ তৈরী করে নি। কিন্তু অকস্মাৎ ব্যাখ্যাতীত কোন কারণে সেই পাথরের আকৃতি ভক্তজনের ধ্যানের বস্তুর সঙ্গে কিছুটা সামঞ্জস্য রক্ষা করছে।

আমি আঁচ করে নিলুম তার দুটো চোখ দেখে। সোনার চোখ বসানো এ পাথর হিন্দুস্থানী পট্টিতে কলকাতার নানা স্থানেই নজরে পড়ে।

নেমে এলুম দালান থেকে। বীরেনদা দেখি ছটফট করছেন মূর্তি দেখবার জন্যে। ইতিমধ্যে কার কাছে শুনেছেন, এমন জাগ্রত ঠাকুর সারা কাশীতে আর নেই। বিশ্বনাথের চেয়েও জাগ্রত। তাই দূর দূরান্ত থেকে লোকেরা এসে ভীড় করে কাশীতে সংকটমোচনের মন্দিরে প্রার্থনা জানাবার জন্য।

বীরেনদা সাগ্রহ দুটি চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: কি দেখলে?

আমি বললুম: উঠুন! ঐ দালানে উঠে মন্দিরের দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন।

বীরেনদা উঠে গেলেন। আমি জুতো পাহারায় রইলুম। ততক্ষণে ভীড় প্রচণ্ড ঘন হয়ে জমে উঠেছে। কোন রকমে মেয়েমানুষ বলে দেহ বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসতে পারলেন—রাঙামাসী আর মিনু। ভীড়ের চাপে মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে মিনুর।

বললুম: কি দেখলে মিনু?

ও বলল: হনুমান।

আমি আর হাসি চেপে রাখতে পারলুম না। এরই জন্যে এত সাগ্রহে অপেক্ষা!

তীব্র উৎকণ্ঠা! আকাঙ্ক্ষা আর প্রাপ্তির মধ্যে এই বিরাট অসামঞ্জস্যকে বুঝি ইংরাজীতে বলে Anti-climax

মিনু বলল : হাসছ কেন? মনের মধ্যে ভক্তি রাখ। ভক্তি আর বিশ্বাসই তো সব।

এর মধ্যে বীরেনদা ভীড় ঠেলে এগুতে পারলেন না। পায়ের নখের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, এর পাশ দিয়ে, ওর কাঁধের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে শত চেষ্টা করেও মন্দিরের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত দেবতার মূর্তি সম্পর্কে কোন হদিসই করতে পারলেন না। অগত্যা হতাশ হয়ে ফিরে এলেন।

প্রকৃতপক্ষে ঐ পাথর দেখে মূর্তি অনুমান করা সহজ নয়। জিজ্ঞেস করলুম : কি দেখলেন বীরেন দা?

বীরেনদা বললেন : কিছু তো দেখতে পেলুম না।

আমি হাসি চেপে বললুম : সে কি! বড় জাগ্রত দেবতা অবশ্য পাপীদের চোখে নাকি ধরা দেন না।

বীরেনদার মুখখানা দেখলুম গম্ভীর। বললেন : থাকগে, কাশী এসেছি বিশ্বনাথ দর্শনের জন্য। পুণ্যি অপুণ্যি সব বিশ্বনাথ দর্শনেই হয়েছে। নাই বা দেখতে পেলুম। আমাকে বললেন : কিসের বিগ্রহ?

আমি বললুম : মিনুকে জিজ্ঞেস করুন।

মিনুর দিকে তাকাতে মিনু বলল : হনুমান।

বীরেনদা হেসে ফেললেন : তাই নাকি! যা বাবা, এরই জন্য এত হয়রান।

আমি বললুম : তুচ্ছ করছেন কেন? এ জাগ্রত হনুমান। ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়। তাই হনুমানের এত প্রতাপ হিন্দুস্থানে।

বীরেনদা বললেন : হিন্দুস্থানে বোল না, বল হিন্দুস্থানীদের কাছে।

আমি বললুম : সে যাই হোক, আপনি বিরাট জিনিস হারালেন।

বীরেনদা বুঝলেন যে, আমি তাঁকে ঠাট্টা করছি। তাই বললেন : ঠিক আছে। তুমি দেখছ তো? ওতেই হয়েছে। আমি না হয় পাপীই থাকলুম।

হনুমানের মূর্তি দেখে সেদিন আমি ঠাট্টা করেছিলুম বটে, কিন্তু এর মধ্যেও যে কিছু আছে সেটা আমি বুঝতে পেরেছিলুম পরবর্তীকালে যখন হিমালয়ের সেই মহাপুরুষের কল্যাণে আমার কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করতে পেরেছিলুম। কলকাতার উপকণ্ঠে কুঁদ ঘাট থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন আমার কাছে। তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখেন, এসেছিলেন সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে। চোখ বুজে তাঁর স্বপ্নের কথা চিন্তা করতে গিয়ে দেখি আকাশ পথে হনুমান ভেসে চলেছে গদা কাঁধে নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলুম, ভদ্রলোক 'আকাশে ভেসে বেড়ান' স্বপ্নে এই দৃশ্য দেখেন। সে কথা জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, হ্যাঁ, ঠিক তাই। হনুমানের ভাসমান মূর্তি দিয়ে কে যে তাঁর স্বপ্নের গোপন কথাটি আমাকে জানিয়ে দিল কে জানে! আমি একে বলি Divine Pictorial Language. এই দিব্য রহস্যের কিনারা ত্রিমাত্রিক বুদ্ধিতে

ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। রূপহীন যে পাথরখণ্ডের মধ্যে রূপ আরোপ করে পুজো করা হয়, সে পাথরকে ইংরেজীতে বলে Aniconic আমি আমার নব জন্মান্তরের চেতনাতে এমন বহু পাথরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা জাগ্রত মূর্তি দেখে হতবাক হয়ে বিস্ময়ে শুধু ভেবেছি আদিবাসী বর্বর মানুষের Animism বা সর্বপ্রাণবাদের কথা, কী অতিচেতন মানসের অধিকারী হতে পেরে তারা জড়বস্তুর মধ্যেও লুক্কায়িত এই প্রাণের সন্ধান পেয়েছিলেন। জড় যে জড় কোন বস্তু নয়, সর্বত্রই প্রাণের একটা প্রবাহে স্পন্দিত, অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের এই অধুনা আবিষ্কারকে বহু প্রাচীনকালেও কী আত্মশক্তি বলে মানুষ জানতে পেরেছিলেন কে জানে!

আবার রিক্‌শায় চাপলুম। এবার মানস মন্দির। কোন কিছু ধারণা করতে পারি নি নাম শুনে। মূল্যবান পাথরের মন্দির। শ্বেতপাথরের উপর 'রামচরিত মানস' থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করা রয়েছে। দেখলুম মন্দিরের উদ্বোধন করেছেন ডঃ রাধাকৃষ্ণণ, প্রেসিডেন্ট অব্ ইন্ডিয়া। মন্দির এবং মন্দিরের কারুকার্য দেখবার মত। মানস মন্দির নামকরণ হয়েছে—রামচরিত মানস থেকে।

মানস মন্দির থেকে এলুম বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিরাট এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। আধ ঘণ্টা বিরামহীন সাইকেল রিক্‌শাতে ঘুরেও পরিদর্শন শেষ করতে পারলুম না। এক এক জায়গায় এক একটি ডিপার্টমেন্ট। এখনো কাজ চলছে, শেষ হয়নি।

মিনুকে বললুম: মিনু, দেখ, তুলনা কর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে, যত টাকা বুঝি উত্তরপ্রদেশেই ব্যয় হচ্ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বিল্ডিং উঠতে একযুগ কেটে গেল। স্থানাভাবে ছাত্রেরা পড়তে পায় না। অথচ কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন দেখ!

মিনু বলল: দেখতে খুবই সুন্দর, আয়তনও বেশ। তাই বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনা করো না। প্রশ্নটা মর্যাদার। মানস মন্দির বিশ্বনাথের মন্দিরের চেয়ে অনেক খরচা করে তৈরী হয়েছে। দেখতেও সুন্দর। কিন্তু ভক্তজনের ভীড় দেখলে কি সেখানে? ফুলপাতা পড়ে শেওলা পড়ে গেলেও লোকের ভিড় বিশ্বনাথের মন্দিরেই। এখানেও প্রশ্নটা মর্যাদার, ঐতিহ্যের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীনত্ব আর পেছনের ইতিহাসটা দেখ।

দেখলুম মিনুও বেশ কথা বলতে শিখেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমা শেষ করে রিক্‌শা এসে থামল বিড়লা মন্দিরে। এই সর্বপ্রথম কাশীতে একটি মন্দির দেখলুম যার চূড়াকে গগন-স্পর্শী বলা চলে। শ্বেতপাথরের তৈরী মন্দির। আধুনিক স্থাপত্যের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। চক্ষুকে তৃপ্তি দান করে। মন্দির, মন্দির চত্বর, সবটাই তাকিয়ে দেখবার মত। বিরাট শিবলিঙ্গ রয়েছে মাধ্যখানে। কিন্তু ভীড় নেই। লোকে তাকে নমস্কার করছে নিশ্চয়ই—কিন্তু স্পর্শের প্রেরণা নেই তত।

শুনলাম, বিশ্বেশ্বরকে ঘাট থেকে উঠিয়ে এনে এখানে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন ভারত সরকার। কিন্তু পাণ্ডাদের আন্দোলনের জন্য সম্ভব হয় নি। তীর্থযাত্রীদের সুবিধার কথা চিন্তা করেই সরকার এই চিন্তা করেছিলেন। কারণ বিশ্বনাথ মন্দিরের গলিপথে যেমন ভীড় হয়, চুরি ছিনতাইও চলে প্রচুর। সেটা এড়াবার জন্যই, এমন প্রশস্ত স্থানে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা চলেছিল। সরকারী দৃষ্টি বাস্তব দিক থেকে যতই ভাল হোক না কেন, ইন্দ্রিয়াতীত জগতের এক ধর্মানুভূতির সঙ্গে তার কোন মিল ছিল না।

কাশীর বিশ্বনাথকে, কাশীর ঐ পুরোনো মন্দিরেই মানায়। গগনচুম্বি শ্বেতপাথরের মন্দিরের মধ্যে তাকে এনে বসালেও তাঁর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমের ডালে যেমন আতা ফল হয় না, তেমনি আতা গাছেও আম ফলে না। যার যেখানে স্থান।

বিড়লা মন্দির দেখা হলে, চুক্তি অনুযায়ী আমাদের দর্শনীয় স্থানগুলি পরিদর্শন করা শেষ হল। রিক্‌শা ফিরে চলল মিশনের দিকে। তাকিয়ে দেখলুম, সূর্য তখনো আকাশের বেশ উপরেই আছে। ৮

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট দিয়ে বেরুলাম। দ্বারদেশে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের স্ট্যাচু। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলে তাঁর দান অসামান্য। একবার তাকিয়ে পণ্ডিতজীকে দেখলুম। রিক্‌শা ছুটে চলল।

মিশনে এসে যখন পৌঁছলাম, তখনো বেশ আলো আছে। সূর্য ডুবে যায় নি। বাঙামাসীকে ক্লান্ত দেখলাম। তাঁর এ বয়সে ক্লান্তি আসবারই কথা। মাসীকে বললুম তুমি একটু বিশ্রাম কর, আমরা ঘাট থেকে ঘুরে আসি।

মিনুকে জিজ্ঞাসা করলুম : তুমি থাকবে, না যাবে ?

মিনু বলল : চল, বিকেলবেলা ঘাটটা ঘুরে আসি।

বাঙামাসীকে ঘরে রেখে আমি বীরেনদা আর মিনু ঘাটের দিকে বেরুলাম।

ঘাটে তীর্থযাত্রীদের অনেকেই গিয়েছে। কেউ নৌকো করে গঙ্গার বুক থেকে কাশীকে দেখছে। কেউবা আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউবা একা কোথাও চুপ করে বসে আছে। কেউ বেদ উপনিষৎ পাঠ করছে। তাকে ঘিরে দু'চার জন বৃদ্ধ, বৃদ্ধা। সব চেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে কীর্তন। একজন কীর্তনিয়া পদাবলী কীর্তন করছে। বালবিধবা থেকে বৃদ্ধা সকলেই তাকে ঘিরে সিঁড়ির উপর বসেছে। ভীড়টা বেশ জমে উঠেছে সেখানে। কীর্তনিয়ার বয়স অল্প। কিন্তু ঢং বেশী। এক দৃষ্টিতে যদি মানুষ চিনতে পারি, তাহলে বলব, অন্তর তার পবিত্র নয়। বাইরে সে রাধাকৃষ্ণের নামে গান করে, অন্তরে তার কালিমা। কিন্তু গান গায় ভাল। এই গানের সুযোগ সে নেয় বলে আমার বিশ্বাস। ধর্মস্থানে ব্যবসার সুযোগ সব চাইতে বেশী। আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে গান শুনলুম। একদিনে একটা পালা কোনদিনই শেষ করে না কীর্তনিয়া। ধরে ধরে গান করে, যাতে শ্রোতা ও শ্রোতৃরা (কারণ অধিকাংশই

মহিলা) রোজ আসে। কীর্তন শেষে দু'আনা চার আনা করে সকলে যা দেয় তাতে মন্দ আয় হয় না।

মনে পড়ল ছোটবেলায় নিজের গ্রামের কীর্তনের কথা। বৃন্দাবন নমদাস। ভাল কণ্ঠ। রামমঙ্গল গাইতো। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান ছেড়ে সে আর আসতে পারল না। অপরিচিত স্থানের একটা ভীতিই তাকে আসতে দিল না। ভাল কণ্ঠের অধিকারীর পক্ষে হিন্দুস্থানে আয় করে খাওয়া খুব কঠিন নয়। এই কাশীর ঘাটে সেও যদি এসে পেঁছি তে পারত, অন্নবস্ত্রের অভাব তার হত না নিশ্চয়ই।

গান শেষ হলে মিনুকে বললুম ঃ কেমন শুনলে ?

মিনু বলল ঃ চোখ বুজে শুনলে ভাল লাগতো।

—কেন ভাবে বিভোর হয়ে গিয়েছিলে নাকি ?

মিনু বলল ঃ তাই বটে। লোকটার অঙ্গভঙ্গী, চাহনি কোনটাই ভাল নয়! বিশ্রী লাগছিল। চোখ বুজে শুনলে হয় তো ভাল লগত।

দেখলুম, যে প্রশ্ন আমার মনে উঠেছে, সে প্রশ্ন মিনুরও।

বীরেনদারও ভাল লাগছিল না বোধ হয়। তিনি ডাকলেন ঃ এস, যত সব বুজরুকি।

আমি বললুম ঃ তীর্থস্থানে এই তো হয় বীরেনদা। কেউ একে পরম পবিত্র বলে মনে করে, কেউ মনে করে বুজরুকি।

বীরেনদা আমার কথার উত্তর না দিয়ে গম্ভীর হয়ে থাকলেন! তিনি আমাদের ছাড়িয়ে একটু এগিয়েই গেলেন।

আমি মিনুকে বললুম ঃ বীরেনদা কি ভাবছেন, আমি বলে দিতে পারি।

—কি ?

—তিনি ভাবছেন, একটা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধুর দেখা যদি হঠাৎ পেয়ে যেতেন তিনি! আর তাঁর একটু ফুৎকারে বীরেনদার সমস্ত প্রতিবন্ধকতাগুলো যদি কেটে গিয়ে রাতারাতি সে ভাগ্যের উদয় হত!

বীরেনদা কাশী, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, কোথাও ঘুরে সে সাধুর সন্ধান পাননি। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, সে দিনের সেই প্রায় নাস্তিক 'আমি' সেই আমার কাছে যখন পঁচিশ বছর পরে তিনি তাঁর দুই নাতিকে নিয়ে এসেছিলেন এই জানতে যে, তাদের চাকুরী হবে কিনা, তাদের একজন সম্পর্কে বলেছিলুম, তার চাকুরী হবে Indian Airlines-এ। মাস খানেকের মধ্যেই প্রাক্তন পরীক্ষার ফল হিসেবে সেই চাকুরীই সে পেয়েছিল। মালদহ মহানন্দটোলার বিষ্ণুচরণ দাস। শেষ পর্যন্ত সত্যিই কোন সাধুসন্তের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন কিনা আমি বলতে পারব না। সে কথা যাক, পঁচিশ বছর আগের যে কথা বলতে যাচ্ছিলুম, তাই আবার বলা যাক।

মিনু বলল ঃ তা মন্দ বলনি। দাদা একটু তুকতাকে বিশ্বাস করেন। আর সাধু সন্ন্যাসীর নাম শুনলেই ছুটে যান।

আমি বললুম ঃ জান মিনু, ধর্ম সম্পর্কে একটা কথা আমার মনে হয়, সাধু-সন্ন্যাসীর খোঁজ করলে তাঁদের দেখা মেলে না। মনের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারলে সন্ন্যাসীরাই ভক্তজনকে খুঁজে বের করবেন। আমাদের অধিকাংশের ধর্মই তো স্বার্থ থেকে। পুণ্য অর্জন পাপ খণ্ডাবার জন্যে। ভগবানের জন্য ভগবানকে ভালবেসে আত্মহারা হন ক'জন? বিপদে পড়লে আমরা পুজো করি, আর্চা করি, জ্যোতিষ আর তান্ত্রিকের কাছে ছুটে যাই. ঈশ্বরে ভক্তি তখন হয়। যাই বল তুমি, ভক্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কত বড় কথা বলে গেছেন, যা ভাবলে রোমাঞ্চ জাগে ঃ

'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোব প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।'

প্রার্থনা করে ফল না পেলে আমাদের সংশয় জাগে। আবার পাবার জন্যে আমরা দশ জনকে দেখিয়ে ঢং করে পুজো করি। কেউ মা, কেউ বাবা বলে ডাকি। মন্দিরে হত্যা দিই। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন, ধর্ম করবে মনে, বনে, কোণে। যেন কেউ না জানে। প্রভু যিশুখ্রীষ্টেরও এই নির্দেশ। তীর্থস্থানে তীর্থ করতে আসাটাকেই বড় ধর্ম বলে মনে ক'বা না তুমি।

মিনু বলল ঃ এক প্রস্থ বেশ উপদেশ দিযে ফেললে। এখন উপদেশ রাখ। তুমিও যে কোন পথে চলেছ, ভেবে ভয় হয়।

মিনুর দিকে ফিরে তাকিয়ে হেসে বললুম ঃ আমার একটি মাত্র সাধনা, সেটা প্রেমের। সীমা এবং অসীমকে সেই ভালবাসার মধ্য দিয়েই পেতে চাই আমি। সুতরাং তোমার ভয়ের কিছু নেই।

মিনু একটা চমক ভরা হাসিতে আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল ঃ চল, বীরেনদা অনেকদূর এগিয়ে গেছেন।

আমি আর মিনু, একটু দ্রুত পায়ে বীরেনদার দিকে এগিয়ে গেলুম। বীরেনদার যেন কেমন গম্ভীর গম্ভীর ভাব।

বললুম ঃ কি বীরেনদা, কি ভাবছেন? সাধু-সন্ন্যাসীর খোঁজ করছেন নাকি?

বীরেনদা আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকালেন ঃ দেখেছ সন্তু, সারা কাশীতে একটা সাধু নজরে পড়ল না!

আমি বললুম ঃ গেরুয়া পরলেই সাধু হয় না। প্রকৃত যে সাধু, সে এই মাঠে ঘাটে জনারণ্যে নিজেকে প্রকাশ করে দিয়ে বসে থাকে নাকি? তবে তো মানুষের জ্বালাতনে দুদিনে তাঁর সাধুত্ব ঘুচবে। মানুষের কাছে নিজেকে জাহির করবার জন্যে যে গেরুয়া পরে ঘুরে বেড়ায়, তাকে বিশ্বাস করবেন না। সে ঠিক জোচ্চোর। মানুষের দুর্বলতার সুযোগে সে তাকে প্রতারণা করে। সাধুকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাগ্যে থাকলে সাধু নিজেই খুঁজে বের করেন ভক্তজনকে।

বীরেনদা বললেন : কি জানি, আমার সাধুতে দরকার নেই। ঘাটটা ঘুরতে বেরিয়েছি, ঘুরে দেখে যাই।

মিনু বলল : চলুন, নৌকোয় করে আর একবার বেড়িয়ে আসি।

ট্যাঁকে হাত পড়বার কোন প্রশ্ন দেখা দিলেই বীরেনদা কেমন সংকুচিত হয়ে যান। বললেন : না থাক। সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছি, আর নয়।

সূর্য তখন ডুবে গেছে। একটা স্নিগ্ধ মধুর সন্ধ্যা ঘিরে ধরেছে কাশীকে। হৃদয়ে যার অনুভব প্রবল, অতীন্দ্রিয়ের স্বাদ মাঝে মাঝে যে পায়, তার পক্ষে এ ঘাটের আকর্ষণ সারা জীবন ভরে তাকিয়ে থাকলেও যাবার নয়। সুতরাং আমরা ফিরলুম।

ঘাটের সংলগ্নই বাজার। নানা মনোহারী জিনিস বিক্রি হচ্ছে সেখানে। ভ্রমন-বিলাসীরা স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ প্রত্যেক জায়গার বিশেষ বিশেষ জিনিসগুলো দু' একটা কেনে।

বাজার দেখে মিনু বলল : চলুন, দেখে আসি।

কাশীর নিদর্শন বীরেনদারও কিছু নেবার ইচ্ছা। তাই বীরেনদা মানা করলেন না। সকলে বাজারে এলুম।

পাথরের কাজ ভারি সুন্দর। সারি সারি পাথরের জিনিস সাজিয়ে রেখেছে দোকানীরা। অধিকাংশ তীর্থযাত্রীর (বরং ভ্রমণবিলাসীর বলা উচিত) ভীড় এখানেই। দাম করতে গিয়ে দেখলুম, বাজার আগুন।

মিনু বলল : বাবা, এত দাম। থাক, কিছু কিনে দরকার নেই। দুই বৌদির জন্য ছোট দুটো পাথরের সিঁদুরের কৌটো কিনে নিয়ে যাই। সামান্য দামে মিনু সেই কৌটো দুটো কিনল। বীরেনদা ছোট একটি পাথরের বাটি কিনলেন। আমি কিনলুম রাঙামাসীর জন্য একটা পাথরের থালা। আমি জানি, রাঙামাসী খুব খুশি হবেন।

কেনাকাটা সেরে সোজা ঘরে ফিরে এলুম। এসে দেখলুম, রাঙামাসী ওপাশের বিধবা মহিলাদের সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে বসেছেন। এটা এই কারণে নয় যে, আড্ডা দেওয়া ওঁর স্বভাব। তীর্থে এসে পুণ্যবতীদের সান্নিধ্য লাভ করবার কামনা থেকেই রাঙামাসী ওঁদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ট ভাবে মিশছেন। রাঙামাসীর ধারণা, যারা কাশীতে বাস করে তারা সবাই পুণ্যাত্মা। হাত-মুখ ধুয়ে এসে আমি বিছানায় গড়িয়ে পড়লুম। মিনু আর বীরেনদাও বিছানায় গা এলিয়ে দিল। আমাদের সাড়া পেয়ে রাঙামাসী এসে ঘরে ঢুকলেন।

মিনু বলল : রাঙামাসী ঘাটে সুন্দর কীর্তন হচ্ছে, তুমি গেলে না ?

রাঙামাসী বললেন : কি করব, নিয়ে গেলি না তোরা।

হঠাৎ বীরেনদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে কাজের কথা পাড়লেন। বললেন : কালই হরিদ্বার রওনা হব মাসী !

মাসী বললেন : সেকি ! তিন রাত যে কাশীবাস করতে হয় !

বীরেনদা বললেন : তিন দিন যে বাস করেছি এতেই হবে। আমার ছুটি মাত্র দশ দিনের। বড় জোর আর চারদিন ছুটি নিতে পারি। ঘুরতে হবে অনেকদূর। হরিদ্বার মথুরা বৃন্দাবন। সন্তুরা আবার দিল্লী আগ্রা না দেখেও যাবে না বলছে। সুতরাং দুদিন করে প্রত্যেক জায়গায় থাকতে গেলেও সময় কোথায় ?

মাসী নিতান্ত মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু আর কোন প্রতিবাদ করলেন না। বীরেনদার কল্যাণে, জীবনের সায়াহ্নে এই তিনি প্রথম তীর্থ দর্শনে বেরুলেন। ছেলেরা তো কেউ তাঁকে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্যে আজ পর্যন্ত নিয়ে বেরোয় নি।

মিনু একটু প্রতিবাদ করল : সেকি বীরেনদা! কালই যাবেন কি! কাল যে সারনাথ যাব বলে ঠিক করেছি। কাশী এসে সারনাথ দেখব না, এটা হয় নাকি ?

বীরেনদা বললেন : তাহলে ওদিকের প্রোগ্রাম কাটতে হয়। ভেবে দেখ। দিল্লী আগ্রা তাহলে মোটেই দেখা হবে না। কারণ হরিদ্বার মথুরা বৃন্দাবনের নাম করে যখন বেরিয়েছি, দেখতেই হবে।

মিনু নিতান্ত ক্ষুণ্ন হল। আমিও। নির্বাণের পরমবাণী যিনি উচ্চারণ করেছেন সেই গৌতম বুদ্ধের প্রথম প্রচারক্ষেত্র মৃগশিখাবন অর্থাৎ সারনাথ দেখা হবে না একথা মনে ভাবতেও দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। পথের শক্তি যে অর্থ তা বীরেনদার পকেটে। বীরেনদার ক্রেডিটের উপর নির্ভর করে বেড়াতে না এলেই ভাল হত। কিন্তু এসেছি যখন, তখন বীরেনদাকে ছেড়ে তো আর চলা যাবে না। সুতরাং স্বল্প সময়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী লাভ যাতে হয়, তাই দেখতে হবে। কাশী কলকাতা থেকে খুব দূর নয়। কিন্তু হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, আগ্রা অনেক দূরে। ইচ্ছে করলেই ও সব জায়গাতে যাওয়া যায় না। সুতরাং সারনাথ দেখা না হলেও দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার দেখা চাই-ই।

আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে বীরেনদা বললেন : কৈ, তোমাদের মতটা বল ?

আমি বললুম : আপনি যা ভাল বোঝেন তাই হবে। চলুন কালই হরিদ্বার যাব। তবে দিল্লী আগ্রা আমাকে দেখতেই হবে।

—মিনু কি বল ? বীরেনদা মিনুর দিকে তাকালেন।

মিনুর মুখ তখনো গম্ভীর। বলল : যা ভাল হয় তাই করুন। চলুন হরিদ্বার। এত অল্প সময় হাতে নিয়ে বেড়াতে না বেরুলেই ভাল হত।

বীরেনদা বললেন : চাকরি করে খাই। উপরওয়ালাকে সন্তুষ্ট রাখতে হয়। ছুটি-ছাটা আর মেলে কই। এবার অনেক করে কয়েকটা দিনের ব্যবস্থা করেছি। সবটা ঘুরে দেখে যেতে চাই। সারনাথ ঘরের কাছে, যখন খুশি এসে দেখে যেতে পারবে। কিন্তু হরিদ্বার মথুরা বৃন্দাবন তো যখন তখন আসা যাবে না।

মিনু বলল : ঠিক আছে, চলুন।

সুতরাং পরদিনই হরিদ্বার রওনা হবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

ন'টার মধ্যে মিশন থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে যাওয়া নিয়ে পরামর্শ করতে বসলুম।

গাড়ি ছাড়বে স্টেশন থেকে পরদিন বেলা দশটায়। সাড়ে ন টার মধ্যে এখান থেকে স্টেশনে গিয়ে পৌঁছুতে হবে। মিশনে এগারটার আগে খাবার পাওয়া যাবে না। সুতরাং আমাদের হোটেলে খেতে হবে। কিন্তু রাঙামাসী খাবেন কোথায়? তিনি তো আর হোটেলে ভাত খেতে পারবেন না! প্রথম দিন তো হোটেলে উঠে তিনি ভাত খান নি। দই মিষ্টি খেয়ে ছিলেন।

তীর্থক্ষেত্রে এই অসুবিধার কথা চিন্তা করে রাঙামাসী পাঁচ সের চাল, কিছু ডাল, আর ঘি সঙ্গে করে এনেছিলেন। একটা থালা আর বাটিও ছিল। কিন্তু রান্নার সরঞ্জাম কোথায়? আমরা সে কথাই ভাবলুম। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল। সেই প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা আমাদের দেখতে এলেন: কি দিদি, কি করছেন?

—বসুন।

—না না, বসব না। দাঁড়িয়েই একটু কথা বলি। তীর্থযাত্রী দেখলেও আনন্দ হয়। আজ তো কাশী ঘুরলেন। কাল ব্যাসকাশী আর সারনাথ দেখুন।

রাঙামাসী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন: সেটা আর হল না দিদি।

—কেন?

—কালই যে রওনা হচ্ছি।

বিধবাটি আশ্চর্য হয়ে বললেন: ওমা, সে কি! কালই যাবেন কি? তিন রাত্তির যে কাশীবাস করতে হয়!

আবার একটা ফ্যাসাদ না ঘটে, সেইজন্য বীরেনদা তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপ করলেন: তিন রাত্রি কাশীবাস করতে হয়, এমন কোন বাধ্যবাধকতা আছে নাকি? সমস্তই ভক্তির ওপর, বিশ্বাসের ওপর। বিশ্বেশ্বর দর্শন নিয়ে কথা। কাশীতে দুদিন তাঁকে দেখলুম। আমার আবার সময় নেই। হরিদ্বার, বৃন্দাবন, মথুরা ঘুরতে হবে। ছুটি ফুরিয়ে যাচ্ছে। আর কবে বেরোন হবে, কি হবে না, কে জানে? সুতরাং সবটাই ঘুরে দেখা চাই।

বিধবা মহিলাটি বললেন: না, তেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এটা লোকাচার। বিশ্বাসই তো সব। ঘরে বসেও তো কাশীবাসের পুণ্যি হয়। সবই মনে। তা হলে কালই যেতে চাও?

—আজ্ঞে, মাসীমা।

—কাল গাড়ী তো দশটায়। মিশনে বলেছ? খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা তো করতে হবে?

বীরেনদা বললেন: সেটাই ভাবছি।

বিধবাটি বললেন: এগারটার আগে তো মিশনে কোন খাওয়া দাওয়া হয় না। ভোগ না হলে তো আর খেতে দিতে পারে না।

বীরেনদা জানালেন: আমাদের জন্য ভাবছিনে। আমরা না হয় হোটেলে খেয়ে নেব। কিন্তু মাসীর কথা ভাবছি।

মাসী বললেন : চাল ডাল সবই ছিল। শুধু রান্নার কোন...

বিধবাটি বললেন ; সে জন্য ভাবনা কি। আমরা তো উনুন ধরাবই। না হয় একটু আগে ধরাব।

বীরেনদা বললেন : আপনাদের কষ্ট হবে।

উনি বললেন : এইটুকু কষ্ট যদি না করতে পারি, তবে···

ব্যবস্থা হয়ে গেল রাঙামাসীর। ওদের ওখানেই খাওয়া দাওয়া করবেন। আমরা ন'টার মধ্যে হোটেলে খাওয়া দাওয়া সেরে নেব।

পরদিন খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে নিলুম। তারপর আমি আর বীরেনদা মিশনে গেলুম টাকা পয়সা মিটিয়ে দেবার জন্যে। আটটায় মিশনের অফিস খোলে। রাঙা-মাসীকে বললুম : মাসী, এক কাজ কর। সমস্ত চাল ডাল ওঁদের দিয়ে দাও। ঘি তেল সব। এবার যেখানে যাচ্ছ, সেখানে হোটেলে খেতে তোমারও বাধা থাকবে না। কারণ হরিদ্বার থেকে বৃন্দাবন মথুরা, কোথাও মাছমাংসের কারবার নেই। কিছুই ভেব না। তীর্থস্থানে এইসব পুণ্যার্থীদের যা সামান্য দিয়ে যেতে পারবে, তাতেই তোমার পুণ্যি বাড়বে।

মিনু বলল : অযাচিত দান করতে গেলে ওরা যদি মনে ব্যথা পান ?

রাঙামাসী বললেন : না, না। আমি ওদের সব কথা জেনেছি। পরে বলব। প্রকৃতপক্ষে দশজনের দানের উপরই ওঁরা কাশীতে আছেন। রামকৃষ্ণ মিশন যা দেয় তার উপরই ওদের নির্ভর। ওদের নিজস্ব বলতে কিছুই নেই।

বীরেনদা বোধহয় সবটা চাল ডাল হাত ছাড়া করবার পক্ষপাতী ছিলেন না, গম্ভীর হয়ে রইলেন। রাঙামাসী সম্মতির জন্য তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম : কোন ইতস্তত কোর না মাসী। আর্তকে দান করবার মত বড় দান আর নেই। তোমার ভাল হবে।

সুতরাং সবটা চাল ডাল আর ঘি দিয়ে দেওয়া সাব্যস্ত হল। আমি আর বীরেনদা বেরিয়ে গেলুম।

রাস্তায় আমার মাথায় আর একটা বুদ্ধি খেলল। মনে করলুম, মিশনের স্বামীজীর কাছ থেকে যদি একটা চিঠি নেওয়া যায়, তবে সেই চিঠির পরিচয়ে হরিদ্বার রামকৃষ্ণ মিশনেও হয় তো আশ্রয় জুটতে পারে। মিশনে আশ্রয় পেতে হলে একটা পরিচয় পত্রের দরকার। কাশীতে যেমন হঠাৎ স্থান পেয়ে গেছি, এমন সর্বত্র নাও হতে পারে। বীরেনদাকে আমার পরিকল্পনা'র কথাটা বললুম।

বীরেনদা বললেন : স্বামীজী কি পত্র দিতে রাজী হবেন ?

আমি বললুম : চেষ্টা করে দেখি না, হতেও তো পারে।

বিরাট মিশন, আগেই বলেছি। তার বিস্তৃত অংশ জুড়ে হাসপাতাল। সেখানে সার্জিক্যাল ওয়ার্ড থেকে সব কিছুই আছে। স্বামীজীদের মধ্যেই অনেক ডাক্তার নার্স আছেন। কিছু আসেন বাইরে থেকে। বুদ্ধ মহারাজকে অপারেশন ওয়ার্ডের কাছে

ধরা গেল। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে কেবল তিনি বারান্দা থেকে নামছিলেন। আমি গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম।

স্বামীজী বললেন : কি চাই?

আমি বললুম : আমরা আজ চলে যাচ্ছি।

—আজই যাচ্ছ?

—আজ্ঞে।

—ঠিক আছে। তুমি সে নিয়ে অফিসে কথাবার্তা বল।

আমি বললুম : আমাদের একটা আর্জি ছিল।

হাসিমুখে স্বামীজী বললেন : কি?

—হরিদ্বারের মিশন অফিসে যদি দয়া করে একটা পত্র লিখে দেন।

স্বামীজী বললেন : এখন কি আর পত্র দিলে জায়গা পাওয়া যাবে? এ সময় বড় ভীড় হয় যে।

আমি বললুম : তবু যদি দয়া করে…

—ঠিক আছে। তোমরা অফিসে যাও, আমি আসছি।

আমরা যেন নিশ্চিন্ত হলুম। স্বামীজীর চিঠি পেলে হরিদ্বারেও থাকার ভাবনাটা আর ভাবতে হবে না। স্বামীজী যে এক কথায় রাজী হয়ে যাবেন, ভাবতে পারি নি।

অত্যন্ত খোলা মন বুদ্ধ মহারাজের। লোকের মুখে শুনে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজীদের সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, তা আর কিছুমাত্র থাকল না।

অফিসে এসে হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে দিলুম। টাকা জমা দিতে দিতে বুদ্ধ মহারাজ এসে গেলেন আমাদের চিঠি লিখে দিলেন তিনি। বললেন : জায়গা থাকলে ঠিক পাবে। আজই হরিদ্বারের মিশন থেকে দুজন ভদ্রমহিলা এসেছেন। জায়গা ছিল না, অনেক কষ্টে ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আশা করি, আমাদের কথাও ওঁরা ফেলবেন না।

চিঠি হাতে নিয়ে স্বামীজীকে প্রণাম করলুম। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে আর ছোট করলুম না। তাড়াতাড়ি ফিরে এলুম। মিনুকে নিয়ে হোটেলে যেতে হবে। কিন্তু শুনলুম, বিধবা মহিলা দুটির ওখানে মিনুরও ব্যবস্থা হয়েছে। আমার যেন কেমন লাগল। যাদের কেউ নেই, তাদের উপর এটা অত্যাচার। যতটুকু দিলুম, তার সবটুকুই তো ওঁরা ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু ব্যবস্থা যখন হয়ে গেছে, তখন আর কিছু করবার নেই। সুতরাং আমি আর বীরেনদা তাড়াতাড়ি হোটেলের খোঁজে চললুম। ঘড়িতে তখন সাড়ে আটটা বাজে। ন'টার মধ্যে যেমন করেই হোক বেরিয়ে পড়তে হবে।

কোন রকমে গোগ্রাসে কিছু গিলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লুম। বাঁধাছাদা আগেই হয়ে গিয়েছিল। বীরেনদাকে বললুম : আপনি রাঙামাসী আর মিনুকে নিয়ে আসুন। আমি স্টেশনে গিয়ে টিকিট কেটে রাখছি। হয় তো লাইনে দাঁড়াতে হবে।

বীরেনদা ফিরলেন। আমি রিক্‌শায় চাপলুম স্টেশনের উদ্দেশ্যে। যে স্টেশন থেকে মিশনে আসতে ভাড়া দিতে হয়েছিল রিক্‌শা প্রতি তিন টাকা, সেই মিশন থেকে স্টেশনে যেতে এবার চার্জ হল আট আনা মাত্র। ভেবে সত্যি তাজ্জব লাগল।

প্রচুর ভীড় না হলেও, লাইনে লোক ছিল। টিকিট কাটতে কাটতে বেজে গেল পৌনে দশটা। স্টেশনের সামনে বীরেনদাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে, অথচ তখনো ও'রা এসে পে'ছিান নি। মাত্র পনের মিনিট বাকি। ট্রেন তো এসে পড়ল বলে। উৎকণ্ঠ অপেক্ষায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলুম। ওরা যখন এসে পে'ছিল, তখন পাঁচ মিনিট মাত্র বাকি। ছুটে স্টেশনে ঢুকে দেখি, গাড়ী ইন্ করে গেছে। দুই জনে দুই বেডিং হাতে নিয়ে ছোটাছুটি করতে লাগলুম। কিন্তু অধিকাংশ গাড়ীই রিজার্ভ করা। বাকী যে কয়খানা কামরা আছে, তার পাদানিতে পা রাখবার'ও জায়গা নেই। তা হলে উপায়? ফিরে যেতে হবে নাকি? মিশনের ঘর ছেড়ে দিয়ে এসেছি। ফিরে গিয়ে সে ঘর পাওয়া যাবে না। ধরমশালার অবস্থা যা কাশীতে, তাতে বারান্দাতেও লোকে স্থান পাচ্ছে না। কাশীতে আর একদিন থাকতে হলে হোটেলে থাকতে হবে। সে কথা ভাবতেও যেন চোখে জল এসে গেল। বীরেনদার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। হঠাৎ আমার কেন যেন বীরেনদার উপরই রাগ হয়ে গেল। বললুম: সময় থাকতে কিছুই খেয়াল করবেন না। এখন বুঝুন ফল। কাশীতে থেকেই হরিদ্বারের জন্য স্লিপিং বার্থ রিজার্ভ করা উচিত ছিল। আর তা ছাড়া এত তাড়াহুড়ো করে বেড়ানো চলে নাকি?

বীরেনদা আমার কথার কোন প্রত্যুত্তর করলেন না। শুধু অসহায়ের মত আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কোন পথ না পেয়ে আমি থ্রি টায়ার স্লিপিং বার্থের কাছে এসে দাঁড়ালুম। T T C হাঁকলেন: রিজার্ভ গাড়ী। এখানে নয়।

আমি অনুনয় করে বললুম: দেখুন, যদি একটু দাঁড়াতে দিতে পারেন।

তিনি বললেন: এখানে হবে না।

—দেখুন, যদি সিট খালি থাকে। আপনার চার্জ যা লাগে দেব।

—না, হবে না।

পাগলের মত অন্য কম্পার্টমেন্টে গেলুম। সেখানেও একই কথা, হবে না। সাধারণ কম্পার্টমেন্টে একটি মক্ষিকাও গলতে পারে কিনা সন্দেহ। সুতরাং শেষ চেষ্টা হিসাবে আবার স্লিপিং বার্থের T T. C.-কে ধরলুম: দেখুন, যদি দয়া করে একটু জায়গা দিতে পারেন। আপনার যা চার্জ, দেব। মেয়েছেলে নিয়ে নইলে বিপদে পড়ব।

হঠাৎ কি ভেবে T. T C. বললেন: আচ্ছা উঠুন।

'জয় মা তারা'। মিনু রাঙামাসী আর বীরেনদাকে নিয়ে স্লিপিং বার্থে উঠলুম। সেখানেও দেখি, লোকে লোকারণ্য। বিছানা ফেলে তার উপর মিনু আর রাঙামাসীকে

বসতে দিয়ে আমরা দু'জন দাঁড়ালুম। যা হোক, উঠতে তো পারা গেছে, না হয় দাঁড়িয়েই যাব হরিম্বার পর্যন্ত।

গাড়ী ছেড়ে দিলে T. T C এলেন আমাদের কাছে। একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে আমাকে বললেন ঃ কত দেবেন ?

আমি বললুম ঃ আপনি যা চাইবেন, তাই দেব।

—পার হেড পাঁচ টাকা করে লাগবে।

শুনে একটু ঘাব্‌ড়ে গেলুম। তার মানে extra কুড়ি টাকা। বললুম ঃ বসতে পাব তো ?

উনি বললেন ঃ বসতে কি, শুতে পারবেন। সিট রিজার্ভ করে দেব। দু-এক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। কোথায় সিট ভ্যাকাণ্ট আছে দেখতে হবে।

আমি বললুম ঃ ঠিক আছে, পাঁচ টাকা করেই নেবেন।

সঙ্গে সঙ্গে মিনু আর রাঙামাসীকে নিয়ে T. T. C ওধারে গেলেন। পেছনে আমাকে আর বীরেনদাকে ডাকলেন। পাশাপাশি দুটো বেঞ্চে জায়গা পেলুম। জানালার ধারের বেঞ্চে যে দু'জন প্যাসেঞ্জার আছেন, তাঁরা তিনটি স্টেশন পরেই নেমে যাবেন। আমি তাদের মাঝখানে বসলুম। বীরেনদা আপাতত একজনের সিটে একটু অংশ নিলেন।

হঠাৎ শুনলুম কে ডাকছে ঃ আরে মিনু, তুই !

ফিরে তাকিয়ে দেখি, হৃষ্টপুষ্ট গড়নের একটি মেয়ে। পরনে ছাপা শাড়ী। কাজল দিয়ে আঁকা ডাগর দুটি চোখ।

চার

তিনটি স্টেশন পরেই আমার বেঞ্চ খালি হয়ে গেল। তিনটি সিট।

মিনু আর সেই মেয়েটি এসে বসল। মিনুর সিটে বসলেন বীরেনদা, আর মেয়েটির সিটে রাঙামাসী।

মেয়েটির নাম অঞ্জনা। মিনুর সঙ্গে লেডি ব্রেবোর্ণে পড়ত। বাবা সহরতলী কলেজের একজন অধ্যাপক। হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট। অঞ্জনাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। একমাত্র ছেলে কলকাতায় মার্চেণ্ট অফিসে ভাল চাকুরী করে। সে কলকাতাতেই আছে।

অঞ্জনার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল মিনু ঃ আমার বন্ধু, অঞ্জনা।

—নমস্কার।

—আর উনি, সন্তুদা।

—ও, আপনিই! নমস্কার।

বেশ হাসিখুসি, স্বাস্থ্যবতী মেয়েটি। আমি বললুম: আপনি? আপনি কি আমাকে চেনেন?

অঞ্জনা বলল: আপনাকে দেখি নি, কিন্তু চিনি অনেকদিন ধরে। আপনার নাড়ি নক্ষত্র সব বলে দিতে পারি।

বললুম: আমার কিন্তু আশ্চর্য লাগছে।

অঞ্জনা হেসে বলল: আপনার এ্যাডমায়ারের অভাব আছে নাকি? তাদের কারো কাছ থেকেই শুনেছি। সন্তুদা বলতে সে অজ্ঞান।

আমি মিনুর দিকে তাকালুম। সে হেসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।

আমি অঞ্জনাকে বললুম: গুণহীন এই অজ্ঞানেরও এ্যাডমায়ারার আছে, সেটা এই প্রথম আপনার কাছ থেকে শুনলুম।

অঞ্জনা বলল: গুণহীন কিনা সে বিচারের মালিক তো আপনি নন। সোনা কি হবে জহুরৎ বিচার করে জহুরী। ওরা নিজেরা নয়। আপনি কি, কতটুকু, সে বিচারের ভার আপনার নয়।

দেখলুম, অঞ্জনা যথেষ্টই বাক্‌পটু।

অঞ্জনা ইতিমধ্যেই আমাদের সকলের পরিচয় করিয়ে দিল ওর বাবা মার সঙ্গে।

বাবাকে ডেকে বলল: বাবা, এই দেখ মিনু।

বাবা চিনতে পারলেন না। কারণ মিনুকে তিনি কোনদিন দেখেন নি।

অঞ্জনা বলল: ব্রেবোর্ণে পড়তুম। আমার বন্ধু। আমাকে দেখিয়ে ও বলল: সনৎ মুখোপাধ্যায়, ইতিহাসের অধ্যাপক।

নমস্কার করলুম। অঞ্জনার বাবা প্রতি নমস্কার করলেন। রাঙামাসী আর বীরেনদার সঙ্গেও অঞ্জনা ওর মা বাবার পরিচয় করিয়ে দিল।

অঞ্জনা মিনুকে বলল: তুই কোত্থেকে রে?

—কাশী থেকে।

—কাশী থেকে?

—হ্যাঁ, হঠাৎ কাটিহার থেকে চলে এলুম। রাঙামাসী তীর্থে এলেন কিনা।

—তুই?

—সোজা কলকাতা থেকে চলেছি হরিদ্বার। ওঃ, কি যে ভাল লাগছে! বড় একা একা লাগছিল। জার্নিটা খুব প্লেজেন্ট্ হবে এবার। মুখ বন্ধ করে যেতে হবে না। তারপর, তোরা কি হরিদ্বার পর্যন্তই, না আর কোথাও?

মিনু বলল: না, দিল্লী আগ্রা মথুরা বৃন্দাবনও ঘোরবার ইচ্ছে আছে।

অঞ্জনা বলল: How strange! আমাদের প্রোগ্রামও যে দিল্লী আগ্রা মথুরা বৃন্দাবন। ভাগ্য ভাল, ভগবান জুটিয়ে দিয়েছেন। কতদিন থাকবি?

মিনু বলল : থাকা যাবে না বেশী দিন। নম নম করে সাড়তে হবে। বীরেনদার হাতে মোটে সময় নেই।

অঞ্জনা বলল : আমাদেরও সময় নেই। বাবার ফিলজফির বইটা বেরুচ্ছে তো। প্রুফ নিয়ে ব্যস্ত। আমি পেড়াপীড়ি করে বের করলুম। আমাদের এটা শর্ট টুর। যাক, ভালই হল, পথে দেখা। এমনও তো হতে পারতো যে আরেক দিন পরে তোরা উঠতিস্, বা আমরা আগে উঠতুম! আমার দিকে তাকাল অঞ্জনা : আপনি কি বলেন ?

আমি বললুম : অবিশ্বাসীর ভাষায় বলতে গেলে এটা এ্যাকসিডেন্ট। আর বিশ্বাসীর ভাষায় বলতে গেলে এটা যোগাযোগ।

অঞ্জনা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল : আপনি দেখছি সাংঘাতিক লোক মশাই। কথাবার্তাতে ধরা ছোঁয়া দিতে চান না। হিসেব করে আপনার সঙ্গে কথা বলতে হবে।

অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে দেখলুম, তার চোখের কোণে উচ্ছল হাসির স্রোতে ভাঁজ পড়ে গেছে। উদ্দাম যৌবন যেন সে হাসিতে ঠেলে বেরুতে চাইছে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ভরাট মুখখানা।

অঞ্জনা বলল : আপনি নিজে এ মিটিংটাকে কি বলেন স্পষ্ট করে সেটাই বলুন।

আমি বললুম : শুনে তো আবার বিদ্রূপ করবেন না ?

—কেন ?

—একালের মানুষের মুখে যদি সেকালের কথা বেরয় ?

অধৈর্য অঞ্জনা বলল : ও মশাই, হেঁয়ালী ছেড়ে বলুনই না।

আমি বললুম : যোগাযোগ।

অঞ্জনা বলল : আমিও বলি তাই।

মুহূর্তের মধ্যে অঞ্জনা আর মিনুর মধ্যে একটা তুলনা করে দেখলুম আমি। অঞ্জনা একটা ঝর্ণা। উদ্দাম হাসির কলস্রোতে কলকল খলখল শব্দে ছুটে চলেছে। মিনু গভীর নদী। স্রোত আছে। কিন্তু জলে না নামলে সে স্রোত বোঝা যায় না।

মিনু আর অঞ্জনা ওদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ করল। আলোচ্য বিষয়, নিজেদের বন্ধু বান্ধবী। কার বিয়ে হল, কে এম এ পড়ছে, ইত্যাদি। অঞ্জনার বাবা সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম শুনেছি। বিখ্যাত দর্শনের অধ্যাপক তিনি। অধ্যাপকের চাইতে Text Book রচয়িতা হিসাবে বেশী পরিচিত। ছাত্রেরা ওঁর বই পড়ে। বেশ গম্ভীর গোছের লোক সুনীলবাবু। আমি জানি, এইসব গাম্ভীর্যের আড়ালে স্নেহের ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়। তা না হলে অঞ্জনার মত এমন উচ্ছল মেয়ে সম্ভব হোত না।

সুনীলবাবু আমায় জিজ্ঞেস করলেন : কোন কলেজে অধ্যাপনা করেন ?

বললুম : বি. এন কলেজে।

—সে আবার কোথায় ?

—ঠিক কলকাতার উপরে নয়। বেহালার কাছে।

—কি সাবজেক্ট ?

—হিস্ট্রি।

—মর্ডান ?

—আজ্ঞে।

—টিচারদের পে স্কেল সম্বন্ধে আপনার মত কি ?

—ইউ জি. সি-র কথা বলছেন তো ?

—হ্যাঁ। আপনারা কি তিনশ ছশতেই রাজী ?

আমি বললুম: আপাতত রাজী। বুঝলেন না, শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতি ঢুকুক এটা আমি চাই না। মাইনে বাড়ানোর আন্দোলনটাকে প্রকৃতপক্ষে একদল লোক পলিটিক্যালি Exploit করতে চাইছে। আমার এতে সায় নেই।

যেন একটা মনের মত কথা পেয়ে গেলেন সুনীলবাবু: দি আইডিয়া। আমারও এই মত। তবে আমরা হলুম সেকেলে লোক, বুঝলেন না। আমাদের আর কে বোঝে।

আমি বললুম: আপনাদের কাছে শিক্ষাদানটা ছিল মিশন, প্রফেসন নয়। আজ আর সে নোবল আইডিয়া নেই।

সুনীলবাবু যেন হঠাৎ উল্লসিত হয়ে উঠলেন: Exactly। আপনার সঙ্গে আমার ধারণা মিলে যাচ্ছে। অথচ বর্তমান ইয়ং মেনদের সঙ্গে আমার মোটেই খাপ খায় না। সত্যি, আপনার—

সুনীলবাবুকে কথা শেষ না করতে দিয়ে বললুম: একটা কথা বলব ?

—বলুন।

—দয়া করে আমাকে 'আপনি' বলবেন না। আমি আপনার ছেলের মত।

একটা অমায়িক হাসি হেসে উনি বললেন: তা ঠিক। তবে কিনা কেমন যেন…। ঠিক আছে, তুমি বলেই বলব। আচ্ছা, তুমি বই টই লিখেছ কিছু ? রিসার্চ টিসার্চ করছ ?

আমি বললুম: রিসার্চ করছি না। তবে ইতিহাস নিয়ে মাঝে মাঝে এদিক ওদিক কিছু কিছু লিখি।

সুনীলবাবু বললেন: রিসার্চ করবার আমার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু লেখার চাপে এমন ব্যস্ত যে আর কিছু হয়ে উঠল না।

আমি বললুম: হ্যাঁ, আপনার নাম তো খুব শুনেছি আমরা। আপনার দুএকটা উপন্যাসও আছে।

যেন একটু লজ্জা পেলেন সুনীলবাবু: হ্যাঁ, সেই মানে প্রথম যৌবনের লেখা। তখন একটু আধটু গল্প কবিতা লিখতুম।

আমি বললুম: শুনেছি, আপনার লেখায় ধার ছিল। সাহিত্যের ইতিহাসে আপনার কথা দেখতে পাই।

সুনীলবাবু যেন বিনয়ে ভেঙে পড়লেন।

হঠাৎ অঞ্জনা ফিরে তাকাল বাবার দিকে : বাবা, বইটা শেষ কর। এরপর আমি পড়ব বলি নি?

আমি একবার অঞ্জনা, একবার ওর বাবার দিকে তাকালুম।

সুনীলবাবু বললেন : আমার এক ছাত্র। উপন্যাস লিখে পড়তে দিয়েছে। বাড়ীতে তো পডবার সময় পাই না। বেড়াবার ফাঁকে যদি শেষ করা যায়।

দেখলুম, কোলের উপর বইখানা হাতে ধরা। তিনি আবার বইখানা মেলে ধরলেন।

অঞ্জনা আমাকে চোখ টিপে বাবার সঙ্গে কথা বলতে মানা করল। আমি ফিরে তাকালুম অঞ্জনাব দিকে। অঞ্জনা আস্তে আস্তে বলল : আর যাই করুন, লেখা নিয়ে, বিশেষ করে সাহিত্য নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনায় বসবেন না। তাহলে আর পার পাবেন না। শেষে আপনাকেও এমন করে পেয়ে বসবেন যে, দলবল ছাড়া করে নিজেব কাছে বসিয়ে রাখবেন।

আমি বললুম : ক্ষতি কি? আমাকেও তো সময় কাটাতে হবে।

অঞ্জনা বলল : বারে! শুধু বাবার সঙ্গে কথা বলবেন? আমরা ভেসে যাব নাকি? তা হবে না। এই দিকে ফিরে তাকান।

বড় সহজ মেয়েটা। হৃদয়ের মধ্যে কোন জটিলতা নেই। আমি ফিরে তাকালুম। মিনুকে বললুম : কথাবার্তার তোড়ে বেশ তো ভেসেই যাচ্ছিলে, তা হঠাৎ আমার ঘাড়ে দোষটা চাপাচ্ছ কেন?

মিনু বলল : অভিযোগ আমার নয়, অঞ্জনার। বোঝ ওর সঙ্গে।

অঞ্জনা বলল : মিনুর মুখে আপনার কথা এত শুনেছি যে অনেক দিনই মনে হয়েছে দেখে আসি। হঠাৎ যদিবা ভাগ্যক্রমে দেখা হল, বাবার সঙ্গে আলাপ করে কাটাবেন নাকি? বাবা একবার সাহিত্য আর লেখাপড়ার আলোচনায় বসলে সব ভুলে যান। জমে উঠলে আপনাকে ছাড়তে চাইবেন না। হাতের কাছে পেয়ে কথাটা পর্যন্ত বলা হবে না, এটা সহ্য করতে রাজী নই।

আমি মিনুর দিকে তাকিয়ে তাকে একবার দেখে নিলুম। মিনুও একটু আরক্ত হল। বললুম : এমন গোপন ভক্ত আমার আছে, আমি আগে জানতে পারি নি। আমার গুণগান করবার মত লোক আছে, আগে জানতুম না। আপনার মুখে প্রথম শুনলুম।

অঞ্জনা বলল : কিছু আগে বাবাকে কি বলেছেন মনে আছে?

আমি কিছু বুঝতে না পেরে অঞ্জনার মুখের দিকে তাকালুম।

অঞ্জনা বলল : দয়া করে 'আপনি' সম্বোধনটা আর করবেন না আমাকে। 'তুমি' বলেই বলবেন। আমি সন্তুদা বলে ডাকব।

আমি হেসে বললুম : বেশ, তাই হবে।

অঞ্জনা বলল : মিনুর মুখে প্রশংসা শুনেছি খুব কম লোকের। অমন শক্ত মেয়ে আমাদের সহপাঠিনীদের মধ্যে কেউ নেই। সত্যিসত্যিই ওকে যে টলাতে পেরেছে, তাকে দেখবার একটা কৌতূহল ছিল।

মিনু লজ্জা পেয়ে বাইরে তাকাল।

আমি বললুম : কিন্তু খুব ডিস্যাপয়েণ্টেড হলে নিশ্চয়ই ?

—কেন ?

—লোকটাকে দেখে।

—কেন ?

—আমার আকৃতির মধ্যে কোন ম্যাগনেটিক কিছু নেই বলে।

অঞ্জনা বলল : ম্যাগনেট আপন চুম্বকত্বের খবর রাখে নাকি ? আপনি দেখছি বেশ মশাই ?

আমি বললুম : দেখ, পড়াই ইতিহাস। নিতান্ত নিরস subject. তোমাদের মত সুন্দর করে কথা বলতে জানিনে।

অঞ্জনা বলল : আছি ক'দিন সঙ্গে সঙ্গে। আপনাদের মত আমাদেরও একই প্রোগ্রাম। দেখব, কথা বলতে কে জানে, আর কে জানে না। আমরা তো বক্‌বক্তা, আপনি বক্তা।

—কি করে জানলে ? এখন পর্যন্ত তো কথাই বলি নি।

—বক্তা যারা, তারা কথা বলে কম। মেপে মেপে বলে। বাজে বক্তারা বক্‌বক্‌ করে মরে। 'ইতিহাসের অশ্রু' বলে পত্রিকাতে সেবার আপনিই আর্টিকল লিখেছিলেন না ? মোগল সাম্রাজ্যের পতনের মুখে কতকগুলি করুণ কাহিনী ?

আমি বললুম : তোমার স্মৃতিশক্তিকে খুব প্রখর বলতে হবে।

অঞ্জনা বলল : স্মৃতিশক্তি প্রখর কি না জানিনে। ওসব মিনুকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। তবে লেখাটা এত ভাল লেগেছিল যে তুলে রেখেছি। কোনদিন দেখা হলে এ নিয়ে আলোচনা করব বলে ইচ্ছে ছিল।

হঠাৎ অঞ্জনা বাবাকে ডাকল : বাবা, তোমার সেই আর্টিকলটার কথা মনে আছে ? 'ইতিহাসের অশ্রু' ? তুমি খুব প্রশংসা করেছিলে। ইনিই সেই লেখক।

বই থেকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন সুনীলবাবু : I see, তুমিই সেই লেখক ? অপূর্ব হয়েছিল, অপূর্ব ! ইতিহাস একটা মৃত কাহিনী নয়, তার মধ্য দিয়ে একটা জীবনের স্পন্দন প্রবাহিত, এটাই তুমি প্রমাণ করেছ। করুণ কাহিনীতে যে ইতিহাসের সুর, তা বড় মর্ম্মন্তুদ, অথচ সুন্দর। এভাবে যদি ইতিহাস লেখা যায়, তবে ইতিহাস মানুষের হৃদয়ের কাছে এসে দাঁড়াবে। আমার বিশ্বাস ছিল, ইতিহাস গল্প-উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য, তুমি তা প্রমাণ করেছ।

আমি বললুম : ভাল লেগেছে শুনে খুব আনন্দ বোধ হল। লেখার অভ্যাস নেই। মনটাও সে ভাবে তৈরী নয় কি না।

সুনীলবাবু বললেন : কি বলছ ? সুন্দর হয়েছে। পাকা হাতের লেখা। আমার

মনে হয়, তোমার মধ্যে একটা প্রবল অফুরন্ত রোমান্টিক কল্পনা লুকিয়ে আছে। সেই রোমাঞ্চের স্পর্শ ইতিহাসকেও জীবন্ত করে তুলেছে। তুমি লেখ না কেন ?

অঞ্জনা হেসে তাকাল আমার দিকে : এবার আপনার চুম্বকত্ব কোথায় সেটা বুঝতে পারলেন ?

আমি কি বলব ভেবে পেলুম না। একবার মিনুর দিকে তাকালুম। মিনুর সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল।

একা অঞ্জনাই যেন এক'শ। একটা প্রাণের স্পন্দন তুলে দিল। প্রচণ্ড প্রাণের আবেগ যাদের মধ্যে নেই, তারা সে আবেগের অংশ গ্রহণ না করতে পেরে একঘরে হয়ে থাকল। বীরেনদা আর রাঙামাসী যেন আমাদের সঙ্গেই বেরোন নি, তাদের দেখে এরকম মনে হল। সব চেয়ে শোচনীয় মনে হল বীরেনদার অবস্থা। রাঙামাসী ততক্ষণে অঞ্জনার মায়ের সঙ্গে জমিয়ে ফেলেছেন। দু'জনে প্রায় সমান বয়সী। চিন্তা আর মনের অবস্থাও সমান। বীরেনদা করেন কি ? ঝানু অধ্যাপক সুনীলবাবুর সঙ্গে উনি আর কি আলোচনা করবেন ? বীরেনদা বোঝেন টাকা আনা পাইয়ের হিসাব। সুনীলবাবু বোধহয় এক টাকার রেজগি গুনে নিতে জানেন না। তাঁর জগৎ কাণ্ট, হেগেল, হিউমের জগৎ। তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, রোমা রোঁলা, টলস্টয়। ফলে ধ্যানী বুদ্ধের মত বীরেনদা উত্তর প্রদেশের শস্যহীন মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মিনুকে পর্যন্ত কোণঠাসা করে দিয়েছে অঞ্জনা। গাড়ী চলেছে প্রবল বেগে। বিরাট এই উত্তর প্রদেশ। তাকে ছাড়াতে দিনরাত ধরে এ গাড়ীকে চলতে হবে। আমি কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে দুই দিকের মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখে নিতে লাগলুম। সেই শূন্যতা। সেই শস্যহীন শুষ্কমাটির নিঝুম বৈরাগ্য। না আছে কোথাও এতটুকু সবুজের ছায়া, না আছে জলের রেখা। মাঝে মাঝে দল বেধে কৃষকেরা কুয়ো থেকে জল তুলে মাঠে ঢালবার চেষ্টা করছে। নিষ্ঠুর দৃশ্য, অথচ সুন্দর। ঐ রুক্ষ মাটির উদাসীনতার মধ্যেও কোথায় যেন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, যা মনকে অনেক দূরে টেনে নিয়ে যায়। এই অসীম দিগন্তব্যাপী ছড়ানো বৈরাগ্যই কি রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করেছিল, যার জন্যে তিনি লিখেছিলেন :

"ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন
পায়ের তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।"

আমি মিনুকে বললুম : মিনু, রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা মনে পড়ে ? 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন'।

আমার দিকে তাকাল মিনু। হঠাৎ এ কথাটা কেন উত্থাপন করলুম সেটাই বুঝি বুঝতে চাইল।

—কেন ?

—উত্তর প্রদেশের এই খরাক্লিষ্ট ধু ধু মাঠের মধ্যেও কোথায় যেন একটা আকর্ষণ রয়ে গেছে। যা মনকে টেনে নেয়।

উত্তর দিল অঞ্জনা : মিনু সাহিত্যের ছাত্রী বলে প্রশ্নটা ওকেই করলেন। ভাবছেন বুঝি, এ অনুভবটা আমাদের হোত না ?

আমি বললুম : কেন, তা কেন। তুমি মিনুর চেয়ে বেশীই অনুভব কর।

অঞ্জনা মিনুর দিকে তাকাল। বলল : মিনু, দেখলি তো কি কমপ্লিমেণ্ট ? তোর হিংসে হচ্ছে না তো ?

মিনু একটু হাসল।

অঞ্জনা বলল : কি করে বুঝলেন, আমি মিনুর চেয়ে বেশী অনুভব করি ?

—মুখ দেখে।

—মুখ দেখে বোঝা যায় ?

—নিশ্চয়ই। Face is the index of mind.

অঞ্জনা বলল : ওটা আপনার মুখস্থ বুলি। মুখের দর্শনে আপনি মনের ইতিহাস পাঠ করতে পারেন না। পারলে আমাকে মিনুর চাইতে সংবেদনশীল বলে মনে করতেন না। একটা কথা বলব ? কিছু মনে করবেন না তো ?

—নিশ্চয়ই নয়। বল।

—মিনু আপনাকে যতখানি জেনেছে, ততখানি আপনি মিনুকে জানতে পারেন নি।

একবার রাঙামাসী আর বীরেনদার দিকে তাকিয়ে দেখলুম। ওরা এ কথাগুলো শুনতে পাচ্ছেন না তো ? নিশ্চয়ই না। ওরা বেশ দূরেই আছেন। আমি উত্তর দিলুম অঞ্জনাকে : আমার দুর্বলতা আমি স্বীকার করছি। আমি অত্যন্ত ছোট, তাই মিনু আমাকে সহজে ধরে ফেলেছে। কিন্তু মিনু এত বড় যে ওকে ঠিক ধরে উঠতে পাচ্ছি না হয়তো আমি।

অঞ্জনা একবার আমার মুখের দিকে, আর একবার মিনুর দিকে তাকিয়ে দেখল। দেখলুম, মিনু লজ্জা পেয়েছে। একবার সে কটাক্ষে আমাকে চোখ রাঙাল।

অঞ্জনা বলল : দেখুন, আমি দর্শনের ছাত্রী। সাহিত্য জানি না। কাব্যটাব্য আসে না। আর আমি যে রোমাণ্টিক চেতনার অযোগ্য, সেটা তো আপনি আগেই টের পেয়েছেন। তবু যদি অপরাধ না নেন, একটু কাব্য করব ?

হেসে ফেললুম : কর।

মিনুর দিকে তাকাল সে : কি রে মিনু অনধিকার চর্চায় রাগ করবি না তো ?

মিনু বলল : তোর কথার ঢং দেখে আমি নিজেই সাহিত্য পড়ি কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ জাগছে।

অঞ্জনা বলল : যত খুশী ঠাট্টা কর্। এই মুহূর্তে আমার একটি খুব ছোট কবিতা মনে পড়ছে। সন্তুদার বৈষ্ণব বিনয় দেখে লাইন কটি মনে পড়ে গেল :

"তুমি যে তুমিই ওগো
সেই তব ঋণ,

আমি মোর প্রেম দিয়ে
শুধি চিরদিন।"

বলেই টুক্ করে উঠে গেল অঞ্জনা। দরজার কাছে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দিগন্তব্যাপী মাঠের দিকে তাকাল। আমি বুঝলুম, আমাকে আর মিনুকে মুখোমুখী দাঁড়াবার একটু সময় করে দিল অঞ্জনা। সত্যি, আশ্চর্য রহস্যময়ী এক মেয়ে। প্রচণ্ড এক তড়িৎপ্রবাহ যেন। মুহূর্তের মধ্যে যেন একটা জীবনের সাড়া তুলে দিয়েছে। আমি আমার নিজের মনটাকে চিনিনে। কল্পনা বিহারী নিশ্চয়ই আমি। সেখানে অনবরত সৃষ্টি কার্যের ক্ষান্ত নেই। কিন্তু জীবনের এই ফেনপুঞ্জ উন্দামতা কখনো ফোটে না আমার। মিনুব মধ্যে ভালবাসা আছে, কিন্তু এত জীবন নেই। মিনুকে বললুম ঃ ও কি বলল, শুনলে ?

লজ্জিত ভাবে মিনু আমার দিকে তাকিয়ে বলল ঃ শুনেছি।

—অথচ তুমি আমার মনের সে অবস্থাটা টের পেলে না।

মিনু বলল ঃ তুমি অন্তর্যামী নাকি ? তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছ ? জান না তুমি, সাগরের ঢেউটা উপরের ?

বিরাট একটা কথা বলল মিনু। বুঝি ঐ কথার মধ্যেই মিনুর পরিচয়। আমিই হয়তো ওর সত্য রূপটাকে ধরতে পারি নি। মেয়েদের চোখে মেয়েদের মন যতটা ধরা পড়ে, পুরুষদের চোখে হয় তো ততটা পড়ে না। অঞ্জনা ঠিক ধরতে পেরেছে।

মিনু বলল ঃ বাংলা দেশে এখন দেখছি উল্টো চলন! এতক্ষণ কাব্য করছিলে তুমি, এবার অঞ্জনা। সামলাও এবার ওর কাব্য। আমি তো চিনির বলদ। মিনুও উঠে অঞ্জনার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দু'জনে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উত্তর প্রদেশের দিগন্তে তাকিয়ে রইল বুঝি।

একা বসে আবার আমি মাঠের দিকে তাকালুম। কিন্তু দৃষ্টি আমার বারবার নিজের মনের উপর পড়তে লাগল। অঞ্জনা আর মিনু দুজনের কথা ভাবলুম। একটা ঝড়ের মত অঞ্জনা, অথচ বেশ মধুর। একটা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত মিনু, গান অথচ কাছের নয়। সত্যি, এটা কি যোগাযোগ ? একটা অদৃশ্য শক্তির ইচ্ছাতেই এটা হয়েছে ? মনের মধ্যেটা যেন আমার নাড়িয়ে দিয়েছে অঞ্জনা। অঞ্জনা, নামটাও যেন ছন্দময়। যেন নাচে। ছোট্ট একটি পাহাড়ী নদী। রিভ্যুলেট। কেন যেন রবীন্দ্রনাথের 'এক গাঁয়ে' কবিতার লাইন কয়টি মনে পড়ল :

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা—
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা—
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে—
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

গাড়ীর তালে তালে আমার মনের মধ্যে কবিতার এই সুরটি যেন দুলতে লাগল। ওরা দুই বান্ধবী বাইরে তাকিয়ে কি দেখছিল, ওরাই জানে। কিছুকাল পরে আবার

ফিরে এল। অঞ্জনা বসল আমার পাশে। মিনু গিয়ে দাঁড়াল সুনীলবাবুর সামনে। আমি বাইরেই তাকিয়ে রইলুম। সুনীলবাবুও বই-এ একটা পেজমার্ক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কি দেখছিলেন যেন। মিনুর দিকে নজর পড়তে বললেন: এস মা, বোস। তুমি কি পড় ?

—এম এ. পড়ছি।

—কি নিয়ে ?

—বাংলা।

—ভাল, ভাল। রোজগারের ধাধাঁয়, সত্য ও সুন্দরের মূল্য দিতে তো লোকে ভুলেই গেছে। সাহিত্য আর দর্শনকে লোকে তাই বড় আমল দেয় না। বাংলাকে বিদ্রূপ করে, দর্শনকে ডেড সাবজেক্ট বলে। অঞ্জনা তো ইতিহাস নিয়ে পড়তে চেয়েছিল। আমি ওকে জোর করে দর্শন পড়ালুম। ভাল করি নি ?

—বেশ করেছেন। মেয়েদের লেখাপড়া তো মনকে সুন্দর করে তোলবার জন্যে। উপার্জনের জন্য তো নয়।

—দি আইডিয়া। চমৎকার বলেছ। আমিও অঞ্জনাকে এই কথা বলি। ফিলজফি পড়ে চাকরী মিলবে না, অঞ্জনার এই ভয়। আমি বলি, চাকুরীর কি প্রয়োজন ? মনটাকে সুন্দর করবার জন্যেই তো লেখাপড়া।

ওদের টুকরো টুকরো কথা কানে আসতে লাগল। আমার পাশে অঞ্জনা বসে আছে এটাও বুঝলুম। কিন্তু আমি ফিরে তাকালুম না। অঞ্জনা বোধহয় কিছুকাল অপেক্ষা করল আমি ফিরে তাকাব বলে; কিন্তু আমি না তাকালে ও ডাকল: কি ভাবছেন এত, সন্তুদা ?

ফিরে তাকালুম আমি।

—কি ভাবছেন ?

—কিছুই ভাবছি না। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার কয়টি লাইন বার বার আমার মনে পড়ছে।

—কি ?

আমি আস্তে আস্তে আবৃত্তি করলুম:

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা—
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা—
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচ জনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

অঞ্জনা দুষ্টু হাসি হেসে আমার দিকে তাকাল, আস্তে। এই কাব্যের উচ্ছ্বাস আপনার সেই 'রঞ্জনাটি' শুনতে পেলে কিন্তু ভুল বুঝতে পারে।

—আমি বললুম: কেন, সে ভয় কেন ? এই একটু আগে তুমি কি বললে মনে নেই ?

অঞ্জনা সে কথার উত্তর না দিয়ে কেমন রহস্যময় হাসি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। যে হাসির অন্তর্নিহিত অর্থ ধরা বড় কঠিন। 'মোনালিসা'র হাসির অর্থ আজ পর্যন্ত কেউ ভেদ করতে পারেনি।

গাড়ী ভর্তি যাত্রী। সকলেই চলেছে হরিদ্বার। অধিকাংশ যাত্রীই বাঙালী। আসছে কলকাতা থেকে। কত বিচিত্র মন, বিচিত্র কল্পনা, বিচিত্র আশাই না এই একই গাড়ীর মধ্যে যাচ্ছে। ঐ ওধারে কয়টি যুবক। চল্লিশ-উর্ধ্ব কয়েকজন ভ্রমণ বিলাসী। সুন্দরী বৌ, ছোট শিশু। নব বিবাহিতা স্ত্রী। সবাই চলেছে এক জায়গায়। এক পথের উপর দিয়ে। কিন্তু সবাই কি একই ভাবছে? এক দেখছে? প্রত্যেকের মনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে বিচিত্র রাগিণীর স্বাদ অনুভব করা যেত। এই সব বৈচিত্র্যের মধ্যেও কি কোন সংযোগ আছে কনসার্টের মত? মনে হল, এ প্রশ্নটা অঞ্জনাকে করি। কিন্তু ফিরে তাকিয়ে দেখি, সে নেই। কখন উঠে গিয়েছে। টিফিন ক্যারিয়ার খুলে সে দেখি খাবার ভাগ করছে। হাত লাগিয়েছে ওর সঙ্গে মিনুও।

আমি ভাবলুম, মিনু আমার কে? কেউ নয়। কিন্তু পরিচয় ওকে আপন জনের চাইতেও প্রিয় করে তুলেছে। অঞ্জনাকে আগে কোনদিন দেখি নি। মুহূর্তে সে দীর্ঘ পরিচিত ব্যক্তির মত হয়ে উঠেছে। এই পৃথিবীতে প্রথম মানুষ আর প্রথম মানবীও আপন ছিল না। প্রথম দর্শনের পর তারা আপন হয়েছিল। কি এক দুজ্ঞেয় রহস্য যে সবকিছুর অন্তরালে কাজ করে, কে জানে। কাশীর ঘাটে আমি আর মিনু কয় মুহূর্ত থেকে এলুম। একটুখানি স্বপ্নের ছোঁয়া ছিল আমাদের মনে। সে মুহূর্ত কি কোন দিন মরে যাবে? তারপর হঠাৎ দেখা হল অঞ্জনার সঙ্গে। অঞ্জনা আর মিনু এখন...

—সন্তুদা!

বাইরের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলুম। ডাক শুনে চমকে ফিরে তাকালুম। দেখি, অঞ্জনা টিফিন ক্যারিয়ারের ঢাকনিতে করে একটা পরোটা আর মিষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে।

—কি?

—এই নিন।

—ও কি?

—দেখতেই তো পাচ্ছেন খাবার। তবে সামান্য।

—না, না, খাবার তো কাশী থেকে খেয়েই বেরিয়েছি।

—তাতে কি হল? এখন কটা বাজে খেয়াল আছে?

রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে দেখি, বেলা আড়াইটে। কখন আমাদের অজ্ঞাতসারেই অজস্র কথার ফাঁকে সময় চলে গেছে। গাড়ীর মধ্যে থেকে সময়ের প্রবাহকে তেমন অনুভব করা যায় না। দুটোরই গতি আছে বলে বুঝি এমন হয়।

—নিন।

—না, না।

ধমকে উঠল অঞ্জনা : ভদ্রতা রেখে ধরুন দেখি।

ওদিকে তাকিয়ে দেখি মিনু, বীরেনদা, সুনীলবাবু, অঞ্জনার মা—সকলের হাতে খাবার। এমন কি রাঙামাসীমার হাতে পর্যন্ত দুটো মিষ্টি। মিনুর দিকে তাকাতে সে শুধু একটু হাসল।

আমি খাবার নিতে নিতে অঞ্জনাকে বললুম : তোমাদের স্টক বুঝি শেষ হয়ে গেল?

অঞ্জনা বলল : আপনাদের স্টকেও যদি কিছু থাকে, ভাববেন না রেহাই পাবেন। একসঙ্গে যখন চলেছি, তখন ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্ন পান।

সত্যি এক আশ্চর্য মেয়ে অঞ্জনা। প্রবাসেও সে ঘরের পরিবেশ তৈরী করে ফেলেছে। বিধাতা এক একজনকে আশ্চর্য ভাবেই তৈরী করেন।

জলখাবার শেষ হলে অঞ্জনা আর আমার সীটে বসল না। মিনুও না। প্রকৃতপক্ষে এদিকে তিনটা বেঞ্চ এখন আমাদের দখলে। বীরেনদাকে ঠেলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে মিনু আর অঞ্জনা নিজেরা সেখানে বসল। বসল না, শুয়েই পড়ল। রাঙামাসী পর্যন্ত স্থানচ্যুত হয়ে ও বেঞ্চে চলে গেলেন। দুই প্রৌঢ়া মুখোমুখী বসে গল্প করতে লাগলেন। অঞ্জনা আমার দিকে তাকাল : বিশ্রাম করে নিচ্ছি সন্তুদা, কিছু মনে করবেন না যেন। একটু হেসে অঞ্জনা আর মিনু দুয়েরই দিকে তাকালুম আমি। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলুম বাইরের দিকে।

বীরেনদা হাই তুলতে লাগলেন। দিনের বেলা ঘুমোনো তার মোটেও অভ্যেস নেই। তবু গাড়ীর একটানা ঝাঁকিতে দেহে একটা আলস্য অনুভব করছেন। কিন্তু আমার স্বভাব ভিন্ন। গাড়ীর মধ্যে বসে স্থির নিদ্রাকে যেন আমি কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারিনে। ঘুম কিছুতেই আসে না। বাইরের মাঠ ঘাট আমাকে টানে। মনের মধ্যে হাজারো ভাবনা ভীড় করে এসে গুন্‌গুন্‌ করতে থাকে। আমি মনের দুয়ার খুলে দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

তন্ময় হয়ে ছিলুম বোধহয় অনেকক্ষণ। হঠাৎ আমার পাশে কার উপস্থিতি অনুভব করে ফিরে তাকালুম। দেখি, রাঙামাসী। আমার পাশ দিয়ে তিনিও বাইরে তাকিয়ে আছেন। বীরেনদাকে দেখি ঝিমুচ্ছেন। গাড়ীর দোলানীর কাছে তিনি বোধহয় হার মেনেছেন। ওপাশে সুনীলবাবু অঞ্জনার মার সঙ্গে কি কথা বলছেন। রাঙামাসী বোধহয় তারই জন্যে ওখান থেকে উঠে এসেছেন। বললুম : বোস মাসী।

রাঙামাসী বসলেন। বললেন : মেয়েটা বেশ, না সন্তু?

—হ্যাঁ।

—ভালই হল। পথের সঙ্গী মিলল। শুনলুম, ওরাও মথুরা-বৃন্দাবন যাবে।

—হ্যাঁ।

মাসী আবার একটু চুপ করলেন। আমি বাইরে তাকিয়ে রইলুম।

হঠাৎ মাসী বললেন : তিন রাত্রি কাশী থাকলুম না, অন্যায় হোল না তো ?

আমি বললুম : কোন অন্যায় হয় নি মাসী। এটা বোধহয় ভগবানেরই ইচ্ছে ছিল। দেখ না গাড়ীতে পরিচিত লোক জুটে গেল। আজ না এলে এদের সঙ্গে দেখা হোত না।

—তা ঠিক।

আবার বাইরে তাকালেন রাঙামাসী। কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : কাশীর বিধবা ঠাকরুণ দুটির কথা মনে পড়ছে।

আমি মাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

মাসী বললেন : যে ঠাকরুনটি দুদিন এসে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন—

—হ্যাঁ, কি ?

—উনি কিন্তু বুড়ী ঠাকরুণের মেয়ে নন!

—মানে ? উনি যে বললেন, ওঁর মা।

—না। বুড়ী ঠাকরুণের সেবার জন্যে একে রাখা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে ওর কেউ নেই।

রাঙামাসী সেই প্রৌঢ়া বিধবা মহিলাটির সব কাহিনী ভেঙ্গে বললেন। সে এক বেদনার ইতিহাস। বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। বিয়ে হয়েছিল যার সঙ্গে তার ঘর তত বড় নয়। কিন্তু ছেলে বড়। ভাল চাকুরী, প্রচুর লেখাপড়া। বিয়ের পর চাকুরীতে উন্নতি হল অনেক বেশী। বড় অফিসার হলেন স্বামী। বাড়ি করলেন বালিগঞ্জে। চাকর বাকর দাসদাসী অসংখ্য। কিন্তু বিধাতা সব সুখ কপালে দেন না। কোন সন্তান হল না। ইতিমধ্যে মধ্য মধ্যবয়সে পার হয়ে স্বামীকে হারালেন। মৃত্যুটা হল হঠাৎ-ই। উনি সন্দেহ করলেন, ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা কেউ বিষ খাইয়ে থাকবে নিঃসন্তান কাকার সম্পত্তি পাবার জন্যে। পেলেও তারা।

কিন্তু কাকার সম্পত্তি পেল বটে, তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করল না। কাকিমাকেই আশ্রয় দিল না। ভাসুরপোদের ঔদ্ধত্য, তাদের বৌদের অবজ্ঞা অসহ্য ঠেকলো। উনি এসে আশ্রয় নিলেন বাপের বাড়ি। ভাইয়েরা তার সমৃদ্ধির সময় আশা করেছিল অনেক। কিন্তু পায় নি কিছুই। কারণ ভদ্রমহিলার স্বামী শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে তেমন মেলামেশাটা পছন্দ করতেন না। ভাইয়েরা বিরক্ত হল। ভাই-বৌয়েরা অপমান পর্যন্ত করতে ছাড়ল না। উনি শুধু নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে কাঁদলেন। একটি মাত্র সন্তানের অভাবে তাঁর জীবন শূন্য মরুভূমির মত হাহাকারে ভরা। নিভৃতে নিজের চোখের জল মুছে নিঃসম্বল মহিলা অগতির গতি বিশ্বনাথের চরণ ভরসা করে একদিন বেরিয়ে পড়লেন।

ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকলেন কাশীর ঘাটে। সৌভাগ্যক্রমে স্বামীজীদের সঙ্গে পরিচয় হলে এখানে আশ্রয় পেলেন এই বৃদ্ধা মহিলাকে দেখাশুনা করবার। গৃহ

নেই, কিছু নেই তার, একমাত্র বিশ্বনাথের চরণ ছাড়া। বৃদ্ধার দেখাশুনো করে দিন কাটে। কেউ কিছু দিলে অস্বীকার করেন না।

রাঙামাসী বললেন : চাল কটি দিলুম বলে কী আনন্দ। যেন কেঁদেই ফেললেন। ভাবি, মানুষের কী অদৃষ্ট! সুখের আশ্রয় ছেড়ে নিঃসম্বল ভিখারী হয়ে কাশীতে জীবন কাটাতে হবে, এটা কি উনি জানতেন!

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রাঙামাসী যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বললেন : যা করেন বাবা বিশ্বনাথ। মানুষের কী ক্ষমতা আছে!

আমার মন ততক্ষণ ফেলে আসা কাশীর ছোট্ট একটি ঘরে ফিরে গেছে। পৃথিবীর জীবনকে ফেলে এসে, পৃথিবীর বাইরে এসে আশ্রয় নিয়েছেন এই সব অনাথা আশ্রয়-হীনারা। একটু যেন হাসিও পেল মনে মনে। সে হাসি বেদনার ম্লান স্পর্শে ভরা। এরই জন্য কি শাস্ত্রে কাশীকে পৃথিবীর বাইরে বলে কল্পনা করা হয়েছে? যাঁরা সর্বত্র আশ্রয় হারিয়েছেন, তাঁরা এসেছেন এখানে। এদের এই সকরুণ কান্না কি বিশ্বনাথের কানে গিয়ে পেঁছোয়? বিশ্বনাথ কি সত্যিই এদের নির্ভয় আশ্রয় দিতে দাঁড়িয়ে আছেন? কে জানে!

সেদিন একথার জবাব আমি জানতুমনা। পরম পুরুষ কৃষ্ণ শিব হিসেবে বিশ্বনাথ নির্বিকার। চিৎ পর্যায়ে তিনি শ্বেত শিব অর্থাৎ Pure Consciousnes আনন্দ পর্যায়ে তিনিই 'বিন্দু', শিবলিঙ্গ। কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণে বিশ্বনাথের এই চরিত্রের কথা যিনি জানেন তিনি তাঁর আশ্রয় পান বৈকি! যিনি জানেন না, কর্মফল এড়িয়ে যাবার তার উপায় নেই। তবে আন্তরিক বিশ্বাসের শক্তি এত বেশি যে, কুলকুণ্ডলিনীকে এই বিশ্বাসই জাগরিত করতে পারে। ত্রিতাপ যন্ত্রণা লাঘব করে বিশ্বনাথ তখন তাকে কিছুটা শান্তি দিতে পারেন বৈকি।

কার্তিকের দিন। বেলা পশ্চিম আকাশে না গড়াতেই আলোতে ম্লান আভা ফুটে উঠে। ধূসর মাঠের উপর সেই বিষন্ন আলোর ছায়া চোখে পড়তে লাগল আমার। কি এক সকরুণ কান্না যেন বেজে চলেছে পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে। আমি কান পেতে কান্নার সেই করুণ সুর স্পষ্ট শুনবার চেষ্টা করতে লাগলুম। বহুদিনের হারানো অতীত থেকে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে সেই এক সকরুণ কান্নার প্রবাহ যেন আমি অনুভব করতে পারলুম। শুধু এক বিষন্ন ভারে, স্তব্ধ মন নিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলুম।

বাইরে সন্ধ্যা নামল চোখের উপর দিয়ে। গাড়ীতে আলো জ্বলে উঠল। কিন্তু ভিতরে তাকিয়ে সে আলো দেখবার ইচ্ছে হল না। আমি বাইরে তাকিয়ে রইলুম আগামী স্টেশনের অপেক্ষায়। T.T.C-র কাছে আগেই জেনে নিয়েছিলুম যে, সামনের স্টেশন লক্ষ্ণৌ। একদা ইসলামিক সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌর ঘরোয়ানা, লক্ষ্ণৌর বাঈজী কোথায় না ভারতবর্ষের হৃদয়কে স্পন্দিত করেছে? যদি অতীতে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করা যায়, দেখা যাবে লক্ষ্ণৌর সেই দিনগুলি, যখন

চাঁদনী চকে আসর জমিয়ে বসত বাঈজীরা। স্নিগ্ধ কাজল রেখা চোখে টেনে কৃষ্ণশ্মশ্রু মুসলমান নবাব বাদশার পুত্রেরা আসতো আসরে। কীই না পরিবেশের সৃষ্টি হত? মুহূর্তের জন্য দুঃখ বেদনা ভুলে পৃথিবীর এক সীমিত অঙ্গনে নেমে আসতো স্বর্গের আনন্দধারা। এইখানেই কত না হাসিকান্না, কত না প্রণয়গুঞ্জন বয়ে গেছে। আমি তাকিয়ে রইলুম সামনের দিকে। ধীরে ধীরে সামনে বেশ কিছু দূরে কতগুলো নক্ষত্র যেন নেচে উঠল।

বিরাট স্টেশন। গাড়ী এসে থামল। গাড়ী এখানে অপেক্ষা করবে বেশ কিছুক্ষণ। ইতিমধ্যে মিনু আর অঞ্জনা কখন উঠে প্রসাধন পর্যন্ত সেরে নিয়েছে, টের পাই নি। হঠাৎ পাশে স্নো ব গন্ধ পেতে ফিরে তাকালুম। দেখলুম, মিনু আর অঞ্জনা দুজনই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

অঞ্জনা বলল: কি ব্যাপার, একেবারে কবির মত তন্ময় হয়ে তখন থেকে কি দেখছেন?

আমি বললুল: কি আর করি বল। তোমরা ঘুমুচ্ছিলে। একা একা···
অঞ্জনা চোখে ঠমক টেনে বলল: আমাদের অভাব, না বিশেষ কারো অভাব?

আমিও ঘুরিয়ে ইঙ্গিত করলুম অঞ্জনাকে: বিশেষত্ব কারো থাকলে নিশ্চয়ই সেটা অনুভব যোগ্য।

সে কথার ইঙ্গিত বোধ করি কিছুটা বুঝল অঞ্জনা। তাই কেমন করে তাকিয়ে আমাকে দেখে নিল।

মিনু বলল: কোন্ স্টেশন?

—লক্ষ্ণৌ।

—লক্ষ্ণৌ!

—হ্যাঁ।

—আরে, এখানেই কবি অতুলপ্রসাদ ছিলেন না?

—হ্যাঁ।

অঞ্জনা দেখি, দুষ্টু ভাবে আমার আর মিনু উভয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বললুম: কি দেখছ?

ও বলল: দেখছি না, ভাবছি।

—কি ভাবছ?

—ঐ যে অতুলপ্রসাদের কথা বললেন, তাঁরই গানের কথা।

—কোন্ গান?

—'সবারে বাসরে ভাল, নইলে তোর মনের কালো ঘুচবে নারে।'

বললুম: হঠাৎ বেছে বেছে এই গানটিই মনে পড়ল?

অঞ্জনা বলল: তখন যে বিশেষত্বের কথা তুলেছিলেন, সে জন্যই মনে পড়ল। বিশেষত্বের যন্ত্রণাও আছে একটা, কি বলেন?

আমি বললুম : কি জানি। তোমার দর্শনের হেঁয়ালী অতটা বুঝবার মত ক্ষমতা কোথায় আমার? মিনু সাহিত্যের ছাত্রী, তার চট করে মনে পড়ে গেল সাহিত্যের কথা। তুমি দার্শনিক, তাই দার্শনিক ব্যাখ্যা দিলে।

মিনু বলল : যার যার সাবজেক্ট অনুযায়ী সে যদি ভেবে থাকে তবে কি অন্যায় হল? তোমার সাবজেক্ট হিস্ট্রি। তুমি কি ভাবলে বল দেখি?

অঞ্জনা বলল : হ্যাঁ, বলুন।

আমি বললুম : আমি বিশেষ কিছু ভাবি নি।

অঞ্জনা জোর করে ধরল : না, কিছু একটা ভেবেছেন নিশ্চয়ই। কি ভেবেছেন বলতেই হবে।

বললুম : দেখ, আমাদের ইতিহাস পাঠ তো রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে। ইতিহাসের হাসিকান্না নয়, তার শুষ্ক তত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত আমরা। সুতরাং সেই এ্যাকাডেমিক ইতিহাসের পাতা থেকে লক্ষ্ণৌ সম্পর্কে কিছু ভাববার তো আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তাই বলে বলছি না যে, এখানকার কোন ইতিহাস নেই। এখানকার যে ঘটনাবলী তা সমগ্র ভরতবর্ষের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এতটা মূল্য পায় নি। সে জন্য এ ইতিহাস পড়া হয় কম। তবে স্কুল কলেজে পাঠ্য ইতিহাসের বাইরে এর আর একটি ইতিহাস আছে। সেটা তার সাংস্কৃতিক ইতিহাস, যে ইতিহাসে অমর অক্ষরে লেখা রয়েছে লক্ষ্ণৌর ঘরোয়ানার কথা! তার চাঁদনী চকে নবাবপুত্রদের স্বাপ্নিক পরিবেশ সৃষ্টির কথা। অলিখিত কত না করুণ কান্নাহাসির কাহিনী। সেই কথাই ভাবছিলুম লক্ষ্ণৌ-এর দিকে তাকিয়ে।

মিনু আমাকে বিদ্রূপ করে বলল : হ্যাঁ, শুনেছি ইদানিং ইতিহাসে সেই বেগম-বাঈজীদের উৎপাত বেশী চলেছে! অলিখিত কাহিনী থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে তারা বড় চমক সৃষ্টি করছেন।

আমি বললুম : ইতিহাসের সেটাই প্রাণস্পন্দন মিনু। কেউ যদি সেটাকে ইদানিং বের করে আনবার চেষ্টা করে, সে জন্যে তাকে বিদ্রূপ কোর না। আর ইতিহাসের কাছে বাংলা সাহিত্য একটু ঋণী হয়ে পড়ছে বলে ইতিহাসকে অবজ্ঞা কোর না।

জানি না অঞ্জনা বিদ্রূপ করল কি না। আমার কথার সায় দিয়ে বলল : আপনি ঠিক বলেছেন সন্তুদা। যুগে যুগে মানুষের হাসিকান্নাই তো ইতিহাসের প্রাণস্পন্দন, তার ডায়ালেকটিক। মিনুর কথা বাদ দিন, সাহিত্য ও যে কেন পড়ছে ভেবে পাই নে।

মিনু বলল : ইতিহাস পড়লে বুঝি ভাল করতুম—সাহিত্যের স্বাদটা বেশী করে পেতুম।

চোখে একটা হাসির রেখা টেনে অঞ্জনা তাকাল মিনুর দিকে· দর্শন পড়লেও পারতিস।

পাতা খুঁজে পেলাম না।

মিনু হেসে বলল : এখন সেটা বুঝতে পারছি।

কম্পার্টমেণ্টের ওদিকে তাকিয়ে দেখলুম, ততক্ষণে একদল তরুণ-তরুণীর কলকণ্ঠ উঠেছে। কান পেতে শুনলুম, লক্ষ্মৌ তাদের মধ্যেও সাড়া তুলেছে। দল বেঁধে ওরা সব নেমে পড়ল। লক্ষ্মৌতে বেশ কিছুক্ষণ গাড়ী দাঁড়াবে। ওরা লক্ষ্মৌর মাটিতে নেমে লক্ষ্মৌকে অনুভব করে নিতে চায়। ওভারব্রিজ পার হলেই স্টেশনের ওধারে টাউন। হাসো-লাসো যৌবনের উদ্দাম ভঙ্গীতে ওরা সব ওদিকে চলল। ওদের সেই যৌবনাবেগ স্পন্দিত প্রসেশন অঞ্জনারও দৃষ্টি এড়ায় নি। ওদের উদ্দেশ্যটা সে আঁচ করে নিতে পেরেছে।

অঞ্জনা বলল : চলুন সন্তুদা, নেমে একটু ঘুরে আসি। ট্রেন তো এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াবে।

আমারও যে একটা লোভ হচ্ছিল না তা নয়। আমি মিনুর দিকে তাকালুম। কিন্তু কোন প্রস্তাব রাখবার আগেই জানালার পাশে হাঁক শুনলুম : খাবার চাই বাবু ?

তাকিয়ে দেখি, উর্দিপরা রেলওয়ের বাবুর্চী। এরা খাবার সরবরাহ করে। আমি কিছু বলবার আগেই দেখি বীরেনদা এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন। এখান থেকেই খাওয়াটা সেরে নাও, সন্তু।

অঞ্জনা বলল : এখনই খাবেন কি ? কেবল তো সাতটা বাজে।

মিনু আর আমি হাসলুম। যৌবনের প্রাণস্পন্দনে উচ্ছ্বসিতা অঞ্জনা বীরেনদার খাওয়া শোয়ার গোপন তথ্য জানে না। সন্ধ্যা মানেই খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়বার সিগন্যাল বীরেনদার। রাত জেগে রবীন্দ্রনাথ, টয়েনবি পড়া বা হেগেলের ডায়ালেক্-টিকের গভীর জট খুলবার চেষ্টা করেন না বীরেনদা। দিনে তিনি রাজস্ব আদায় করেন দৈত্যের মত। রাতে ঘুমান শিশুর মত।

বীরেনদা বললেন : আবার গাড়ী কোথায় কতক্ষণে থামবে কে জানে। ভাল খাবার পাওয়া যাবে কিনা কে বলবে। এখান থেকেই খাওয়া দাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক।

অঞ্জনার মধ্যে ততক্ষণ একটা রোমাণ্টিক স্বপ্ন শিহরণ তুলেছে। একদা ইতিহাসের রঙিন স্বপ্ন দিয়ে ভরা লক্ষ্মৌর মাটিকে সে স্পর্শ করতে চায়। ওধারে ওভারব্রিজ পার হয়ে টাউনে নেমে সে তার কল্পনাকে প্রসারিত করে দিয়ে হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির গন্ধ নিতে চায়। কিন্তু বীরেনদাকে চটিয়ে দিয়ে সেই কল্পনার রঙ গায়ে মাখবার সাহস আমার হল না। আমি বললুম : খাওয়া দাওয়াটা সেরে নিলেই হত অঞ্জনা। শুনেছি লক্ষ্মৌর খাবার নাকি ভাল। এরপর হয় তো ভাল খাবার আর পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া রাত্রি বেলা লক্ষ্মৌয়ের কী হদিশ করতে পারব, বল ?

জানি না কেন, মিনুও আমার কথায় সায় দিল। অঞ্জনার এই প্রবল আবেগটাকে সে হয় তো সমর্থন করতে পারছিল না। কেন পারছিল না সে প্রশ্ন তার মনের গভীরে ঢুকে বের করে আনা আমার তো দূরে স্থান মিনুর নিজেরই তখন সম্ভব ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

অগত্যা বীরেনদার প্রস্তাবটাকেই গ্রহণ করা হল। শুধু একটি জিনিস লক্ষ করলুম—অঞ্জনা মিনু নয়। তার ইচ্ছাব বিরুদ্ধে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মুখ জুড়ে আষাঢ়ের মেঘ জমে আসে না। বিন্দুমাত্র অভিমানেব রেশ না রেখে অঞ্জনা বলল : বেশ, তাই হোক। কে কে খাবেন ? রাঙামাসী তো খাবেন না। মার তো রাত্রি বেলা ভাত খাওযা উচিত নয়। দেখি বাবা খাবেন কি না।

অঞ্জনা সুনীলবাবুর দিকে ফিরে তাকাল : বাবা, তুমি ভাত খাবে তো ?

বোঝা গেল, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপাবে সুনীলবাবুর ম্যানেজার অঞ্জনা নিজে। তিনি কিছু বললেন না।

অঞ্জনা আমাকে বলল : তা হলে পাঁচ প্লেট ভাত নিন, আমবা পাঁচ জন আছি। মা-আর রাঙামাসীর জন্য পাউরুটি কলা আর মিষ্টি কেনা যাবে।

বাবুর্চি প্রশ্ন করল : ভেজিটেবিযান অউর নন্ ভেজিটেরিয়ান ?

আমি অঞ্জনাব মুখের দিকে তাকালুম।

অঞ্জনা বলল। বাঙালী মানুষ বাপু, ভেজিটেরিয়ান হতে যাব কোন দুঃখে। নন-ভেজিটেরিয়ান।

—মস্‌লি অউর মিট্ ?

—মিট্।

অর্ডার চলে গেল।

অঞ্জনা মিনু কে নিয়ে স্টেশনে গেল বাঙামাসী আর অঞ্জনাব মার জন্য কলা পাউরুটি মিষ্টি কিনতে। সত্যি মেয়েটি অদ্ভুত। কাব্য বল, কাব্য করবে, সোচ্চার স্বপ্ন দেখবে, আবার গৃহিণীপনাতে কারো চেয়ে এক পা পিছিয়ে নেই। মিনু লেখাপড়া কবে, স্বপ্ন দেখে হিসেব করে, গৃহিনীপনা করে মেয়েদের ওটা স্বভাব বলে। সে হল নদীর আণ্ডার কারেণ্ট, আর অঞ্জনা ঢেউ।

ওরা খাবাব কিনে নিয়ে ফিবে এল। আমাদের খাবারও এসে গেল। দু'জন দু'জন করে এক একটা বেঞ্চে বসে গেলুম। মিনু আর অঞ্জনা, বীরেনদা আর আমি, শুধু সুনীলবাবু একা। রান্নাটা মন্দ নয়। মাংসটা ভালই হয়েছিল। বীরেনদা দেখতে দেখতে সীমিত ভাতের স্তূপটাকে শেষ করে দিলেন। ওধারে সুনীলবাবুর কণ্ঠ শোনা গেল, রান্নাটা বেশ ভালই তো রে অঞ্জু।

অঞ্জনা ফিরে তাকিয়ে বলল : তাই বলে সবটা ভাত যেন তুমি খেও না বাবা।

সব দিকে নজর অঞ্জনার।

আমাদের খাওয়া শেষ হতেই সেই তরুণ তরুণীর দল ফিরে এল গাড়ীতে। স্টেশন থেকে ওরা লক্ষ্ণৌকে আঁচ করে এল, অর্থাৎ গোলদীঘিব জল দেখে কল্পনাকে ফাঁপিয়ে সমুদ্র করে দেখা আর কি ? কম্পার্টমেণ্টে ফিরে ওরা বুঝতে পারল যে, অবাস্তব স্বপ্নের জন্য একটা বাস্তব ক্ষতি করে ফেলেছে। লক্ষ্ণৌর ভাল মিলটা নেওয়া হয় নি।

ওদের অনুশোচনাটা কানে এল। কে যেন বলছে: স্বপ্না, সহরে ঘুরতে গিয়ে ভুল হল। কিছু দেখাও হল না, এদিকে মিলটাও হারালুম। সকলেই দেখ, খাওয়া দাওয়া প্রায় সেরে নিয়েছে।

আমাদের খাওয়া দাওয়া তখন শেষ। হাত মুছতে মুছতে মিনু আর অঞ্জনা এসে বসল আমার বেঞ্চে। আমি অঞ্জনার দিকে তাকালুম: অঞ্জনা, শুনলে তো?

মিনু বলল: ভাগ্যিস আমাদের কোন স্বপ্না নেই। তার স্বপ্নের প্রলোভনে পড়লে আমরাও পস্তাতুম।

আমি অঞ্জনার দিকে ফিরে তাকালুন: স্বপ্না নেই এটা বোল না মিনু। স্বপ্না আছে। তবে সে সোচ্চার স্বপ্না, তাই ম্যানেজ করা গেল।

অঞ্জনা বলল: রাত্রি বেলা বলে ছেড়ে দিলুম। চলুন না হরিদ্বার, সোচ্চার স্বপ্নার দৌড় কতটা দেখিয়ে দেব। হাঁটিতে হাঁটিতে পা অবশ করিয়ে দেব না।

মিনু বলল: ওর মধ্যে আমাকে কিন্তু টানবিনে, অঞ্জনা।

অঞ্জনা একটা রহস্যের ভঙ্গীতে মিনুর দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে বলল: তবে তো ভালই হয়। একা একা সন্তুদাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াব। লাভ আমারই হবে।

ঐ ছোট্ট এক টুকরো কথা যেন স্বপ্নের জাগ্রত ঝঙ্কারে ভর্তি। আমার হৃৎপিণ্ডটা ছলাৎ করে উঠল। এ কথার ইঙ্গিত স্পষ্ট, সোজাসুজি। মিনুও একটু রাঙিয়ে উঠল। দিনের বেলা হলে তার মুখের রঙটাকে আরো স্পষ্ট দেখা যেত।

আমাদের কথার ফাঁকে বীরেনদা কিন্তু তার নিজের বাঙ্কে বিছনা বিছিয়ে নিয়ে অলরেডি শোবার জন্য প্রস্তুতিপর্ব সেরে ফেলেছিলেন।

অঞ্জনা সেদিকে তাকিয়ে বলল: উনি বোধহয় সঙ্গ ছাড়া বোধ করেছেন।

মিনু বলল: না, উনি ওর স্বভাবমতই কাজ করছেন। উনি প্রকৃষ্ট দিবাকর ব্যক্তি। ওর কাহিনী জান না?

—সন্ধ্যা বেলাতেই শুয়ে পড়েন উনি?

—হ্যাঁ, এর চেয়েও আগে।

ড্যাব্ ড্যাব্ চোখে কিছুক্ষণ অঞ্জনা বীরেনদার দিকে তাকিয়ে রইল।

বীরেনদা কিন্তু নিঃসঙ্কোচ। এ ব্যাপারে তিনি ইউরোপের যুগলমিলন। অপরের দৃষ্টিকে গ্রাহ্য করেন না। বীরেনদা নির্বিকারভাবে উপরে উঠে শুয়ে পড়লেন।

অঞ্জনা আমার দিকে তাকাল: আপনি?

মিনু বলল: বিছানা করে দিলেও উনি এখন বাইরে তাকিয়ে থাকবেন। গাড়ীর গতি নাকি যত বাড়ে তত রবীন্দ্রনাথের বলাকার ভাব এনে দেয় ওর মধ্যে।

গাড়ী লক্ষ্ণৌ স্টেশন ছেড়ে চলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। অঞ্জনা আমার দিকে ঘুরে মুখে একটা হাসির রেখা টেনে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বললুম না। শেষে অঞ্জনাই বলল: আপনার চেহারা দেখে ঐতিহাসিক মনে না হয়ে কবি বলেই বোধ হয় কিন্তু।

আমি বললুম ঃ অঞ্জনা, অতবড় অপবাদ দিও না। লোকে হাসবে, সমাজ অবজ্ঞা করবে। কয়েকটা বাতুলের ক্ষীণ আসর ছাড়া কবি আছেন নাকি বর্তমানে? এই সব অদ্ভুতদের উদ্ভট সৃষ্টি লোকে পড়েও না পড়তেও চায় না। বাংলা দেশে কবি তাঁরাই, স্কুল-কলেজ পাঠ্য বই-এ যাঁদের কবিতা স্থান পেয়েছে। তার বাইরে কবি নয়, কপি। দেখলে লোকে হাসে, মিটিংয়ে গেলে লোকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

আমার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল অঞ্জনা। হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। তারপর মিনুর দিকে তাকিয়ে বলল ঃ বাংলা কবিতার এতবড় একটা অপমানকে বরদাস্ত কারস নে, জবাব দে।

মিনু বলল ঃ জানিস তো বড় নাস্তিক সবচেয়ে বড় আস্তিক হয়। সন্তুদার মধ্যে লুকানো কবি মানুষটাকে আবিষ্কার করেছিস বলে মনে মনে কিন্তু ও খুব খুশি। আমি ঐ মর্যাদাটুকু ওঁকে দিই না বলে আমার উপর খুব রাগ। বাংলায় ইদানিং কবিরা যদি কপি হবেন, তবে জীবনানন্দের কবিতাকে কণ্ঠস্থ করে রেখেছেন কোন সুবাদে সন্তুদা, শুনি?

অঞ্জনা আমার দিকে তাকাল ঃ তাই নাকি?

আমি বললুম ঃ মিনু তো সাইকোলজির ছাত্রী নয় বলেই জানি।

মিনু শাসনের ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকাল ঃ মিথ্যে বোল না সন্তুদা। জীবনানন্দের কবিতা তুমি রোজ পড় কি না বল?

অঞ্জনা বলল ঃ তর্ক করে মিটমাট করে নে তোরা। আমি বাবার বিছানাটা ছড়িয়ে দিয়ে আসি।

অঞ্জনা উঠে গিয়ে ওধারের আপার বাংকটায় সুনীলবাবুর বিছানা ছড়িয়ে দিতে লাগল।

মিনু আস্তে আস্তে বলল ঃ নিজের মনের ভাবটা গোপনে লুকিয়ে রাখতে চাও কেন বল দেখি?

বললুম ঃ আমার মনের মধ্যে একটা স্বপ্ন আছে, এ কথাটা এতদিনে যে তুমি আবিষ্কার করলে, সে জন্যে ধন্যবাদ। স্বপ্নহীন মনে করে এতদিন তো আমাকে বরবাদ করে দিয়েই রেখেছিলে তমি।

মিনু বলল ঃ হুঁ, আমার মনের কথা তুমি সব জান তো!

আমি বললুম ঃ দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্য।

মিনু জানালার বাইরে তাকিয়ে বলল ঃ তুমি মানুষ হলেও তো আমার যন্ত্রণাটা কমতো।

আমি অনেকক্ষণ মিনুর দিকে তাকিয়ে থেকে ভাববার চেষ্টা করলুম—এই কি সেই মিনু!

বিছানা সেরে আবার অঞ্জনা এল আমাদের কাছে ঃ কি, চুপচাপ যে দুজনে?

বাইরে বিপুল অন্ধকার। সে দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ভেতরে তাকালুম ঃ

কবি তৈরী করেছ তো আমাকে। বাইরে অন্ধকার দেখে তাই কবিতার লাইন মনে পড়ছে।

—কি?

—'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তির কারুকার্য'।'

অঞ্জনা মিনুর দিকে তাকিয়ে একটু মুখ টিপে হেসে বলল: সত্যি, মিনুর ফর্সা রঙয়ের উপর কালো চুলগুলি অন্ধকারকেও হার মানিয়ে দেয়। আর শ্রাবস্তির কারুকার্যকে জানিনে। কোন ভাস্কর যদি মিনুর ফুলের মত মুখ সেখানে খোদাই করে থাকে তো সে নিশ্চয়ই বড ভাস্কর ছিল।

মিনু বলল: তোর নিজের মুটা আশী দিয়ে দেখে নিস্।

অঞ্জনা বলল: লজ্জায় দেখি না। আর রঙটা তো কালো!

মিনু বলল: বাংলা সাহিত্যে তো কালোরই জয় জয়কার। বৈষ্ণব কবিতার প্রাণপুরুষ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—কালো।

অঞ্জনা বলল: সে পুরুষ সন্তুদার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য!

আমি একটু রাঙিয়ে উঠলুম।

মিনু বলল: মেয়েদের সম্পর্কে বিশ্বকবি যে বর্ণনা দিয়েছেন তার তুলনা নেই। 'কালো তা সে যতই কালো হোক, আমি দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।'

অঞ্জনা আমার দিকে একবার কটাক্ষপাত করে মিনুকে বলল: ও কথাটা যদি সন্তুদার মুখে শুনতুম, তবে খুব ভাল লাগতো।

মিনু বলল: আমি শুয়ে পড়ি। তুই বোস, সারারাত ভর কালো রূপের অনেক বর্ণনা শুনতে পাবি।

অঞ্জনা আস্তে আস্তে বলল: কি সন্তুদা, ব্যাপার কি? 'দেহি পদ পল্লব মুদারম' বলে এখনো আত্মসমর্পণ করতে পারেন নি নাকি? সত্যি আমাকে দেখলে আপনার মুখ দিয়ে অনর্গল কবিতা বেরুবে?

মিনু বলল: তুই বসে থেকে দ্যাখ না!

অঞ্জনা বলল: না বাবা, দরকার নেই। কবিতা শুনে কি বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটাব নাকি? আর মিছে মিছে কতগুলি মিষ্টি কথা শুনে আমি ভুলব বলে মনে করেছিস? পুরুষদের স্বভাবটা আবার তেমন ভাল নয়, পাশে পেলেই একটু অভিনয় করতে চায়। চলন্ত ট্রেনে পাশে বসে হয় তো দু'টো প্রেমের কবিতাই শুনিয়ে দেবেন। না না, সেটা ভারি মর্মান্তিক হবে।

মিনু বিদ্রূপের ভঙ্গিতে তাকাল: প্রেমের কবিতা?

—হ্যাঁ।

—সন্তুদার মুখে?

—কেন বেরুতে পারে না?

—শুনি নি, তবে তোকে দেখলে হয় তো বেরুতে পারে।

হঠাৎ আমার বিমল ঘোষের 'ঘরোয়া' কবিতার দুটো লাইন মনে পড়ে গেল। আবৃত্তি করে ফেললুম :

'তোমায় শোনাব প্রেমের কাব্য এমন ভাগ্য করি নি—
শোনালে হয় তো শোনাতে ওষ্ঠ বাঁকায়ে—
কোথায় শিখলে এত ঢং এত বঙ্গ ?
বানিয়ে বানিযে মন ভোলানোর যত মিছে কথা লিখলে !'

অঞ্জনা হেসে উঠল। তারপর তর্জনী দেখিযে আমাকে বলল : আমার বান্ধবীর সম্পর্কে এমন মিথ্যে ধারণাটাকে কিন্তু আমি প্রশ্রয় দেব না। প্রেমের কবিতা আজ পর্যন্ত একটিও শুনিয়েছেন ওকে ?

আমি কোন কথা না বলে বাইরে তাকালুম।

অঞ্জনা বলল : কি, জবাব দিন ?

আমি নীরব।

—বলুন না ?

ছোট্ট করে বললুম : সাহস পাই নি।

অঞ্জনা বলল : ভাল। বেশী প্রশ্রয় দিলে আপনারা অনেকটা বেড়ে যান। শেষে আসল জিনিসটার মর্যাদা এমন ছোট করে ফেলেন যে...

আমি বললুম : অভিজ্ঞতা আছে নাকি তোমার ?

একটু চুপ করে গেল অঞ্জনা। কি যেন বলব বলে ভাবল। কিন্তু তার আগেই মিনু বলল : অঞ্জনা সম্পর্কে তুমি কতটুকু জান ? আর দশজনের মত ওকে ভেবো না, বলে দিলুম। ছেলেদের অঞ্জনা পাত্তাও দেয় না।

বললুম : যত বড় নাস্তিক, তত বড় আস্তিক নয় তো ?

মিনু বলল : নিজের সম্পর্কে খুব বেশী ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছ তুমি।

আমি বললুম : বিনয় আমি প্রথম থেকে দেখিয়ে আসছি। আবার বলছি, আমি নিজে...বৃন্দাবনস্য কস্যাচিৎ গলিত তুলসি পত্রস্য কীটাণুকীটস্য দাসাণুদাসস্য ঝাঁঝরি ঝাঁঝরি কীটি কীটি ১০৮ শ্রীমদ্ সন্তু।

শুনে মিনু আর অঞ্জনা দুজনেই হো হো করে হেসে উঠল। প্রবল হাসির দমকে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল।

অঞ্জনা হাসতে হাসতে বলল : এ কথার মানে ?

আমি বললুম : আমি বৃন্দাবনের গলিত কীটদষ্ট তুলসীপত্র, যা পোকায় কেটে ঝাঁঝরি ঝাঁঝরি করে দিয়েছে তারও ১০৮ ভাগের এক ভাগ।

অঞ্জনা বলল : বাব্বা ! মহা বিনয়ী ব্যক্তি দেখছি। বৈষ্ণব বাবাজীদের মধ্যেও কেউ কদাচিৎ এমন বিনয় লক্ষ্য করেছে কিনা জানিনে। তা পদকর্তা কি স্বয়ং সন্তুদা নিজে ?

আমি বললুম : কর্তা হবার ঔদ্ধত্য কখনো আমি দেখাতে সাহস করিনে অঞ্জনা। সবই তাঁর।

মিনু আর থাকতে পারল না। বলল : নাও, থাম তো। তোমাকে যদি একটি কথা বলবার জো আছে। তুমি যে এত কথা বলতে জান, এ পরিচয় আগে পাই নি। রোজ সন্ধ্যা বেলা জ্যোতিষ আশ্রমে বসে এই সব শিখেছ তুমি ?

অঞ্জনা বলল : জ্যোতিষ আশ্রম সে কি ? সেখানে কি করেন ?

আমি বললুম : অবাক করলে অঞ্জনা। বাঙ্গালী মেয়ে হয়ে জান না, জ্যোতিষ আশ্রমে লোক কেন যায় ? জ্যোতিষ আশ্রমে লোকে যায় হাত দেখাতে।

মিনু বলল : ঘোড়ার ডিম। তোমার জ্যোতিষ-আশ্রম হাত দেখাবার জায়গা নয়, আড্ডা মারবার জায়গা। আসলে এইসব হয় সেখানে।

আমি বললুম : এই আড্ডা একটা বিরাট জিনিস। এই আড্ডা মানুষের দৃষ্টিকে উদার করে, মনকে নির্মল করে, দুঃখকে লাঘব করে। সেই আড্ডার নিন্দে কোর না।

মিনু রাগ করে বলল : নাও, তোমার লেকচার বন্ধ কর তো! এত জ্ঞান তো একটা থিসিস লেখ না কেন ?

অঞ্জনা মজা উপভোগ করে আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বললুম : থিসিস তো এখন সর্বজন পরিচিত এবং সহজে অতিক্রম্য থাইসিসে পরিণত হয়েছে।

মিনু রাগ করে বলল : তোমার সঙ্গে কথা বলাই বৃথা।

অঞ্জনা বলল : সন্তুদা, আপনার বৈষ্ণব বিনয়তত্ত্ব কিন্তু ভঙ্গ হল।

আমি জিব্ কেটে বললুম : ও সরি! এ অপরাধের জন্য আমি অনুতপ্ত। গোস্বামীজীরা আমার ঔদ্ধত্য ক্ষমা করুন।

মিনু কোন কথা বলল না। কিন্তু অঞ্জনা মুখে একটা হাসির রেখা টেনে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুকাল পরে বলল : আপনার রূপ ধরা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আপনি দেখছি গিরগিটির মত বহুরূপী। এই এক রঙ তো, এই আর এক।

আমি বললুম : রঙটা হৃদয়ের প্রতিফলন। সেই হৃদয়কে চেনা কষ্টকর। নিজেকে জানা যায় না তো অপরকে জানবে কি করে ? অপরের হৃদয়কে ধরতে গেলে নিজেরই হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি।

—কি রকম ? অঞ্জনা তাকাল আমার দিকে।

আমি ছোট্ট একটা কবিতা আবৃত্তি করলুম :

'এইটুক বুক যেন তার
ঘন নীল সমুদ্র অপার।
মন তার গভীর গহন,
খুঁজিতে হারিয়ে গেল
আপনার মন॥'

হঠাৎ কি হল, একটু চুপ করে গেল অঞ্জনা। কি যেন একটু ভাবল। তারপর বলল : এ কবিতাটা কার ?

—কেন ?

—না, জিজ্ঞেস করছি।

—কবিতাটা কেমন, আগে তাই বল ?

—যিনি লিখেছেন, তিনি মনের সমুদ্রে ডুব দিয়ে উঠেছেন সন্দেহ নেই।

—তাই নাকি ? কিন্তু আশ্চর্য কি জান, যিনি লিখেছেন, তার বদনাম এই যে, তিনি নাকি অপরের মনের খবর রাখেন না। সবচেয়ে বড় কথা তার নিজেরই নাকি মন বলে কোন পদার্থ নেই।

অঞ্জনা বলল : মনটা কোন পদার্থ নয় বলেই ওটা পদার্থ হতে পারে না। কিন্তু অনেক বাংলা কবিতা তো পড়েছি। এত সুন্দর ছোট্ট একটা কবিতা তো কোনদিন নজরে পড়ে নি! কবিতাটা কার, সন্তুদা ?

—অনুমান কর।

—জীবনানন্দের ?

—না।

—সুধীন দত্তের ?

—না।

—বিষ্ণু দের ? না না তিনি এমন লিখবেন না। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তো নয়ই, তাঁর কাজ কাস্তে হাতুড়ি লাঙ্গল নিয়ে। তবে কি বুদ্ধদেব বসুর ?

—না।

—তাহলে কার ? এমন একটা সার্থক কবিতা রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কল্পনাতে সম্ভব হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হলে কি জানতুম না ? সত্যি, কেমন কেমন লাগছে। কার বলুন তো ?

আমি মিনুকে দেখিয়ে বললুম : সাহিত্য যার এক্তিয়ারের মধ্যে, তাকে জিজ্ঞাসা কর না ?

মিনু কিন্তু সে কথা শুনেও শুনল না। জানালা দিয়ে আরো ভাল করে বাইরে তাকাল।

অঞ্জনা বলল : আপনিই বলুন না, কোন্ বইয়ে আছে ? বইটা কিনব।

আমি বললুম : এটা এখনো প্রকাশিত হয় নি।

—মানে ! এবার বুঝি অঞ্জনার সন্দেহ হল, বলল : তাহলে আপনিই লিখেছেন নাকি ?

— মাথা খারাপ, আমি লিখতে যাব কবিতা !

—আপনার কোন বন্ধুর ?

—হ্যাঁ, তাই।

—কে ? কি নাম ? নিশ্চয়ই কাগজে লেখেন ?

আমি বললুম ঃ ঐ একটি জায়গায় তোমরা ভুল করে আছো। ভাল লিখলেই কাগজে বেরুবে এমন কোন কথা নেই। কাগজে লেখা বেরুনটা যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না, করে তোয়াজের উপব।

—ওর তাহলে কোন কবিতাই কাগজে বেরয়নি ?

—না।

—কি নাম বলুন তো ?

—নাম বলা বারণ।

অঞ্জনা এবার অনেকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল আর বলতে হবে না। সত্যি, আপনার রূপ অনেক। কিন্তু এ সংবাদটা মিনু আজো জানে না, তাই ভাবি। মিনুর গা ঠেলে দিল অঞ্জনা ঃ এই শোন। দেখ, নতুন আবিষ্কার করলুম।

মিনু সব শুনছিল। তার কতটা ভাল লাগছিল কি লাগছিল না জানিনে, তবে এ খবরটা তার কাছে নতুন ছিল নিশ্চয়ই। সে অঞ্জনাকে বলল ঃ নতুন আবিষ্কারটা সম্পূর্ণ হৃদয় নিয়ে। চোরাবালিব আমেরিকা, পা ফেলতে সাবধান।

অঞ্জনা বলল ঃ তা যাই বলুন, এ কবিতাটা যদি আমায় নিয়ে হত, তবে বুকে করে রাখতুম।

এই বথা বলেই হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে। নিজেই একটু লজ্জা পেয়ে গেল কিনা কে জানে। বলল ঃ না, উঠি, ঘুম পাচ্ছে। আমাদেব কারো দিকে ফিরে না তাকিয়ে সে বরাবর নিজের বাঙ্কের কাছে চলে গেল।

নিচে মা, উপরে সুনীলবাবু, মাঝের থাকে তাব বিছানা। সে বাঙ্কে উঠে সটান শুয়ে পড়ল।

মিনু আর আমি দু'জনেই ওর দিকে তাকিয়ে দেখলুম। কিন্তু অঞ্জনা ফিরেও তাকাল না। সত্যি, মেয়েটা রহস্যময়ী। মিনু আমার দিকে ফিরে তাকাল। গলা খাটো করে বলল ঃ সত্যি, তুমি লিখেছ ?

—কেন, বিশ্বাস হয় না ?

—বিশ্বাস হবে না কেন। ক্ষমতা কি তোমার নেই ? কিন্তু আমায় তো কখনো বল নি ?

—সাহস পাই নি।

—কেন ?

—তুমি ঠাট্টা করবে বলে। হাজার হলেও তুমি তো সাহিত্যের ছাত্রী।

—খুব বৈষ্ণব বিনয় শিখেছ দেখছি।

আমি শুধু মিনুর চোখের দিকে তাকালুম।

চোখে চোখে হতে মিন্ চোখ নামিয়ে নিল। বলল: কিন্তু একটা হাহাকারের সুর কেন এর মধ্যে? কোন্ হৃদয় তুমি খোঁজ করে পাও নি শুনি?

কোন ভনিতা না করে খুব আস্তে করে বললুম: তোমার।

মিনু বলল: আহা! আমার হৃদয়ের খোঁজ যেন তুমি করেছ। বরং আমিই খুঁজে সাড়া পাই নি।

আমি বললুম: বিশ্বাস কর, খুঁজেছি অনেকদিন। বুঝতে পারি নি এতদিন। বেড়াতে এসে বুঝলুম। বুঝে কিন্তু আরো হারিয়ে যাচ্ছি।

এবার মিনুও উঠে দাঁড়ালো: যাক, আর কাব্য করতে হবে না। এবার শুয়ে পড়, রাত হচ্ছে।

ও চলে গেল। অঞ্জনার ঠিক উল্টো দিকেই মাঝের বাঙ্ক মিনুর।

আমি এবার একা বসে রইলুম। খানিকটা বাইরে তাকালুম। গাড়ী ছুটে চলেছে। নিবিড় অন্ধকার বাইরে থেকে জড়িয়ে ধরেছে গাড়ীকে। যেন বহুদূর পেছনে লক্ষ্ণৌ থেকে একটা সুর ভেসে আসছে 'একা আমি জীবনতরী বাইতে নারি'। অতুলপ্রসাদের লেখা গান। কোন্ বেদনার মুহূর্তে তিনি এটা লিখেছেন কে জানে! আজ ২৫ বছর পরে সেদিনের সেই হারানো সুরটি স্মৃতিপটে ভেসে উঠতে মনে হচ্ছে, অতুলপ্রসাদ সেদিন বোধ হয় বুঝতে পারেন নি যে, 'জীবনতরীর ভার মানুষ একা হলে তবেই বহণ করা যায়।' 'দুখের বরষায় চক্ষের জল' যেই নামে, 'বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ' এসে তখনই থামে। মানুষ যখন পার্থিব নিঃসঙ্গতায় একা হয়ে আর্তশ্বাস ত্যাগ করে তখনই তার জীবনতরীর হাল ধরতে এগিয়ে আসেন ঈশ্বর। কিন্তু এ-সব এখন থাক। আবার সেই ২৫ বছর আগেকার সেই স্মৃতিই চারণা করা যাক। অজানা দেশের উপর দিয়ে আর এক অপরিচিত দেশের উদ্যেশ্যে এগিয়ে চলেছে গাড়ী। গাড়ী চলে হরিদ্বারের দিকে। হরিদ্বার আগে কখনো দেখি নি।

ঘড়ির দিকে তাকালুম। দেখলুম, রাত বেশ হয়েছে। গল্প করতে করতে আমরা অনেক সময় কাটিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে আরো দু একটা স্টেশনে গাড়ী থেমেছে। খাবার উঠেছে। প্রায় সব যাত্রীই খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে শুয়ে পড়েছে। পয়সা দিয়ে রিজার্ভ করা স্লিপীং বার্থ। পয়সার মূল্যটা যথার্থ অর্থেই উঠিয়ে নিতে হবে। আমি বাথরুমে যাবার পথে জানালার ধারে বসেছি। আমার সিঙ্গল সিট। থ্রি টায়ার সিট হলেও আমার ঠিক মাথার উপরে কোন ঝোলানো সিট নেই। একেবারে উপরে সিট, সেটা T. T. C-র নিজের। আমিও শুয়ে পড়লুম। গাড়ীটা দুলছে। আমার নিজের মধ্যেও প্রবলভাবে দোলনা অনুভব করছি। মিনুকে এত গভীরভাবে আগে জানি নি। অঞ্জনার মত এমন মেয়ের সঙ্গে ইতিপূর্বে আমার পরিচয় হয় নি।

—এই যে সন্তুদা, এখনো ঘুমিয়ে! একটা মিষ্টি সুর কানে যেতে মাথার উপর থেকে চাদরটা সরালুম। দেখি, অঞ্জনা দাঁড়িয়ে। বাইরে তাকিয়ে দেখি, আকাশে

দিনের আভাস। গাড়ীর ঝাঁকুনীতে, মনের দোলনায় অনেকক্ষণ দুলতে দুলতে কখন যে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, কিছু বুঝতে পারি নি। রাতই কেটে গেছে। চোখ কচ্‌লে উঠে বসলুম। বেশ একটু শীত শীত লাগছে। চাদরটা গায় দিলুম।

মিনু আর অঞ্জনাকে দেখি, বেশ ফ্রেশ দেখাচ্ছে। হাত-মুখ ধুয়ে প্রসাধন সেরে নিয়েছে ওরা। গাড়ীর মধ্যে সকলেই জেগে উঠেছে। রাঙামাসী আর অঞ্জনার মা ওধারের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। একমনে সুনীলবাবুও বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমিও বাইরে তাকিয়ে দেখলুম। যাদুমন্ত্র বলে প্রাকৃতিক দৃশ্যের যেন বিরাট এক পরিবর্তন ঘটেছে। সেই শুষ্ক ধূসর মাঠের রুক্ষতা আর নেই। মাঠে মাঠে পাকা ধান। কুয়াসার মধ্যে জড়িয়ে সজল স্নিগ্ধ মাঠ। পাহাড় এখনো চোখে পড়ছে না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে অনতিদূরে পাহাড়ের আভাস। একটা নতুন গানের সুরে যেন প্রকৃতি ডাক দিচ্ছে। মিনু বলল ঃ যাও, হাত-মুখ ধুয়ে নাও। হরিদ্বার আর খুব দূরে নেই। গাড়ী একবারে হরিদ্বার স্টেশনেই থামবে।

হরিদ্বার! এখানে হরিদর্শন হয়। অর্থাৎ পরম মুক্তি এ পথ দিয়েই নেমে এসেছে ভারতবর্ষের সমতল ভূমিতে। শুনেছি অপূর্ব সুন্দর এই হরিদ্বার। প্রাচীনকাল থেকে সৌন্দর্য পিপাসু মানুষের নয়ন তৃপ্ত করে এসেছে। কত সুন্দর হরিদ্বার এখনো দেখা হয় নি, কিন্তু মনে মনে কল্পনা করে রেখেছি, অপূর্ব। যা ভেবেছি, তাকেও নিশ্চয় ছাড়িয়ে যাবে। ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রকৃতি। প্রকৃতির এক বিরাট প্রভাব মানুষের উপর। সামান্য মাঠ, ঘাস, গাছ, নদী আমাকে দোলা দেয়। হরিদ্বার হয় তো আমাকে ব্যাকুল করে তুলবে। মনে মনে হরিদ্বারের সৌন্দর্য কল্পনা করে কতবার তার বুকে নিজেকে সঁপে দিয়েছি। সেই হরিদ্বার সামনেই। এই সেই হরিদ্বার, যার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে প্রাচীনকালে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং এর নাম দিয়েছিলেন—কো-ইউ-লো, অর্থাৎ মায়াপুর।

বুকের মধ্যে একটা অব্যক্ত অনুভব নাড়াচাড়া দিয়ে উঠল। এখন বাথরুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে সময় নষ্ট করবার ইচ্ছে হল না। মনে হল, তাকিয়ে থাকি। ধীরে ধীরে সৌন্দর্য এখন প্রবল হতে প্রবলতর হতে থাকবে।

অঞ্জনা আমাকে লক্ষ্য করছিল। বলল ঃ সে কি সন্তুদা, ভাব এসে গেল নাকি?

আমি ফিরে তাকালুম অঞ্জনার দিকে।

অঞ্জনাও বলল ঃ যান হাত-মুখ ধুয়ে আসুন।

অগত্যা উঠতে হল আমাকে।

বাথরুমের কাছে গিয়ে দেখি, দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন বীরেনদা। অঞ্জনার আসার পর তিনি যেন সত্যিসত্যিই কোন্ ঠাসা হয়ে পড়েছেন। মিনু আর আমি অঞ্জনার সঙ্গেই ব্যস্ত। রাঙামাসী মেতেছেন অঞ্জনার মায়ের সঙ্গে। ছেলে মেয়ে থেকে আরম্ভ করে ঘর গেরস্থালী অনেক কথাই দুজনে ইতিমধ্যে বলে ফেলেছেন। সুনীল-বাবু অবশ্য একাই আছেন। তাঁর মেয়ে আর মিনুর সঙ্গে আমি ব্যস্ত। কথা বলবার

সঙ্গী তাঁর নেই। বীরেনদাকে পাকড়াও করতে গিয়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। একে জাঁদরেল প্রফেসর। তার উপর বয়সে বেশী। বীরেনদা হিসেব নিকেশ করে তাঁর সঙ্গ এড়িয়ে চলছেন। বীরেনদার ভয়, পাছে পাঠ্যপুস্তকের কিছু তাঁকে জিজ্ঞেস করে বসেন সুনীলবাবু।

বীরেনদার ম্লান মুখ দেখে আমার কষ্ট হল। আমরা তাঁকে অবজ্ঞা করে চলেছি, এরকম ভাবছেন না তো বীরেনদা? প্রকৃতপক্ষে কাশী স্টেশন থেকে গাড়ীতে চাপবার পর, বীরেনদার সঙ্গে আমাদের প্রায় কথাই হয় নি। অঞ্জনা এসে এমন তুফান তুলেছে আমাকে আর মিনুকে নিয়ে যে সেই তুফানের আড়ালে আর সবাই যেন হারিয়ে গেছেন।

আমি বীরেনদার কাছে এগিয়ে গেলুম: কি বীরেনদা, এখানে দাঁড়িয়ে?

—এই একটু দেখছি।

আমি বীরেনদার সঙ্গে একটু কথা বলবার চেষ্টা করলুম: এখানে শস্য বেশ ভালই হয়েছে মনে হচ্ছে, না?

কৃষির কথায় বীরেনদার আগ্রহটা বেশী বলে আমার ধারণা ছিল। কিন্তু আমার কথা শুনে বীরেনদার চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠল না।

নিরাগ্রহ কণ্ঠে বললেন: মন্দ নয়।

আমি ভাবলুম, সত্যি, বীরেনদা মনে মনে আঘাত পেয়েছেন নাকি?

হঠাৎ বীরেনদা বললেন: সকাল থেকে কোথাও খাবার পাওয়া গেল না, আশ্চর্য! গাড়ী আর হরিদ্বার স্টেশনের আগে থামবে বলে মনে হচ্ছে না।

টাইম টেবিল অনুযায়ী সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হরিদ্বারে গাড়ী পৌঁছুবার কথা। এটা ব্রাহ্মমুহূর্ত। গাড়ী থামবার সম্ভাবনা কম। তবে বীরেনদার বিষণ্ণতার কারণটা বেশ বুঝে নিতে পারলুম। ঘুম ভেঙ্গে পাখীরাও উড়ে, সেটাই ব্রাহ্মমুহূর্ত, তারপর মাটীতে নেমে খাবার খোঁজে। বীরেনদা মানুষ, উড়ে বেড়ানো সম্ভব নয়, কিন্তু একটু পদচারণা করতেও তিনি নারাজ। আগে তাঁর খাবার চাই।

তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে এসুম। এসে দেখি, আমার বিছানাপত্র বাঁধা হয়ে গেছে।

— ওমা একি!

অঞ্জনা বলল: হরিদ্বার আর কদ্দুর, সেটা খেয়াল আছে? স্টেশনে নেমে বাঁধা ছাদা শুরু করবেন নাকি?

মিনু বলল: ঐ দূরে বোধ হয় পাহাড়ের রেখা দেখা যাচ্ছে রে অঞ্জনা।

—কৈ, কোথায়? একটা চপল মেঘের মত অত্যন্ত আগ্রহে অঞ্জনা বাইরে তাকালো। আমিও তাকিয়ে দেখলুম। কালো পাহাড়ের রেখা দূরে দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের গায়েই নিশ্চয় হরিদ্বার হবে। গাড়ী ওখানেই যাচ্ছে। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং। পাহাড়ের মাথায় মেঘের উপর সূর্যের রংয়ের খেলা দেখেছি আমি। বর্ণচ্ছটার সেই মায়াপুরী

এখনো ফুটে উঠে নি উত্তর প্রদেশের প্রত্যন্ত সীমায়। পাহাড়ও খুব উঁচু বলে মনে হচ্ছে না। অথচ এই নগাধিরাজ হিমালয়। কে জানে ঐটেই হরিদ্বার কিনা! কিন্তু আরো এগুতে হবে! তবে হরিদ্বার যে কাছে হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ সব যাত্রীই বিছানাপত্র বেঁধে প্রস্তুত।

হঠাৎ অঞ্জনাকে বললুম ঃ অঞ্জনা, তোমাদের পাঁউরুটি কিছু আছে?

প্রত্যাশিত হরিদ্বারের আবির্ভাবের জন্য তাকিয়ে থাকা মেয়েটির কাছে এর চেয়ে ছন্দপতনের আর কি হতে পারে! মিনু তো বেশ বিরক্ত হয়েই আমার দিকে তাকাল।

অঞ্জনা কিন্তু বিরক্ত হল না, হেসে বলল ঃ কেন, খিদে পেয়েছে নাকি?

আমি বললুম ঃ হ্যাঁ, তবে আমাব নয়, আর একজনের। বেচারী বড় বিষণ্ণ হয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন।

মিনু বলল ঃ বীরেনদা বুঝি? সকাল থেকে তাই দেখছি, ঐ দরজার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন।

অঞ্জনা বলল ঃ ওঁর বুঝি খুব সকালে খাওয়া অভ্যাস?

মিনু বলল ঃ হ্যাঁ, পাখী না ডাকতে।

উঠে দাঁড়াল অঞ্জনা ঃ হ্যা, দেখি, আছে বোধহয়। কাল মার জন্যে পাঁউরুটি কলা কিনেছিলুম। মা রুটি খান নি। দুটো সন্দেশ খেয়েই শুয়ে পড়েছিলেন। দাঁড়ান আনছি।

অঞ্জনা তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে টিফিন ক্যারিয়ার খুলে দেখল। রুটি আছে। দুটো কলাও। রুটি কলা নিয়ে ও এগিয়ে এল।

আমি হাত পাতলুম ঃ দাও, বীরেনদাকে দেই।

অঞ্জনা বলল ঃ কেন, আমার হাত নেই? আমি দিতে জানিনে?

বরাবর সে বীরেনদার কাছে চলে গেল। অত্যন্ত সহজে পরকে আপন করে নিতে পারে সে। এতটুকু সঙ্কোচ নেই। বীরেনদার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকল ঃ এই যে বীরেনদা, ধরুন।

অঞ্জনার দিকে ফিবে তাকিয়ে বীরেনদার মনের ভাব কি হল জানিনে, কিন্তু কলা আর পাঁউরুটি চোখে পড়তেই মুখটা তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল ঃ কোথায় পেলেন?

অঞ্জনা প্রায় ধমকে উঠল ঃ ওমা, পেলেন কি? ছোট বোনের মত ভাবতে পারেন না? তুমি বলে ডাকবেন।

বীরেনদা একটু আশ্চর্য হলেন। একটা লজ্জারাঙা হাসি তাঁর মুখের উপর ফুটে উঠল। হাত পেতে তিনি খাবার নিলেন ঃ তোমাদের আছে তো?

অঞ্জনা বলল ঃ সে ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না। যতক্ষণ আমি সঙ্গে আছি, খাবার ভাবনা ভাববেন না। পয়মন্ত মেয়ে আমি। জন্মাবার পর বাড়ির উন্নতি হয়। মামা তাই আমায় ডাকেন লক্ষ্মী বলে।

বীরেনদা বললেন : ভাল, আমিও তোমায় লক্ষ্মী বলেই ডাকব।

—নিশ্চয়ই। অঞ্জু বলুন, লক্ষ্মী বলুন, যা খুশি। শুধু নাম ধরে ডাকবেন।

বীরেনদা পাঁউরুটির বিরাট এক অংশ কামড়ে ছিঁড়ে একটা কলার আধখানা মুখে পুরে দিলেন।

অঞ্জনা ফিরে এল আমাদের কাছে।

আমি বললুম : লক্ষ্মীর কৃপা থেকে আমি বঞ্চিত হলুম যে ?

অঞ্জনা খুব আস্তে করে বলল : আপনার লক্ষ্মী স্বয়ং পাশে বসে। আমি লক্ষ্মীপণা দেখাতে গেলে প্রলয় হবে।

মিনু একটু রাঙিয়ে উঠল।

আমি বললুম : আমার কাছে তাহলে 'নহ মাতা, নহ কন্যা' ?

অঞ্জনা বলল : নহ মাতা, নহ কন্যার কথা আমার সম্পর্কে ভাবলেন সন্তুদা ? জানেন না, সবচেয়ে ট্র্যাজিক হল সে জীবনই ? সুধাভাণ্ড মিনুর হাতে দিয়ে, গরলটা আমায় দিতে চান ?

হাত জোড় করে বললুম : হার মানছি অঞ্জনা। লক্ষ্মী নও, উর্বশী নও, তুমি সরস্বতী। এবার হল তো ?

—বেশী কথা বলি বলে বুঝি ?

—বাক্‌দেবী তো বেশী কথা বলবেনই।

অঞ্জনা বলল : জানেন, মাঝে মাঝে রাগ করে আমি একদম কথা বন্ধ করে থাকতে পারি। বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

আমি বললুম : দোহাই তোমার, সে রাগটা যেন আমাদের উপর কোর না। তোমার বাক্যস্রোতে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাও, দোলাও। বিদেশটা প্রাণের স্পন্দনে ভরে উঠুক।

অঞ্জনা এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

গাড়ী তখনও চলেছে। তার চলার মধ্যে সেই তাড়াহুড়ো ভাবটা যেন আর নেই। সে নিশ্চিন্ত যে গন্তব্যস্থানে যাত্রীদের সময়মত সে পৌঁছে দেবেই। পাহাড়টা আবছা থেকে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল, আবার হারিয়ে গেছে। সেকি। হরিদ্বার কি তবে সমতল ভূমিতেই নাকি ? কিন্তু আমার কল্পনা তো চিরদিনই পাহাড়ের আশ্রয়ে হরিদ্বারের কল্পনা করে এসেছে !

হঠাৎ মনে প্রশ্ন এল, অঞ্জনারা হরিদ্বারে থাকবে কোথায় ? স্টেশনে নেমে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে নাকি ? মুহূর্তের মধ্যে এত আপন হয়েছে যে, সারা পথ, দিল্লী, আগ্রা, মথুরা বৃন্দাবন পর্যন্ত সে সঙ্গে সঙ্গে থাকলে যেন ভাল হয়। বললুম : আচ্ছা অঞ্জনা, হরিদ্বারে তোমারা কোথায় থাকবে ?

বিদ্রূপ মেশানো একটা হাসি ফুটলো নাকি অঞ্জনার মুখে ? আর একটু গভীর ভাবে সে আমাকে তাকিয়ে দেখল, তারপর বলল : কাশী থেকে এতদূর এক সঙ্গে এসে এ প্রশ্নের মানে ?

আমি বললুম : না, মানে, আগে থাকতে ঠিক করে এসেছ কিনা, তাই।

অঞ্জনা বলল : ঠিক করা থাকলেও, সেটা এখন বেঠিক হত। যখন বেরুই, তখন দল ছিল তিনজনের, এখন সাতজনের। আপনারা কোথাও ঠিক করে এসেছিলেন নাকি?

আমি বললুম : না, ঠিক ছিল না। তবে কাশীর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে চিঠি এনেছি হরিদ্বারের মিশন আশ্রমে, যদি জায়গা মেলে।

অঞ্জনা বলল : ভালই হল, সেখানেই উঠব। না আপনাদের আপত্তি আছে?

একটু গম্ভীর হয়ে বললুম : একথা তুমি ভাবতে পারলে?

সুর পাল্টে অঞ্জনা বলল : না না, এমনিই বলছিলুম। বিদেশে পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা। সঙ্গ ছাড়ি আর কি করে।

মিনু বলল : তোকেও আমরা ছাড়ছিনে। বীরেনদাকে সকালবেলা কলা পাঁউরুটি খাইয়েছিস। আবার পয়মন্ত মেয়ে বলে পরিচয় দিয়েছিস। বীরেনদা তোকে ছাড়লে তো!

আমি বললুম : বীরেনদা এখন তোমার বশ।

অঞ্জনা বলল : একজনকে বশ করবার মন্ত্রটা শিখলুম, কিন্তু আর একজন?

মিনু বলল : আরেক জনের বশীকরণ তো বাগ্‌দেবীর কণ্ঠে।

অঞ্জনা বলল : লক্ষ্মীর ঘটের দিকে যার নজর, বাগ্‌দেবীর বাক্যছটায় সেকি ভুলবে? আচ্ছা দেখা যাক।

গাড়ীর গতি ইতিমধ্যে শ্লথ হয়ে এসেছে। বাইরে তাকিয়ে দেখি, পূব আকাশে আলোর আভাস। হরিদ্বার স্টেশন এসে গেছে।

বেশ শীত, একেবারে জমানো। ব্যাগের মধ্যে গরম জহর কোট ছিল। সেটা বের করে গায়ে দিলুম। কিন্তু শীত মানল না। কলকাতা, কাটীহার, কাশী থেকে এ শীত অনুমান করা সম্ভব হয় নি। 'ক' থেকে 'হ' এর মধ্যে অক্ষরের ব্যবধান যেমন বেশ দূর, ক্লাইমেটও দেখি সম্পূর্ণ পৃথক। হঠাৎ বাইরে আসব বাংলা দেশ ছেড়ে উত্তর প্রদেশের এই সীমান্তে, এটা কি জানতুম? নিশ্চয়ই তা হলে প্রস্তুত হয়ে আসতুম। এসেছিলুম কাটীহার, তাই সঙ্গে এনেছিলুম ছোট বিছানা আর সাধারণ ভাবে গায়ে দেবার জন্যে একটা সস্তা দরের খদ্দরের চাদর। সে চাদর বাইরে গায়ে দেওয়া যায় না।

অঞ্জনারা হরিদ্বারের শীত সম্পর্কে সচেতন, তাই গায়ে দেবার জিনিষ নিয়ে এসেছে। সুনীলবাবু দেখি, একটা কোট গায়ে দিয়ে গলায় মাফলার পর্যন্ত জড়িয়ে নিয়েছেন। অঞ্জনার মায়ের গায়েও শাল। অঞ্জনার নিজের গায়েও সোয়েটার। মিনুও গরম সোয়েটার এনেছিল। বীরেনদা সদ্য কেনা দামী তুঁষের চাদরটা এনেছিলেন। ও চাদর একাই একশ। রাঙামাসীও কি একটা গায়ে জড়িয়েছেন দেখলাম। শুধু আমি গায়ে জড়াবার মত কিছু নিয়ে আসি নি। হরিদ্বারের শীতটাকে বাংলা দেশের শরৎকালীন পোষাক দিয়ে আটকানো যাবে না বুঝতে পারলুম। বেশ একটা কাঁপুনীই যেন অনুভব করলুম।

অঞ্জনা আমার দিকে তাকিয়ে বলল : সেকি সন্তুদা, চাদর কোথায়! একটা জহর কোট গায়ে দিয়ে শীত আটকাবেন নাকি হরিদ্বারে? ঠাণ্ডা লেগে যাবে কিন্তু।

আমি বললুম : এত যে শীত আগে বুঝি নি। আর তাছাড়া আমি তো বেড়াতে বেরুব বলে বেরুই নি, নইলে প্রস্তুত হয়ে আসতুম।

হঠাৎ অঞ্জনা দোখ উঠে গেল। নিজের ব্যাগ খুলে একটা চাদর বের করল। শালটা লেডিস নয়, জেণ্টস্। শালটা হাতে নিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল : দাদার শাল। কি জানি, কি প্রয়োজনে লাগে বলে নিয়ে এসেছিলুম।

শালটা ও আমার গায়ে জড়িয়ে দিল। বেশ আরামবোধ করলুম আমি। শীত যেন পাগলা কুকুরের মত সূক্ষ্ম ধারালো দাঁতে কামড়ে ধরছিল আমাকে। বললুম : আমাকে ঋণে জড়িয়ে ফেলছ অঞ্জনা।

অঞ্জনা বলল : জড়ানো ঋণটা না হয় নাই খুললেন। সব মহাজন তাগাদা দেয়না জানবেন।

আমি বললুম : তবু ঋণটা খাতককে খোঁচা দেয় তো।

অঞ্জনা বলল : দিক না, তবু তো আমার কথা মনে পড়বে।

আমি বললুম : না, সত্যিই তুমি লক্ষ্মী।

অঞ্জনা বলল : এই না কিছু আগে বলেছিলেন, নহ মাতা নহ কন্যা।

আমি বললুম : দেবী-মাহাত্ম্য বোঝা ভার। নৌকোর ওপর পা রাখলে তবে না নৌকো সোনা হয়। আর ঈশ্বরী পাটনী বুঝতে পারে, এ মেয়ে তো মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়।

অঞ্জনা বলল : থাক, এবার কাব্য বন্ধ করুন, গাড়ী স্টেশনে থামল।

সত্যি গাড়ি স্টেশনে থামল। হরিদ্বার স্টেশন। তাড়াতাড়ি নামতে হবে। গাড়ীটা এখানেই শেষ নয়, যাবে দেরাদুন।

দেরাদুন এক্সপ্রেস।

অঞ্জনা ডাকল : কুলি, কুলি।

আমি বললুম : কুলি ডাকতে হবে না। 'রেখেছ বাঙালী করে মানুষ কর নি।' এ অপবাদ আমি আর বীরেনদা কাটিয়ে দিয়েছি। তুমি শুধু তাকিয়ে দেখ।

তাড়াহুড়ো করে আমি আর বীরেনদা সব বিছানাপত্র নামালুম।

সুনীলবাবু বললেন : একি! একি! কুলি ডাক।

আমি বললুম : শরীরটা যখন অচল নয়, তখন আর অযথা কুলি কেন? জিনিসপত্র টানতে লজ্জা বোধ হবে এমন মনে করবেন না মেসোমশাই। যতীন বাগচীর কবিতা আছে না, 'কর্ম মোদের ধর্ম বলে কর্ম করি রাত্রিদিন'? কর্মটার মর্যাদা সত্যি আমি দিতে জানি।

জিনিসপত্র প্ল্যাটফর্মে রেখে রাঙামাসী আর মাসীমাকে নামতে সাহায্য করলুম।

ছোট্ট স্টেশন, কিন্তু পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। রিকশা আর টাঙ্গা গাড়ী সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে।

মেশোমশাই প্রশ্ন করলেন : কোথায় উঠবে সনৎ?

—আজ্ঞে, রামকৃষ্ণ মিশনে।

—ওখানে কি জায়গা পাওয়া যাবে? এ সময় বড্ড ভিড় হয় শুনেছি।

আমি বললুম : চিঠি এনেছি কাশী রামকৃষ্ণ মিশন থেকে।

মেশোমশাই বললেন : আমাদের জায়গা হবে তো?

বললুম : আমাদের হলে আপনাদেরও হবে, না হয় কারো হবে না।

উনি বললেন : বেশ, চল। মিশনে জায়গা পেলে তো খুব ভাল কথা। ধর্মশালা বড নোংরা। আর হোটেলে উঠতে সাহস হয় না। ভারত সেবাশ্রমের কথা বলেছিলেন কয়েকজন। শুনেছি, সেটাও নাকি নকল আছে।

সুন্দর, লম্বা চওড়া, গায়ের রং টক্‌টক্‌ করছে, একজন গাড়োয়ান ওর টাঙ্গায় আমাদের ডেকে নিয়ে গেল। আরও একটা টাঙ্গা নিলুম। আমাদের দুটো টাঙ্গার প্রয়োজন। মিনু, বাঙামাসী, মাসীমা আর অঞ্জনা উঠল এক টাঙ্গাতে। মেসোমশাইকে নিয়ে বীরেনদা আর আমি উঠলুম আর একটাতে। বললুম : রামকৃষ্ণ মিশনে চল।

গাড়োয়ান বলল : মিশন কিন্তু অনেক দূর। আর জায়গা পাওয়া যাবে কিনা ঠিক নেই।

বললুম : দূর হোক ক্ষতি নেই, মিশনেই যাব।

—চার রুপিয়া লাগবে।

—ঠিক আছে, চল।

গাড়ী চলল। কিন্তু তখনো হরিদ্বারের প্রকৃত রূপ আঁচ করতে পারি নি। চলমান গাড়ী থেকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম—কখন হরিদ্বারের সেই অপরূপ মন ভোলানো দৃশ্য দৃষ্টিপথে ফুটে উঠে তাই দেখবার জন্য। স্টেশন থেকে বেরুতেই একটি মূর্তি নজরে পড়ল। পথের মাঝখানে, রেলিংয়ে ঘেরা। চার হাত। দুই হাতে মালা আর ডম্বরু, আর দুইহাত মাথায় জল ঢালছে। অনবরত ফোয়ারার মত জল পড়ছে মাথায়। পেছন থেকে দেখে মূর্তিটিকে ঠাহর করতে পারলুম না। গঙ্গা এ পথেই নেমেছেন মর্তের দিকে। গঙ্গার মূর্তি নাকি! পেছন থেকে অঞ্জনার গলা শুনতে পেলুম : কি মূর্তি সন্তুদা?

ইতিহাসের ছাত্র বলে ও আমাকে সর্বজ্ঞ ঠাওরেছে নাকি? আমি বলতে যাচ্ছিলুম : বোধ হয় গঙ্গা।

কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই গাড়োয়ান বলল : মৃত্যুঞ্জয় মহাদেওজী। গাড়োয়ানরা শুধু গাড়ী চালক নয়, গাইডও। চলতে চলতে গড়গড় করে সবকিছুর পরিচয় দিয়ে যায়।

সেদিন এ মূর্তিটির তাৎপর্য ধরতে পারিনি। আজ ২৫ বছর পরে তার

স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে নতুন করে মূর্তিটি ধরা পড়ছে। এইতো সেই বিশ্বছন্দ-নৃত্যের নটরাজ, শিব, 'কারণ সমুদ্রের স্রোতে যিনি অনন্তপ্রবাহ প্রাণস্রোত ঢালছেন। ডম্বরু হল 'ও'' ধ্বনির প্রতীক। আর মালার রুদ্রাক্ষ হল অনন্ত আকাশের পরমাণু। কিন্তু বর্তমানের চিন্তা থাক। সেই অতীতের চিন্তাতেই ফিরে যাওয়া যাক।

মূর্তিটি বেশ, আর এমন জায়গায় বসানো যে, চমৎকার দেখায়।

গাড়ী শিবের মূর্তিকে পেছনে রেখে এগিয়ে চলল। মিশন ঠিক হরিশ্বারে নয়, কণখলে। ঠাণ্ডা শীতল হাওয়াটা যেন আরো জোর অনুভব করা গেল। চাদরটা মাথার উপর দিয়ে কান দুটো ঢেকে নিলুম।

বাতাস এত ঠাণ্ডা হবার কারণ এই যে, গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে গঙ্গার ধারে। হাওড়া ব্রীজ থেকে গঙ্গা দেখে এ গঙ্গাকে কি ধারণা করা যায়? আমরা যে গঙ্গার ধারে এসে পেঁাছেছি, হঠাৎ কল্পনাই করতে পারি নি। পূবে কেবল সূর্যটা উঁকি দিয়েছে। দু'ধারে বাঁধানো গঙ্গা কানায় কানায় ভর্তি। কলকল খলখল অজস্র বীচিমালা স্রোতের বুকে ফুটে উঠে ছুটে চলেছে। সে এক অদ্ভূত অপূর্ব দৃশ্য। বর্ণনা দিয়ে বোঝানো যায় না, অনুভব করতে হয় শুধু। সেই অপ্রশস্ত অথচ বেগবতী গভীর গঙ্গার এপার ওপার সেতু দিয়ে বাঁধানো। সেই সেতুর উপর গিয়ে গাড়ী উঠল। অপূর্ব! অপূর্ব!

অঞ্জনার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম পেছন থেকে: 'How Lovely'! আঃ, কি সুন্দর! কি সুন্দর! সন্তুদা দেখেছেন?'

এই দৃশ্য অন্ধেরও চোখে পড়বে, আমি দেখব না? দেখেছি ঠিকই কিন্তু দেখে বাক্ হারিয়ে ফেলেছি। তাকিয়ে দেখে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না, কথা বলতে ইচ্ছে করে না। শুধু মনে হয়, দেখি। গাড়ী ব্রীজ পার হল। ওধারে গঙ্গার ধারে ধারে বাঁধানো ছবির মত রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল। পাশে ফেনিলোচ্ছল গঙ্গা চলেছে মর্ত্যের পথে। মনে হল, থাক আশ্রয়, থাক মিশন, এখানেই বসে পড়ি। অনিমেষ নেত্রে শুধু তাকিয়ে দেখি।

কিন্তু কিছুকালের মধ্যে গঙ্গার সেই অপূর্ব দৃশ্য ছাড়িয়ে টাঙ্গা চলল ভিতরের রাস্তা দিয়ে। মনের মধ্যে রইল সেই গঙ্গার ছাপ। গাড়ী চলতে লাগল কণখলে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশে। মনে হতে লাগল, মিশনে না থেকে এই গঙ্গার ধারে কোথাও ঘর পেলে সুবিধে হত। হাতে বেশী সময় নেই। যে দুদিন থাকব, এই গঙ্গার সুনির্মল জলরাশি আর অশ্রান্ত স্রোত দেখে কাটাতে পারলে জীবন সার্থক হত।

সূর্যের রশ্মি ফুটে উঠেছে। এতক্ষণ শীতে জমে যাচ্ছিলুম। এবার একটু আরাম বোধ হল। গাড়ী এসে থামল মিশনে। একেবারে মিশনের আঙিনার মধ্যে ঢুকে গেল টাঙ্গা। চলাফেরার ভাব দেখে মনে হল, টাঙ্গাওয়ালা মিশনের সঙ্গে খুবই পরিচিত। সামনে একজন মহারাজ দাঁড়িয়ে বাগানের তদারক করছিলেন। তাঁকে গিয়ে সেলাম জানাল টাঙ্গাওয়ালা। ওর সঙ্গে সঙ্গে আমিও গিয়ে নমস্কার জানালুম।

বীরেনদাও এলেন। অঞ্জনা আর মিনু গাড়ি থেকে নেমে একটু পায়চারী করল। কাশীর মিশনের মত অত বড় নয়, অত জীবনের সাড়া নেই এই হরিদ্বারের মিশনে। দুটি কলকাতার মেয়েকে দেখা গেল ঘুরে ঘুরে সকাল বেলার রোদ উপভোগ করছে।

মহারাজ বললেন : কি চাই ?

কাশীর স্বামীজীর পত্রখানা বের করে দিলুম।

পত্রটির উপর চোখ বুলিয়ে মহারাজ বললেন : আমার তো কিছু বলবার নেই। স্বামীজী এখন অনুপস্থিত। আগে থাকতে ব্যবস্থা না করলে তো এখানে জায়গা পাওয়া যায় না। ঐ দেখুন, দুটি মেয়ে এসেছে। ওদেরই থাকবার স্থান করে দিতে পারি নি এখনও। স্বামীজী গেছেন জেলা সহরে, ফিরবেন দুদিন পরে।

সুতরাং আর কোন কথা নেই। বোঝা গেল. স্থান হবে না। মনটা ভেঙ্গে গেল। কিন্তু একদিকে আবার একটু আনন্দও হল। হরিদ্বারের প্রাণকেন্দ্র, বাঁধানো গঙ্গার ঘাট, সেতু, ব্রহ্মকুণ্ড, এসব থেকে মিশন অনেকদূরে। মিশনে থাকলে সব সময় এসব দেখা যাবে না। বরং হরিদ্বারের উপর কোন স্থান পেলে ভাল হয়। কাশীর মত ঘন ঘিঞ্জি নয় হরিদ্বার। ঝকঝকে তক তকে রাস্তা ঘাট। নেই সেই দিশেহারা করে দেবার মত গলি। সুতরাং এখানে হোটেলে উঠলেও কিছু হবে বলে মনে হল না। যা হোক, মনের অনুভূতিরও একটা বক্তব্য আছে। কাশীতে পা দিতেই মনটায় একটা সন্দেহের দোলা লেগেছিল। সে শুধু বলছিল : না, না, না। প্রত্যেকটা জিনিসে যেন সন্দেহ লাগছিল। হরিদ্বারে সেই মনের সঙ্কীর্ণতাকে অনুভব করলুম না। কেন কে জানে! হয় তো স্থান মাহাত্ম্য।

মহারাজের কাছ থেকে ফিরে আসতে অঞ্জনা বলল : কি হল সন্তুদা ?

বললুম : এখানে জায়গা নেই।

সুনীলবাবু মাফ্‌লার গলায় জড়িয়ে জড়সর হয়ে টাঙ্গায় বসে ছিলেন। বললেন : আগেই জানতুম। এখানে সহজে জায়গা মেলে না। কি আর করবে ফিরে চল।

অঞ্জনা বলল : ভালই হল, গঙ্গার কাছ থেকে এ জায়গাটা অনেক দূরে। হরিদ্বার এসে যদি গঙ্গার অপূর্ব দৃশ্যই চোখে না পড়ল তবে আর কি ?

বীরেনদা বললেন : বাবা কালি-কমলী ওয়ালার আশ্রমে যাওয়া যাক।

সুনীলবাবু বললেন : সেত লছমন ঝুলায় !

লছমন ঝুলা আর হরিদ্বারের তফাৎ বীরেনদা নিশ্চয়ই হিসেব করে দেখেন নি। যাত্রাকালে কে তাকে বাবা কালি-কমলীওয়ালার কাহিনী বলে দিয়েছিলেন, তাই মনে মনে ঘুরছে। কাশী থেকে বলে আসছেন, যদি হরিদ্বার মিশনে জায়গা না পাই, তবে কালি-কমলীওয়ালার ধর্মশালায় আশ্রয় নেব।

সুনীলবাবু বললেন : তার চেয়ে ভারত সেবাশ্রমে চল। সেখানে থাকব।

টাঙ্গাওয়ালা বলল : ওহি আচ্ছা হোগা বাবু। উধার জায়গা মিলে যাবে।

অঞ্জনা বলল : হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই চল। না হয় হোটেলে থাকা যাবে।

বীরেনদা যেন চমকে উঠলেন ঃ না, না, হোটেল টোটেল নয়।

বুঝলুম ঃ কাশীর হোটেলের পার ডে দশ টাকা চার্জের আতঙ্ক এখনো বীরেনদার মনে লেগে রয়েছে।

অঞ্জনা বলল ঃ সে যা হয় হবে'খন। আগে চলুন তো।

আমাদের গাড়ী ফিরে চলল আবার হরিদ্বারের দিকে।

অঞ্জনাদের গাড়ী আগে। পেছন দিকে মুখ করে অঞ্জনা আর মিনু বসে। আমি পেছনের গাড়ীতে সামনের দিকে মুখ করে। অঞ্জনা মুখে হাসি টেনে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কি এক অপার কৌতুক যেন ওর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। মিনু কিন্তু সটান আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছে না। কাশীতে যতটা সহজ সে আমার কাছে ছিল, এখানে বা হরিদ্বারের পথে গাড়ীতে ততটা সহজ ভাব হতে পারে নি। কেন? অঞ্জনা মিনু আর আমার সম্পর্ক সম্পর্কে তাকে সচেতন করে দিচ্ছিল বলে কি? মিনু যেন আমাকে দেখেও দেখছে না।

আমার সামনে অঞ্জনা। মুখ আমার দিকে। সরস যৌবনে উজ্জ্বল স্বাস্থ্যবতী অঞ্জনা। লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখবার ইচ্ছা যে না হোল তা নয়। কিন্তু প্রকৃতিরও এক অপ্রতিরোধ্য আহ্বান। সে দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে যেতে লাগলুম আমি। মনের অবচেতনে একটি কথা নিশ্চয়ই মনে হচ্ছিল, চিরকালের জন্য তো আর হরিদ্বারে থাকছি না। চলে যাচ্ছি দু'এক দিনের মধ্যেই। যতটা পারি দেখে নি। আর দেখা হবে কিনা কে জানে!

আমার তন্ময় ভাব লক্ষ্য করে অঞ্জনা বলল ঃ কি সন্তুদা, একেবারে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন বলে মনে হচ্ছে?

হেসে তার দিকে ফিরে তাকালুম।

অঞ্জনা বলল ঃ বুঝতে পাচ্ছি, হরিদ্বারে আমাদের মূল্য আর থাকবে না।

আমি বললুম ঃ আমাকে অত বেশী মূল্য দিও না।

অঞ্জনা আড়চোখে মিনুর দিকে তাকিয়ে বলল ঃ আমি মূল্য দেব আপনাকে? তবে তো সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে যাবে। আপনার মূল্য যাচাই করার ইচ্ছা আমার নেই। ভাবছি নিজেদের মূল্যের কথা।

পাশাপাশি সবাই। পাশে সুনীলবাবু আর বীরেনদা। এসব আলোচনা ওদের পাশে বসে করতে আমার অত্যন্ত লজ্জা করে। গাড়ীতে তবু আমাদের বেঞ্চটা অনেকটা তফাতে ছিল। আমি কোন উত্তর দিলুম না।

আবার গঙ্গার উপর সেতু পার হয়ে গাড়ী এল এপারে। সেই অপূর্ব নীল জলরাশির প্রবল অমিলন স্বচ্ছ প্রবাহ। কলকল খলখল শব্দে প্রাণের মধ্যে একটা স্পন্দন জাগে। গাড়ী মৃত্যুঞ্জয় শিবের মূর্তি ঘুরে মূল হরিদ্বার সহরে প্রবেশ করল। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে পথ। রাস্তায় একটা সূচ পড়লে দেখা যাবে যেন। সিমেণ্ট আর পাথর

দিয়ে প্লাস্টার করা রাস্তা। ভারতবর্ষে কংগ্রেসী আমলে এমন সুন্দর একটা জায়গা আছে ভাবা যায় না।

আরো অনেক টাঙ্গা চলেছে। সব টাঙ্গাই যাত্রী বোঝাই। সকলেই আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটছে। একটা উদ্বেগের ছাপ সকলের মুখেই। ভারত সেবাশ্রমের কাছে এসে টাঙ্গা থামল। দেখলুম, ইতিমধ্যেই অনেক গাড়ী এসে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়োয়ানরা দালাল হিসাবে আশ্রমের স্বামীজীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। আমাদের টাঙ্গা-ওয়ালাও নেমে গেল। কিন্তু দু'এক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে জানাল ঃ বাবুজী, ইধার ভি জায়গা মিলবে না।

সর্বনাশ তাহলে, উপায় ? বীরেনদার মুখ দেখি শুকিয়ে গেছে। সুনীলবাবুও চিন্তান্বিত। দলে দলে টাঙ্গা আসছে, যাচ্ছে। সবারই সমস্যা ঃ ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী।

ঠিক যেন তাই। হরিদ্বার ছোট্ট একটি জায়গা। অথচ পুজোর মরশুমে বাংলা দেশ ভেঙে ভিড় করেছে এখানে। বাঙালী ছাড়া, মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী তো আছেই।

টাঙ্গাওয়ালাকে বললুম ঃ কি করা যাবে ?

টাঙ্গাওয়ালা বলল ঃ ঘাবড়াইয়ে মাৎ। জায়গা জরুর মিলে যাবে।

টাঙ্গা ঘুরিয়ে আবার সে ছুটল। মনে পড়ল, রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার লাইন ঃ আর কতদূর নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী।

রাস্তায় দেখি, পরিচিত এক লোকের মুখ। বেহালার লোক। সত্য ব্যানার্জী নাম।

টাঙ্গাওয়ালাকে বললুম ঃ রোখ।

সে থামল।

সত্যবাবু আমায় দেখে বললেন ঃ এখানে যে ?

—এলুম একটু বেড়াতে। উঠেছেন কোথায় ?

—ধরমশালায়।

—জায়গা হবে ?

—আরে মশাই জায়গা। অনেক কষ্টে আমি পেয়েছি। কত লোক ফিরে যাচ্ছে।

মুখটা এবার শুকিয়ে গেল ঃ আচ্ছা, চলি। আবার দেখা হবে।

টাঙ্গা চলল আবার। এসে থামল এক ধরমশালার কাছে। গঙ্গার ধারেই একেবারে। মেহেরচাঁদ ধরমশালা।

টাঙ্গাওয়ালা 'মাইজী, মাইজী' বলে চিৎকার করতে করতে একেবারে ভেতরে ঢুকে গেল। কার সঙ্গে কি কথা বলল। তারপর বেরিয়ে এসে আমাকে ডাকল ঃ আসুন, বাবুজী। মাইজীর সঙ্গে কথা বলুন।

আমি বীরেনদাকে বললুম ঃ যান, কথা বলুন।

বীরেনদা বললেন : তুমিও এসো।

আমরা দুজনেই নেমে গেলুম।

এক ভদ্রমহিলা, গুজরাটী হবেন বোধহয়। পরে জানলাম গারোয়ালী। তিনিই এই ধরমশালার ইনচার্জ। একটু উঁচু দাঁত। মোটাসোটা চেহারা। মধ্য বয়েস। বললেন : কতদিন থাকবেন?

বললুম : দু একদিন।

—বেশী নয় তো?

—না।

মহিলাটি বললেন : একটা ঘর আছে। কলকাতা থেকে বাবুলোক আগেই রিজার্ভ করে রেখেছেন। তিন দিন পর আসছেন। সুতরাং দু'দিনের জন্য দিতে পারি। তার বেশী নয়।

দু'দিনের আশ্রয় নয় তো অনন্তকালের আশ্রয়? যেন স্বর্গ হাতে পাওয়া গেল। বললুম : না, না, কোনমতে দু'দিনের বেশী থাকব না।

—কে কে আছেন আপনাদের?

রাঙামাসী, মিনু, অঞ্জনা. অঞ্জনার মা বাবা, আমাদের সকলের কথাই জানালুম। বললুম : দুটো ঘর হলে ভাল হয়।

মহিলাটি বললেন : আর একটি ঘর আজকে খালি হবে বিকেলে। আপাতত একটা ঘরে থাকতে পারেন।

জানালুম : তাতে কোন অসুবিধা হবে না।

সেই অনুপাতে খাতায় আমাদের নাম Entry করতে হল। পাঁচ টাকা জমা দিতে হল। প্রতিদিন ঘর পিছু এক টাকা। চার আনা আলোর জন্য। সব শুদ্ধো পাঁচ সিকে ঘর প্রতি।

বীরেনদার মুখে হাসি ফুটল : এ Charge নিতান্তই সামান্য, হোটেলে যে যেতে হয় নি এ জন্য ধন্যবাদ!

বাইরে এসে দেখি, ওরা সব টাঙ্গায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

সুনীলবাবু বললেন : কি হে, জায়গা মিলল?

আমি বললুম : আপাতত মিলল। তবে দুটো ঘর পাওয়া গেল না। বিকেলে মিলতে পারে একটা ঘর।

অঞ্জনা বলল : বাব্বা, পাওয়া যে গেছে এই ভাগ্যি। নামো, নামো সব।

টাঙ্গা থেকে ঝুপ করে নেমে পড়ল অঞ্জনা। আমি আর বীরেনদা বিছানাপত্রগুলো টেনে নামালুম। অঞ্জনা নামাল রাঙামাসী আর ওর মাকে।

দোতলায় আমাদের ঘর। আমি আর বীরেনদা তর্‌তর্ করে উঠে গিয়ে ঘর খুলে নিলুম। ঘরটা ভাল। একেবারে বারান্দার গায়ে। গঙ্গামুখী। সামনে বারান্দা। রেলিং জাল দিয়ে ঘেরা। পরিষ্কার।

বীরেনদা আমাকে বললেন : যাও, নিচে যাও। ওদের নিয়ে এস। আর একটা স্যুটকেস রয়েছে। আমি বাথরুম আর ল্যাট্রিনটা দেখে নিই। এসব আগে দরকার, বুঝলে।

—দেখুন। বলে নিচে নেমে এলুম আমি।

অঞ্জনাকে দেখি, রাঙামাসী আর ওর মাকে নিয়ে উপরে উঠছে। পিছনে সুনীলবাবু।

টাঙ্গার কাছে মিনু দাঁড়িয়ে। একটা স্যুটকেস পাহারা দিচ্ছে। আমাকে নিচে নামতে দেখে একটু মুচকি হাসলো অঞ্জনা। সে হাসির ইঙ্গিত ধরতে আমার এতটুকু বিলম্ব হল না।

অঞ্জনা বলল : ঘরটা কোন্ দিকে ?

বললুম : দোতলায় একেবারে বারান্দার দিকে। বেশ ভাল ঘর। আলো বাতাস আছে। যাও, বীরেনদা দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি নিচে নেমে এলুম।

শীতে একটু শুকনো শুকনো, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, আর মলিন দেখাচ্ছে মিনুকে।

আমি টাঙ্গাওয়ালাকে প্রথম টাকা মিটিয়ে দিলুম। দুটো টাঙ্গাতে দশ টাকার কম ছাড়ল না। যতটা পথ ওরা অতিক্রম করেছে, তার মজুরি দশ টাকা হতে পারে না। কিন্তু টাঙ্গাওয়ালা যে জায়গা করে দিয়েছে, সে জন্যে দশ টাকা ওকে দিতে বাধল না। ওদের বিদেয় করে স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে বললুম : চল মিনু।

মিনু অনেক ক্ষণ পরে আমার দিকে স্পষ্ট করে তাকান।

বললুম : কিছু বলবে ?

—না।

—মনে হল যেন কিছু বলবে ?

—না।

—বলই না।

—জায়গাটা ভারি সুন্দর, না ?

—হ্যাঁ। আমি বললুম : শুধু যদি তুমি আর আমি থাকতুম !

মিনু গম্ভীরভাবে আমার দিকে তাকাল : সে কথা তোমার মনে হয়েছে তাহলে ?

বললুম : স্বপ্ন দেখতে দোষ কি ?

মিনু বলল : আমার বহু ভাগ্য। কিন্তু ভাবছি, সত্যিই তুমি সে স্বপ্ন দেখছ কি না ?

অঞ্জনারা সহযাত্রী হবার পরই, মিনু কেমন একটু গম্ভীর হয়েছে। তাহলে মিনুর মনে কি অন্য কোন রকম প্রশ্ন উঁকি দিয়েছে ? অঞ্জনা বেশী কথা বলে। সহজে আপন করে নেয়। মিনু কি তাকেই অন্য রকম করে ভাবল নাকি ? অথচ অঞ্জনা তো ওরই বন্ধু !

বললুম : তুমি কি···

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মিনু বলল : ওপরে চল।

আমি বললুম : সত্যি তুমি তো কোন...

মিনু একটা ব্যাখ্যাতীত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল : ওপরে চল তো।

আমার কথাটা আমি শেষ করতে পারলুম না। মনের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল।

উপরে উঠে দেখি, অলরেডি কোমরে আঁচল জড়িয়ে অঞ্জনা ঘরে ঝাঁট দিতে লেগে গেছে। আমায় দেখে সে হেসে তাকালো : কি, ঠিক একজন ঝাড়ুদারনীর মত দেখাচ্ছে তো? সবই পারি। শুধু পারি নে মিনুর মত লেখাপড়া করতে।

মিনু বলল : হ্যাঁ, স্কুল ফাইনালই তুমি এখনো পাশ কর নি কিনা?

দুষ্টু চাহনীতে মিনুর দিকে তাকিয়ে সে বলল : একে ধরতে গেলে এখনো কার নি। আমি তরবর করে পড়েই গেলুম, Result-এর বেলায় শূন্য। একজন মনে মনে পড়েও পাশ করে গেছে।

মিনু একবার আমার আর একবার অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে বলল : ভার্বেল পরীক্ষা দিচ্ছিস নাকি?

অঞ্জনার মুখটা লাল হয়ে উঠল। আমার দিকে তাকিয়েই সে মুখটা নামিয়ে নিল। মিনু যে কাজ জানে তা প্রমাণ করবার জন্যে সেও বিছানা খুলে পাততে লাগল।

আমি বাইরের বারান্দায় বসে গঙ্গার দিকে তাকালুম। ওপাশে দুটো বাড়ির ফাঁকে গঙ্গার চলমান স্রোত লক্ষ্য করা যায়। সূর্যরশ্মি গঙ্গার বুকে পড়ে চিক্‌চিক্‌ করছে। গরম পশমের স্পর্শের মত তার আলো এসে মুখের উপর লাগল। তা হলে এই সেই হরিদ্বার!

হঠাৎ গা ঘেঁসে এসে অঞ্জনা দাঁড়াল : দেখলেন, মিনু কি ভাবল?

আমি একটু হেসে তার দিকে তাকালুম।

একটু হাসল অঞ্জনাও : ভার্বেল পরীক্ষা দিয়ে একজামিনারকে কাৎ করা যায় বলে বিশ্বাস করেন আপনি?

আমি বললুম : ওরাল এক্‌জামিনেশন বলে কথাটা তা হলে আছে কেন?

অঞ্জনা কোন কথা বলল না। শুধু কেমন একটা দৃষ্টিতে আমার দিকে একটু তাকাল। তারপর ঘরের মধ্যে চলে গেল। আমার বুকের মধ্যেটা ছলাৎ করে উঠল।

ইতিমধ্যে বীরেনদা প্রাতঃকর্ম সেরে এসেই ব্যাগ খুলে তেলের শিশি বের করলেন : আগে স্নানটা সেরে আসি। শুনেছি, হরিদ্বারের গঙ্গায় স্নান করলে নাকি সঙ্গে সঙ্গে শরীর ভাল হয়ে যায়।

পুণ্যার্থিণী রাঙামাসী। বললেন : হ্যাঁ, চল, আগে মা গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি।

অঞ্জনা বলল : বারে ! আমরা বাদ যাব নাকি ? দাঁড়ান, ঘরটা গুছিয়ে নি। আমরা সবাই এক সঙ্গে যাব। এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে নাকি ?

আমি বললুম : বাথরুমের জলটা কিরকম দেখলেন, বীরেনদা ?

বীরেনদা বললেন : ওরে বাবা, তোড়ে জল পড়ছে। শুনলুম, সবসময় জল থাকে।

অঞ্জনা বলল : সেকি ! গঙ্গায় যাবেন না তাহলে ?

আমি বললাম : আজকে আর নয়।

—ওমা, সেকি কথা ! বুড়ো হয়ে গেলেন নাকি ?

মিনু বলল : জানিস না, জ্যোতিষ আশ্রমের জ্যোতিষী ওকে কি বলেন ?

—কি ?

—'বার্ধক্য জরসা বিনা।'

আমি বললুম : যাই বল আমাকে আজ গঙ্গায় যাব না আমি।

সুনীলবাবু বললেন : সেকি।

—না, বড় tired feel করছি।

—গঙ্গায় ডুব দাও, দেখবে সব ক্লান্তি চলে যাবে। হরিদ্বারের গঙ্গার এটা বিশেষ মাহাত্ম্য।

রাঙামাসী বললেন : হরিদ্বারের গঙ্গায় স্নান করে পুণ্যি করে সবাই। তুই কিরে।

অঞ্জনা বলল : উনি পুণ্যি করতে আসেন নি। মানুষ দেখতে এসেছেন। ধর্মের কাহিনী কাকে শোনাচ্ছেন মাসীমা ?

ততক্ষণে বীরেনদা জামা গেঞ্জি খুলে গায়ে তেল মালিশ করতে লেগে গেছেন। বললেন : থাক, একজন ঘরে থাকা উচিত।

বললুম : সেই ভাল। আপনারা যান, আমি ঘর পাহারা দিচ্ছি। ইতিমধ্যে ঘর গোছগাছ করে সবাই প্রস্তুত। মিনু আর অঞ্জনাও কাপড় চোপড় বের করে ঘাটে যাবার জন্যে তৈরি হল।

সুনীলবাবু পর্যন্ত গায়ের জামা খুলে রোদে পিঠ দিয়ে তেল মেখে নিলেন।

বীরেনদা বললেন : আমরা তেল মাখতে মাখতে তুমি বাথরুমে গিয়ে স্নানটা সেরে এসো। ভিড় হয়ে যাবে এখনি।

—সেটা মন্দ নয়।

সুতরাং জামা খুলে তোয়ালে নিয়ে আমি বাথরুমে গেলুম। টাটকা জল। বেশ স্নিগ্ধ। স্নানটা সেরে নিলুম আমি। শরীর হালকা বোধ হল।

বেরিয়ে এসে দেখলুম, রাঙামাসী, মিনু, অঞ্জনার মা, আর সুনীলবাবু ততক্ষণে চলে গেছেন। বীরেনদা দাঁড়িয়ে। আমায় দেখে বললেন : তুমি তাহলে বোস, আমি যাই।

আমি কাপড়টা মেলে দিয়ে জামাকাপড় পরে বারান্দায় রোদে গিয়ে দাঁড়ালুম।

আমাদের ঘরের সামনে রাস্তার ওপাশে একটা মেয়েদের স্কুল। কিন্তু নাম লেখা 'আনন্দময়ী কলেজ'। গুটিগুটি করে মেয়েরা দেখি এসে দাঁড়ালো সেই স্কুলের সামনে। ছোট থেকে বড়, সব রকমের মেয়ে। পাঞ্জাবী মেয়েদের মত পোষাক। সুন্দর স্বাস্থ্যবতী সবাই। মুখে একটু রা নেই। গোলমাল নেই। নীরবে একে একে সব আসছে, জড় হচ্ছে। আমি সেই দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম। রোদের তেজ অনেকটা বেড়ে গেছে। সকাল বেলার সেই কামড়ানো শীত আর নেই। রাস্তার ওপাশে বাড়িগুলোর ধারে গঙ্গার কল্‌কল্‌ স্রোত শোনা যাচ্ছে। ওরা ফিরে এলে ওখানে গিয়ে বসতে হবে।

আধ ঘণ্টা পরে দল বেধে অঞ্জনারা সব ফিরে এল। গঙ্গায় স্নান করে একটা স্নিগ্ধতায় ভরে উঠেছে যেন সবাই।

রাঙামাসীর মুখে পুণ্য সঞ্চয়ের এক তৃপ্তি। অঞ্জনার মার মুখেও তাই। ভিজে চুলের রাশি পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে মিনু আর অঞ্জনা। ওদেরও দেখতে বেশ লাগছে।

অঞ্জনা বললে ঃ ভুল করলেন সন্তুদা। সত্যি, বড় আরাম গঙ্গায় স্নান করে।

আমি বললুম ঃ গঙ্গাস্নানের পুণ্যে তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হোক।

বীরেনদা বললেন ঃ না, সত্যি বড় ভাল। ডুব দিয়ে ওঠার সময় শরীরটা হালকা বোধ হয়। কত লোক স্নান করছে। ছেলেমেয়ে সবাই। বাঁধানো চাতাল। ভিড় জমে গিয়েছে সেখানে।

সুনীলবাবু বললেন ঃ না, সন্তু, গঙ্গার একটা মহিমা আছে। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলেছিলেন ঃ পাহাড় ধুয়ে নানা রকম মিনারাল আসে তো জলের সঙ্গে। জল যেন ঔষধ হয়ে যায়। আমার বাতের ব্যথাটা ডুব দিয়ে উঠে আর টের পাচ্ছি না।

রাঙামাসী বললেন ঃ গেলে পারতিস। তোরা যে কি হয়েছিস একালের ছেলেমেয়েরা!

প্রকৃতপক্ষে গঙ্গার মাহাত্ম্যকে অস্বীকার করার জন্যে যে আমি যাই নি তা নয়। নির্জন বাথরুমে স্নান করি। হাজারো লোকের সামনে স্নান করতে কেন যেন দিক্‌ বোধ করছিলুম আমি। তাই যাই নি।

ইতিমধ্যে বীরেনদা জামাকাপড় ছেড়ে মাথা আঁচড়ে নিয়েছেন।

বললেন ঃ এবার খাবার ব্যবস্থাটা করতে হয়।

মিনু হেসে আমার দিকে তাকাল। খাবার ব্যাপারে বীরেনদার দুর্বলতার কথা সে আর আমি ভাল করেই জানি।

আমি অঞ্জনার দিকে তাকালুম ঃ অঞ্জনা, আজ নিশ্চয়ই জলখাবার সঙ্গে নেই তোমার?

অঞ্জনা বলল ঃ রাস্তায় আসতে গরম পুরী ভাজতে দেখলুম। আর শুনেছি হরিদ্বারের রাবড়ি বিখ্যাত।

আমি বললুম : চলুন বীরেনদা, খোঁজ করা যাক।

সুনীলবাবু হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন : বেলা নটা বেজে গেছে। এখন আর জলখাবার খেয়ে কি হবে? চল, ঘাটে যাই। ব্রহ্মকুণ্ডে হর কি পৌড়িতে পুজো দিয়ে এসে একেবারে খেয়ে দেয়ে গাড়ী বা টাঙ্গা ঠিক করে বেরিয়ে পড়া যাবে। আজকে হরিদ্বারের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে নিতে হবে। কাল বেরিয়ে পড়ব হৃষিকেশ আর লছমন ঝুলার উদ্দেশে।

রাঙামাসী বললেন : হ্যাঁ, সেই ভাল। হরিদ্বারে বসে গঙ্গার পুজো না দিয়ে কিছু খাওয়া উচিত হবে না।

বীরেনদার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম—থমথম করছে মুখখানা। সেই থমথমে ভাব লক্ষ্য করে অঞ্জনা আর মিনু মুখ টিপে হাসতে লাগল। আমি বীরেনদাকে বললুম : চলুন, কি আর করা যাবে। পুজোটাই আগে সেরে আসা যাক।

বীরেনদার মুখে পরাজয়ের ছাপ : চল।

আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালুম। মিনুরা মিনিট খানেকের মধ্যে কাপড় চোপড় পরে রেডি হয়ে নিল। সদলবলে হর কি পৌড়ির দিকে বেরুলাম।

কাশীর মত পান্ডা নেই হরিদ্বারে। রাস্তা থেকেই বিরক্ত করতে আরম্ভ করে না।

তবে সরু দীর্ঘ রাস্তা ধরে এখানেও ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে অগ্রসর হতে হয়। অবশ্য এপারে যারা থাকে, তাদের। ওদিকে ঘাটের উপরই বড় বড় হোটেল আছে। পঁচিশ ত্রিশ টাকা পার হেড ডেইলি চার্জ। তাদের আর গলিপথে হাঁটবার প্রয়োজন হয় না। দুদিকে প্রচুর মনোহারী দ্রব্য ভ্রমনবিলাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গরম পুরি, রসগোল্লা আর রাবড়ি পরপর সাজানো। যেতে যেতে একটা বাঙালী হোটেল চোখে পড়ল।

অঞ্জনা বলল : সন্তুদা, ঐ একটা বাঙ্গালী হোটেল। ফিরে এসে ওখানেই ভাত খেয়ে নেব। ভাত নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে ওখানে।

আমি বললুম : ভাত পাওয়া যায় না কোথায়? লন্ডনে পর্যন্ত ভাত মেলে, এ তো ভারতের অঙ্গ। ভাতের জন্যে চিন্তা নেই। তবে মাছ পাবে না, এটা ঠিক। এখানে মাছ মাংসের চলন নেই।

মিনু বীরেনদাকে ক্ষেপাবার জন্য বলল : বীরেনদা, শুনেছি, হরিদ্বারের রাবড়ি একেবারে খাঁটি।

বীরেনদাকে দেখলুম, সাগ্রহ দৃষ্টিতে রাবড়ির দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলেন।

আমি বললুম : বীরেনদা, খাঁটি দুধের তো? ব্লটিং দিয়ে তো তৈরী করে নি?

অঞ্জনা বলল : সবই আপনার বাংলা দেশ নাকি!

আমি বললুম : খাঁটি দুধ আর খাঁটি ঘি এ দেশে আর মিলবে বলে ভরসা হয় না।

বাংলা দেশে তো দুধে জল মেশায় না, জলে দুধ মেশায়। এখানে কি দুধেও জল মেশাবে না? বিজ্ঞাপন দাতারা বিজ্ঞাপন দিতে গিয়ে সাহস করে খাঁটি দুধ ঘিয়ের কথা বলতে পারে না। বলে. 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। কিন্তু ঋণও মেলে না, আর খাঁটি ঘিও পাওয়া যায় না।' এ রকম ভাষায় বিজ্ঞাপন দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় প্রায়ই দেখবে।

রাঙামাসী এই প্রথম কথা বললেন: এবার পা চালিয়ে চল্ তো। আগে পুজোটা দিয়ে নি। তোদের তর্ক পরে হবে।

আবার চলতে লাগলুম। কিন্তু যতই এগুতে লাগলুম, ততই একটা কামড়ানো শীত অনুভব করতে লাগলুম। ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম, আর কয়েক পা এগিয়েই। সামনেই গঙ্গা। হরিদ্বারের সর্বাপেক্ষা পুণ্য স্থান ব্রহ্মকুণ্ড। ভাগ্যিস জহর কোটটা গায়ে চড়িয়ে এসেছিলুম কিন্তু তাতেই কি শীত মানে! দাঁতে দাঁত লেগে যেতে লাগল। আশ্বিন কার্তিকেই যে এত শীত সেটা কি অনুমান করতে পেরেছিলুম।

অঞ্জনা আমাকে লক্ষ্য করছিল বলল: 'চাদরটা নিয়ে এলেন না কেন?' চাদরটা অঞ্জনাই দিয়েছিল এখানে গায়ে দেবার জন্য।

বললুম: ঋণ আর কত বাড়াই? শোধ করব কি করে?

অঞ্জনা একটা বিদ্রুপের দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষেপ করে বলল: বাবা, ঋণ সম্বন্ধে খুব সচেতন দেখছি?

বললুম: ঋণ করে ফরাসী রাজারা মরেছেন। ভারত আমেরিকার কাছে ডুবতে বসেছে।

অঞ্জনা বলল: আপনি যে ইতিহাসের অধ্যাপক সেটা জানি। কিন্তু এটা ধর্ম স্থান! দেখতে দেখতে এসে দাঁড়ালুম ব্রহ্মকুণ্ডের পাশে। সকাল বেলার সূর্যের নিচে যেন এক খণ্ড স্বর্গ ঝলমল করছে। বাঁধানো গঙ্গার তীর। যেন ইউরোপের কোন সী-বীচ। পার্থক্য এই, গায়ে চন্দন মেখে আছে। সারি সারি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে যেন মুক্তির মধ্যে। কিছু ভিখারী। পাণ্ডার উৎপাত মোটে নেই। কে যেন রাঙামাসীকে হয় তো পুণ্যার্থিনী ভেবে ধরে বসল। কিন্তু সে দিকে আমার খেয়াল নেই।

৮.

পঁচিশ বছর পরে আবার এসে দাঁড়িয়েছি ব্রহ্মকুণ্ডের ধারে। ভাবছি ব্রহ্মকুণ্ডের কথা। ব্রহ্মকুণ্ডের ধর্মীয় গুরুত্বের পেছনে রয়েছে একটি পুরাণ-কাহিনী। যে কাহিনীর মূল বক্তব্য: সমুদ্রমন্থনজাত অমৃত দৈত্যেরা যাতে না পায় সেই জন্য দেবতারা অমৃতকলসী এই ব্রহ্মকুণ্ডে এনে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেই থেকেই অপরিসীম পুণ্যের আকাঙ্ক্ষায়,—সম্ভবত অনন্ত জীবন লাভের প্রত্যাশায় লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী প্রতি বছর এখানে স্নান করতে আসেন।

ব্রহ্মকুণ্ডে ক্ষীরসমুদ্র মন্থন জাত অমৃত একটি কলসীতে ভরে দেবতারা এখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন, এমনতর গল্প সত্যিই অবিশ্বাস্য। ২৫ বছর আগেও এ বিষয়ে

আমার বদ্ধমূল সন্দেহ ছিল, যে জন্য ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীকে আমি মনে করতুম গাঁজাখুরি। কিন্তু পাঁচিশ বছর পর কোয়ান্টাম ফিজিক্স সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান অর্জন করার পর পৃথিবীর সকল দেশেরই পৌরাণিক কাহিনী সম্পর্কে আমার ধারণা আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে—যা ইহজীবনেই আমার কাছে জন্মান্তর তুল্য। ফিজিক্সের বড় একটা ভাষা যেমন অঙ্ক, তেমনই প্রাচীন ঋষিদের সত্য দর্শন সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য পেশ করার মাধ্যম ছিল সাংকেতিক কাহিনী, যাকে বলা হয় রূপক। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই রূপক ব্যাখ্যা করতে গেলে এর আশ্চর্য অর্থ আমাদের কাছে উন্মাটিত হয়। শুধুমাত্র ভারত নয়, প্রাচীন মিশর এবং আমেরিকার মায়া, ইনকা ও অ্যাজটেক প্রভৃতি সভ্যতার তৎকালীন রূপক মাধ্যমে প্রকাশিত অভিজ্ঞতাও বর্তমানে কোয়ান্টাম ফিজিক্সের আবিষ্কারের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিলে যাচ্ছে। বিশ্বজগতের উৎপত্তি ও তার প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে বর্তমান কোয়ান্টাম ফিজিক্স যে তত্ত্ব খুঁজে পেয়েছে, তা এই সব প্রাচীন সভ্যতার ধ্যান ধারণার সঙ্গে হুবহু এক।

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে যে প্রাচীন ধারণা আছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, তত্ত্ব বা উপাদান সম্পর্কে সকলেই আদি সলিলের উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষে এই আদি সলিলকে বলা হয়েছে কারণ সলিল। মিশরীয় পুরাণ কাহিনীতে একে বলা হয়েছে নুনের (Nu) এর বিশৃঙ্খল জল যার মধ্যে আমোন (Amon) আলোড়ন সৃষ্টি করে জগৎ তৈরি করেছেন। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের জেনেসিসে এই ধরনের বর্ণনা আছে: ঐশ্বরিক মানস জলের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এমন সময় ইচ্ছা করলেন, জলের উপর আকাশ তৈরি হোক জল থেকে জল বিভক্ত হোক। ঈশ্বর এইভাবে আকাশ এবং কারণ সলিল থেকে আকাশের নিচস্থ জলকে বিভক্ত করলেন। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতেও (ঐতরেয় উপনিষদ) এই ধরণের কাহিনী আছে: তিনি চিন্তা করলেন যে, আমি নানা জগৎ (স্তর) তৈরী করব, যেমন, আদি সলিল, আলোর রাজ্য, মৃত্যু, জল ইত্যাদি। এইভাবেই স্বর্গের উপরে কারণ সমুদ্র, তার ওপর মেঘের মত আকাশ তৈরি হল। আর হাওয়ামণ্ডল হল আলোতে পরিপূর্ণ। এল মৃত্যু অর্থাৎ ঘনীভূত পদার্থ। এর নিচে হল জল।

মধ্য আমেরিকার পৌরাণিক কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে পঞ্চ সূর্যের উল্লেখ। পঞ্চম সূর্য থেকে তৈরী হয়েছে আমাদের স্থূল জগৎ। ঠিক এর উপরেই হল জলের অবস্থান। এদের চিন্তাধারা ভারতীয়দের ক্ষিতি, অব, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ তত্ত্বের মত। এই পঞ্চতত্ত্বই হল পঞ্চসূর্য (Energy-এর বিভিন্ন স্তর)। আদি সলিল বলতে প্রাচীনেরা যা বুঝিয়েছেন তা স্থূল H_2O জাতীয় জল থেকে পৃথক।

সব প্রাচীন পৌরাণিক আখ্যায়িকাতে আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে, জলের পরেই আসছে আগুন। জেনেসিসে বর্ণনা আছে এই ধরনের: আলো সৃষ্টি হবার পূর্বে ছিল আদি সলিল। আদি সলিলে জল থেকে আকাশ বিচ্ছিন্ন হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই আলো আদি সলিলের মধ্যেই ছিল।

আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানে দেখা যাচ্ছে যে, জগতের আদি উপাদান ছিল তেজ (energy)। কোয়াণ্টাম ফিল্ড তত্ত্ব অনুযায়ী এই শক্তি বা তেজ শস্য দানার মত পিণ্ড তৈরী করে নিজেকে প্রকাশ করে। ত্রিমাত্রিক গতি হিসেবে সারা দেশ (space) আচ্ছন্ন করে রয়েছে এই শক্তি। আইনস্টাইন এই জন্যই বলেছেন যে, দেশ থেকেই বস্তুর আবির্ভাব হয়েছে। দেশে field অত্যন্ত ঘনীভূত হয়েই বস্তুর আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছে।[১] কোয়াণ্টাম ফিজিক্সের এই যে ধারণা, অর্থাৎ দেশে চলমান শক্তিক্ষেত্রের ব্যাপ্তি, যার মধ্যে রয়েছে গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি (অর্থাৎ ঘনীভূত শক্তি) প্রাচীনদের ধারণা থেকে তা খুব যে পৃথক তা নয়।

দেশে শক্তি-ক্ষেত্রের এই সম-ব্যাপ্তিকেই প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বিভিন্ন দেশে জল বলে উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ আদি সলিল বা কারণ সলিল। জল থেকে জলকে বিচ্ছিন্ন করার অর্থ হল বস্তু তৈরি করার পথে শক্তির ঘনায়মান অবস্থা। এই জন্য ঋগ্বেদে (১০, ১৭ ৭ ক্রমিক সংখ্যা ৩, পরিশিষ্ট ১) এমন বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়, 'যখন দ্যুলোকের জল গর্ভভাবক্রান্ত হয়ে দেখা দিল, এল অগ্নি। দেব দেবীদের শ্বাস থেকে ফুটে ওঠার মত তিনি আবির্ভূত হলেন।' আরও বলা হয়েছে যে, দেবতারা দেশে নির্দিষ্ট স্থানে অধিষ্ঠান করে পরস্পর হাত মেলালে নর্তকের ঘূর্ণায়মান চরণসংঘাত জাত ধূলির মত ঘন মেঘের উদয় হল (অর্থাৎ Milky Way বা Galaxy-এর)।

জগতের আদি অবস্থা সম্পর্কে ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে এই ধরনের বর্ণনা আছে :

'তখন না ছিল অ-বস্তু না বস্তু,
না ছিল মৃত্যু না অমরত্ব ..
আদিতে শুধুই ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন অন্ধকার
এ সবই ছিল অবিচ্ছিন্ন আদিম জলরাশি।

নাসদীয় সূক্তের এই বর্ণনা থেকে একটি জিনিষ বোঝা যায় এই যে, প্রাচীনেরা শক্তিক্ষেত্র (Energy Field) ও নির্ভেজাল শক্তির (Energy per se) মধ্যে একটা পার্থক্য করতেন। একদিকে ছিল ইথারিয় (বর্তমানে যা false vacuum) মানস শক্তিক্ষেত্র (ethereal as field of thought) ও ঘনায়মান শক্তি (coarser forms that resulted from its condensation)। মানস শক্তি ক্ষেত্রকে এরা বলতেন আত্মন বা শক্তি (energy per se) এবং ঘনায়মান শক্তিকে

(১) বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে, দেশে চার্জ (ঘনীভূত শক্তি)-এর উদয় হওয়া মাত্রই সেখানে এক ধরনের অস্বস্তি দেখা দেয়। এর চতুর্দিকে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, অন্য কোন ধরনের ঘনীভূত শক্তি সেখানে দেখা দিতেই (charge-এর নানা ধরণ আছে, যেমন, positive, negative, neutral ইত্যাদি) প্রথম সৃষ্ট শক্তির জন্য সেও শক্তি অনুভব করে। দেশের (space) এই যে অবস্থা যেখান থেকে শক্তির উদয় হয় তাকেই বলে field। Tao of Physics, Fritjof Capra—p 47-48.

সলিল। জেনেসিসে ঈশ্বরের যে শক্তিকে জলের উপর ভ্রাম্যমান অবস্থায় বর্ণনা করা হয়েছে, তা হল ঘনায়মান শক্তির উপর মানস শক্তি। এই মানস শক্তির বহির্মুখী গতি (kinetic energy)-র ফলে আলোর আবির্ভাব। জল থেকে জলকে বিচ্ছিন্ন করা অর্থ বাষ্পীয় ক্ষেত্রের ঘনায়মান শক্তির ফলে নীহারিকাপুঞ্জ, নক্ষত্র, গ্রহাদির সৃষ্টি। হিন্দুদের তৈত্তিরিয় উপনিষদে সৃষ্টির মৌল উপাদান হল আত্মন অর্থাৎ নির্ভেজাল শক্তি প্রবাহ (energy per se)। এ থেকেই এসেছে আকাশ (space) বায়ু (গতি) অগ্নি (আলো) ও জল (ঘনায়মান তরল শক্তি) এবং সর্বশেষে বস্তু অর্থাৎ সর্বজ্ঞাত ভারতীয় পঞ্চতত্ত্ব—ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অব্ ও ক্ষিতি।

মিশরীয় পুরাণ কাহিনীতে নুনের অশান্ত জল বলতে বোঝাতো মানস শক্তি। এ থেকেই ঘনীভূত শক্তি আতুমের (Atum) উৎপত্তি হয়। এর মধ্যে Positive ও Negative শক্তি একত্রে যুক্ত ছিল। এইজন্য আমাদের অর্ধনারীশ্বর মূর্তির মত আতুমও স্ত্রী ও পুরুষ শক্তির সঙ্গে একত্রে যুক্ত দেবতা। মধ্য আমেরিকানরা যে পঞ্চ সূর্যের উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ শক্তির পঞ্চস্তর, তার মধ্যে প্রথম স্তর বা সূর্য ছিল মানস শক্তি। দ্বিতীয় সূর্য গতিশক্তি। তৃতীয় সূর্য আলোশক্তি। চতুর্থ সূর্য ঘনায়মান শক্তি এবং পঞ্চম সূর্য স্থূলশক্তি।

আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানে প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে শুধুমাত্র বিরাট এক সাদৃশ্যই যে খুঁজে পাওয়া যায় তাই-ই নয়, আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের Elementary particle-এর ব্যবহারের মধ্যেও প্রাচীনদের দেব-দেবী কল্পনার একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। Particle গুলির চরিত্র বিচার করলে দেখা যায় যে, তাদের কোনটার রয়েছে positive electric charge, কোনটার মধ্যে negative electric charge এবং কোনটার মধ্যে no charge

যে সব particle-এর সমচরিত্র চার্জ আছে তারা একে অপরকে আকর্ষণ করে না বরং দূরে ঠেলে দেয়। যেমন positively charged proton-আর একটি proton-কে দূরে ঠেলে দেবে। কিন্তু negatively charged particle-কে টানবে, যেমন electron Negatively charged particle electron proton দ্বারা আকর্ষিত হয়েও নিজের অস্তিত্ব হারায় না। Proton-এর সঙ্গে একত্রে মিলে যায় না। Proton-এর আকর্ষণে ধরা পড়লে দ্রুত গতিতে তাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকবে। যতই সে proton-এর বেশি কাছাকাছি আসবে ততই বেশি ঘুরতে আরম্ভ করবে কিন্তু একত্রে মিশে যাবে না। Electron ও proton-এর এই লীলার মধ্যেই রয়েছে জগৎ রহস্যের চাবিকাঠি ; যদি electron proton-এর মধ্যে ঢুকে যেত তবে অনু তৈরী হত না। Electron-এর বস্তুসাত্তিক উপাদান থাকলেও অনুর কেন্দ্রের চতুর্দিকে তা ঢেউ-এর আকারে ঘুরে বেড়ায়। একজন বৈজ্ঞানিকের ভাষায়—[১]

(১) French scientist Louis de Broglie

electron গুলি যেন দণ্ডায়মান ঢেউ বা negative energy-র মেঘস্বরূপ। এই যে positive ও negative energy-এর উৎস হল negative particle. এই particle-টির নাম neutron দেখা গেছে neutron যদি একা থাকে তাহলে তার মধ্য থেকে আপনা আপনিই ১১ থেকে ১৪ মিনিটের মধ্যে proton ও electron-এর উদয় হয়। সুতরাং অনুর উপাদান এই তিনটি particle, neutron, proton ও electron. Neutron কে বলা যায় মানস শক্তি যা থেকে Proton ও Electron-এর জন্ম, এবং Proton ও Electron-এর সম্পর্ক থেকেই জগতের সৃষ্টি। Particle গুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তাদের ঘূর্ণন—অর্থাৎ আপন অক্ষরেখাকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণন, যাকে বলে spin Spin বাদ দিলে particle-গুলি তাদের পরিচয়ই হারিয়ে ফেলবে। তবে এমন কোন কোন particle-ও আছে যাদের spin নেই—যেমন, pion. তক্ষুনি প্রশ্ন দেখা দেয় particle গুলি তবে কি? অনুর nucleus-এর চতুর্দিকে যদি electron মেঘপুঞ্জের ন্যায়ই ঘুরে বেড়ায় তাহলে তারই বা spin থাকবে কি ভাবে? তবু বৈজ্ঞানিকদের ধারণামত electron-এর spin আছে। তাহলে শেষ পর্যন্ত আমরা গিয়ে কোথায় দাঁড়াচ্ছি?

জবাব হল এই ধরনের ঃ—কোথাও নয়, অথচ সর্বত্রই। এমন জবাব পাওয়া যাবে কোয়াণ্টাম মেকানিক্সের কাছ থেকেও। Spin হল particle-এর সহজাত গুণ। তবে যদি বৃহদায়তনিক স্থূল জগতের spin-এর মত একে ভাবতে চাই তাহলেই ভুল হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি এমন সজাগ নয় যে nucleus এর চতুর্দিকে ঘূর্ণয়মান electron-এর আকৃতি দেখতে পাবে। একে particle রূপে ভাবলে তাই-ই। আবার ঢেউ রূপে ভাবলে সেটাও সত্য। Particle রূপে ভাবলে spin আছে। ঢেউয়ের মত ভাবলে spin নেই। particle-এর আকৃতি কি সেটা ধরবার চেষ্টা না করে—বরং আমাদের বাস্তব সত্যের ক্ষেত্রে তাদের অবদান কি সেটাই বিচার্য হওয়া উচিত।

হিন্দুরা শক্তিকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে ভাবে। সুতরাং একে electron-এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয়ের জন্য এই negative principle-এরই প্রয়োজন। তাঁকে কালী, দুর্গা, শতরূপা, ব্রাহ্মণী যে নামই দেওয়া যাক না কেন, সেটা তেমন কথা নয়। প্রাচীন ঋষিরা এ ধরনের দৃষ্টি নিয়েই শক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান যদি কেউ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন তা হলে তিনিও লক্ষ্য করবেন যে, বিজ্ঞানও প্রাচীন ঋষিদের দর্শনের পথ ধরেই চলেছে।

Particle-গুলোর আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এর anti-particle আছে। কিন্তু কিছু particle আছে যারা নিজেরাই তাদের antiparticle, যেমন photon ও neutral pion Particle ও anti-particle একে অপরের চক্ষুশূল। যখনই তারা কাছাকাছি আসে একে অপরকে ধ্বংস করে দেয়। অথচ এমন বিপদের সম্ভাবনা রয়েই গেছে, কারণ particle ও anti-particle পরস্পর বিপরীত শক্তি বা

charge সম্পন্ন। যদি তাদের পরস্পর সংঘাত ঘটে তবে তারা ধ্বংস হয়ে শূন্যে হারিয়ে যায়। শূন্যে হারিয়ে গিয়ে থাকে কোয়ান্টাম ফিল্ডে যেখানে সৃষ্টির পূর্বে তারা একত্রে ছিল। এরা কোয়ান্টাম ফিল্ডে মিলে গেলে নির্ভেজাল শক্তি ছাড়া আর কিছুই থাকে না। কিন্তু proton ও electron-এর ক্ষেত্রে অবাক হয়ে দেখা যায় যে, তারা বিপরীত চার্জ সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও একে অপরকে ধ্বংস করছে না। অবশ্য এদের বাস্তবিক উপাদান সমান নয় অর্থাৎ mass. Proton-এর mass electron এর চাইতে বহুগুণ বেশি। যেমন, ১৮৩৬ গুণ বেশী। তবে শক্তি উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান। তা যা ই হোক, এক্ষেত্রে electron-কে proton অপেক্ষা দুর্বল ভাবা যেতে পারে। প্রাচীন ঋষিরাও সৃষ্টির মূলে যে স্ত্রী শক্তি ও পুরুষ-শক্তি দেখতে পেয়েছিলেন তার মধ্যে পুরুষের শক্তি স্ত্রী-শক্তি অপেক্ষা প্রবল এমন বলেছেন। এই স্ত্রী-শক্তি ও পুরুষ শক্তির মিলনেই সৃষ্টি। অপরপক্ষে part cle ও anti-particle-এর মিলনে সংঘর্ষ ও ধ্বংস। এই antiparticle-ই ভারতীয়দের অসুর। Particle দেবতা। Particle ও anti-particle উভয়ের ঘূর্ণন বিপরীত দিকে হলেও mass কিন্তু সমান। শক্তিও একই।

আইনস্টাইনের $E = Mc^2$ এই তত্ত্ব জানার পর এটা আরও আশ্চর্য লাগে যে—proton-এর mass বেশি হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুদ্র electron-এর বৈদ্যুতিক শক্তি অপেক্ষা তার শক্তি বেশি নয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী mass বেশী হলে শক্তি বেশী হওয়া উচিত। অনেকে মনে করেন যে, proton-এর অতিরিক্ত mass শক্তিক্ষেত্রের (Energy field) অপর কোন practicle দ্বারা গৃহীত হয়, যা নাকি সমগ্র দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। ব্যাপারটা কিন্তু প্রকৃত ঘটনাকে আরও বেশ রহস্যময় করে তুলেছে। Electron-এর মধ্যে এমন কি গুণ আছে যাতে ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও proton-এর সবকটি শক্তি সে অর্জন করতে পারে? একি তার বহির্মুখি শক্তির জন্য (Kinetic energy), গতির জন্য? না বেগবৃদ্ধি কবার জনা?

Practicle-এর mass বলতে স্থিতাবস্থায় এর mass বোঝায়। কারণ particle-এর গতি যত বাড়ে এ mass-ও তত বেড়ে যায়। এর কারণ particle-এর গতি বেশি হলে গতির মধ্যে যে শক্তি থাকে সেই শক্তি সে আহরণ করে নেয়। শক্তি বৃদ্ধি মানেই mass বৃদ্ধি। সুতরাং ধরে নিতে কোনই অসুবিধা নেই যে গতিশক্তি নিজেই mass তৈরি করতে পারে। তবে এই mass যে কোন স্থূল উপাদানে গঠিত তা নয়। এ হল এর শক্তির পরিমাণ মাত্র। Ilustrated Science and Invention Encyclopedia-এর ভাষায় 'শক্তি হল—বিজ্ঞানের ব্যাপক অর্থে কর্মক্ষমতা মাত্র।' বস্তুর অন্তর্নিহিত গুণই হল শক্তি। তবে কোথাও তা সুপ্ত, কোথাও বা গতিরূপে লক্ষণীয়। কর্ম আরম্ভ হলে তবেই শক্তিকে বোঝা যায়। জগতে যত particle আছে প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট কর্ম আছে। তাদের কর্মপদ্ধতি দেখলে মনে হবে, তারা যেন রীতিমত বুদ্ধিমান অস্তিত্ব। যেমন proton-এর কাজ হল সে electromag-

netic force-এর বার্তাবহ। অপরপক্ষে pion হল strong nuclear for ce-এর বার্তাবহ। মনে হতে পারে, এইসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শক্তিবিন্দুকে নির্দিষ্ট কর্তব্যের দায়িত্ব দিয়েছে কে? কম্পিউটার যেমন মানুষ দ্বারা programmed হয়ে কাজ করে এদের কর্মপদ্ধতিও যেন ঠিক তেমনই। যেন কেউ এদের programmed করে দিয়েছে।

কে এদের program দাতা? এমনতর প্রশ্ন করা হলে কোয়ান্টাম ফিজিক্স এর কোন জবাব দেবে না। কিন্তু মরমিয়া প্রাচীনেরা বলবেন—মহাজাগতিক চিৎশক্তি। তিনি কিভাবে কাজ করেন? মনুষ্যাকারে? মানব বা মানবীরূপে? দার্শনিকভাবে তর্ক করতে গিয়ে এ নিয়ে অনেক দূর অগ্রসর হলেও মূলত যে জবাব পাওয়া যাবে তা হল নির্ভেজাল একটি মানসশক্তি। এই মানস শক্তির জন্য যে মস্তিষ্কস্নায়ু বা কম্পিউটারের সূক্ষ্ম তারের প্রয়োজন আছে, তা নয়। বস্তুত মন ও মস্তিষ্ক দুটি ভিন্ন সত্তা। মন চিন্তাতরঙ্গ ছড়িয়ে দিলেও মস্তিষ্ক স্নায়ু যে কাজ করবেই তা নাও হতে পারে। মন চিন্তাতরঙ্গ তৈরি করলেও মস্তিষ্ক স্নায়ুকে সক্রিয় করে তুলতে আরও কিছুর প্রয়োজন আছে। সেটা কি? ইচ্ছাশক্তি?

ধরা যাক মন চিন্তাশক্তি সৃষ্টি করল। ইচ্ছাশক্তি তাতে গতি সংযোগ করল। মস্তিষ্ক স্নায়ু কাজ করতে আরম্ভ করল। দেহতন্ত্রী তখনই নড়ে উঠল। তাহলে মহাবিশ্বে যে গতি সৃষ্টি হচ্ছে তার সৃষ্টি একটি মহামানস থেকে হয়েছে এমন চিন্তা করতে দোষ কি? বৈজ্ঞানিক হলে এ ব্যাপারে জবাব না দিয়ে নীরব থাকবেন। কারণ, মানুষের মনের সঙ্গে কিছুতেই বিশ্বমানসকে সমতলে এনে ফেলতে তিনি রাজি হবেন না। কিন্তু মরমিয়ারা নির্দ্বিধায় মহামানবকে মেনে নেবেন। বলবেন, নিচেও যেমনই. উপরেও তেমনই।' সেই হিসেবে তারা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিতে চাইবেন যে, ঈশ্বর নিজের অনুকরণে মনুষ্যাকৃতি তৈরি করেছেন। প্রশ্ন আসবে, মহা-বিশ্ব জাগতিক মানস কি মানবমনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে? জবাব হবে :— নিশ্চয়ই। কিন্তু মারমিয়াদের কথা ছেড়ে দিয়ে আবার বিজ্ঞানেই ফিরে আসা যাক।

Massless particle বলেও ইদানিং এক তত্ত্ব তৈরি হয়েছে। সেটি কি? বৈজ্ঞানিকদের ভাষায় massless particle হল এমন particle যখন তা স্থির অবস্থায় থাকে তখন তার mass হল শূন্য। Photon-কেই এমন particle বলা যায়। এর mass তৈরি হয় তখনই যখন এতে গতি সঞ্চার হয়। Photon যখন আলোর গতিতে ছুটে চলে তখন এতে mass সৃষ্টি হয়। Photon-এর গতিবেগ বাড়ানো যায় না, কমানোও যায় না। Photon এমন একটি কাজ করে যা না হলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদয় হত না। এই কাজ হল electron-কে proton-এর দিকে টেনে আনা। গতির মধ্যে এই কারণেই স্থিতি দেখা দেয়।

Particle-এর উপর বিভিন্ন চার্জের প্রতিক্রিয়ার কথা আমরা আগে বলেছি। এবার দেখা যাক electromagnetic force কি ভাবে কাজ করে। Electro

magnetic force-এর যাতায়াত হল—proton ও proton এবং proton ও electron-এর মধ্যে। একে বহন করে নিয়ে যায় photon Photon যেমন সমশক্তিসম্পন্ন particle-কে দূরে ঠেলে দেয় তেমনই বিপরীত শক্তি সম্পন্ন particle-কে কাছেও টেনে আনে। এ থেকেই মনে হয় অব-আনবিক স্তরে particle গুলি বুদ্ধি সহকারে কাজ করতে পারে। Photon হল এমন particle যার খোলসের মধ্যে বৌদ্ধিক বার্তা আবদ্ধ হয়ে থাকে। প্রাচীন মরমিয়ারা এই জন্যই বলতেন, গতির নিজস্ব সত্তা ও স্বতসৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি আছে যা ইচ্ছে মত গতির দ্রুততা বাড়াতে পারে, দিক পরিবর্তন করতে পারে, আবার অস্তিত্ব বিহীনও হতে পারে। সুতরাং এরই মধ্যে রয়েছে সৃষ্টি ও ধ্বংসের উপাদান। এই গতির জন্যই electron atom-এর মধ্যে ধৃত হলেও এব nucleus-এ প্রবেশ করে না।

এই যে গতি, এই গতি আদি সলিলকে আলোড়িত করেছিল। তখন এই জলের মধ্যেও এক ধরনের অস্থিরতা ছিল। আকাশের স্থির বুননের মধ্যে এই শক্তিই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু তৈরী করেছে। এই গতিই বৃহৎ ও ক্ষুদ্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। এতই ক্ষুদ্র যে তার অস্তিত্ব হারায় তা নয়। আবার এই গতিই সব ধ্বংস করে দেয়। যেমন গতি যদি আলোর গতি ছাড়িয়ে চলতে চায় তাহলে সে পেছন দিকে হঠতে থাকবে। ফলে সৃষ্টি তার কেন্দ্রের দিকে ফিরে যাবে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। হিন্দুদের মতে এই গতি তত্ত্বই হল শিব। তিনি যখন সৃষ্টি করেন তখন তাঁর মঙ্গলময় দিক ফুটে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেন। যখন উৎসের দিকে ফিরে যান তখন সব ধ্বংস হয়ে যায়। নটরাজের মূর্তিতে এই তত্ত্বই ধরা পড়েছে। বিজ্ঞানীরা যে কথা অংকের ভাষায় বলেছেন ভারতীয় দার্শনিকেরা তাকেই ভাস্কর্যের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। শিবের সহধর্মিনী হলেন kinetic energy, যাকে বলা হয় শক্তি।

গতি যদি সচেতন ভাবে না চলত তাহলে proton ও proton-এ সংঘর্ষ হত। অনুই তৈরি হত না। যদি হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম অনু তৈরি না হত গ্রহ, নক্ষত্র নীহারিকাপুঞ্জ কিছুই দেখা দিত না। অর্থাৎ সৃষ্টি বলতে যা বুঝি সেটা থাকত না। অনু তৈরি হয় এই কারণে যে, electron photon-এর সঙ্গে সহযোগিতা করে—অথচ তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বও বজায় রাখে। আবার এটাও সম্ভব হয় photon-এর জন্য। photon-এর কোন mass-ই নেই।

এবার স্থিতিশীল particle-এর খোঁজ করা যাক, কারণ এদের দ্বারাই অনু তৈরি হয়েছে। আর অনু তৈরী না হলে বস্তু জগতও তৈরি হত না। Lepton group-এর মধ্যে electron ও baryon group-এর মধ্যে photon হল এই স্থায়ী ধরনের particle এরা যদি স্থায়ী না হত জগত হত না। সুতরাং যদি বিশ্বব্রহ্মাগতিক মানস সত্তাকে বস্তু জগতে নেমে আসতে হয় তাহলে যে সকল particle (with mass) proton ও electron-এ নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে, মহামানসকে সেই সকল অস্থায়ী particle-গুলিকে programmed করতে হবে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে

দেখা যায় যে, অস্থায়ী particle গুলি স্থায়িত্ব পাবার জনাই আমাদের বস্তুসত্তায় অবতবণ করে। সেই জন্য বৈজ্ঞানিকরাও মনে করছেন যে, অস্থায়ী particle স্থায়ী particl -এ মিশে গিয়ে যখন বস্তু তৈরী করে তখন সেই ভাবে নির্দিষ্ট হয়েই তা করে। অতএব অনু পর্যায়ে particle গুলির এই ব্যবহার লক্ষ্য করেই বোধহয় প্রাচীনেরা চিন্তা করেছিলেন যে, আত্মনের অন্তস্থিত চিরন্তন একটা ইচ্ছাই বস্তুসত্তার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছে।

Meson বলে এক ধরনের particle আছে যার ব্যবহার অদ্ভুত। যে সকল meson-এ positive charge আছে তারা anti-particl হয়ে যায়। অপর পক্ষে anti meson যার charge negative তা p rticl -এ পরিণত হয়। এ থেকেই বিশ্বাস জন্মে যে, স্থিতি এবং অস্থিতি, সৃষ্টি এবং ধ্বংস একই অন্তর্নিহিত সত্তার বিভিন্ন দিক মাত্র। ভাল থেকে মন্দের উৎপত্তি হতে পারে। আবার মন্দ থেকে ভালও দেখা দিতে পারে। Anti-particle দিযে গঠিত জগতে যেমন particle অশুভ শক্তি হিসেব দেখা দেবে তেমনই particle দিযে গঠিত জগতে anti-particle ভয়ানক সর্বনাশের কারণ হবে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, anti-particle-ও সেই আদি মানস সত্তা থেকে উৎসারিত। এই মানস সত্তাকেই বিজ্ঞান বলেছে quantum field—যার মধ্যে particle ও anti-particle, positive ও negative charge একত্র যুক্ত থাকে।

প্রাচীন ঋষিরা জানতেন যে, দ্বৈতের মধ্যে, বহুর মধ্যেও একটি ঐক্য আছে। সেই-জন্য ভারতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে এক দেহে দেখানো হয়েছে।

তবে বিরাট প্রশ্ন মনে দেখা দেয় এই যে, positively charged দুটি proton যদি একে অপরকে দূরে ঠেলে দেয় তাহলে অতি ক্ষুদ্র আনবিক কেন্দ্রে তারা একত্রে থাকতে পারে কি করে? বিজ্ঞানের মতে strong nuclear force-এর দ্বারাই এটা সম্ভব হয়। এই strong nuclear force না থাকলে hydrogen atom ছাড়া অন্য কোন atom-ই তৈরি হতে পারত না। এইজন্য strong force-কে বলা হয় সৃষ্টির সাংরক্ষণিক দিক (preservative aspect of the energy of expression)। এই strong force-এর বার্তা বহন করে pi-meson. এই ক্ষুদ্র particle-টি proton থেকে proton-এ ঘোরাফেরা করে তাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের করণীয় কর্তব্য কি। যেন তাদের বলে দেওয়া হয় অনুর কেন্দ্রবিন্দুতে (Nucleus অবস্থান কর। অপর দিকে -meson neutron-কে অনুরূপভাবে অনুর কেন্দ্রবিন্দুতে ধরে রাখে। তাছাড়া এটা দেখাও যেন তাদের কাজ যে, proton ও neutron-এ যাতে সংঘাত না ঘটে। তাদের ব্যবহার দেখে মনে হয় যে, তারা proton ও neutron-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমেরিকান পদার্থবিদ R Hofstadter মনে করেন যে, proton ও neutron-এর কেন্দ্রবিন্দু pion দ্বারাই গঠিত। এজন্য তিনি ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল প্রাইজও পান।

কোয়ান্টাম ফিল্ড তত্ত্বে এটাই দেখানো হয়েছে যে, দেশে (space) অবিচ্ছিন্ন-প্রবাহ এক শক্তি রয়েছে। Electromagnetic force ও strong force ত্রিমাত্রিক শক্তি ক্ষেত্র (force field) রূপে দেখা দেয়। Proton, neutron, electron, এরা অনুর মধ্যেই আবদ্ধ থাক বা স্বাধীনভাবেই থাক, সব সময়ই pion ও photon রূপ মেঘে আবৃত হয়ে আছে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তারা-বিকিরণ ও অধিগ্রহণের খেলা খেলে চলেছে। Electron দ্বারা এত দ্রুত photon নিসৃত ও অধিকৃত হয়, proton ও neutron দ্বারা pion-ও নিসৃত বা অধিকৃত হয় যে, বিজ্ঞানের কলা কৌশলের মাধ্যমেও (Bubble Chamber-এ) তা ধরা যায় না। এইজন্য এদের নাম দেওয়া হয়েছে virtual photon ও virtual pion. এরকম নাম দেবার কারণ তাদের অস্তিত্ব শুধু সত্তার মধ্যেই রয়েছে কার্যত নেই। এই ফিল্ড তত্ত্ব বস্তু ও শূন্যতার মধ্যে ভেদও দূর করে দিয়েছে। Photon আবিস্কৃত হবার পর আলোর মাধ্যম হিসেবে ether-এর কল্পনাও মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে। এখন শূন্যতাকে শুধু মাত্র শূন্যতা বলা হয় না, বলা হয় False vacuum অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে শূন্য। কিন্তু সর্বত্র শক্তি বর্ধমান শক্তি দ্বারা সিক্ত। আইনস্টাইন-এর তত্ত্বে দেখানো হয়েছে যে, দেশ থেকে বস্তুকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। বস্তু হল দেশে (space) প্রবাহিত শক্তির ঘনীভূত রূপ। সুতরাং যথার্থ সত্তা হিসেবে শূন্যতার কোন অস্তিত্ব নেই। সর্বত্রই রয়েছে শক্তি। এই যে আবিস্কার তা প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের সেই বোধতুল্য—যাকে তাঁরা বলেছেন আত্মন (spirit)। বস্তু জগতের নানা দিক এই আত্মনেরই নানা রূপান্তর মাত্র!

এটাই যদি সত্য হয়, তাহলে যথার্থ শূন্যতা কি? বর্তমানে এর যে স্পষ্ট জবাব পাওয়া যাবে তা হল এই যে, শূন্যতা বলে কিছু নেই। বাইরে থেকে যা স্থির ও বশীভূত বলে মনে হয়—মূলত তা হল গতিময় ও স্পন্দনময়—যদিও যন্ত্র দ্বারা অদ্যাবধি তাকে আমরা ধরতে পারিনি। এই যে গতিময় অধরা শক্তি তাই মহামানস, এর কোন particle তৈরী হয় নি। তবে ইদানিংকালে 'Mindon' বলে একটি particle-এর কথা অনুমান করা হচ্ছে যা নাকি আত্মিক শক্তির particle হিসেবে গণ্য হতে পারে। এই নামের উদ্‌গাতা ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ V. A, Firsoff. Paul Dirac ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে দেখিয়েছেন যে, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ধরনের particle-এরই নিজস্ব ক্ষেত্র (field) আছে। সমগ্র দেশ (space) ব্যাপ্ত করেই এই ক্ষেত্র রয়েছে। এই ক্ষেত্র গুলির পারস্পারিক সংযোগে (interaction) নতুন নতুন particle তৈরী হয়।

প্রাচীন মরমিয়া ঋষিরা সৃষ্টি-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে গল্পের অবতারণা করেছেন—তা হল মানস ক্ষেত্র (field of mind)। শুধুমাত্র ওল্ড টেস্টামেন্টে spirit শব্দ দ্বারা এই energy field-এর কথা বোঝানো হয়েছে। অন্যত্র এদের বোঝানো হয়েছে দেব-দেবীর কল্পনা করে। মিশরীয়দের ক্ষেত্রে এই শক্তিক্ষেত্রের নাম

নুন (Nun)। নুনকে বলা হয়েছে অনন্ত। এর উপরও নেই, নিচও নেই। আদি সলিল রূপে এই নুন সমগ্র দেশ ব্যাপ্ত করে ছিল। নুন নিজের শক্তি দ্বারা কাজ করতেন। এই শক্তির সাহায্যেই অন্যান্য দেবতাদেরও সৃষ্টি হয়েছিল। নুনের মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি একত্রে যুক্ত ছিল। এদেরই মধ্যে ছিল অন্যান্য ছোট ছোট দেবতা। নুন প্রথম জন্ম দেন পুরুষ প্রকৃতি একত্রে যুক্ত আতুমের (atum)। এই atum-ই হলেন বস্তুশক্তির প্রকাশ। একেই বলা যায় 'principle of expression', মিশরীয় ঋষিরা এই নুনের মধ্যেই আত্মিক কোয়ান্টাম ফিল্ডের সন্ধান পেয়েছিলেন।

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে তিনটি তত্ত্ব আছে যেমন গতিতত্ত্ব, প্রকাশতত্ত্ব ও দেশতত্ত্ব। এই তিন তত্ত্বের উপরই আমাদের বিশ্বজগৎ দাঁড়িয়ে আছে। বিষ্ণুপুরাণের মতে 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ঈশ্বরের সর্বাপেক্ষা তীব্র শক্তি। এর পরই হল ছোট ছোট দেবতাদের স্থান। এর পরেই এসেছে—মানব, পশু, পক্ষি, কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদ প্রভৃতি। উৎস থেকে যে যত দূরে সে ততই দুর্বল। বিভিন্ন গ্রন্থে এক এক জনকে বড় করে দেখানো হলেও, আসলে রূপকার্থে তাঁরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের ক্ষেত্রে এঁরা সকলেই সমান মর্যাদা সম্পন্ন। তিনটি দেবতার চরিত্র এই ধরনের, শিব হলেন kinetic energy-র প্রতীক : বিষ্ণু হলেন দেশ (phenomenon of space) এবং ব্রহ্মা হলেন মানস শক্তির ক্ষেত্র (psychic energy field) অর্থাৎ ব্রহ্মণের প্রকাশিত রূপ। ব্রহ্মণ হলেন ক্লীব লিঙ্গ, neutral in gender তিনিই হলেন উৎস (First principle, psychic mind field)।

ব্রহ্মণের প্রকাশিত রূপ ব্রহ্মার মধ্যে রয়েছে পুরুষ ও প্রকৃতি একত্রে যুক্ত হয়ে। এইজন্য তিনি হংসবাহন। হং (চিরন্তন প্রাণ – ব্রহ্মণ) স (স্থূল জগৎ) অর্থাৎ positive এবং negative principle ব্রহ্মা যেন ঘনীভূত নিউট্রনের ক্ষেত্র (field) যা থেকে সব কিছু বেরিয়ে এসেছে, যেমন, proton ও electron, ব্রহ্মার বিস্ফোরণ থেকেই (অর্থাৎ field or blackhole-এর বিস্ফোরণ থেকেই) আকাশের অভ্যুদয়। এই আকাশ তত্ত্বই হল বিষ্ণু (বিষ্ণু শব্দের উৎপত্তিও বিন=তামিল শব্দ আকাশ থেকে)। আকাশেই সৃষ্টি স্থিত হয়ে থাকে বলে বিষ্ণু পালন কর্তা। Atmosphere বা আবহাওয়া মণ্ডলের আকাশে তার বর্ণ নীল কিন্তু আবহাওয়া মণ্ডলের বাইরে দেশের বর্ণ কালো কারণ সেখান দিয়ে আলো দৃশ্য হয় না। এই জন্য বিষ্ণুর একদিকে রঙ নীল, অপর দিকে কালো। শিব kinetic energy রূপে সৃষ্টিকালে অর্থাৎ Big Bang থেকে বিস্ফোরণের পর সম্প্রসারণ কালে ছন্দময় সৃষ্টির সহায়ক অর্থাৎ কল্যাণময় শিব। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলে পুনরায় field-এর টানে ফিরতে আরম্ভ করলে ধ্বংসের প্রতীকরূপে শিবের এই রূপই দক্ষিণ ভারতের নটরাজ মূর্তিতে ফুটে উঠেছে। উৎস শক্তি হল ব্রহ্মণ—যা নাকি বর্তমান কোয়ান্টাম ফিজিক্সের false vacuum বা pulsating void-এর মত। ব্রহ্মণ শব্দের অর্থও বৃহ বা 'বৃ' ধাতু থেকে। যার অর্থ স্ফীত হওয়া। কখনও তিনি প্রকাশমান, কখনও অপ্রকাশিত। কখনও ভিত্তী হীন,

কখনও দূরে মূলে। কখনও তিনি সময়, কখনও সময়াতীত। তিনিই হলেন সৃষ্টির আদি উপাদান। তিনি চিৎ, তিনি আলোর আলো, তিনি অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপ্ত সর্বদ্রষ্টা, সর্বশক্তিমান, অসীম এবং কালাতীত। তিনি এমন এক বিশ্ব যা বিশ্ব জুড়ে রয়েছে। তিনি অমৃত যিনি বস্তুজগতের অস্তিত্বের আড়ালে রয়েছেন। সকল দেবদেবী তাঁরই মধ্যে স্থিত এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল। অগ্নি তাঁকে দাহ করতে পারে না। বায়ু তাঁকে ওড়াতে পারে না। তাঁর ইচ্ছা না হলে কিছুই হয় না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে তাই বলা হয়েছে—'যিনি আকাশে বাস করেন, তিনি আকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন। যাঁর দেহ এই আকাশ, আকাশ তাকে চেনে না। যিনি আকাশে থেকে আকাশকে শাসন করেন তিনিই আত্মা, দেহাভ্যন্তরের পরিচালক, তিনি অমৃত।' ঐতরেয় উপনিষদে দেবতাদের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে—'এ সবই চৈতন্য দ্বারা পরিচালিত, চৈতন্য ধৃত। চিৎ শক্তি দ্বারাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত। চৈতন্যই এর ভিত্তি, ব্রহ্মণই চৈতন্য। বৃহ (স্ফীতমান) + মন (চিৎশক্তি) = ব্রহ্মণ। সমগ্র দেশ ব্যাপী প্রবহমান শক্তির এই সর্বব্যাপ্ততা বিজ্ঞানও এখন স্বীকার করে। দেখা যাচ্ছে—রূপান্তরের সময় particle-এর কিছু mass হারিয়ে যায়। তা থেকে নব সৃষ্ট particle গুলির একত্রিত mass মৌল particle-এর rest-mass থেকে কম হয়। এই যে উদ্বৃত্ত mass বা energy তাহলে কোথায় যায়? যদি কোন Energy field বা শক্তিক্ষেত্র না থাকে তবে তা কোথায় যাবে এ প্রশ্নটা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। এই উদ্বৃত্ত mass অথবা energy, Paul Dirac-এর কল্পনা অনুযায়ীতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যায় না, যায় একটি সার্বিক ক্ষেত্রে (general field-এ)। এই সার্বিক ক্ষেত্র সম্ভবত চার্জের দিক থেকে নিরপেক্ষ (Neutral in charge) হিন্দুদের ব্রহ্মণের মত। Particle বা anti-particle যাবই শক্তি ক্ষয় হোক না কেন—তা যায় এই নিরপেক্ষ ক্ষেত্রে এবং এখান থেকেই অন্যান্য শক্তির অভ্যুদয় হয়।

Proton-এর mass বেশি থাকা সত্ত্বেও proton ও electron চার্জের দিক থেকে সমান। এতে এমনতর মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, চার্জ ও mass পরস্পরের সঙ্গে যুক্তও নয় আবার স্বাধীনও নয়। Mass মানেই স্থির শক্তি (potential energy)। উপরোক্ত ঘটনা প্রমাণ করে যে, চার্জ ও এনার্জি পরস্পর তেমন যুক্ত নয়। এই জন্যই neutron-এর mass থাকা সত্ত্বেও কোন চার্জ নেই। অপরপক্ষে proton এর mass electron থেকে বহুগুণ বেশী হওয়া সত্ত্বেও উভয়েরই চার্জের পরিমাণ সমান। এ থেকে মনে করা যেতে পারে যে, neutron যখন তার মধ্যে আবদ্ধ বিপরীত particle গুলিকে ছেড়ে দেয় তখনই ইলেকট্রিক চার্জের উদ্ভব হয়। এ থেকেই মনে হয় আদি যে শক্তি তা ছিল গুণের দিক থেকে নিরপেক্ষ (neutral)। সেই জনাই সমস্ত বিপরীত গুণ সম্পন্ন জিনিষই তার মধ্যে স্থিত হয়ে থাকতে পেরেছিল—অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব, সময়, না-সময় ইত্যাদি। শুধুমাত্র আত্মপ্রকাশ করার সময় তার মধ্য থেকে বিপরীত গুণ সমূহ, যেমন

positive ও negative চরিত্র আত্মপ্রকাশ করে বস্তু জগতের পটভূমি তৈরী করেছিল। সেই জন্য neutron-কে আমাদের বস্তু জগতের পিতা এবং মাতা বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। Neutron (যা নাকি একে অপর থেকে ঠেলে দেয় না) ঘনীভূত হয়ে ডিম্বাকৃতি ধারণ করে অতিরিক্ত চাপের ফলে বিস্ফোরিত হয়ে স্বতন্ত্র neutron-এর আবির্ভাব ঘটায়। এ থেকে electron ও proton আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম তৈরী হয় হাইড্রোজেন অনু। বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার অনুযায়ী পৌরাণিক কাহিনীগুলিকেও দেখা যায় যে, আদিতে ছিল নিরপেক্ষ মানস শক্তি ক্ষেত্র (psychic energy field)। পরে তা ঘনীভূত হয়ে পুরুষ প্রকৃতি অর্থাৎ positive ও negative charge নিয়ে একত্রে field তৈরি করে। এরপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাদের (particle—negative and positive) আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই যে ঘনীভূত আত্মিক ক্ষেত্র যার মধ্যে positive, negative, particle—anti particle সব ঘনীভূত হয়ে থাকে—তা আমাদের দেশে ব্রহ্মা, মিশরে Atum নামে পরিচিত ছিল। মিশরীয়দের মতে সেই এক Atum নিঃসঙ্গ বোধ করে এবং অন্যান্য দেবদেবীর সৃষ্টি করে। Atum এই সব দেবদেবীর (particle) সৃষ্টি করেন নিজের ছায়ার সঙ্গে মিলে। প্রথম নিজের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেন 'শু' (পুরুষ) ও তেনফুত (মহিলা, স্ত্রী)। এরা একত্রে মিলিত হয়ে একই আত্মা লাভ করে (common soul)। এ যেন ঠিক আধুনিক বিজ্ঞানের সাধারণ ঘনীভূত শক্তিক্ষেত্র অর্থাৎ neutron ফিল্ড থেকে স্বত নিয়মেই electron (মহিলা) ও proton (পুরুষ) বেরিয়ে আসার মত। এরা পরস্পর যুক্ত হয়ে হাইড্রোজেন অনু তৈরি করে। মিশরীয় common soul সম্ভবত এই হাইড্রোজেন।

মধ্য আমেরিকার পৌরাণিক কাহিনীতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। তাদের আদি সত্তা ছিল ওমটিওটল (Omteotl) যা থেকেই এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি। এই আদি সত্তা হল আমাদের ব্রহ্মা বা মিশরের আতুমের মত। বর্তমান বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় compressed neutron এর মধ্যে ছিল পুরুষ ও প্রকৃতি একত্রে। এখানে যে field তৈরী হয় তাই আমেরিকানদের মতে ছিল ডিম্ব। এই ডিম্বের মধ্যে ছিল স্বাভাবিক সৃষ্টিশক্তি—হেগেলীয় ধারণা মতে antithesis in thesis। নির্ভেজাল মানস শক্তি হিসেবে ওমটিওটল এর কোন মূর্তি নেই। শুধু তাঁর হাত ও পা আঁকতে দেওয়া হত। ইনিই He-She God যার মধ্যে positive ও negative charge একত্রে রয়েছে। তাঁর সহধর্মিনী হিসেবে দেখানো হয়েছে নক্ষত্র খচিত একটি ঘাগরাকে। এই ঘাগরা ছিল মহাবিশ্বের প্রতীক মাত্র। যে ভাবে এই দেবতার বর্ণনা করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, রূপান্তরের মধ্য দিয়ে তিনি অমর হয়ে আছেন, ধ্বংসের মধ্যে অমরত্ব অর্জন করেছেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও দেখা যায় এই ভাবেই elementary particle গুলি কাজ করছে। বিশেষ করে neutron particle গুলির ধ্বংস হয় না রূপান্তর হয় মাত্র। বিজ্ঞান ও দর্শনে যে সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে পৌরাণিক কাহিনী

তাকেই রূপক হিসেবে গল্পের আকার দিয়েছে। সকলেরই বক্তব্য সেই একই। ভারতীয় বেদ ও উপনিষদের বহু সূত্রেই দেখা যায় বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে force field বলা হয় তেমনই force ফিল্ডের কথা বলা হয়েছে, যেখানে বিপরীত শক্তি সৃষ্টির প্রারম্ভে একত্র যুক্ত হয়ে ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে একটি কাহিনী আছে এই ধরনের: 'আদিতে শুধু ছিল আত্ম। এই আত্ম ছিলেন পুরুষের আকারে। তিনি মানব মানবী রূপে একত্রে যুক্ত হয়ে অর্থাৎ নিবিড় আলিঙ্গনে যুক্ত হয়ে থাকার মত ছিলেন। স্বইচ্ছায় তিনি নিজেকে দুভাগে বিভক্ত (পত্) করেন। তা থেকে পতি ও পত্নীর উদয় হয় (খৃষ্টানদের woman-ও আদমের হাড় থেকে owe অর্থাৎ ধার করে নিয়ে সৃষ্ট। Man থেকে owe করা হয়েছিল বলেই তার কাছে থেকে ধার করা অপর অংশের নাম woman)। এই ভাবেই সৃষ্টি দেখা দেয়। ঋগ্বেদে যে পুরুষের কথা বলা হয়েছে—যার সহস্র চক্ষু, সহস্রপদ ইত্যাদি এবং সহস্র স্থূল জগতকে তিনি আচ্ছন্ন করে রয়েছেন, এর বাইরেও দশ আঙুল পরিমাণ (দশ দিকে) যিনি ছড়িয়ে রয়েছেন, তা থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইনি কোন মনুষ্যাকৃতি ব্যক্তি নন—বরং নৈসর্গিক ঘটনা। তাঁর সহস্র চক্ষু হল আকাশের অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী। সহস্র পদ হল বিশ্ব জগতের অসংখ্য বস্তুসত্তা। বৈদিক সাহিত্যে যে যজ্ঞের কথা আছে তা হল ত্যাগের কথা, ইংরেজীতে যাকে বলে sacrifice 'একে'র আত্মাবস্থা ত্যাগ থেকে বিশ্ব সৃষ্টি। বিশ্বের স্থূল অবস্থা ত্যাগ থেকে আত্মাবস্থায় ফিরে যাওয়ার এই যে চিরন্তন লীলা তাই হল যথার্থ অর্থে যজ্ঞ। আনুষ্ঠানিক যে যজ্ঞ করা হয়, তা তার প্রতীক রূপ। ব্রহ্মপুরাণে ব্রহ্মাকে বলা হয়েছে 'অপব' অর্থাৎ যিনি জলে (কারণ সলীলে) লীলা করে বেড়ান। অপব-এর মধ্যে আছে পুরুষ ও প্রকৃতি একত্র হয়ে (neutron), পরে যা নিজেকে দু'ভাগে বিভক্ত করে।

মৎস্য পুরাণে আরও একটি চমকপ্রদ গল্প আছে। গল্পটি এই ধরনের: ব্রহ্মা তাঁর নির্ভেজাল সত্তা থেকে একটি মহিলা তৈরি করলেন, যার নাম শতরূপা, সাবিত্রী, ও ব্রহ্মাণী। আত্মজাত এই কন্যাকে দেখে ব্রহ্মা বিমোহিত হলেন (felt electro-magnetic force)। বললেন, কী অনবদ্য সুন্দরী। শতরূপা তাঁর ডানদিকে গেলেন। ব্রহ্মা তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতে গেলে তার দ্বিতীয় মস্তিষ্ক দেখা দিল। শতরূপা তাঁর দৃষ্টি এড়াতে বামে ও পশ্চাতে গেলে ব্রহ্মার স্কন্ধে আরও দুটি মস্তিষ্ক দেখা দিল। অবশেষে শতরূপা আকাশে উঠলেন। সেখানে তাঁকে দেখতে গিয়ে ব্রহ্মার স্কন্ধে পঞ্চম মস্তিষ্কের উদয় হল। ব্রহ্মা তাঁকে বললেন 'এস আমরা আরও প্রাণী সৃষ্টি করি—মানুষ, সুর (particle) অসুর (anti-particle) প্রভৃতি।' একথা শুনে শতরূপা নেমে এলেন। তারা একটি নির্জন স্থানে গিয়ে একশত দিব্যবর্ষ একত্রে বাস করলেন।

এই গল্পটি পাঠ করলে বর্তমান বিজ্ঞানের আধুনিক তত্ত্বের কথা মনে পড়ে যায়। শতরূপা বা ব্রাহ্মণীর ব্রহ্মার চারপাশে নৃত্যকে হাইড্রোজেন অনুরূপে অনুমান করা

যেতে পারে যেখানে একটি electron একটি প্রোটনের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' কিন্তু এর এই বৈজ্ঞানিক পশ্চাৎপট উপলব্ধি করতে না পারা গেলে গল্পটিকে অশ্লীল বলে প্রতীয়মান হবে। তবে মৎস্যপুরাণ নিজেই গল্পটিকে সাধারণ গল্প বলে ধরতে বারণ করে দিয়ে বলেছে যে, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এর গোপন তথ্য জানা দুঃসাধ্য।

হিন্দুরা যে বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার উদয় বলে বর্ণনা করেছে তার অর্থ আকাশের মধ্যে নিরপেক্ষ neutral force বা neutron field-এর আবির্ভাব। একে পদ্ম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এই কারণে যে, এর গঠন অনেকটা প্যাঁচানো ধরনের। অর্থাৎ field-এর আবর্ত ধরনের। সেই হিসেবে এই পদ্ম গতিরও প্রতীক। পদ্মপুরাণে এই জন্য শিব বিষ্ণুকে বর্ণনা করেছেন অনাদি অনিঃশেষ বলে। অর্থাৎ তিনি অসীম সম্প্রসারণের ক্ষমতাধারক। মহাভারতে বলা হয়েছে, বিষ্ণুর বাসস্থান অসংখ্য উজ্জ্বল রত্ন অর্থাৎ নীরাহিকাপুঞ্জাদি দ্বারা সজ্জিত। বিষ্ণুর রাজ্যে গঙ্গার স্বচ্ছ বারিধারা প্রবাহিত হয়। এই গঙ্গা পার্থিব গঙ্গা নয়। এই গঙ্গা হল আকাশের ছায়াপথ—Milky Way.

বিষ্ণুকে সাধারণত কৃষ্ণদেবতা হিসেবে দেখানো হয়। তার কারণ দেশ, আবহাওয়া মণ্ডলী (নীলবর্ণ) ছাড়িয়েও বিস্তৃত, যেখানে আলো দৃষ্ট নয়। তাঁর কয়েকটি অবতার রূপ নিঃসন্দেহে বিশ্বজাগতিক ব্যাপার। কয়েকটির পেছনে অবশ্য ঐতিহাসিক পশ্চাৎপটও রয়েছে। তাঁকে একবার কূর্মাবতার হিসেবে দেখা যায়। তিনি ক্ষীর সমুদ্রের নীচে ডুবে যান যাতে তার পিষ্ঠের উপর মন্দার পর্বত বসিয়ে সমুদ্র মন্থন করা যায়। এই ক্ষীর সমুদ্র নিঃসন্দেহে Milky Way-এর অনন্ত ঘূর্ণন, মন্থন তুল্য। মন্দার পর্বত হল এই Milky Way-এর ঘনীভূত কেন্দ্র। পাশ থেকে দেখতে গেলে আমাদের ছায়া পথকে কচ্ছপের মতই দেখায়।

বিষ্ণুর মধ্যেই অর্থাৎ দেশ (space)-এর মধ্যেই প্রকাশতত্ত্ব (ব্রহ্মা) ও গতিতত্ত্ব (শিব) খেলা করেছিল বলে বিষ্ণুর দুইপাশে এঁদের স্থাপন করা হয়েছিল যেমন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। যেহেতু আমরা আকাশে বাস করি এবং বহুদিন পর্যন্ত এই আকাশেই জগৎ বর্ধমান হতে থাকবে, Big Crunch বা কেন্দ্রে ফিরে যাবার টান অনেক দিন পরে অনুভব করা যাবে, এই জন্য আকাশের বুকে লালিত হবার ভাব থেকে বিষ্ণুকে পালন-কর্তা হিসেবে ধরা হয়েছে, একদা ক্ষীয়মান দেশ (space) হিসেবে ধরা হয়নি।

বরাহপুরাণের গল্পটিরও এই জন্য কোয়াণ্টাম ফিজিক্স ও অ্যাসট্রোফিজিক্সের সঙ্গে বেশ মিল আছে। যেমন বরাহপুরাণে বলা হয়েছে : আদি পুরুষ নারায়ণ (পুরুষকে মানুষরূপে চিন্তা করেই নর থেকে তাঁকে নারায়ণ রূপে কল্পনা করা হয়েছে। নতুবা তিনি psychic mind field) জগৎ সৃষ্টি করবেন চিন্তা করে ভাবলেন সৃষ্টির পর একে রক্ষা করতে হবে। তখন তিনি নিজের সত্তা থেকে অযোনিসম্ভব এক দিব্য আকৃতি সৃষ্টি করে বললেন : হে বিষ্ণু তুমি বস্তুজগৎ সৃষ্টি কর। এ জগতের তুমি রক্ষক হও ; সকল মানবের পূজনীয় হও।

উপরোক্ত বক্তব্যের মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব লুকিয়ে আছে তা এই ঃ—সত্যের তিনটি স্তম্ভ হল প্রকাশতত্ত্ব, গতিতত্ত্ব ও দেশতত্ত্ব (ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু)। এই তিন তত্ত্ব এমন নিকট সম্পর্কে যুক্ত যে তাদের পৃথক করে দেখা চলে না। বিজ্ঞানের চিন্তায় আসা যাক, দেখা যাবে electron-এর স্থিত অবস্থায় mass থাকলেও (rest mass) এই electron-ই প্রকাশতত্ত্ব হতে পারে। আবার প্রকাশতত্ত্ব হওয়া সত্ত্বেও অনুর চতুর্দিকে এটি অনবরত ঘূর্ণায়মান। অপরপক্ষে গতিতত্ত্বও প্রকাশতত্ত্বে পরিণত হতে পারে, যেমন photon—যার mass নেই। কিন্তু গতির জন্য mass-এর অধিকারী হচ্ছে। pion-এরও ঐ একই অবস্থা। আবার দেশতত্ত্বে দেখা যাচ্ছে, এটা বাড়তেও পারে, ছোটও হতে পারে অর্থাৎ এর মধ্যে গতিতত্ত্বও রয়েছে। আবার এরই মধ্যে শক্তি ঘনীভূত হয়ে প্রকাশতত্ত্ব রূপে বিরাজিত। সুতরাং গতিতত্ত্ব, প্রকাশতত্ত্ব ও দেশতত্ত্বকে অর্থাৎ শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। কেউ কারো অপেক্ষা বড় একথাও ভাবা যায় না। বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার উদ্ভবে দেশে প্রকাশতত্ত্বকে দেখানো হয়েছে। অপর পক্ষে পঞ্চানন কর্তৃক ব্রহ্মাকে পঞ্চমুণ্ড দ্বারা শোভিত কবার মধ্যে রয়েছে শিবের ভিন্নতর প্রকাশ। এর দ্বারা গতিতত্ত্ব ও প্রকাশতত্ত্বের সংযুক্তি বোঝাচ্ছে। এই যে গভীর হিন্দুতত্ত্ব, দুঃখের বিষয় আজ তা হারিয়ে গেছে। এই হারিয়ে যাবার কারণ হয়তো এই যে, যখন এই তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল তার বহুদিন পরে তা লিখিত হয় (আর্যরা লিখতে শিখেছিল পরে)। যখন লেখা হয়, তখন সেই লেখাও হয় রূপকের আকারে। ফলে সময়ের গতিতে এক সময় এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হারিয়ে যায়। শুধু খোলস পড়ে থাকে। সেই খোলসের মধ্যে অজ্ঞরা যা কিছু তাই ঢুকিয়ে দিয়েছে। যেমন কাম ঋগ্বেদে জগৎ সৃষ্টির প্রথম ইচ্ছাশক্তি হলেও পরে মদনাত্ত র কামদেবতায় পরিণত হয়েছে। ঠিক একই ভাবে শিবলিঙ্গ বিকৃত আকারে দেখা দিয়েছে। আসলে শিবলিঙ্গ হল ঘনীভূত সেই অবস্থা যা আদি শক্তিক্ষেত্রকে (primal field of energy) এর উত্তেজনাময় স্থিতাবস্থা থেকে গতিতে পরিণত করে।

ডিরাক (Dirac) জগৎ রহস্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, শক্তি তিনভাবে বিরাজ করত, যেমন নির্দিষ্ট চার্জসম্পন্ন, শূন্য চার্জসম্পন্ন এবং শূন্য অপেক্ষাও কম চার্জসম্পন্ন, অর্থাৎ চার্জবিহীন। আদিতে দেশে ছিল এমন ক্ষেত্র (field যা ছিল চার্জবিহীন electron-এ পূর্ণ। এর অর্থ দাঁড়ায় বিষয়হীন বস্তু। এর দৈর্ঘ্যও নেই, সময়ও নেই। শুনতে অদ্ভুত হলেও ব্যাপার এই যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই শক্তিহীন electron দ্বারা অভিষিক্ত। যদি কোন অজ্ঞাত শক্তিকে এই শক্তিহীন electron থেকে বেরুতে হয় তবে তা বেরুবে বাস্তব জগতে negative electron রূপে। কিন্তু যখনই এর পশ্চাৎপট হিসেবে থাকবে শূন্য-পকেটরূপ শক্তিবিহীন ক্ষেত্র (non energy field)—তখনই এই পকেট দেখা দেবে positron অর্থাৎ anti-electron হিসেবে। তবে ভাগ্যের কথা যে positron আমাদের জগতে বেশিক্ষণ

থাকবে না—যে জগৎ মূলত particle দিয়ে তৈরি। এই ফিলে-ফেলা electron (Lo·s· electron) খুব তাড়াতাড়ি বা দেরীতেই হোক—একটি বিবরের মধ্যে ঢুকে যাবে। আবার শাক্তি হীন অবস্থা পেতে হলে যে শক্তি জন্মকালে সে পেয়েছিল তা ছেড়ে আসতে হবে। তখনই আমাদের মনে হবে electron-positron-এর ধ্বংস রূপ দেখছি। ডিরাকের এই তত্ত্ব কোয়াণ্টাম ফিজিক্স ও আইনস্টাইনের থিওরি অব্-রিলেটিভিটির সংমিশ্রণেই সম্ভব হয়েছিল। Particle physics-এ positron-কে 'ele t on-hol·' বলা হয় তবে বর্তমানে পদার্থ বিজ্ঞানিরা এই তত্ত্ব স্বীকার করছেন না। একটি সার্বিক শক্তিকেন্দ্র (energy field) খুঁজে পাবার চেষ্টা চলেছে। এই সার্বিক কেন্দ্র খুঁজে পাবার চেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন আইনস্টাইন তাঁর 'unified field theory' দিয়ে। আশা করা যায়, একদিন এ সমস্যার সমাধান হবে। শক্তির বিভিন্ন রূপ যে একই শক্তির প্রকাশ মাত্র এটা দেখাবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি নেই তাদের ধারণা Big Bang-এর পূর্বে সব শক্তিই এক শক্তিরূপে বিবাজ করত। সেই একককে ধরা গেলে ভারতীয় অদ্বৈতবাদও প্রমাণিত হয়ে যায়। অবশ্য সেই শক্তির চরিত্রও জানতে হবে তা স্থির না অস্থির শূন্যতা স্বরূপ (pulsating void)।

ঋগ্বেদে বার বার এ ধরনের উল্লেখ পাই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল আদি এক তপ (তপস্যা) থেকে। এই তপ হল স্ববিস্মৃতি (auto-hypnosis)। এতে মন ক্রমশ অভ্যন্তরে ঢুকে যেতে থাকে। বিজ্ঞানে big bang তত্ত্বের উদ্ভাবকেরা এমন তত্ত্বেই বিশ্বাস করেন। এতেও দেখা যায় যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেন্দ্রস্থ হতে হতে এত ছোট হয়ে যাচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত বিশ্বের সমগ্র শক্তি ও বস্তু এতটাই ঘনীভূত হচ্ছে যে, অণুর কেন্দ্র (nucleus) অপেক্ষাও তা ছোট হচ্ছে। তখন অবস্থাটা দাঁড়ায় ঋগ্বেদের এই বক্তব্যের মতন: তখন না ছিল মৃত্যু না অমরত্ব। সেই 'এক' তখন বায়ুহীন শ্বাস পরিত্যাগ করছিল আপন তপস্যা বলে (The impetus to explode due to extreme compression)। এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সৃষ্টির প্রারম্ভে অন্ধকার ছিল ঘন তমিস্রায় আচ্ছন্ন। তা থেকে 'এক' বেরিয়ে এল তপস্যা বলে (due to extreme compression)। আরও বলা হয়েছে, সেই তপোবল বিস্ফোরিত হলে বেরিয়ে এল ঋত ও সত্য (অর্থাৎ বস্তুসত্তা)। প্রথম এল রাত্রি (কেন্দ্রে বা field-এ বিস্ফোরণ হলে প্রথম দেখা দিয়েছিল পাঁচ লক্ষ বছর ব্যাপি অন্ধকারের মধ্য দিয়ে শক্তির গতি। এই অন্ধকারকেই রাত্রি বলা হয়েছে। সেই তপ (তাপ) থেকে বেরিয়ে এল তরঙ্গায়িত সমুদ্র (আলোরূপ বিন্দু। ছোট দেখায় বিশ্বের প্রান্ত দেশ থেকে আমরা তাকে দেখি বলে, নইলে তার এক্রিয়ার বিরাট এবং তা ঘূর্ণায়মান অবস্থাতে রীতিমত তরঙ্গায়িত) ঋগ্বেদের এই স্তোত্রের বায়ুহীন শ্বাস পরিত্যাগ করা হল আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের false vacuum-এর মত, যাতে কোন particle নেই অথচ শক্তি সর্বব্যাপ্ত হয়ে আছে। তপের তাপ হল—বস্তুহীন চাঞ্চল্য অর্থাৎ pulsating void.

এই যে আদি মানস সত্তা (psychic field) যা থেকে সব কিছুর উদয়—মরমিয়া ঋষিরা মনে করেন ব্যক্তিমানস তার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে। ভারতীয় যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্র বিশেষ করে একথা বলেছে। আধুনিক কালের সর্বাপেক্ষা মরমিয়া সাধক যিশু খ্রীষ্ট বহুবার তাঁর আত্মিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

ভারতীয় পুরাণ কাহিনীতে এমন একটি গল্প আছে যা বিজ্ঞানের particle ও anti-particle-এর সংঘর্ষের কথা প্রমাণ করে। গল্পটি এই ধরনের : ব্রহ্মা জন্মের সময় জলন্ধর অসুরকে এই বর দিয়েছিলেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতারা তাকে পরাজিত করতে পারবে না। জলন্ধর বড় হয়ে উঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাদের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তাদের আকাশ (স্বর্গ) ছেড়ে যেতে বললেন। উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য তৈরী হল। বিষ্ণুর আবির্ভাবমাত্র যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল [অর্থাৎ দেশের উদ্ভব হওয়া মাত্র particle ও anti-particle দেখা দিল। দেশ (space)-এর উদ্ভব হয়েছিল Big Bang এর পর অর্থাৎ আদি শক্তিকেন্দ্র (energy field) বিস্ফোরণ ঘটার পর। দেশের বুকেই particle ও anti-particle ধৃত। সুতরাং দেশ অর্থাৎ বিষ্ণুর আবির্ভাব না হলে যুদ্ধ হতে পারে না]। যুদ্ধে বিষ্ণু ভূপাতিত হলেন, (অর্থাৎ particle ও anti-particle-এর সংঘর্ষে সব ধ্বংস হয়ে গেল। দেশও মিলিয়ে গেল মূল কেন্দ্রে) দেবতারা পালিয়ে গেলেন ব্রহ্মার কাছে (অর্থাৎ neutron energy field এর কাছে—যা থেকে সবার সৃষ্টি হয়েছিল)। আবেদন জানালেন তাঁদের রক্ষা করতে। ব্রহ্মা নিজে নিষ্ক্রিয় বলে এতে অংশ নিতে পারলেন না। তিনি শিবকে পাঠালেন অর্থাৎ কেন্দ্রে ঘনীভূত শক্তি সাধারণ ভাবে অতিরিক্ত compression হেতু বিস্ফোরিত হয়ে kinetic energy হল)। শিব, দেবতাদের বললেন, সকল দেবতার শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভয়ানক অস্ত্র তৈরি করুক, যা দিয়ে জলন্ধরকে হত্যা করা যাবে (অর্থাৎ সকল pariticle-compressed হল)। দেবতারা ক্রোধে (তাপে) উত্তাপিত হয়ে জ্বলতে লাগলেন (অর্থাৎ বিস্ফোরণ হল)। প্রচুর পরিমাণে অগ্নিশিখা রূপ স্ফুলিঙ্গ বেরুতে লাগল (due to Big Bang)। শিব তৃতীয় নেত্রে এইসব শক্তি গ্রহণ করে তাকে আরও তেজ সম্পন্ন করলেন (অর্থাৎ শিবের গতি দেখা দিল)। ফেনিল এই অরুণ কণাধার (plasma)[১]-এর উপর নিজের পায়ের গোড়ালি স্থাপন করে তিনি প্রচণ্ড ভাবে ঘুরতে লাগলেন (অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান বেগে ছায়াপথ তৈরী করলেন)। ফলে সুদর্শন চক্র (ছায়াপথ) সৃষ্টি হল (সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত বেগে particle anti-particle-এর উদয় হল)। উভয় পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। শিবের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধে (Motion যুদ্ধে Anti-particle) অসুরেরা স্বর্গে পালিয়ে গেল (অর্থাৎ anti-particle space -এর অন্যত্র স্থাপিত হল)।

---

(১) রক্তের যে তরল অংশে লোহিতবর্ণ কণিকা ভেসে থাকে তাকে বলে plasma, অরুণ কর্ণাধার।

বৈজ্ঞানিকেরা এর যে ব্যাখ্যা করেছেন তা এই ধরনের ; ব্রহ্মা যে অসুরদের সঙ্গে সংগ্রামে তাঁর ক্ষমতা নেই বলে জানিয়েছিলেন, তা হল বিজ্ঞানের তিনি প্রকাশতত্ত্ব (principle of expression) মাত্র, কার্য করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু যে অসুর দ্বারা ভূপাতিত হলেন তার অর্থ এই, space বা দেশ হল particle-ও anti-particle-এর লীলাক্ষেত্র। শিব যেহেতু গতিশক্তির প্রতীক সেইজন্য বেগ প্রভাবে তিনি anti-particle-কে p rticle থেকে বিভক্ত করতে পারলেন অর্থাৎ তাদের তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হলেন।[১]

ভারতীয় পুরাণ কাহিনীতে দেখা যায় অসুরেরা বার বার স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করেছে। তারা বিতাড়িত হলেও আবার আসছে। যখন শিবের গতিশক্তি থেমে গিয়ে তা কেন্দ্রাভিমুখী হবে তখনই anti-particle-গুলিও particle গুলির সঙ্গে ফিরে আসার পথে পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে সংঘর্ষে তলিয়ে যাবে। দেবতা ও অসুরের দুই প্রান্তে অবস্থান হল Big Bing-এর সময় অর্থাৎ প্রকাশক্ষেত্র (field) থেকে বিস্ফোরণের সময়। আবার সংঘর্ষ হল কেন্দ্রে ফিরে যাবার সময় অর্থাৎ Big Curnch-এর সময়। বিজ্ঞানের ভাষায় এঁদের নাম রাখতে গেলে নাম দাঁড়াবে এই রকম :—ব্রহ্মা হলেন Neutron Nun এবং আত্মন হলেন 'quantum field'

তবে বিজ্ঞানীরা শূন্য বলতে কিছু দেখতে পাননি। একে সর্বদা তরঙ্গসমন্বিত বলেছেন। এর নাম দিয়েছেন তাঁরা Fal e vacuum বা pulsating void কিন্তু আরও একটা শূন্যতা আছে, মরমিয়ারা যাকে বলেন অতি-শূন্যতা। এই-ই হল মূল পটভূমি যার উপর শক্তিতরঙ্গ নৃত্য করে বেড়ায়। সেই যে একটা বর্ণনার অতীত অবাঙ্‌মানসগোচরম, সেই মহাক্যানভাসের বুকেই বিশ্বলীলার অবতারণা হয়। মহামানস তারই ওপর ইচ্ছামাত্র মানস চিত্র অঙ্কিত করতে পারেন। মানুষও পারে। মানুষ জানে না যে, সে যে চিন্তা করে তার প্রতিটি চিন্তাতরঙ্গ এই পরমাত্মার বুকে ছবি এঁকে রাখে। পরমাত্মার এই স্তরে যাঁরা যেতে পারেন তাঁরা সেই ছবি দেখতে পান। সেই মূল পরমাত্মা স্তরে স্তরে বস্তুজগতের বিভিন্ন ভাঁজে নিজেকে কখনও দর্পণতুল্য কখনও জ্যোতিতুল্য করে রেখেছেন। মানুষ অন্তস্থ হলেই তার তৃতীয় নয়নে এ-সব দেখতে পায়। দেখে তার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। জগতের স্মরণাতীত কাল থেকে প্রবাহিত ঘটনার চিত্র এবং সুদূর ভবিষ্যতে মানবের মানস সৃষ্ট বহু চিত্র সেই পরমাত্মায় ফুটে আছে। কোয়াণ্টাম ফিল্ড যেমন তৈরী হয় implosion-এর ফলে, মানুষও সেই পরমাত্মার সন্ধান পায় অন্তঃস্থ হলে। কিন্তু একথা এখন থাক। ২৫ বছর আগের যে কাহিনী বলতে যাচ্ছিলুম। তাই বলা যাক :—

(১) কেউ কেউ অবশ্য শিবের সঙ্গে জলন্ধরের হাতাহাতি লড়াইকে দুটি ছায়াপথের (particle-ছায়াপথ ও anti particel-ছায়াপথ) সংঘর্ষ বলে বর্ণনা করেছেন।

হয় কি পোড়ীর ছোট মন্দির দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গার উপর। ওধারেও বাঁধানো চাতাল। একটি মনুমেণ্ট দাঁড়িয়ে। ফুলওয়ালারা সারে সারে ছাতা মেলে তার নিচে ফুল নৈবেদ্য সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে। এপার ওপার সেতু দিয়ে যুক্ত। গঙ্গা এখানে দ্বিধা বিভক্ত। মনুমেণ্টের ওধারে তার আরো একটু প্রশস্ত গতি। তার ওধারেও কুল বাঁধানো সেতু। এমন মনোরম দৃশ্য আর কোথাও চোখে পড়ে নি। মনে হল, পাগলের মত ঘুরে বেড়াই। শুধু দেখি, আর দেখি। এই শীতের মধ্যেও উলঙ্গ দেহে কিছুকিছু লোক ব্রহ্মকুণ্ডের নীল জলে শিকল ধরে ঝাঁপাচ্ছিল।

মিনু বলল: আচ্ছা সন্তুদা, এই শীতের মধ্যে ওরা পাগলের মত এমন জলে ঝাঁপাচ্ছে কেন?

অঞ্জনা বলল: পুণ্য সঞ্চয় করছে।

সুনীলবাবু বললেন: না, ওরা স্থানীয় লোক। গঙ্গাপুজো করে অনেকে এখানে সোনা দানা টাকা পয়সা জলে ছুড়ে দেয়। সেগুলো কুড়োবার জন্যেই এমন করে ঝাঁপাচ্ছে ওরা।

আমি বললুম: আশ্চর্য ব্যাপার! ফাঁকী দিয়ে আয় করার জন্যে এত কষ্ট! সৎভাবে পরিশ্রম করলে অনেক কম পরিশ্রমে এরা আরো বেশী আয় করতে পারত বোধ হয়। কই. কিছু তো পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না?

ইতিমধ্যে হঠাৎ দেখি, অঞ্জনা কখন ছুটে গিয়ে জলের ধারে গঙ্গার জলে হাত দিয়েছে। সে চিৎকার করে উঠল: সন্তুদা, দেখে যাও, দেখে যাও। মিনু, এদিকে আয়।

হঠাৎ আমার বুকটা একটু কেঁপে উঠল—কোন শঙ্কায় নয়, অঞ্জনার আচম্বিত চিৎকারের জন্যও নয়, অঞ্জনার সম্বোধন শুনে। সে হয় তো নিজেও জানে না যে আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে ফেলেছে।

আমি আর মিনু দুজনেই ছুটে গেলুম জলের ধারে: কি?

—ঐ দেখ।

তাকিয়ে দেখলুম: মাছ। অজস্র মাছ স্বচ্ছ জলের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে। স্রোতের মধ্য দিয়েও দিব্যি হেসে খেলে বেড়াচ্ছে যেন। গায়ের রঙটা, আঁশটা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। ভয় নেই, সহজ নিঃসঙ্কোচ গতি।

মিনু বলল: এত মাছ! একঝাঁক মাছের পেছনে সে ধাওয়া করতে করতে বেশ কিছুদূর এগিয়েই গেল।

অঞ্জনা আমার দিকে তাকালো। আমি বললুম: ইস্, ব্রহ্মকুণ্ডের এই গঙ্গা যদি কলকাতার কাছে থাকতো?

আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো অঞ্জনা: কি হতো তাহলে?

বললুম: বাঙ্গালী মানুষ, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতুম না নিশ্চয়ই।

অঞ্জনা বলল: মনে রাখবেন, এটা ধর্মস্থান। লোভ বিসর্জন দিয়ে তাকাতে হয়।

আমি বললুম : 'তুমি' থেকে 'আপনি'-তে নামলে কেন হঠাৎ ?

—মানে ?

—এই কিছুক্ষণ আগে 'আপনির' ব্যবধান ঘুচিয়েই তো আমাকে ডেকেছিলে ?

অঞ্জনা একটু লাল হয়ে উঠল। হাত দিয়ে গঙ্গায় নীল শীতল জল কাটতে লাগল। বললুম : এবার থেকে 'আপনির' ব্যবধান ঘুচিয়ে 'তুমি' বলেই ডেকো। কেমন ?

অঞ্জনা চোখ না তুলে, জল কাটতে কাটতে বলল : কি হবে বলে ?

—আমরা যে অত্যন্ত কাছে এসেছি, সে কথা প্রমাণ হবে।

অঞ্জনা যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল : না, তা আর হয় না।

—কেন ?

—অত কাছে আমি তো যেতে পারব না। আমি কতদূরে দাঁড়িয়ে আছি, সে তো জানি।

বুঝলুম, মিনুর ইঙ্গিত দিচ্ছে অঞ্জনা।

আমি যেন কি একটু ভাবলুম।

অঞ্জনা বলল : মিনু কেমন একটু মনমরা হয়ে গেছে। আমার চেয়ে ওর সঙ্গে কথা বেশী বলবেন। ও হয় তো আমাকে ভুল বুঝছে। কিন্তু কি করি বলুন তো, বেশী কথা বলাটা আমার স্বভাব যে !

আমি বললুম : তোমাকে আমি অনেকটা চিনে নিয়েছি। সুতরাং তুমি যদি আমাকে 'তুমি' বলেই ডাক, তাতে অন্য অর্থ হবে না।

অঞ্জনা বলল : মিনু এগিয়ে গেছে, হয় তো আপনাকে একটু একা চায়। আমি রাঙামাসীদের সঙ্গে মন্দিরে যাই।

বললুম : আমি যাচ্ছি। কিন্তু 'আপনি' বলে আর ডেকো না। এই অনুরোধটুকু রেখো।

অঞ্জনা আর কিছু না বলে একটা লজ্জানম্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল শুধু।

আমি এগিয়ে গেলুম মিনুর দিকে। মিনু গঙ্গার ধারে এগুতে এগুতে ওদিকটার সেতুটাতে গিয়ে উঠেছে ততক্ষণে। দ্রুত হেঁটে গিয়ে তাকে ধরলুম। নিবিষ্ট মনে গঙ্গার নীল জলপ্রবাহের দিকে তাকিয়ে আছে মিনু তখনো।

বললুম : গভীরভাবে কি এত দেখছ মিনু ?

মিনু আমার দিকে তাকালো। হয় তো একটু বেদনা-মাখানো আছে তার দৃষ্টিতে। ও বলল : কি সুন্দর' না ?

বললুম : অপূর্ব ! দেখে যেন আর নয়ন ভরে না।

মিনু সেতুটার উপরে উঠে রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে নিচে তাকাল। আমি তার পাশে দাঁড়ালুম। অঞ্জনার সঙ্গে দেখা হবার পর মিনু যেন অনেকটা স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে।

—কি ভাবছ মিনু ?

মিনু আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল।

—কি ভাবছ ?

—ভাবছি...

—বল।

—না।

—বল না।

—না।

—কেন ?

—না।

একটু অভিমান করলুম : না বললে ব্যথা পাব :

মিনু মনের কথাটিকে কোন রকমে কণ্ঠে আনল : ভাবছি...। কিন্তু ভাবনার কথাটা সহজে সে বলতে পারল না।

—বল ?

লজ্জায় যেন রাঙিয়ে উঠল মিনু।

—বল।

অবশেষে মিনু বলল : আবার হরিদ্বারে আসব, কেমন ?

—আসব।

—শুধু তুমি আর আমি, কেমন ?

আমার বুকের রক্তের মধ্যে দোলা লাগল। মিনু তার আরক্ত মুখখানি নিয়ে নিচে প্রবহমান গঙ্গার দিকে তাকালো।

সেতু থেকে তাকিয়ে দেখতে পেলুম অঞ্জনা Clock Tower-এর ধারে দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছে। মিনুকে বললুম : চল, এবার যাই। সকলের থেকে পৃথক হয়ে এভাবে থাকাটা ভাল দেখায় না।

মিনু একটু লজ্জানম্র হাসি হেসে আমার দিকে তাকাল।

—চল।

—চল।

সেতু থেকে আমরা দুজনে নামলুম।

মিনু বলল : অঞ্জনাকে কেমন মনে হয় ?

মিনুর প্রশ্নের মধ্যে তার মনের কোন সন্দেহ আছে বলে মনে হল। কিন্তু সেটা যে আমি বুঝতে পেরেছি, এরকম কোন ভাব দেখালুম না। বললুম : ভারি হাসিখুশি মেয়েটা। জীবনের প্রাচুর্যে যেন ঝলমল করছে।

মিনু বলল : হ্যাঁ, বরাবরই ও ঐ রকম কলেজেও সব সময় ও সকলকে মাতিয়ে রাখত। অনেক ছেলে শুধু এই কারণেই ওকে ভালবাসত।

বললুম : অঞ্জনাও নিশ্চয়ই ভালবাসত কাউকে ?

মিনু বলল ঃ ঠিক সে কথা জানি নে। যা জানিনে বলে লাভ কি। বরং একজনকে ভাল না বেসে দশ জনের সঙ্গে মিশত বলে মেয়েরো ওকে ভাল চোখে দেখত না।

—কেন ?

—সকলে বলত, ও ছেলেদের নিয়ে ফ্লার্ট করে।

আড়চোখে মিনুর দিকে তাকিয়ে দেখলুম। এর মধ্যে একটা ঈর্ষা কাজ করছে না তো ? কিন্তু সে কথা ওকে বুঝতে না দিয়ে বললুম ঃ সরল মনেও তো সবার সঙ্গে ও মেলামেশা করতে পারে ? সে জন্যে এ অপবাদটা না দিলেও চলত নাকি ?

মিনু বলল ঃ কি জানি, কার মনে কি আছে। তবে অতটা ফ্রি মেলামেশা আমারও পছন্দ নয়। নিরঞ্জন তো ছায়ার মত সবসময় ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো। ওকে নিয়ে থাকাটাই ওর পক্ষে ভাল হত। ওর বি. এ. পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করবার মূলে নিরঞ্জনের সাহায্য কতটা রয়েছে, সে তো আমরা জানি। ওর নোট তো সব নিরঞ্জনেরই করে দেওয়া।

আমি শুধু বললুম ঃ একটা মানুষের মনের ভেতর প্রবেশ না করে বাইরে থেকে তাকে বিচার করতে নেই মিনু।

আশ্চর্য ! পঁচিশ বছর পরে সে কথা মনে পড়ে আজ আমার হাসি পাচ্ছে। আজ যদি হত, তা হলে অঞ্জনার চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখার কোন প্রয়োজনই হত না। চোখ বুজলেই তার মনের ছবি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠত। মিনুর কথার উপর কোন মন্তব্য করতে হত না। কিন্তু থাক, পঁচিশ বছর পরের কথা থাক, ইহজীবনেই আমার অতীত অভিজ্ঞতাগুলিকে স্মরণ করা যাক।

মিনু আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন পরীক্ষা করে দেখবার চেষ্টা করল। আমি কিন্তু সেটা দেখেও না দেখার ভান করে এগিয়ে চললুম।

হাসতে হাসতে এলুম ক্লক টাওয়ারের কাছে। সেখানে তখনো অঞ্জনা দাঁড়িয়ে ছিল। নীল স্বচ্ছ জলরাশি বয়ে চলেছে। সেই দিকে যেন ধ্যান মগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অঞ্জনা। আমাদের উপস্থিতিটা টের পেল কিনা কে জানে। কিন্তু ফিরে তাকালো না।

বললুম ঃ পার্বতীর মত ধ্যানে বসে গেলে নাকি অঞ্জনা ?

অঞ্জনা ফিরে তাকালো। আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল ঃ এখান থেকে হিমালয় খুব দূরে নয়। হয় তো এখানেই কোথাও পার্বতী শিবের ধ্যান করে থাকবেন। সতীর বাপের বাড়ি কিন্তু এই হরিদ্বারের কাছেই কংখলে ছিল।

—তুমি কোন্ শিবের ধ্যান করছিলে শুনি ?

হেসে অঞ্জনা বলল ঃ বলব কেন ? আমার শিব ঠিক জানতে পারবেন।

ততক্ষণে পুজো সেরে রাঙামাসীরা মন্দির থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

আমি সামান্য একটু অঞ্জনাকে তাকিয়ে দেখলুম। তারপর বললুম ঃ চল, ঐ ওঁরা বেরিয়েছেন।

অঞ্জনা এগিয়ে গেলুম মন্দিরের কাছে।

রাঙামাসী আর মিনুর মায়ের মুখ উৎফুল্ল। সুনীলবাবুও কপালে চন্দনের তিলক পরে বেশ তৃপ্ত। তবে বীরেনদাকে দেখলুম কেমন ক্লান্ত যেন।

প্রাতঃপ্রাশটা সারা হয় নি বলেই যে বীরেনদার এই বেদনা সেটা আমি বুঝতে পারলুম।

সুনীলবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : কেমন লাগছে সনৎ?

বললুম : অপূর্ব মেশোমশাই! দেখে দেখে যেন আর চোখ ভরে না। বুঝলুম, ভ্রমণবিলাসীরা কেন প্রতি গ্রীষ্ম আর পুজোর ছুটিতে কলকাতা থেকে বেরোয়।

সুনীলবাবু বললেন : বহু জায়গায় ঘুরেছি হরিদ্বারটায় আগে আসা হয় নি। তুমি খেয়াল করে দেখেছ কিনা জানি না—এখানে যেন একটা অতি-প্রাকৃতের ছোঁয়া আছে। .

অঞ্জনা বলল : সবাইকে কি তোমার মত ফিলজফির প্রফেসর ভেবেছ নাকি বাবা? সন্তুদা এখানে প্রকৃতি দেখে বিভোর। অতি-প্রাকৃত দেখবে কখন? জান বাবা, সন্তুদা কিন্তু কবিও।

—তাই নাকি? সুনীলবাবু একটা সাগ্রহ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

বললুম : না, না, অঞ্জনা বাড়িয়ে বলছে।

অঞ্জনা বলল : বাড়িয়ে আমি বলি নি। সেই কবিতার লাইন দুটো বাবাকে শুনিয়ে দেব?

বললুম : থাক্।

সুনীলবাবু বললেন : কবি হলেই অতি-প্রাকৃতকে নজরে পড়বে না এমন ভাবছ কেন? কবিদের চোখেই তো এসব বেশী করে পড়ে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির মধ্যেই তো সেই অতি-প্রাকৃতের সন্ধান পেয়েছিলেন। আমাদের রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-চেতনার মধ্যেও সেই অতি-প্রাকৃতের ছোঁয়া দেখবে। ফিলজফির ছাত্র হলেই, অতি-প্রাকৃতকে জানতে পারবে এমন নয়। সেই অতি-প্রাকৃত যে একটা অনুভবের জিনিষ। তাকে ধরতে হলে মরমিয়া চেতনা থাকা দরকার। রবীন্দ্রনাথ অতি বড় মরমিয়া কল্পনার অধিকারী ছিলেন বলেই অপার্থিব একটা শক্তিকে সর্বত্র লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন।

অঞ্জনা বলল : ওরে বাবা, এ যে বিরাট লেকচার দিয়ে ফেললে তুমি। এসব ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ রবীন্দ্রনাথের কিছু বুঝি না আমি, মিনুকে জিজ্ঞেস কর।

মিনু একটু রাঙিয়ে উঠল।

রাঙামাসী আমাকে বললেন : চল্, গঙ্গার ধারটা একটু ঘুরে নি। বড় সুন্দর জায়গা রে।

বীরেনদার চোখে-মুখে বিরক্তির রেখাটা ততক্ষণে প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। সৌন্দর্য দিয়ে পেট ভরে না। পেট না ভরলে মনও ভরে না।

বললুম : মাসী, গঙ্গার ধারটা বিকেলে ঘুরব। তখন দেখতে আরো ভাল লাগবে।

এখন চল, ফিরি। খাওয়া দাওয়াটা সেরে নিয়ে এক্ষুনি আবার বেরিয়ে পড়তে হবে। আজকের মধ্যেই হরিদ্বারটা দেখে নিতে হবে। কাল হবে হৃষিকেশ লছমন ঝুলা। সুতরাং এখন আর সময় নষ্ট করো না। বীরেনদা, আপনি কি বলেন ?

বীরেনদা এতক্ষণ অনাদৃত হয়ে ছিলেন। তাকে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছিল না। অথচ এ বিষয়ে তারো তো কোন বক্তব্য থাকতে পারে ?

বীরেনদা বললেন ঃ হ্যাঁ, তাড়াতাড়িই এসব দেখেশুনে নিতে হবে। হাতে তো সময় নেই। মথুরা বৃন্দাবন সবই বাকী। চল, খাওয়া দাওয়াটা সেরে আবার বেরিয়ে পড়ি।

মিনু আর অঞ্জনা খাওয়া দাওয়ার কথা শুনে একটু হাসল। এতক্ষণ এ কথাটা তাদেরও বোধ হয় খেয়াল ছিল না। ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজে। এতক্ষণও বীরেনদা না খেয়ে আছেন, সেটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার।

অঞ্জনা বলল ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটাই ভাল। ভাল রাবড়ি দেখেছি, ফেরার পথে কিনে নেব।

বীরেনদার মুখের ভ্রূকুঞ্চনগুলো কেটে গিয়ে হাসির আলো লক্ষ্য করা গেল। সকলেই আবার ফিরতে লাগলুম সেই গলিপথ ধরে। গঙ্গার ধার সবটা ঘুরে দেখা হল না। অথচ দেখবার মত জায়গা। বিকেলবেলা দেখা যাবে।

রাঙামাসী একটা দোকানের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তীর্থস্থানের নমুনা নিতে হয় সব জায়গা থেকে। একটা কিছু কিনি।

বীরেনদা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। আমি তার বিরক্তির কারণ বুঝতে পেরে বললুম ঃ বিকেলে দেখে শুনে কিনব মাসী। এখন থাক।

—তোদের আবার মনে থাকবে তো ?

—থাকবে।

আবার আমরা চলতে লাগলুম।

সেই গাড়ী থেকে লক্ষ্য করে আসছি, সকলেই কিছু না কিছু কথা বলছেন, শুধু অঞ্জনার মা চুপচাপ। মাঝে মাঝে রাঙামাসীর সঙ্গে কি কথা বলেন, আমরা শুনতে পাই না। তিনি কথা বলেন না দেখে আমরাও যেন তাকে অবজ্ঞা করে চলেছি। এটা উচিত নয়। হঠাৎ আমি অঞ্জনার মাকে জিজ্ঞেস করে বসলুম ঃ মাসীমা, সবাই আমরা কথা বলছি কিন্তু আপনি একেবারে চুপ, কেন বলুন তো ?

অঞ্জনার মা মাথার ঘোমটা আর একটু টেনে দিয়ে সলজ্জ ভঙ্গীতে হাসলেন শুধু। সেই সেকেলে ভদ্রমহিলা।

সুনীলবাবু বললেন ঃ রাস্তায় বেরুলে উনি মৌনী অবলম্বন করেন। ওর মৌনী ভাঙাবার চেষ্টা কোরো না। উনি আবার সেই হেঁশেলে ঢুকে ঘোমটা আর মুখ দুটোই খুলবেন। তখন একবার ওর মুখের কাছে গিয়ে দাঁড়িও! কয়েকটা দিন মুখ বন্ধ করে থাকতে দাও। মুখটা আর খুলিও না সনৎ। নইলে ভ্রমণটা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে।

এরপরেও একটা প্রতিবাদ করলেন না অঞ্জনার মা। শুধু আরও একটু বেশী সলজ্জ হয়ে উঠলেন। এ মানুষ হেঁসেলে ঢুকেও মুখ আর ঘোমটা কোনটা খোলেন বলে আমার মনে হল না। অথচ এরই মেয়ে অঞ্জনা। একটা কথায় জাহাজ।

চলতে চলতে হঠাৎ বীরেনদা এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালেন।

—কি বীরেনদা ?

—এই সেই বাঙালী হোটেল।

বীরেনদা বোধহয় দু'ধারে এই হোটেলটা লক্ষ্য করতে করতেই আসছিলেন।

বললুম : দেখুন জিজ্ঞেস করে, রান্না হয়েছে কিনা।

বীরেনদা এগিয়ে গেলেন।

দেখলুম, দুজন বামুন রান্না করছে। দুজন নিচু শ্রেণীর বাঙালী মহিলা যোগান দিচ্ছে।

ওরা জানালো : আরো আধ ঘণ্টা খানেক রান্নার বাকী। শুনে বীরেনদার মুখটা যেন শুকিয়ে গেল।

অঞ্জনা বলল : এগিয়ে চলুন। হোটেলের যা চেহারা দেখছি, এখানে খেতে প্রবৃত্তি হবে না।

বীরেনদা বললেন : অন্য কোথাও বাঙালী হোটেল আছে কি ?

অঞ্জনা বলল : বাঙালীর না থাক, সিন্ধির আছে।

—ভাত মিলবে ?

—নিশ্চয়ই মিলবে। কেন মিলবে না ? স্টেশনের পাশে ভাল ভাল পরিষ্কার সিন্ধি হোটেল দেখেছি, সেখানে খাব।

বীরেনদা অসহায়ের মত আমার দিকে তাকালেন। তার ভয়, বাঙালী হোটেল আর পাওয়া যাবে না। সুতরাং ভাতও মিলবে না।

আমি বললুম : তাই চলুন বীরেনদা। পরিষ্কার হোটেল দেখা যাক। ভাত ঠিকই মিলবে। তাছাড়া মাসীমাদের তো আর হোটেলে বসানো চলে না। ওদের ধরমশালায় রেখে, একটা ভাল হোটেল দেখে আমরা খেয়ে আসব। ফেরার পথে মাসীমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসা যাবে। তীর্থে জাত বিচার নেই। আর তাছাড়া এখানে মাছ-মাংসের বালাই নেই। সবই নিরামিষ।

অঞ্জনা বলল : সন্তুদার প্রস্তাবটাই ভাল। আগে ধরমশালাতেই ফেরা যাক।

সুনীলবাবু বললেন : তা হলে বাপু আমার খাবারটাও ধরমশালাতেই নিয়ে এসো।

বললুম : সেটাই ভাল হবে মেশোমশাই।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ধরমশালাতে পৌঁছানো গেল। রাঙামাসীদের ধরমশালাতে রেখে দুটো বড় টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লুম। ঝকঝকে তকতকে রাস্তা হরিদ্বারের। অনবরত ঝাড়ুদারেরা কাজ করছে। কোথাও [illegible]

নোওয়া পড়বার উপায় নেই। কাশীতে হোচট খেয়ে বীরেনদার নতুন জুতো জোড়ার মাথা খুলে গিয়েছিল। পথে একজন মুচি দেখে থামলেন তিনি। আরো কয়েকজন জুতো সারাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন।

মুচি বীরেনদাকে বলল : কোন্ ধরমশালায় উঠেছেন ?

—মেহেরচাঁদ।

—কোথায় যাচ্ছেন ?

—হোটেলে।

—যান বাবু, খেয়ে আসুন। ফেরার পথে জুতো নিয়ে যাবেন।

সদ্য কেনা নতুন জুতো জোড়া। মুচির হেফাজতে বিশ্বাস করে ফেলে যাওয়া যায় নাকি ?

বীরেনদার মনে সন্দেহের দোলা ছিল। আমাদের মনেও। ইতস্তত করতে লাগলেন বীরেনদা। মুচি ব্যাটা অন্তর্যামী নাকি! আমাদের মনের কথাটা যেন সহজেই বুঝতে পারল। বলল : বাবু, ইয়ে হরিদ্বার হ্যায়। কই ভাবনা নেই, আপলোক যাইয়ে।

ভারতবর্ষে বিংশ শতাব্দীর হালচাল অপেক্ষা হরিদ্বারের হালচাল যে ভিন্ন, এটা বাংলা দেশের মানুষ হয়ে কি করে কল্পনা করি! তবু আমার মনে হল, পরীক্ষা করেই দেখা যাক না। না হয় নতুন দেশের মানুষ পরীক্ষা করতে একুশ টাকা গচ্চা দেব। বীরেনদাকে বললুম : চলুন ভগবানের উপর বিশ্বাস করে। আর তা ছাড়া রাঙামাসীর খাবার তো জুতো পায় দিয়ে আনা যাবে না। জুতো জোড়া মুচির হেফাজতেই থাক।

মিনু বলল : থাক। দেখা যাক না পরীক্ষা করে, কেমন হরিদ্বার।

অগত্যা নিম্‌রাজী হয়ে বীরেনদা আমাদের সঙ্গে এগুলেন। কিন্তু মনটার মধ্যে যে খচ্‌খচ্ করছে তার মুখ দেখেই সেটা টের পাওয়া গেল।

অঞ্জনা বলল : বীরেনদা চলুন, জুতো জোড়া ফিরিয়ে আনা যাক। শেষে খাওয়াটাই আপনার মুখে রুচবে না।

বীরেনদার মুখ লাল হয়ে উঠল। কোন কথা না বলে হন্‌হন্ করে তিনি হোটেলের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

স্টেশনের পথের পাশে সিন্ধি হোটেল দেখেছিলুম। সেখানেই উঠলুম। খুব আদর যত্ন করে বসালে ওরা। সব্জি আর ভাত অর্ডার করলুম। সুগন্ধি দেরাদুন চালের ভাত। অত্যন্ত মিহি। এক প্লেট করে ভাত দিল। দেখে আমারই যেন কেমন মনে হতে লাগল—এতে পেট ভরবে? বীরেনদার মুখ খুব গম্ভীর দেখলুম—এতে পেট ভরে?

কিন্তু খেতে আরম্ভ করে দেখি তাজ্জব ব্যাপার। এক প্লেট ভাতই যেন কয়েক গ্রাস মুখে দেবার পর মুখ মেরে আসে। আর খেতে ইচ্ছে করে না। ওদিকে তাকিয়ে দেখি, অঞ্জনা আর মিনুর মুখেও সেই একই ছাপ।

অঞ্জনাকে বললুম : অঞ্জনা, এ চাল কলকাতার রেশনে দিলে কেমন হত ? আমাদের খাদ্যমন্ত্রী বুদ্ধিমানের কাজ করতেন।

অঞ্জনা বলল : মাইলো দিয়ে দেশ ভাসাচ্ছে, পোলাওয়ের চাল দেরাদুন রাইস দেবে রেশনে ? সন্তুদার যা উদ্ভট চিন্তা।

বললুম : চালটা ভারি ইকনমিক, তা লক্ষ্য করেছ ?

—কি রকম ?

—এক প্লেট উঠাতে পারছি না। চারশ গ্রামে হয় তো সপ্তাহ কুলিয়ে যেত।

কংগ্রেস মন্ত্রীবৈঠকে সুযোগ্য মন্ত্রী নেই। নইলে উত্তর প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে কলকাতার জন্যে দেরাদুন রাইসের ব্যবস্থা করতেন। চারশ গ্রাম চাল দিলেও বলবার কিছু থাকতো না।

অঞ্জনা বলল : তার উপর আবার একশ গ্রাম কাঁকড় মিশিয়ে দিলে তো আর কথাই ছিল না।

বীরেনদা বললেন : তা যাই বল, যত মিহিই হোক না কেন, খুব বেশী খাওয়া যায় না কিন্তু।

তাকিয়ে দেখি, বীরেনদার মত খাইয়ে লোকও সবটা শেষ করতে পারেন নি। প্রথমে হয় তো ভেবেছিলেন, পাঁচ সাত প্লেট ভাতে কি হবে ? কিন্তু ধন্য দেরাদুন রাইস!

পার ডিস দেড় টাকা করে পড়ল। টিফিন ক্যারিয়ারে রাঙামাসীদের জন্য খাবার নিয়ে বেরুলাম। রাস্তায় দেখি, সেই মুচি বসে। বীরেনদার জুতো সারানো হয়ে গেছে, কিন্তু খোয়া যায় নি।

মুচি ডাকল : বাবু, জুতো নিয়ে যান।

সত্যি, হরিদ্বারের বিশেষ মাহাত্ম্য স্বীকার করতেই হবে। একেবারে আনকোরা নতুন জুতো জোড়া নিয়ে যে চর্মকার প্রস্থান করে পড়ে নি, বাঙ্গালীর ছেলে হয়ে এবং বাংলা দেশের ছেলে হয়ে সেটা ভাবতেই পারি নি।

বীরেনদা জুতো জোড়া হারায় নি দেখে খুশী। বললেন : আর একটু থাক। ধরমশালা থেকে আবার যখন বেরুব তখন নেব। হাতে মাসীমার খাবার, জুতো পরবার উপায় নেই।

মুচি বলল : বলুন তো ধরমশালাতে পৌঁছে দেব।

বীরেনদা বললেন : দরকার নেই। এখনি বেড়াতে বেরুব, নিয়ে যাব।

অঞ্জনা বলল : হরিদ্বারের সবই এরকম নাকি ? জিনিষপত্র দাম করা থেকে সবাই বলে ইয়ে হরিদ্বার হ্যায়। ঠকবার ভয় কিছু নেই। এটা কি ভারতবর্ষের বাইরে নাকি ?

আমি বললুম : এটা ভারতবর্ষের বা দুনিয়ার বাইরে নয়। স্বর্গ আর মর্ত্যের মাঝামাঝি। হরিদ্বারের এ কথাটা সত্যি ভুলব না কোনদিন। বিদেশী লোকের জুতো জোড়া মেরে দিয়ে যে কোন সময়ে সরে পড়তে পারতো লোকটি।

ধরমশালায় এসে উপস্থিত হলুম আমরা। রাঙামাসী হোটেলের খাবার খেতে কোন আপত্তি করলেন না। মাছ মাংসের কারবার নেই তো এখানে। কিন্তু পেঁয়াজকে যে এরা নিরামিষ ভাবে, সে কথাটা আর বললুম না তাঁকে।

খাওয়া শেষ হতেই তাগিদ দিলেন বীরেনদা : আর দেরী নয়। আজকের দিনের মধ্যেই হরিদ্বার এবং আশেপাশের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে নিতে হবে।

কিন্তু সুনীলবাবুর চোখে-মুখে একটা আলস্যের ভাব লক্ষ্য করা গেল। এ বয়সে ওটা স্বাভাবিক। অথচ বিশ্রামের তাঁর উপায় নেই। তিনি নিজেও যে বীরেনদার মত হ্যারিকেন 'ট্যুরে' বেরিয়েছেন।

সুতরাং সকলে আবার বেরিয়ে পড়লুম। ঠিক করলুম, দুটো টাঙ্গা নেব। রাস্তা থেকে বীরেনদা জুতো জোড়া নিয়ে নিলেন। সদৃশ্য অবস্থাতেই জুতো জোড়া বিদ্যমান। একটু এগিয়েই দুটো টাঙ্গা পাওয়া গেল। টাঙ্গা প্রতি ভাড়া আট টাকা রফা হল। কিন্তু একটি টাঙ্গাওয়ালার নাম জিজ্ঞেস করে জানলুম, সে মুসলমান।

বীরেনদা বললেন : মুসলমান হয়ে ধর্মস্থান ঘুরে দেখাবে কি করে ?

বললুম : নিন, তীর্থস্থানে এসে আর জাত বিচার করতে বসবেন না। রাঙামাসীকে নিয়ে আপনারা ও টাঙ্গায় (হিন্দুর) উঠুন। আমরা এটায় উঠছি। স্বর্গদ্বারের কাছে এসে আবার হিন্দু মুসলমান আছে নাকি! সব একাকার হয়ে গেছে।

আর কোন বাক্যব্যয় না করে সকলে গাড়ীতে উঠলুম। বীরেনদা আমি মিনু আর অঞ্জনা উঠলুম একটাতে। রাঙামাসী আর সুনীলবাবুরা আর একটাতে উঠলেন। গাড়ী চলতে লাগল ভেতর দিকে। হরিদ্বারের পথ ঘাট কলকাতার মত নোংরা আর যানবাহন-কণ্টকিত নয়। ঝকঝকে পথ। চলছে বেশীর ভাগ টাঙ্গা আর রিক্শা। মাঝে মাঝে দু'একটা স্থানীয় ট্যাক্সী বা দূরাগত ভ্রমণবিলাসীদের প্রাইভেট কার। সাইকেল এখানে বড় বাহন। যুবতী মেয়েরা দেখি সবাই প্রায় সাইকেল চড়ে যাতায়াত করে।

মেয়েদের একটা সাইকেল প্রশেসন দেখে অঞ্জনাকে বললুম : কলকাতায় এই ব্যবস্থাটা থাকলে ভাল হত, কি বল অঞ্জনা ? ইউনিভার্সিটিতে যাবার জন্য স্টেট বাসের ভিড় ঠেলতে হত না এমন করে। এরা দেখ দিব্যি চলেছে। গায়ে গায়ে এতটুকু ধাক্কা লাগছে না। প্রসাধন কোথাও একটু মলিন হয় নি। অথচ ইউনিভার্সিটির প্রাঙ্গণে যখন বাংলার মেয়েরা গিয়ে ওঠে, তখন দেখে মনে হয়, সমুদ্রের ঝড়ে যেন বিধ্বস্ত হয়ে এলো সব।

অঞ্জনা মৃদু হেসে বলল : তুমি বুঝি এটাই লক্ষ্য করতে সন্তুদা ?

'তুমি' বলে সম্বোধনটা এবার তাহলে নিসঙ্কোচেই করল অঞ্জনা। আমার অনুরোধটা সে তাহলে অবহেলা করে নি। কিন্তু মিনু এ সম্বোধনটা শুনে কেমন ভাবল ? ওরা তো পেছনে বসে পেছন দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ দেখবার উপায় নেই। শুধু

অঞ্জনাই মুখ ফিরিয়ে কথা বলবার জন্যে আমার দিকে তাকিয়েছে। তার মুখে অবশ্য একটা দুষ্টু হাসি। আমি বললুম: না, মানে কি জান, আমি তোমাদের জন্য সমবেদনা অনুভব করতুম।

—সেটা তো ছেলেদের জন্যও করতে পারতে?

বললুম: ছেলেরা স্বভাবতই কষ্টসহিষ্ণু। আর সৌন্দর্যটা তো ওদের অঙ্গভূষণ নয়, মেয়েদেরই।

অঞ্জনা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মিনুর গা ঠেলে দিয়ে বলল: ইতিহাসে এরকম এনালিসিস আছে নাকি?

বললুম: ইতিহাসের নয়, এটা মানুষের চোখের এনালিসিস।

হঠাৎ মিনু বলল: তোমার চোখটা ইউনিভার্সিটিতে মানুষের চোখ ছিল নাকি?

বললুম: মানুষ যখন, তখন মানুষের চোখ থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

মিনু বলল: সে কথা জানলুম।

অঞ্জনা বলল: সন্তুদা, মিনুর অভিমতটা কিন্তু আমার নয়।

মিনু একটা কপট ধমক দিল অঞ্জনাকে: থাম তো, বক্‌বক্ করে সময় নষ্ট করছিস। রাস্তার দুই ধারে হরিদ্বারটাকে ভাল করে তাকিয়ে দেখ্। দু'দিন পরেই তো চোখের উপর এ দৃশ্য আর থাকবে না। এসেছিস তো এই দৃশ্য দেখতেই।

বললুম: তোমার কথা মেনে নিয়ে এই দৃশ্যের দিকেই তাকাচ্ছি মিনু। কিন্তু এইটুকু কন্‌সেসন অন্তত তোমার থাকা উচিত ছিল যে আমরা সবাই সাহিত্যের ছাত্র নয়।

মিনু বলল: নও যে সেত বোঝাই যায়। সাহিত্যরসিক যারা, তারা এত বকবক করে না।

বললুম: নই বলেই তো বক্‌বক্ করি। কিন্তু তোমার ধ্যান ভঙ্গ করব না। এই আমি চুপ করলুম।

সত্যি আমি চুপ করে গেলুম। কিছু কালের জন্য ওরাও কোন কথা বলল না। টাঙ্গা চলতে লাগল। আমি পথের দুই দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম। বাজারের কোণ্ ঘেষে ব্রহ্মকুণ্ডের পাশে উঁচু বাঁধের মত রাস্তা দিয়ে আমাদের টাঙ্গা এগিয়ে চলল। আগে রাঙামাসীদের টাঙ্গা চলেছে। সুনীলবাবু গাড়োয়ানের পাশে বসে ধ্যানগম্ভীর ভাবে পারিপার্শ্বিকের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর দার্শনিক মনে কিসের দোলা লেগেছে কে জানে!

আমাদের গাড়ীতে বীরেনদাও চুপচাপ। গাড়ী এসে রেল লাইনের ধারে পৌঁছুল। রাস্তা এখানে রেল লাইনের পাশ দিয়ে গেছে। পাশে পশ্চিমে পাহাড়। উপরে শ্বেতশুভ্র মনসা মন্দির। পাহাড়ের গা দিয়ে রেল লাইন চলে গেছে। দার্জিলিংয়ের রেল লাইনের মত অত ঘোরানো নয়। লাইন গেছে দেরাদুন পর্যন্ত। আমাদের গাড়ী বাঁকানো রাস্তার উপর। এখানে রাস্তা তত সুন্দর

বা পরিষ্কার নয়। রাস্তার ধারে ধারে বাড়ি ঘর। প্রত্যেকটি বাড়ির উপরই হনুমানজীর মূর্তি বা ছোট মন্দির।

দুই পাশে অনেক মন্দির। প্রত্যেকটির পিছনেই কোন না কোন ইতিহাস আছে। গাড়োয়ান বিড়বিড় করে কি সব পরিচয় দিযে যেতে লাগল। এগুলোর গুরুত্ব খুব বেশী নয বলে টাঙ্গা এখানে থামবে না। সুতরাং আমাদেরও আকর্ষণ খুব বেশী থাকল না। হরিদ্বার ঘুরে দেখতে টাঙ্গাতে সারাদিন লেগে যাবে। সর্বত্র নেমে দেখা সম্ভব নয়। চলতি গাড়ী থেকেই স্বল্পখ্যাত জিনিষগুলোকে দেখতে লাগলুম।

ব্রহ্মকুণ্ডের ধার থেকে আড়াই ফার্লং রাস্তা চলবার পর গাড়ীর গতি কমে গেল। গাড়োয়ান বলল : ভীম গোড়া।

ঝাঁকি খেয়ে গাড়ী থামল।

অঞ্জনা বলল : ভীম গোড়া। সে কি ?

আমাদের গাড়োয়ান মুসলমান। বলল : ভিতরমে যাইয়ে। দেখিয়ে।

নেমে ভেতরে গেলুম। পাহারের গায় ভীমগোড়া। ছোট্ট গুহা। পাশে স্নানের সরোবর। দেখলুম, পাঞ্জাবী মেয়েরা স্নান করছে। পাহাড়ের গায়েই ছোট খাটো মন্দির। পাণ্ডারা বসে। একটু চরণামৃতের বিনিময়ে দু' এক পয়সা দর্শনার্থীরা দিয়ে যাচ্ছে। হনুমানজীর মন্দির সর্বত্রই।

খোঁজ নিয়ে জানলুম গোড়ার ইতিহাস। ভীম গোড়ার আগেই সপ্তধারা। গঙ্গা সেখানে সাত ধারায় বিভক্ত। হরিদ্বারের কাছে এসে মিশেছে এক হয়ে। সপ্ত ধারার এক ধারা ভীম গোড়া কুণ্ডের একদিক দিয়ে ঢুকে আর এক দিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে গঙ্গায় মিশেছে। ভীম গোড়ার প্রবাদ হচ্ছে এই যে, গঙ্গা যখন স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামেন, তখন ভীম এখানে পথ দেখাবার জন্যে পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন। ভীমের পায়ের হোচট লেগে এখানে একটি গুহা তৈরী হয়। প্রমাণ স্বরূপ মাঠের মধ্যে কুণ্ডের নিচে একটি আঠার ফিট গভীর গুহার কথা বলল ওরা। এখানে স্নানে নাকি বিশেষ পুণ্যে।

অঞ্জনা বলল : সন্তুদা, রামায়ণের কালে জানি গঙ্গা মর্ত্যে অবতরণ করেন। তবে তাঁব পাহারায় ভীম নিযুক্ত হলেন কি করে ?

বললুম : তীর্থের মাহাত্ম্যে রামায়ণ মহাভারত সব এক হয়ে যেতে পারে। প্রশ্ন তুলো না, শুধু দেখা যাও। ও সব কাব্য সাহিত্যের ব্যাপার।

মিনুর দিকে তাকিয়ে একটু কটাক্ষ করে বললুম : তা ছাড়া সাহিত্য তো অনেকটা ইনটুইশন, ব্যাখ্যা করে তার ধ্যান ভঙ্গ করা উচিত হবে না।

মিনু একটু লাল হল মাত্র, কোন কথা বলল না।

অঞ্জনা প্রতিবাদ করল : সাহিত্যকে বিচারহীন বলতে চাও নাকি তুমি ?

বললুম : অন্তত বাংলা সাহিত্যকে।

অঞ্জনা বলল : আমি প্রতিবাদ করছি। যে সাহিত্যে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ আছেন, সে সাহিত্য সম্পর্কে এমন অভিমত প্রকাশ কোরো না তুমি।

বললুম : তোমার প্রতিবাদ গ্রাহ্য হবে না। সাহিত্যের ছাত্রী নও তুমি।

অঞ্জনা মিনুকে ঠেলে দিয়ে বলল : তুই প্রতিবাদ কর তবে।

মিনু বলল : যে যা জানে না, তা নিয়ে তার সঙ্গে তর্ক করে কি লাভ।

অঞ্জনা একটা কটাক্ষপাত করে আমাকে আর মিনুকে, দুজনকেই তাকিয়ে দেখল।

মাত্তামাসী আর অঞ্জনার মা গোড়ায় নেমে মাথায় জল দিয়ে উঠে এলেন। সত্যাসত্য যাচাইয়ের প্রশ্ন এদের নেই। এদের 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।'

টাঙ্গা আবার ছাড়ল। এবার আরো এগিয়ে। ভারতবর্ষে যে হিন্দুধর্ম লুপ্ত হয়ে যায় নি, উত্তর প্রদেশের এই সীমান্তে এলে সেটা বোঝা যায়। পথের দু ধারে ছোট বড় মন্দির। সাধু সন্ন্যাসীদের আড্ডা। নতুন নতুন মন্দির এখনো তৈরী হচ্ছে। সর্বত্র একটা গৈরিক ভাব বিদ্যমান। এর জন্যে আমার অবশ্য একটু ভালই লাগল। একটা অতি উগ্র বর্তমান সভ্যতার চাপে যেন নিষ্পেষিত হচ্ছিলুম। বার বার খোঁজ করছিলুম, কোথায় সেই তপোবনের ভারত, যার শ্যাম ছায়াতলে ছিল অফুরন্ত শান্তি। এখানে যেন সেই ছায়া অনুভব করা যায়।

প্রাচীন ভারতের সেই শ্যাম স্নিগ্ধ জীবনের জন্য বোধহয় এই বিভ্রান্তির যুগেও মানুষের অবচেতন মনে একটা আকাঙ্ক্ষা আছে। সত্যি, পরিবেশ আর প্রকৃতি এখানে শান্তির প্রলেপ মাখানো, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এই সৌম্য উদার প্রকৃতির কোলে মানুষ যদি কৃত্রিমতা না দেখাতো তবে বোধহয় ধর্মবিশ্বাস মানুষের দুর্বল হয়ে যেত না কোনদিন। সন্ন্যাসীদের জন্য অট্টালিকা উঠেছে। ঘর ছেড়ে তবে তারা বাইরে এল কি কারণে? মন্দিরগুলোর পবিত্রতাও নষ্ট হয়েছে ব্যবসায়ীদের ফাঁদে পড়ে। তেমন একটা মন্দিরের কাছেই আবার এসে টাঙ্গা থামল।

বললুম : এখানে দেখবার কি আছে?

—রামসীতার মন্দির দেখে আসুন বাবুজী।

—নেমে দেখলুম Under-Construction একটি নতুন মন্দির। উঠানে প্রবেশের পথেই প্রাচীন রামায়ণের গল্প অনুসরণে একটি মূর্তি। হাতী-কুমীরের লড়াই। নারায়ণ পৃষ্ঠে উড়ন্ত গরুড় এসেছে স্মরণাপন্ন হস্তিকে রক্ষা করতে। ছোট-বেলা পিসিমার পাশে বসে কৃত্তিবাসের রামায়ণে পয়ারবন্ধ কবিতায় এ কাহিনী পড়েছিলুম। স্মৃতির ছায়া থেকে সেই গল্পটা বেরিয়ে এল।

ভেতরের ঘরে রামসীতা লক্ষ্মণের মূর্তি। উঁকি মেরে দেখলুম : সুন্দর ভাবে কাচ সেট করা মূর্তি চার ধারে। এক রামসীতা কাচের ভেক্ষিতে হাজারো রামসীতার মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

উল্লাসে লাফিয়ে উঠল অঞ্জনা : বাঃ! বেশ মজার তো!

রাঙামাসী তো যত্নভরে বারকয়েক ভক্তি ভরে প্রণাম ঠুকে দিয়ে বললেন : ঠাকুরের মহিমা আছে। দেখ না, এক ঠাকুর হাজার মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

বললুম : রাঙামাসী, আমি নিজে যদি ঐ কাঁচের কুঠরীতে বসি, আমারও হাজার মূর্তি হবে। তাই বলে আমাকেও পুজো করবে না কি?

রাঙামাসী যেন একটু বিরক্ত হলেন : ঠাকুরকে নিয়ে কি যা-তা বলিস।

রাঙামাসীকে আমি বললুম : তাহলে এই দেখ। আমি হাত বাড়িয়ে দিলুম ঘরের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠল।

রাঙামাসী তো দেখে অবাক। অঞ্জনা আর মিনুও।

আমি বললুম : এটা কাঁচের খেলা। এ ভৌতিক বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক দেখানো যায়। কিন্তু তাই বলে এর মধ্যে ভগবান নেই। সাধারণ দেহাতি মানুষকে ফাঁকি দেবার জন্যে এটা এক রকমের ধোঁকাবাজি। এ না করে যদি অকৃত্রিম মূর্তিটাই রাখতো, ধর্মভাব বেশী জাগতো।

সুনীলবাবু বললেন : তুমি ঠিকই বলেছ।

অঞ্জনা একবার বাবার দিকে আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখল।

আমার কথার যথার্থতা বাইরে আসতেই ধরা পড়ল। ধর্মের মর্যাদা মাড়োয়ারী গোষ্ঠী নষ্ট করছে। ধর্মকে তারা ব্যবসায়ের মূলধন হিসাবে ব্যবহার করছে মাড়োয়ারী পুঙ্গবেরা ধর্ম নিয়ে ব্যবসা জুড়ে তার কম ক্ষতি করে নি। ধর্মের ক্ষেত্রে মাড়োয়ারীদের নির্লজ্জ লোভের প্রকাশ এখানেই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেল।

মাথায় পাগড়ি জড়ানো, গায়ে মখমলের পাঞ্জাবী, দু'তিনটে ফোন নিয়ে বসে আছে মন্দিরের মালিকেরা। বিত্তবান উত্তর ভারতের মহিলারা মেঝের উপর ভক্তি সহকারে বসে। সামনে টাকার বাক্স। একশ দুশ টাকার নোট দিয়ে যেতে নিজের চোখে দেখলুম। সাধারণ যাত্রীরা একটাকা দুটাকা থেকে দু আনা চার আনা পর্যন্ত দিচ্ছে। তাদের প্রতি মন্দির-অধ্যক্ষদের ফিরে তাকাবার অবসর পর্যন্ত নেই। রাঙামাসীকে দেখলুম, আঁচল খুলে কয়েক আনা পয়সা রাখলেন বাক্সের ভিতর। অঞ্জনার মাও তাই করলেন। একবার মনে হল চিৎকার করে মানা করি। কিন্তু পুণ্য তো বিশ্বাসের উপর। যাঁরা দান করছেন তারা নিশ্চয়ই প্রতারিত হবেন না। কিন্তু এ ব্যবসা যাঁরা খুলেছেন তাদের মন কি জবাব দিচ্ছে?

সুনীলবাবু বললেন : কলকাতায় একটা ফোন রাখতে হিমসিম খাচ্ছি। সন্ন্যাসীদের দেখছি, তিন তিনটে ফোন্?

আমি বললুম : ধর্মের বাহারটা একবার লক্ষ্য করুন। স্থানের মাহাত্ম্যটা পর্যন্ত এরা নষ্ট করল। ধর্মটা আসলে মিথ্যে নয়, কিন্তু এদের জন্যই বুঝি মার্কস চিৎকার করে প্রতিবাদ করেছিলেন : Religion is opium of the people.

সুনীলবাবু বললেন : Exactly so এইজন্যে কোন মন্দির দর্শনে আমার স্পৃহা নেই। আমি বাইরে বেরুলে চারিদিকে তাকিয়ে দেখি। আর এসব জায়গাতে সেই

আজিমেরে কেথার মধ্যেই ধর্মটা সার্থক বলে মনে হয়। মন্দির মঠগুলো প্রকৃতপক্ষে জোচ্চোরের আড্ডা।

অঞ্জনার মাকে মুখ নাড়তে দেখেছি। কিন্তু তার মুখ থেকে এ পর্যন্ত কোন শব্দ আমার কর্ণগোচর হয় নি। এই প্রথম তার কণ্ঠ শুনলুম। স্বামীকে লক্ষ্য করে তিনি ভর্ৎসনা করে উঠলেন: নাও, বাজে কথা বোল না। সর্বত্রই তুমি বিদ্যা ফলাতে চাও নাকি?

সুনীলবাবু অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকালেন। সে দৃষ্টির অর্থ—দেখ সনৎ।

কিন্তু এতো আমি আগেই দেখেছি। এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা। এই সব মাসী পিসীদের সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। এদের মনের সততা সন্দেহের ঊর্ধ্বে। এ জন্যে তীর্থযাত্রা এঁদের সার্থকও বটে; আর এঁদের জন্যেই সনাতন ধর্ম ব্রাহ্মণদের দীর্ঘ অত্যাচার, মুসলমানদের নিগ্রহ সত্ত্বেও আজো বেঁচে আছে। তর্ক না করে নীরবে ওখান থেকে বেরিয়ে এলুম। মিনু আর অঞ্জনা চারিদিক ভাল করে তাকিয়ে দেখছিল। আমি টাঙ্গার কাছে আসতে ওরাও এদিকে চলে এল।

বীরেনদার মনের মধ্যে এ ধরনের পুণ্যার্জন সম্বন্ধে কি ধারণা জানিনে, তবে ট্যাঁকে টান পড়লে তিনি একটু বিরক্ত যে হন এটা তার মুখ দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেল। পুণ্যার্জনের আশায় রাঙামাসীমা সামান্য হলেও সর্বত্রই দান করছেন। কিন্তু তীর্থ তো এখনো শেষ হয় নি। আরো আছে, মথুরা বৃন্দাবন। এমন করে চললে শেষে টানাটানিতে পড়বেন কিনা সেই চিন্তাতেই বীরেনদা অস্থির। সকলে গাড়ীতে উঠলুম। টাঙ্গাওয়ালারা ঘোড়াকে ঘাস জল দিচ্ছিল। মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে আবার তাদের গাড়ীতে জোতা হল। আবার টং টং করে টাঙ্গা ছুটল।

অঞ্জনা আমাকে বোধ হয় খুব ভাল ভাবেই লক্ষ্য করছিল। এই রামসীতার মন্দির যে আমাকে বিন্দুমাত্র আনন্দদান করতে পারে নি, সেটা ও বুঝতে পেরেছিল। আমাকে শুনাবার জন্যেই বুঝি মিনুকে লক্ষ্য করে বলল: মন্দিরটা বেশ ভাল, না রে? বেশ ভক্তি আসে।

মিনু ওর ইঙ্গিত বোধ হয় বুঝতে পারল না। তাই বলল: কিন্তু তোর চালচলন দেখে তো মন্দিরের প্রতি কোন শ্রদ্ধার ভাব দেখলুম না। শেঠজীদের গদি-বসানো মন্দিরে ভক্তি করবার মত কি পেলি তুই?

অঞ্জনা বলল: তোর চোখ নেই, দেখিস নি। আমি ঠিকই দেখেছি। এই বলে সে একবার আড়চোখে আমার দিকে তাকালো।

অঞ্জনার ইঙ্গিত ধরতে আমার মুহূর্ত বিলম্ব হয় নি। কিন্তু মনটা আমার বিক্ষুব্ধ ছিল। তাই সে কথার উত্তর দিয়ে অঞ্জনার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করলুম না।

সত্যি দৃশ্যটা অতুলনীয় বলেই বোধ হয়। ওধারে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। বাঁধের উপর দিয়ে টাঙ্গা চলেছে। দু ধারে পাহাড়। ওদিকে পাহাড়ের উপর কোথাও হয় তো দেরাদুন। কিন্তু এই সৌন্দর্যের মধ্যে যেন একটা গৈরিক উত্তরীয় বসানো।

দার্জিলিংয়ে উঠতে উঠতে এমন দৃশ্য দেখলে মনে স্বর্গের সম্ভার হয়। কিন্তু সে স্বর্গ কাব্যের স্নিগ্ধতায় ভরা। এখানে যেন মহাভারতের বুক থেকে একটা মহাকাব্যের ধ্বনি ওঠে।

কিছুদূর এগিয়ে গাড়ী আবার থামল। অঞ্জনা ওর স্বভাব অনুসারে প্রশ্ন করল: এটা কি?

—সপ্তঋষির আশ্রম।

—নামো, নামো। মেশোমশাই মাসীমারা নেমে পড়েছেন ইতিমধ্যে। বীরেনদাও নেমেছেন। নামলুম আমরাও।

গাড়োয়ান বলল: বাবুজী, আগারি উধার যাইয়ে। গঙ্গা মাইজীকো দেখকে আইয়ে। দুই গাড়োয়ানেরই এক অভিমত। সুতরাং এটাই বুঝি প্রথা। ফলে, নুড়ি বিছানো পথ দিয়ে গঙ্গার দিকে চললুম। একটা বাবলা গাছের নিচে একক একজন সন্ন্যাসী। অল্প বয়েস। পাশে একটা দৈনিক হিন্দি সংবাদপত্র। একজন কৃষক শ্রেণীর লোক মহারাজকে বোধ হয় এই মাত্র গঞ্জিকা সেবন করিয়ে উঠে পড়ল। যদিও তীর্থস্থানের উদ্দেশ্যে আমি বেরুই নি, তবু তীর্থে এসে সাধু সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে আমার একটা কৌতূহল ছিল। কপাল দেখে, মুখ দেখে কেউ কেউ নাকি ভূত ভবিষ্যৎ সব ব.ল দেয়। কেউ কেউ নাকি এটা সেটা দিয়ে জীবনে অপ্রত্যাশিত সাফল্যও এনে দেন। কে জানে, ভাগ্যবলে আমরাও তো এমন কোন সন্ন্যাসীর দর্শন পেতে পারি? কাশীতে সন্ন্যাসীর দর্শন পাই নি। হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে গেরুয়াধারী দেখেছি বটে, তাদের কাউকে সন্ন্যাসী বলে আমার মনে হয় নি। এ কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত, তান্ত্রিক গোছের। সকৌতুকে পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সন্ন্যাসীপ্রবর একবার নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। আমার বুকটা দুরুদুরু করে উঠল। হঠাৎ কিছু বলে বসেন কিনা কে জানে। অদৃষ্টে অদৃশ্য অক্ষরে কি যে লেখা আছে, সেটা আজ পর্যন্তও আঁচ করতে পারলুম না।

অঞ্জনা বলল: এ জায়গাতেই এ সাধু থাকে নাকি?

—কেন সন্দেহ হচ্ছে নাকি?

—রাত করেও এখানে থাকে?

—সাধুদের আবার রাত-বিরাত আছে নাকি?

—বাঘ ভালুক তো আসতে পারে?

বললুম: গৃহত্যাগ করে যদি বাঘ ভালুককে বশ করবার মন্ত্র পর্যন্ত এরা না শিখল, তবে সুখের সংসার ছেড়ে বৈরাগী হল কেন বল? নইলে তো বেশ মনের সুখে ঘর সংসার করতে পারতো!

অঞ্জনা বলল: সত্যি, আমি কিন্তু ভাবতেই পারি না।

বললুম: গৃহী হয়ে তুমি অ-গৃহীর কথা কি করে ভাববে বল!

ইতিমধ্যে দেখি, মিনু তার দিয়ে ঘেরা একটা জায়গার দিকে এগিয়ে চলেছে।

সন্ন্যাসীর পাশে আমরা সকলেই ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিলুম। মেসোমশাই, বীরেনদা, রাঙামাসীমা সবাই। সকলেরই গোপন মনে একটা তো দুর্বলতা আছেই, বাইরে তাকে প্রকাশ করি বা না করি। তবে মিনু কেন এই কৌতূহল ত্যাগ করে ওদিকে গেল ? মিনুকে অনুসরণ করে অঞ্জনাও তাড়াতাড়ি সে দিকে সরে গেল। চেঁচিয়ে বললুম : ওটা কি মিনু ?

—একজন সন্ন্যাসীর সমাধি।

রাঙামাসীদের সকলকে দেখলুম, হাত জোড় করে সেই বহুকাল গত সন্ন্যাসীর উদ্দেশে প্রণাম জানালেন।

মিনু আর অঞ্জনা ঐ সমাধি থেকে সামনের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখল, তারপর তরতর করে ছুটে এসে পথ বেয়ে গঙ্গার দিকে নামতে লাগল।

সুনীলবাবু ডাকলেন : কি রে, তাড়াহুড়ো করে কোথায় চললি ?

অঞ্জনা নিচে নামতে নামতে চেঁচিয়ে জবাব দিল : সপ্তধারা বাবা।

আমরাও নিচের দিকে চললুম। সন্ন্যাসীপ্রবর কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও বললেন না। নিচে নেমে গঙ্গার দিকে তাকালুম। লক্ষ লক্ষ উপলখণ্ডের বুকের উপর দিয়ে গঙ্গা এখানে বয়ে যাচ্ছে তরতর করে। এক হাঁটুও জল নয়। কিন্তু স্রোত প্রবল। মিনু আর অঞ্জনা গিয়ে বড় বড় পাথরখণ্ডের উপর দাঁড়ালো। পায়ের নিচ দিয়ে জলের স্রোত বয়ে চলেছে। একখণ্ড সরকারি ফলকে সাবধান বাণী লেখা আছে - যেতে যেতে তাড়াহুড়ো করে পা পিছলে জলে না পড়ে কেউ। স্রোতের বেগে ভেসে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। গঙ্গা এখানে শতধারায় প্রবাহিত।

ঐ দূরে, আরো দূরে, গঙ্গা এখানে বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত। মুখ্যত এই ধারা সাতটি। হরিদ্বারের কাছে এক হয়ে মিশেছে। এ দৃশ্যও অতুলনীয়। তাকালে চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না। হরিদ্বারের গঙ্গায় মানুষের সৃষ্টিশক্তির স্পর্শ রয়েছে। এখানে জগদীশ্বরের অকৃত্রিম শিল্প কৌশলের প্রকাশ।

সুনীলবাবু বললেন : এখানে সপ্তধারায় গঙ্গা যে প্রবাহিত হয়েছেন, তার পেছনে একটা কাহিনী আছে।

আমরা উৎসুক দৃষ্টিতে সকলে সুনীলবাবুর দিকে তাকালুম।

সুনীলবাবু বলতে লাগলেন : ভগীরথ যখন এ পথে গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে আসেন, তখন এখানে সাতজন ঋষি তপস্যা করছিলেন। পাছে ঋষিরা স্রোতের বেগে ভেসে যান, সে জন্য গঙ্গা এখানে সপ্তধারায় বিভক্ত হয়েছেন।

কুরু সম্রাট ধৃতরাষ্ট্র এবং মহামতি বিদুর নাকি এইখানেই দেহত্যাগ করেছিলেন! আমি বললুম : এখানে এই পরিবেশে, কিম্বদন্তির একটা বিশেষ রোমাঞ্চ আছে। কিন্তু সে কথা এখন ভাবছিনে মেশোমশাই। আমি ভাবছি অন্য কথা। এই যে ক্ষীণধারা গঙ্গা এইই ভারতবর্ষের প্রাণ! আর এই গঙ্গাই ভাগীরথী-পদ্মার বিশাল রূপ নিল বাংলা দেশে গিয়ে। কীর্তিনাশা দুরন্ত সেই পদ্মা,

বহু প্রকাণ্ড গঙ্গা, সে সব দেখে কি বিশ্বাস হয় যে তার উৎস এই ক্ষীণস্রোত জলের ধারা ?

সুনীলবাবু বললেন : জন্মের পর প্রথম অধ্যায়ে প্রাণশক্তি তো চঞ্চল আর অগভীরই থাকে। যত এগোয় তত গভীর আর স্থির হয়। Physics বলছে জগতের সৃষ্টি Ten dimensional false vaccum থেকে। কোয়ান্টাম leap-এ লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে চতুর্মাত্রিক জগতের রূপ ধরেছে। একেই বলে Vaccum Fluctuation in Quantum field. এর আদিতে যে তীব্রতা, বিশ্বজগৎ ফুটে ওঠার পর সে তীব্রতা থাকে না।

বললুম : আপনি দার্শনিক মানুষ, আপনার দৃষ্টি আলাদা। কিন্তু আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবি।

অঞ্জনা বলল : তুমি তো ঐতিহাসিক। তোমার দৃষ্টিটা এখানে কি ?

বললুম : নদীর উৎপত্তি নিয়ে ঐতিহাসিকের কি বলবার আছে জানি নে। এটা ভৌগোলিকের কাজ। ভৌগোলিক হলে বলতুম : এটা উত্তর প্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল। এখানে কাছেই হিমালয়। সেখান থেকে গঙ্গা পাহাড় পর্বত ভেঙ্গে উপলখণ্ডের উপর দিয়ে মর্ত্যে নেমেছে।

অঞ্জনা বলল : হার মানলুম। তুমি যে মূলত কবি, সে কথাটা ভুলে গিয়েছিলুম। তোমার কাব্যচেতনারও তো একটা বিশেষ দিক আছে ? সে দৃষ্টিতে কেমন দেখলে সেই কথাই জিজ্ঞেস করছি।

বললুম : আমি তৃণাদপি ক্ষুদ্র। স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ নিজের মধ্যে প্রভাতরবির রশ্মি অনুভব করে যে প্রতিক্রিয়া অনুভব করেছিলেন, তা বলতে গিয়ে নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে গেয়ে উঠেছিলেন :

> আজি এ প্রভাতে রবির কর
> কেমনে পশিল প্রাণের পর
> কেমনে পশিল গুহার আধারে প্রভাত পাখীর গান—
> না জানি কেন রে এত দিন পরে
> জাগিয়া উঠিল প্রাণ।

এত বড় বিশ্বকবি যেখানে তাঁর মনে কেমন করে দোলা অনুভব হল, সে কথা বলতে পারেন নি, শুধু একটা হতচকিত ভাবে দিশেহারা ঝর্ণাধারার ন্যায় বয়ে গিয়েছেন, সেখানে আধুনিক সাহিত্যপত্রিকাবহেলিত অখ্যাত নগণ্য একজন নিভৃত কলম চালক কবি সে কথা কি করে প্রকাশ করবে বল ? বলতে গেলে বক্‌বক্‌ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ যেখানে বক্তা হয়েছেন, আমি সেখানে হব বক্‌বক্তা।

মিনু বলল : দোহাই সন্তুদা, তোমাকে বক্‌বক্‌ করতে হবে না। তার চেয়ে গঙ্গার কলধ্বনি শুনি।

আমনাকে বললুম ঃ প্রকৃত শিল্প কোথায় আছে দেখ অঞ্জনা। সাহিত্য ছাড়া এমন অব্যক্ত সৌন্দর্য্যের মূল্য আমরা দিতে জানি নাকি!

দেখলুম, মিনুর কানের ডগা দুটো লাল হয়ে উঠল। সে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

সুনীলবাবু বোধ হয় আমাদের এই তর্কবিতর্কের মধ্যে মজা পাচ্ছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলুম, তিনি মুচকি মুচকি হাসছেন।

শুধু বীরেনদাকে কিছুতেই যেন প্রসন্ন দেখা গেল না। তিনি বিরক্ত। সরস্বতী পুজোর পুরোহিতের মত সর্বত্রই নমো নমো করে উঠে পড়তে চান। কোন কিছুই তাকে আকর্ষণ করে না নাকি? তবে বাইরে বেরিয়েছেন তিনি কেন, কে জানে। বীরেনদা আমাদের না বলে কয়েই দেখলুম গঙ্গা ছেড়ে উপরের রাস্তায় উঠে পড়েছেন।

সুনীলবাবু তা দেখে অঞ্জনা আর মিনুকে ডাকলেন ঃ চলে এস, এবার ফেরা যাক।

অঞ্জনা বলল ঃ আর একটু দেখি।

সুনীলবাবু বললেন ঃ একটু কেন, অনন্তকাল দেখলেও চোখ ভরবে না। চল, সমস্ত হরিদ্বারটাই আজকে ঘুরতে হবে।

সুনীলবাবুর কথাটা আমার কানে গেল। সত্যি, অনন্তকাল দেখলেও এ দৃশ্য দেখে প্রাণ ভরবে না। প্রাণ না ভরুক প্রাণে তৃষ্ণা থাক। সৌন্দর্য সেখানেই তার মূল্য পাবে সব চাইতে বেশী। পেয়ে গেলে, তৃপ্তি এলে, সৌন্দর্যের মূল্য কোথায়? এটাই কীট্‌সের সৌন্দর্যতত্ত্বের মূল কথা নয়?

Ode On A Grecian Urn-এর লাইন কয়টি মনে পড়ল ঃ

> "Fair youth beneath the trees, thou can'st leave
> Thy song, nor ever can those trees be bare;
> Bold lover never, never can'st thou kiss,
> Though winning near the goal—yet, do not grieve;
> She canot fade, thou hast not thy bliss.
> For ever wilt thou love, and she be fair!"

আমিও উপরে এসে উঠলুম। আবার সেই কাঁকড় বিছানো রাস্তা দিয়ে সপ্তঋষির আশ্রমে এসে পৌঁছুলুম। বোধ হয় আমি একটু গম্ভীর হয়ে ছিলুম। কখনো কখনো কোন চিন্তার সূত্র ধরে কি এক অব্যক্ত ভাবে যেন আমি উদাসীন হয়ে যাই।

অঞ্জনা বলল ঃ গম্ভীর হয়ে গেলে যে বড়, সন্তুদা? কবিতার কথা ভাবছ?

হেসে বললুম ঃ সে অধিকার আমাকে কোথায় দিলে বল?

অঞ্জনা বলল ঃ আমায় দুষ্‌বে না। সে অধিকারে আমি হস্তক্ষেপ করি নি।

অঞ্জনা মিনুর দিকে তাকাল। মিনু কিন্তু কপট গাম্ভীর্যে আমার দিকে ফিরেও তাকাল না।

আমরা এসে সপ্তর্ষির আশ্রমে উঠলুম।

মন্দির পুরানো নয় মোটেই। আশেপাশে নতুন তৈরী হচ্ছে ছোট ছোট ঘর! এখানে সাধুদের থাকবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। কল্যাণীর ছোট ছোট ফ্ল্যাটের মত ঘর সাধুদের জন্য। মন্দিরে উঠে ঋষিদের মূর্তিগুলো দেখলুম। গৌতম ভরদ্বাজ ইত্যাদি করে সাত মুনি। সকলেই গোত্র প্রধান। প্রত্যেকের নামে গোত্র আছে।

বললুম: এ যে গোত্রের প্রধান পিতা...

সুনীলবাবু হেসে বললেন: মন্দ বল নি। ব্যাপারটা সে রকমই বটে। তবে কথা হচ্ছে, এই সাত ঋষি কি সমকালীন ছিলেন?

অঞ্জনা যেন একটা মজা পেয়ে তাকাল আমার দিকে: এইবার ঐতিহাসিকের ইতিহাস বোঝা যাবে। বল সন্তুদা, ওঁরা কি Contemporary ছিলেন?

হেসে বললুম: আমার মত ঐতিহাসিকের কাছে এটা সাংঘাতিক প্রশ্ন। ব্যাপারটা প্রাচীনের! আমি মর্ডান হিস্টির ছেলে। তার উপর সময়টা pre-historic. সুতরাং এ সম্পর্কে আমি কোন জবাব দিতে পারব না। তবে প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা আর্য পূর্ব ভারতের সঙ্গে যখন মেসোপোটেমীয় সভ্যতার যোগাযোগ ছিল তখন তাদের মধ্যে থেকেই সপ্তসিন্ধু ও মেসোপোটেমীয় সপ্ত ঋষির কল্পনা ভারতে এসেছিল। সেই মিথ্ থেকেই অদ্ভুতভাবে গোত্রপ্রধান আদি পুরুষের দেহ থেকে যে ভারতে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল অনার্য সাধু দেবতারাই আদি পুরুষের সেই দেহ খণ্ড খণ্ড করেছিলেন। আইরিশ মিথের তিন মাথাওয়ালা দৈত্যের হত্যা-কাহিনীর সঙ্গেও এর একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক কোন সাক্ষ্য এ কাহিনীর সপক্ষে নেই।

সুনীলবাবু বললেন: প্রশ্ন করলুম এই কারণে যে, গঙ্গা এখানে সপ্তধারায় প্রবাহিত। সাত ঋষিকে শ্রদ্ধা করে গঙ্গা বিভক্ত হয়েছে। তাহলে একথা প্রমাণ হয় যে ওঁরা Contemporary ছিলেন। কিন্তু সেটা কি সত্যি?

বললুম: বুঝলেন মেসোমশাই, রামায়ণ মহাভারত থেকে ঐতিহাসিক সত্যতা উদ্ধার করা বড় কষ্টসাধ্য। রাম জন্মাবার ষাট হাজার বৎসর পূর্বে নাকি রামায়ণ-রচিত হয়। ইতিহাসের সাধ্য আছে এর কোন হদিস পায়? আর তা ছাড়া মানুষ লাঙ্গুল ত্যাগ করে বর্তমান আকৃতিতে ষাট হাজার বৎসর আগে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিল কিনা, তা নিয়েই বা কে বলবে। যদিও এখন প্রত্নতত্ত্ববিদেরা পাঁচলক্ষ বছর আগে কারো কারো মতে বিশ লক্ষ বছর আগে (লাঙ্গুলহীন) মানুষের অভ্যুদয় হয়েছিল বলে মনে করেন। এর তো মাথা-মুণ্ডু কিছু বোঝবার উপায় নেই। ঘটনার দিক থেকে রামায়ণ মহাভারতের আগে। কিন্তু রচনার দিক বিচার করে পণ্ডিতেরা বলেন, রামায়ণ রচিত হয় মহাভারতের পরে। মহাভারতের রচনাকালকে তো অনেক পাশ্চমী ঐতি-হাসিক খৃষ্টির প্রথম থেকে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে ফেলতে চান। এই সমস্যার সমাধান করে কে?

সুনীলবাবু বললেন: হ্যাঁ, ভারত-ইতিহাসের এটাই এক বিরাট সমস্যা। হিন্দুরা

পরলোকের দিকে তাকিয়ে ইহলোককে অস্বীকার করেছেন। তাই ইতিহাস রচনা না করে তাঁরা অধ্যাত্ম-দর্শন নিয়ে বেদ-বেদান্ত উপনিষদ সৃষ্টি করেছেন। সেই অধ্যাত্ম আলোচনা এখন পেডিগ্রী বিচারে কাজে লাগছে না। রামায়ণ মহাভারত আর অষ্টাদশ পুরাণের বিক্ষিপ্ত গাঁজাখুরি গল্প গুলিই ইতিহাসের বারোটা বাজিয়েছে। সত্যকে এমন করে ঘিরে আছে যে, বল্মীক সরিয়ে বাল্মীকিকে খুঁজে বের করা এখন দুষ্কর। আচ্ছা রামায়ণের কাহিনীকে কি সত্য বলে মনে হয় তোমার?

বললুম, ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাওয়া গেলে শুধুতো কাব্যের বক্তব্য থেকে কোন ঐতিহাসিক সত্য ধরা যায় না।

তবে ২১ বছর পরে হিমালয়ের সেই মহাপুরুষের পরম আশীর্বাদে আত্মার স্বরূপ যখন আমি বুঝতে পেরেছি তখনই বুঝতে পেরেছি বহু অনাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য আত্মার জগতে প্রবেশ না করলে জানা যাবে না। আত্মার চরিত্র আঠালো জাতীয় স্বচ্ছতায় উজ্জ্বল। সেখানে জন্মকাল থেকে পৃথিবীর ঘটিত সকল ঘটনার চিত্র ফটোর নিগে-টিভের মত সেই আত্মার পাতায় অঙ্কিত হয়ে আছে। বর্তমান কর্মফল বহুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত সেখানে মানুষের কর্মফলজাত চিত্র অংকন করে আছে। যাঁরা নির্দিষ্ট গতিতে কুলকুণ্ডলিনীকে ছুটিয়ে সেই ভবিষ্যতে যেতে পারেন, তাঁরা যা ঘটতে যাচ্ছে তার চিত্র দেখতে পারেন। আবার এর গতি বৃদ্ধি করা গেলে tachyon জাতীয় particle-এর মত আলোর গতিরও অধিক গতিতে ছুটে পেছনের দিকে যেতে পাবেন। যদি তা যাওয়া যায় তবে অতীতের ঘটিত নানা ঘটনার চিত্রই সেখানে পাওয়া যাবে। বর্তমান লেখক, কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের বহুবারই সেই tachyon particle জাতীয় গতি অনুভব করে তাঁর মস্তিষ্কস্নায়ুর দর্শনেন্দ্রিয়ে বহু অতীত কালের দৃশ্য দেখেছেন, যেমন মহাভারতের যুদ্ধের দৃশ্য, গোপাল কৃষ্ণের লীলা, নিজের সাতটি প্রাক্তন জীবন প্রভৃতি! ইহ জীবনেই বিগত কয়েক বছরের নানা ব্যক্তিগত ঘটনা যা পরমাত্মায় চিত্রিত হয়ে আছে লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসা বহু ব্যক্তিকে তা বলে দিয়ে তিনি তার সত্যতার প্রমাণ পেয়েছেন। অনুরূপ ভাবে ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে এমন দৃশ্য দেখেও অনেককে তা বলেছেন—যা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। লেখকের 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' গ্রন্থে এই দর্শনের কাহিনী, পশ্চাৎপট ও বিজ্ঞানের বর্ণনা দেওয়া আছে। আকাশ পথে রামায়ণের হনুমানকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। দেখেছেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকেও। কিন্তু রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্য তাঁর নজরে পড়েনি। এইজন্য রামায়ণ ও মহাভারতের নায়কদের একদা অস্তিত্ব সম্পর্কে বর্তমানে তাঁর মনে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আত্মবিদ্যা অর্জন করে বস্তুবাদী মানুষের অনেকেই যখন পরমাত্মায় আঁকা এই সব অতীত ঘটনার দৃশ্য দেখতে পাবেন, তখন তাঁরাও লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের এক নতুন পদ্ধতি আয়ত্তে আনতে পারবেন। লেখক বিশ্বাস করেন, বিজ্ঞানীদের মধ্যেও একদিন আত্মার এই রহস্য এবং তাতে চিত্রিত চিত্রসমূহ তাঁরা দেখতে পাবেন। সেদিন লেখকের মত ইতিহাসও এক জন্মান্তরে প্রবেশ করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু আজ যখন বৈজ্ঞানিক

যদ্দ্রে সেই লুপ্ত ইতিহাসের চিত্র ধরা পড়েনি তখন প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য ছাড়া ঐ নিয়ে যতই বলা থাক না কেন, সাধারণ মানুষ তাতে আস্থা স্থাপন করবে না। সুতরাং— বর্তমান এই অভিজ্ঞতার কথা ত্যাগ করে সেই ২৫ বছর আগেই আবার ফিরে যাওয়া যাক ঃ—

সপ্ত ঋষি ও গোত্র নিয়ে আমরা যখন সেদিন তর্ক করছিলুম—রাঙা মাসী আর অঞ্জনার মা সে সব তর্কের ধার ধারেন নি।

তাঁরা বারবার ঘুরে ঘুরে ঋষিদের প্রমাণ জানিয়ে এলেন। মিনুরও কেমন যেন একটা নিরাগ্রহ ভাব ছিল। যে তর্কে না থেকে সব ঘুরে দেখে এল। শুধু অঞ্জনা আমাদের আলোচনা কান পেতে শুনল। আমাদের কথা শেষ হলে সে বলল ঃ আবার ফিরে ইতিহাস পড়তে ইচ্ছে করছে। মনে হয়, ভারত-ইতিহাস জানলে ভারত-দর্শনের যথার্থ চরিত্র আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে।

সুনীলবাবু বললেন ঃ কথাটা খুবই সত্যি। তবে ভারতের যথার্থ ইতিহাস রয়েছে স্মরণাতীত কাল থেকে বয়ে আসা তার ঐতিহ্যে। সে ঐতিহ্যের যথার্থ চরিত্র বিশ্লেষণ করে তেমন করে ইতিহাস আর লেখা হয়েছে কোথায়!

অঞ্জনা বলল ঃ কলকাতায় গিয়ে সন্তুদার কাছে ইতিহাসটা জেনে নিতে হবে।

বললুম : আমার কি জ্ঞান আছে ইতিহাসে? এতো পাঠ্য পুস্তকের ইতিহাস।

অঞ্জনা বলল ঃ যেটুকু আছে ওতেই আমার যথেষ্ট।

হেসে বললুম ঃ এই তো দেখলে সপ্তঋষির ধাঁধা ভেদ করতে পারলুম না আমি।

সুনীলবাবু বললেন ঃ সে জন্যে তোমার লজ্জা নেই। এ সব ধাঁধা কোন ঐতিহাসিক আজ পর্যন্ত ভেদ করতে পারেন নি। H. C. Roy Chowdhury-ও তো Political History of Ancient India পরিক্ষীতের আগে থেকে আরম্ভ করতে পারেন নি। গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণ নিশ্চয়ই রাজা পরিক্ষীতের আগের ঘটনা?

আমি সুনীলবাবুর দিকে তাকালুম ঃ ইতিহাসটাও তাহলে আপনি ভাল করেই পড়েছেন?

বিনয় দেখিয়ে সুনীলবাবু বললেন ঃ পড়লুম আর কোথায়? তবে প্রাণমন দিয়ে যথার্থ ইতিহাস খুঁজেছি। পাইনি।

অঞ্জনা বলল ঃ বাবা দর্শনের অধ্যাপক হলেও ইতিহাসের বই অনেক রেখেছেন। আমাদের বাড়ি গিয়ে একদিন দেখবে।

বললুম ঃ নিশ্চয়ই যাব।

আমরা কথা বলতে বলতে সপ্তঋষির আশ্রম পরিভ্রমণ করে মাসীমারা ফিরে এলেন। মিনুও এল। বীরেনদার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম—পরিতৃপ্তির কোন চিহ্ন নেই সেখানে। ঘরের কথা, টাকার কথা ভাবছেন নাকি তিনি? তাহলে হঠাৎ বাইরে

বেরুলেন কেন ? কিন্তু সে বিষয়ে কোন কথা তাকে জিজ্ঞেস করলুম না। সপ্তঋষির আশ্রম থেকে সদলবলে আমরা বেরিয়ে এলুম।

টাঙ্গাওয়ালা দুজনই ঘোড়াকে ঘাস জল দিচ্ছিল। আমাদের দেখে আবার ঘোড়া দুটোকে গাড়ীতে জুড়ল ওরা। যে যার গাড়ীতে উঠলুম। গাড়ী আবার ফিরে চলল। বেলা তখন বেশ বেড়ে উঠেছিল। কার্তিক মাস হলেও রোদে বেশ একটা তেজ। গায়ে জ্বালা ধরে বাইরে দাঁড়ালে। চলতে চলতেই পথের মাঝে মহারাজ মানসিংহের ছত্রী, নীল পর্বততীর্থ, মনসাদেবীর মন্দির, কুশাবর্ত, শ্মমননাথ মহাদেবের মন্দির, চণ্ডী মন্দির, বিল্বকেশ্বর মহাদেবের স্থান, মায়াপুর, এইসব জায়গা দেখাল গাড়োয়ানেরা। অবশেষে গাড়ী এসে থামল কন্খলে।

গাড়ী থেকে মিনুকে বললুম : নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে ?

অঞ্জনা বলল : সকাল বেলাই তো কন্খল রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ঘুরে গেলুম।

আমি বললুম : সে কথা নয়। কন্খল অন্য কোন কারণে নিতান্ত পরিচিত বলে মনে হচ্ছে।

মিনু কোন কথা বলল না। সে হঠাৎ আমার উপর অভিমান করেছে নাকি ?

অঞ্জনা বলল : পুরাণে পড়ে থাকবে।

আমি বললুম : অষ্টাদশ পুরাণের নামই শুনেছি, পড়ি নি এখনো। বাংলা সাহিত্যে কোথাও এর নাম শুনে থাকব হয় তো।

অঞ্জনা মিনুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল : তা হলে আমার এক্তিয়ারের বাইরে। মিনু বলতে পারবে।

বললুম : সেইজন্যই তো মিনুকে জিজ্ঞেস করছি। মিনু, নামটা কোথায় শুনেছি বল তো ?

মিনু যেন একটু বিরক্তির ভাব দেখিয়ে আমাকে বলল : তুমি জানই তো, মিছিমিছি জিজ্ঞেস করছো কেন ?

বললুম : সত্যি, এখন আমার মনে পড়ছে না। বল দেখি, কোথায় পড়েছি ?

মিনু বলল : আহা, রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কবিতা তোমার মনে নেই ?

কোথা সে বিরাজে
ব্রহ্মাবর্তে কুরুক্ষেত্র ! কোথা কন্খল,
যেথা সেই জাহ্নুকন্যা যৌবন চঞ্চল
গৌরীর ভ্রূকুটি ভঙ্গি করি অবহেলা
ফেন পরিহাসচ্ছলে করিতেছে খেলা
লয়ে ধূর্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল ॥

বললুম : এই দেখ, বাংলার ছাত্রী না হলে এসব হয় !

অঞ্জনা একটু হাসল।

মিনু আমার পরিহাসকে গ্রাহ্য না করে গাছের ছায়ায় নিচ দিয়ে ওধারে গঙ্গার একটি

ক্ষীণ ধারার পাশে এসে দাঁড়ালো। এখানে গঙ্গার নীল ধারা আর ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল। ছোট ছোট মাছেরা জলের নিচে খেলছে স্পষ্ট দেখা যায়। পাণ্ডা ধরল রাঙামাসীকে পিন্ড দেবার জন্যে। বারবার পেড়াপীড়ি করতে লাগল—এমন মহৎ কাজের পুণ্য থেকে বঞ্চিত না হতে।

রাঙামাসী আর মিনুর মা দুজনেই স্বাভাবিকভাবে ফাঁদে পা বাড়িয়ে দিলেন। সুনীলবাবু আর বীরেনদার ভ্রূ কুঞ্চিত হলেও রাঙামাসীরা পিন্ড দিতে এগিয়ে গেলেন। বাঁধানো সোপান রয়েছে। সেখানে বসে হাত ধুলেন ওঁরা। অঞ্জনা মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। আমি আর মিনু সিঁড়ির ওধারে একটু দূরে দাঁড়ালুম।

মিনু আমার পাশে একা দাঁড়াতে পেয়ে একটু যেন প্রসন্ন হল। বলল: সপ্তঋষির আশ্রমে অঞ্জনা তোমাকে কি বলছিল?

বুঝলুম, দূরে দূরে ঘুরলেও মিনুর কান ছিল আমাদের কাছেই।

বললুম: কি আর বলবে। এমনিই…

মিনু বলল: তোমাকে ইতিহাস পড়াতে বলছিল তো? জানি ও বলবেই।

মিনু যে অঞ্জনাকে সহজভাবে নিতে পারছে না, এটা আমি অনেক আগে থেকেই টের পেয়েছিলুম। আমি এ নিয়ে আর কোন বাদ-বিসম্বাদে যেতে চাইলুম না মিনুর সঙ্গে। যেন মিনুর কথা ভালভাবে শুনতে পাই নি, এমনভাবে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম। কথার ধারাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে মিনুকে বললুম: ভাবতে কেমন আশ্চর্য লাগছে না মিনু, সেই দক্ষরাজার রাজধানীতে এসে পৌঁছেছি? এই যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এটা নাকি সেই প্রাক্ ঐতিহাসিক আমলের! বিশ্বাস হয়? কল্পনাকে অনেক-দূর অতীতে নিয়ে যাও দেখি? সেই সতীর কথা ভাব। আজ তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, একদিন সেই অপূর্ব যৌবনবতী অনবদ্য সুন্দরী দক্ষকন্যা সেখানে দাঁড়াতেন। এই সভ্যতা, এই অগ্রগতি, সব মুছে ফেলে কল্পনার পাখায় ভর করে সেই অতীতে গিয়ে দাঁড়াও, দেখ তো কেমন লাগে? সেই ধূসর অতীতের কিছু স্বাদ পাও নাকি?

বলতে বলতে আমার চোখে বোধহয় স্বপ্নই ফুটে উঠেছিল। মিনু সেই স্বপ্নের অঞ্জন আমার চোখে দেখতে পেয়েছিল কিনা জানি না। সে বলল: সত্যি, তোমার মধ্যে একটা অতীন্দ্রিয়তার স্পর্শ আছে। এটা কিন্তু আগে এত টের পাই নি। স্বপ্ন দেখতে দেখতে তুমি ভীষণ বদলে যাও।

হেসে তাকালুম মিনুর দিকে: সে রকম মনে হচ্ছে তোমার?

—সত্যিই তাই। তোমার এদিকটার খোঁজ আগে পাই নি। আমার কাছে তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে।

বললুম: জান, তোমাকে এই মুহূর্তে এখানে সেই সতীর মতই মনে হচ্ছে আমার।

মিনু রাঙিয়ে উঠল: যাও, কি যে বল। ওঁর সঙ্গে তুলনা করতে আছে নাকি?

মিনু ভুলেছে। সন্দেহটা ওর মনে গভীর হয়ে বসে নি বুঝলুম। এখানেই আমার তৃপ্তি।

সুনীলবাবুকেও দেখলুম, স্বপ্নালু চোখে তাকিয়ে সবকিছু দেখছেন। আমার চোখে চোখ পড়তে তিনি এগিয়ে এলেন: সনৎ, কেমন লাগছে?

—বেশ ভাল।

—সেই অতীত দক্ষ প্রজাপতির কথা, সেদিনের কথা ভাবতে কেমন শিহরণ লাগছে, না?

বললুম: Exactly so আপনি ঠিক ধরেছেন মেসোমশাই।

—এখানেই হয় তো সতী কোথাও কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন। সে সব কত যুগ আগের কাহিনী।

বললুম: পাশেই সতীকুণ্ড বলে একটা কুণ্ড আছে। সতী নাকি পতি নিন্দা শুনে সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

সুনীলবাবু বললেন: সেটাও দেখতে হবে। আচ্ছা সনৎ দক্ষযজ্ঞের এ কাহিনীকে সত্য বলে মনে কর তুমি?

বললুম: দার্শনিক তত্ত্বের যে শিব, সে শিব তিনি নন, বরং সহজ যোগ ব্যবস্থা ও শৈব তত্ত্বের উদ্ভাবক। সম্ভবত তিনি তিব্বত থেকে ভারতে এসেছিলেন। আর্য-অধ্যাত্ম সাধনার পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাধে। শেষ পর্যন্ত এতে তাঁরই জয় হয়। শিবপত্নী সতীর মৃত্যুর পর তিব্বতী প্রথা অনুসারে তাঁর শিষ্যেরা গুরুপত্নীর দেহের নানা অংশ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষণ করে রাখে। সেই থেকেই সতী পীঠের উদ্ভব। অপরপক্ষে শাক্ততত্ত্ব অনুযায়ী দেশে জগৎ বিকাশের ৫১-তম quantum leap-ই শক্তির দেহের একান্ন অংশ হিসেবে প্রতীক গল্পের মধ্যে স্থান পেতে পারে।

সুনীলবাবু বললেন বাঃ! চমৎকার ব্যাখ্যাতো। এরকম করে আমি কখনও ভাবিনি। না, না, তোমার কথার যুক্তি আছে সনৎ। যেন সেই যুক্তিটির যথার্থতা কতদূর আছে তা ভেবে দেখবার জন্য তিনি আত্মস্থ হয়ে গেলেন। তাঁকে আত্মস্থ হতে দেখে আমি আমার দৃষ্টি মেলে দিলুম কংখলের প্রাকৃতিক পরিবেশের দিকে।

বৃক্ষশ্রেণীর নিবিড় ছায়ার নীচে এই কংখলের ঘাট। ছোট ছোট পাখীরা আপন মনে কিচিরমিচির করে কলকণ্ঠ রব তুলেছে। সব দেখেশুনে একটা স্নিগ্ধ ভাবের শিহরণ জাগে। পাশেই দক্ষরাজার মন্দির। হয় তো এখানে একদিন রাজধানী ছিল।

আরো অনেক যাত্রী। বাঙ্গালীই বেশী। জাতে বাঙ্গালী হলেও ভাবে সাহেব। নিতান্ত বাস্তব পদমর্যাদার অহংকারে অহংকারী অধিকাংশই। পাণ্ডাদের ধমকাচ্ছে কেউ: 'Nonsense। এসব বিশ্বাস করি না' বলে। নাসিকা দেখাচ্ছে কেউ কেউ। আমি কিন্তু সবকিছুই তাকিয়ে দেখতে লাগলুম। অতীতের রোমাঞ্চময় শিহরণের এতটুকুও কি এরা লাভ করতে পারল না?

ভাবতে ভাবতে মাসীমারা উঠে এলেন। এলো অঞ্জনাও। বললুম ঃ কি হে, পুণ্য সঞ্চয় করলে ?

অঞ্জনা হেসে বলল ঃ মাতৃ প্রদক্ষিণ করলুম, দেখলে না ?

—হ্যাঁ, দেখেছি বৈকি। পাণ্ডারা অঞ্জলিবদ্ধ হাতে তিনবার ওকে মায়ের চতুর্দিকে ঘুরিয়ে ছেড়েছে। বীরেনদাও অনুরূপভাবে ঘুরেছেন রাঙামাসীর চতুর্দিকে। বীরেনদাকে রাঙামাসীর আপন ছেলে ভেবেই পাণ্ডারা এ কাজ করেছে বোধ হয়।

বললুম ঃ মাতৃপ্রদক্ষিণের অর্থ কি ?

অঞ্জনা বলল ঃ জানি না। মাতৃঋণ পরিশোধ বোধহয়।

—মাতৃঋণ আবার পরিশোধ হয় নাকি ?

—প্রচলিত রীতিনীতিতে সবই সম্ভব। নইলে বিয়ের পড় বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে কণকাঞ্জলী দিয়ে মেয়েরা মায়ের ঋণ শোধ করে কি করে ?

অঞ্জনার সঙ্গে কথা বলবার উপায় নেই। কথার পৃষ্ঠে কথা ও বলবেই।

রাঙামাসীরা ততক্ষণে একটা বাঁধানো গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

একজন হৃষ্টপুষ্ট সন্ন্যাসী রাঙামাসীকে বললেন ঃ আমাদের কিছু দান করে যাও মা। এক পয়সা, দু'পয়সা, যা খুশী। তোমাদের দানেই তো আমাদের চলে।

রাঙামাসী কয়েক আনা পয়সা রেখে নমস্কার জানালেন। হাত পেতে চরণামৃত নিলেন।

সন্ন্যাসী দেখে আমরাও এগিয়ে গেলুম। আমার আরো বিশেষ কৌতূহল হল, সন্ন্যাসী ঠাকুরকে স্পষ্ট উচ্চারণে বাংলা বলতে শুনে। একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হোক, মন খুলে কথা বলি, এ আকাঙ্ক্ষাটা আমার গোপন মনের মধ্যে সব সময় ছিল। আমি তাই এগিয়ে গেলুম। সন্ন্যাসী সকলকেই চরণামৃত দিলেন। অঞ্জনা, মিনু, সুনীলবাবু সকলেই মন্দিরের বারান্দায় উঠলেন বিগ্রহ দেখতে। অর্থাৎ ঈশ্বরের যে শক্তি বিশেষরূপে রূপ গ্রহণ করেছে তাই দেখতে। রাঙামাসীরা আগেই উঠে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি মন্দিরে না উঠে সেই গাছতলাতেই দাঁড়িয়ে রইলুম। ইচ্ছা, সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা বলি। দু একটা লোক তখনো ঘুরঘুর করছিল। তাই সংকোচ হল। কিন্তু সকলেই চলে গেলে সন্ন্যাসীর আরো কাছে এগিয়ে গেলুম
আমি ঃ আপনি বাঙ্গালী ?

—হ্যাঁ। একেবারে বাংলাদেশের লোক।

—যাক, ভাল হল।

—কেন ?

—আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারব। আমি একজন সন্ন্যাসীই খুঁজছিলুম। দেখুন, কাশী থেকে হরিদ্বার এ পর্যন্ত একটা সাধুও চোখে পড়ল না আমার।

সন্ন্যাসী হেসে বললেন ঃ সাধু তুমি কি করে চিনবে বল। তোমার আশেপাশে এখনেই যে অনেক সাধু নেই, সে কথা তুমি বলবে কি করে ?

বললুম ঃ আশেপাশে কোথাও সাধু থাকলে, তাঁর চোখ-মুখ দেখেই চিনতে পারতুম। নিশ্চয়ই তেমন কাউকে পাশে পাই নি।

যেন একটু বিরক্ত হলেন সন্ন্যাসীটি ঃ সাধুর তুমি কি জান ? চোদ্দ বছর এক নাগারে এই গাছের নিচে বসে সাধু চিনতে পারলুম না। অত সহজে কি সাধু চেনা যায় ? মুখ দেখে সাধু চিনতে হলে নিজেকে তার জন্য প্রস্তুত হতে হয়।

তিনি ওধারে একটি জীর্ণ পান্থনিবাস দেখিয়ে বললেন ঃ ওধারে গিয়ে দেখ একজন লোক বসে রয়েছেন। কাছে গেলে তাড়া করে আসবেন। অথচ উনি খুবই বড় একজন সাধু। যাও, দেখ তো কাছে গিয়ে সাধু বলে চিনতে পার কিনা ?

সাধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাঙামাসী মন্দির থেকে নেমে এলেন। আর সবাই তখনো ওখানে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছিলেন।

মাসীকে বললুম ঃ মাসী, সত্যিকারের সাধু দেখবে তো এসো।

সাধু সন্ন্যাসীর জন্য মাসীর অসীম আগ্রহ। বলেলন ঃ কোথায় ?

—এদিকে এসো।

আমি আর মাসীমা জীর্ণ ঘরটার দিকে এগিয়ে গেলুম।

একজন বোবা দাঁড়িয়ে ছিল কাছে। ওখানে ঢুকতেই আমাদের ইশারাতে সাবধান করে দিল, যেন পয়সা কড়ি কিছু না দিই সাধুকে।

রাঙামাসীর সাহস অসীম। তাঁকে পাঠালুম আগে। কি জানি, সাধু যদি তেড়ে আসেন।

ঘরের মধ্যে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলুম—ইঁদুরে তোলা মাটির উপর কুঞ্চিত চর্ম একটি লোক বসে। ব্যাটাছেলে কি মেয়েছেলে দেখে চেনার উপায় নেই। আমাদের দেখে মাথা তুলে তাকালেন। সাংঘাতিক উজ্জ্বল তীক্ষ্ন দুটি চোখ। সে চোখের দিকে তাকালে বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন কেঁপে উঠে। ভাবলুম, তেড়ে না আসেন।

কিন্তু সাধুটি তেড়ে উঠলেন না। আবার মাথা নামিয়ে ছিন্ন কাঁথার মত কি যেন একটা টেনে টেনে ছিঁড়তে লাগলেন।

ভয় করলেও আমার কি যেন এক জেদ চাপল। যদি উনি সত্যই সাধু হন, তবে আমার নিজের মনের পবিত্রতা এখানে যাচাই করে নেওয়া যাবে। রাঙামাসীর হাতে আট আনা পয়সা দিয়ে বললুম ঃ মাসী, এই পয়সাটা ওঁকে দাও।

আমার মনের বাসনা, পয়সাটা উনি নেন কিনা দেখা। নিলে বুঝতে হবে—আমি সাধুজনের করুণা লাভের অনুপযুক্ত নই।

রাঙামাসী পয়সাটা নিয়ে ওঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। আবার কটমট করে রাঙামাসীর দিকে মাথা তুলে তাকালেন তিনি। হাত দিয়ে ইশারা করে আর এগুতে বারণ করলেন। ইঙ্গিতে মাটিতে পয়সা ছুঁড়ে দিতে বললেন।

রাঙামাসী সেই অনুসারে পয়সাটা মাটিতে ছুঁড়ে দিলেন।

সেই পয়সার দিকে লক্ষ্য না করে নির্বিকারে সাধুটি আবার তুলোর মত কি একটা জিনিষ ছিঁড়তে লাগলেন।

রাঙামাসী আর আমি বেরিয়ে এলুম। মিনুরা তখনো মন্দিরের উপরই ছিল। কি দেখছিল ওরাই জানে। রাঙামাসীও আবার ওদের কাছে চলে গেলেন। আমি বাঁধানো গাছের নিচে বাঙ্গালী সাধুটির কাছে আবার গেলুম। বললুম : দেখে এলুম সাধু। কৈ, তাড়া, করে এলেন না তো ? পয়সা দিলুম, তাও নিলেন।

—নিলেন! আশ্চর্য ভাব করে সাধুটি আমার দিকে তাকালেন। বললেন : তোমার ভাগ্য ভাল। কারো পয়সা উনি নেন না। লোক দেখলে তেড়ে আসেন।

বললুম : দুই হাতে টেনে কি যেন ছিঁড়ছিলেন উনি। সত্যি, পাগল বলেই মনে হয়।

বাঙ্গালী সাধুটি বললেন : উনি নাথপন্থী সন্ন্যাসী। বসে বসে জাল সেলাই করছিলেন। প্রকৃত সাধু উনিই। ওঁর ত্যাগের কথা শুনলে আশ্চর্য হবে। পাঞ্জাবে বাড়ি ওঁর। প্রচুর সম্পত্তি আছে। ছেলেরাও বড় বড় চাকুরে। কিন্তু সব ছেড়ে দিয়ে কবে সংসার থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কোন জিনিষের প্রতি আসক্তি থাকলে সাধু হওয়া যায় না। উনি সব থাকা সত্ত্বেও পথে বেরিয়ে পড়েছেন। স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্র সাধনা করে চলেছেন।

মনে হল, আরো দুএকটা কথা বলি সন্ন্যাসীর সঙ্গে। কিন্তু ইতিমধ্যে আরো নতুন যাত্রী এসে দাঁড়াল। সন্ন্যাসী তাদের চরণামৃত দিতে লাগলেন। কথা হল না। তবে কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন : বুঝলে, অহেতুক ভক্তি থাকা চাই ভগবানের উপর। কাকেও অবিশ্বাস কোর না। আর কাউকে ছোট বলে ভেব না।

লোকের ভীড় একটু কমলে বললুম : ভক্তি কাকে বলে জানি না। তবে ভগবানের প্রতি একটা টান ছোটবেলা থেকেই অনুভব করে আসছি।

তিনি বললেন : সেটা থাকে তো ভাল। সকলের এ জিনিষ থাকে না। তোমার ভালই হবে।

ওঁর সঙ্গে আরো অনেক কিছু নিয়ে কথা বলবার ইচ্ছে হল আমার। কিন্তু ইতিমধ্যে মিনুরা সব নেমে এসেছে। সুতরাং আমাকে ওদের সঙ্গ নিতে হবে। বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে, এখনি উঠতে হবে। সেই সপ্তধারা থেকে এ পর্যন্ত ঘুরতেই তো সূর্য দেখি পশ্চিমে হেলে পড়েছে। হরিদ্বারের বাকি জায়গাগুলি আজই তো দেখে নিতে হবে। কাল হৃষিকেশ লছমণ ঝোলা। সুতরাং মিনুদের দেখে সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছ থেকে বিদায় চাইলুম।

সন্ন্যাসী বললেন : চোদ্দ বছর এই গাছের নিচেই আছি। তীর্থযাত্রীরা যা দুএক পয়সা দেয়, ওতেই চলে যায়। উদ্‌বৃত্ত যা হয় মন্দিরে দিই। বেশ ভালই আছি।

কেমন কাটা কাটা সংযোগশূন্য কথা বলেন সন্ন্যাসীটি। তা হোক, শুধু এই

পরিবেশে ওঁদের সান্নিধ্যে যেন একটা তৃপ্তি আছে। কিন্তু সে সান্নিধ্য অনেকক্ষণ উপভোগ করবার উপায় নেই। বললুম ঃ আসি।

—এসো। আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুললেন সন্ন্যাসী।

মিনুদের দিকে এগিয়ে গেলুম।

অঞ্জনা বলল ঃ সন্তুদা যে মন্দিরে উঠলে না?

বললুম ঃ তীর্থযাত্রী হয়ে তো আমি আসি নি। এসেছি ভ্রমণবিলাসী হয়ে। মন্দিরের প্রতি আমার আগ্রহ নেই।

মিনু বলল ঃ তাই বুঝি সন্ন্যাসীর কাছে ঘুরঘুর করছিলে?

মিনুর চোখ দেখি সর্বদা সজাগ। আমার দিকে সবসময় দৃষ্টি রেখেছে সে।

আমি বললুম ঃ গাছের ছায়াটা বড় ভাল লাগছিল. তাই ওখানে দাঁড়িয়েছিলুম। ভাবছিলুম, ঠিক এখানটাতেই হয় তো দক্ষরাজার নিজের ঘরখানা ছিল।

মিনু বলল ঃ বাংলাদেশের ভাবুকের ভাবনার যখন লাগাম নেই, তখন সব কিছুই ভাবতে পারে তারা।

একটু কটাক্ষ করে বললুম ঃ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কথাটা সত্যই প্রযোজ্য।

কথা বলতে বলতে আমরা টাঙ্গার কাছে এসে দাঁড়ালুম। রাঙামাসীরা ইতিমধ্যে তাদের নিজেদের টাঙ্গায় উঠেছেন মিনু আর অঞ্জনাও টাঙ্গায় উঠল। আমি উঠবার জন্য পাদানিতে পা দিলুম। হঠাৎ এমন সময় সামনে এক আশ্চর্য জিনিস দেখলুম। সেই পাগলা সাধুটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে।

তিনি কখন বেরুলেন। আমি তো এতক্ষণ উঠানেই দাঁড়িয়েছিলুম। এই একটি মাত্র গেট ছাড়া বেরুবারও তো কোন পথও নেই! বিস্মিতভাবে সাধুর দিকে তাকালুম। কেমন যেন একটু হাসলেন তিনি। তারপর আমাকে লক্ষ্য করে হঠাৎ একটা ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মত চিৎকার করে কি যেন বলতে লাগলেন। তাঁর ভাষা দুর্বোধ্য। গালাগালি করলেন কিনা কে জানে। আমার বুকের ভিতরটা কমন যেন একটু কেঁপে উঠল। কিন্তু আমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে সেই সাধুর দিকে তাকালুম। একটা মর্মভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁর। কেন যেন মনটা আমার বিষণ্ণ হয়ে গেল।

আজ ২৫ বছর পরে বুঝেছি তিনি যথার্থই সাধু ছিলেন। কুলকুণ্ডলিনীকে দশ মাত্রায় উঠাতে পেরেছিলেন তিনি, তাই আমি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেও অদৃশ্য অবস্থায় বাইরে গিয়ে, আবার অকস্মাৎ আমার স্যমনে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। বিজ্ঞানও একথা স্বীকার করে। কিন্তু সে থাক, আবার ২৫ বছর আগের কথাই বলা যাক।

গাড়ী ছেড়ে দিল। মনে মনে ভাবলুম—প্রকৃতই যদি উনি সাধু হন, তাঁর এই দৃষ্টির প্রভাব হয় তো চিরকালই আমার উপর থাকবে।

অঞ্জনা আমাকে লক্ষ্য করে বলল ঃ সন্তুদা, কেমন যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেছ এর মধ্যে?

বললুম : গম্ভীর ? কৈ, না তো ?

অঞ্জনা বলল : তুমি নিজে নিজেকে দেখতে না পেলেও আমরা তো দেখতে পাচ্ছি ?

বললুম : তুমি দর্শনের ছাত্রী। তোমাকে কি আর বলব। জান তো কোন একটা জিনিসের সত্যিকারের চরিত্র ধরা বড় কষ্টকর। কারণ দ্রষ্টব্য জিনিসের উপর দ্রষ্টার নিজের মনের ছায়া পড়ে কিনা।

আমার কথার অর্থ ধরতে অঞ্জনার এতটুকু বিলম্ব হল না। সঙ্গে সঙ্গে সে বলল : যখন আমি পথে বেরুই, তখন শুধু মাত্র অঞ্জনা। অন্য কোন বিশেষণ নিয়ে বেরুই না।

বললুম : তোমার বিশেষত্বের কথা জানলুম।

অঞ্জনা বলল : কিন্তু তোমার নিজের গম্ভীর হবার বিশেষ কারণটা তো বললে না ?

নাছোরবান্দা অঞ্জনাকে উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া কষ্ট। সুতরাং কথা না বাড়তে পারে সেজন্য মনগড়া একটা উত্তর দিলুম। ইতিহাসের কথা ভাবছি। এই জায়গার উপর কোন রিসার্চ টিসার্চ করা যায় কিনা।

শুধু মিনুকে দেখলুম, আমার কথা শুনে সে মুখ টিপে একটু হাসলো। কারণ আমার আলস্যের কথা জানতে তার আর বাকী নেই। কলকাতায় ফিরে কলেজ শেষে সারা সন্ধ্যাবেলাটা যে আমি পুরুষকারে নির্ভর না করে জ্যোতিষ-আশ্রমে বসে দৈবের সন্ধানে কাটিয়ে দেই, সে কথাটা সে ভাল করেই জানে। রিসার্চের জন্য পুরুষকারের প্রয়োজন। আমার মত দৈব-নির্ভর মানুষের কাজ ওটা নয়।

আমার জবাব শুনে অঞ্জনা কতটা বিশ্বাস করল জানিনে। তবে সে তার কথার উত্তর পেয়ে চুপ করল। আর আমি মনে মনে ভাবতে লাগলুম সেই সাধুর কথা।

মনটা কিছুতেই যেন আর প্রসন্ন হয়ে উঠল না। টাঙ্গা এপথ সেপথ ঘুরে দেখালো আরো কত জিনিস। গুরুকুল, ঋষিকুল কলেজ, মৃত্যুঞ্জয় প্রতিমা, ভোলা-গিরি আশ্রম, কত সব। নেমে নেমে ওরা দেখল, আমিও দেখলুম, কিন্তু কি দেখলুম জানি না।

অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে একটা ক্লান্তি অনুভব করা গেল। টাঙ্গাওয়ালা আরো কি একটা নতুন মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছিল। সুনীলবাবু বললেন : আজ থাক, আর নয়। এবার ফিরে চল।

টাঙ্গাওয়ালা বলল : সেকি বাবুজী! টাকা দেবেন, সব ঘুরে দেখবেন না ?

সুনীলবাবু বললেন : সূর্য তো পাটে বসবার উপক্রম। সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছি, এবার থাক। ক্লান্তি লাগছে।

টাঙ্গাওয়ালা বলল : আমাদের দুষবেন না যেন বাবুজী।

সুনীলবাবু হেসে বললেন : না, দুষব না। আট টাকার বিনিময়ে অনেক বেশীই দেখিয়েছ। এখন থাক।

কথামত মেহেরচাঁদ ধরমশালার দিকে গাড়ী চলল। গঙ্গার ধারে বাঁধের মত উঁচু রাস্তাতে যখন গাড়ী এসে পৌঁছুল, একটা শীতল হাওয়ার স্পর্শ লেগে যেন শরীরটা জুড়িয়ে গেল। সকলেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলুম। গাড়ী এসে ধরমশালার কাছে দাঁড়ালো। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সকলেই এসে ঘরে উঠলুম। মিনুরা চলে গেল ও ঘরে। আমি, সুনীলবাবু আর বীরেনদা আর একটা ঘরে উঠলুম। আমরা যে দুটো রুম পেয়েছিলুম, তাকে এইভাবে ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে নিলুম।

সুনীলবাবু বিছানার দেহটা এলিয়ে দিয়ে বললেন : বাবা, এই বয়সে কি এমন করে ঘুরে বেড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব? রয়ে সয়ে ধীরে ধীরে দেখতে হয়। অঞ্জনার যা পেড়াপীড়ি, তাই হ্যারিকেন টুরে বেরিয়ে পড়তে হল। উঃ, কোমরটা যেন টনটন্ করছে।

আমি বললুম : আপনার তো বয়েস হয়েছে। আমার নিজেরই এখন ক্লান্তি লাগছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, রাঙামাসীদের কোন ক্লান্তি এসেছে বলে মনে হয় না।

সুনীলবাবু বললেন : বেড়ানোর বেলা মেয়েদের তুমি কখনো ক্লান্তি দেখবে না সনৎ। এখানেই ওদের বিশেষত্ব। আঃ। তিনি একটা আরামসূচক শব্দ করলেন।

আমরা দুজনেই ক্লান্ত। কিন্তু বীরেনদার মধ্যে কোন ক্লান্তির চিহ্ন লক্ষ্য করলুম না। অবশ্য দিনের বেলা যে তিনি কোন ক্লান্তি অনুভব করেন না, এটা আগেই জানি। ঘরে এসেই তোয়ালে নিয়ে তিনি ছুটলেন বাথরুমের দিকে। পাকা সংসারী লোক। গৃহিনী-পনা তিনি জানেন। বাইরে থেকে এসে হাত-মুখ না ধুয়ে যে বিশ্রাম করতে নেই, এটা তিনি বোঝেন। আমি লক্ষ্মীছাড়া, নিয়মকানুনের ধার ধারিনে। সুনীলবাবু লক্ষ্মীমন্ত হয়েও, গৃহিনীর আড়ালে আমাদেরই মত যাযাবর, সেটা বোঝা গেল। কিন্তু নিজে তিনি যাযাবর হলে কি হবে, সংসার তো তাঁকে নিজেই বেঁধে রেখেছে। সহজে কি নিয়ম ভেঙে পার পাবার উপায় আছে তাঁর? দেখি, তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে অঞ্জনা এসে উপস্থিত এ ঘরে। আমাদের এভাবে বিছানায় এলিয়ে পড়তে দেখে যেন জ্বলে উঠল সে। সুনীলবাবুকে লক্ষ্য করে বলল : একি বাবা, হাত পা না ধুয়েই যে তুমি বিছানায় শুয়ে পড়লে?

সুনীলবাবু অপরাধীর মত ধীরে ধীরে বললেন : একটু জিরিয়ে নিচ্ছি, মা।

-- না, না, যাও, আগে হাত পা ধুয়ে এস। এই নাও তোয়ালে।

অগত্যা সুনীলবাবুকে উঠতে হল।

আমারও রেহাই হল না। অঞ্জনা আমাকে লক্ষ্য করে বলল : একি সন্তুদা, হাত পা না ধুয়ে তুমিও শুয়ে পড়লে যে?

বললুম : তুমি যে আমার তদারকি করতে আসবে কে জানতো। হাত পা ধোবো নিশ্চয়ই। একটু...

—না, না, আগে হাত-মুখ ধুয়ে এসো। যাও, যাও।

বুঝলুম, গৃহে যেমন সুখ আছে, অসুখও তেমনি। সংসার জীবনে আর যাই হোক, আলস্যের স্থান নেই। আলস্যকে জড়িয়ে ধরে নিরিবিলিতে উপভোগ করবার উপায় নেই। অগত্যা আমাকেও উঠতে হল।

উপরে বাথরুমে গিয়ে দেখি, সুনীলবাবু সাবান ঘষছেন। আমায় দেখে বললেন: এই যে সনৎ, তোমাকেও ঠেলে পাঠালো বুঝি? তা হাত-মুখটা ধুয়ে নিলে ক্লান্তিটা কমই বোধ হয়।

সুনীলবাবুকে তাকিয়ে দেখলুম। একেই বুঝি প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন 'গৃহ বলিভুক পারাবত'।

হাত-মুখ ধুয়ে দুজনেই ফিরে এলুম। এবার বীরেনদার মুখে একটা ক্লান্তির ভাব দেখলুম। হাত-মুখ ধুয়ে আমরা যেখানে ফ্রেস, সেখানে তিনি ক্লান্ত কেন? ভোজন-রসিক বীরেনদার আসল দিকটার কথা ভুলেই গিয়েছিলুম এতক্ষণ।

বীরেনদা বললেন: এবার একটু জলখাবার হলে ভাল হত, কি বল সন্তু?

ও হরিবোল! বীরেনদার ক্লান্তির অর্থ বুঝতে পারলুম এতক্ষণে। বেলা দশটাতে বেরিয়ে বেলা চারটে অবধি যে তিনি উদরে কিছু না দিয়ে এখনো অস্তিত্ব নিয়ে বজায় আছেন, এটাই তো আশ্চর্যের ব্যাপার।

সুনীলবাবু বললেন: হ্যাঁ, তা যা বলেছেন। একটু চা হলে ভাল হত।

কিন্তু চা-খোর বীরেনদা কদাচিৎ নন। তাঁর এই ক্লান্তির কারণ যে চা নয়, সেটা আমি জানি। কিন্তু জলখাবারের ব্যবস্থা করতে গেলে আবার এখনি নিচে নামতে হয়। হরিদ্বারের রাবড়ির জন্যেও এই মুহূর্তে আমি নিচে নামতে রাজী নই। বরং সারারাত না খেয়ে পড়ে থাকতে পারি। সুতরাং আমি জলখাবার সম্পর্কে উচ্চবাচ্য কিছু করলুম না।

বীরেনদা উসখুস করতে লাগলেন। ঠিক এমন সময় সমুদ্র মন্থনে সুধাভাণ্ড হাতে লক্ষ্মী যেমন উঠে এসেছিলেন, তেমনিভাবে যুগ্মলক্ষ্মী মিনু আর অঞ্জনার আবির্ভাব হল এ ঘরে। টিফিন ক্যারিয়ারের ঢাকনা আর দুটো বাটিতে খাবার। এবং আরো আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, যে রাবড়ির কথা ভাবছিলুম, সেই রাবড়িই এনেছে ওরা।

বীরেনদার মুখে যেন মেঘের ফাঁকে চন্দ্র উঁকি দিল। সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে খাবার নিলেন তিনি।

আমার ভাগ্যে টিফিন ক্যারিয়ারের ঢাকনা। যা হোক, ক্ষিধে আমিও অনুভব করছিলুম। হাতে খাবার নিতে নিতে অঞ্জনাকে বললুম: আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ আছে নাকি তোমার কাছে? মনে না করতেই বাঞ্ছিত জিনিষ এসে হাজির? ম্যানেজ করলে কোত্থেকে?

অঞ্জনা বলল: সে দিয়ে তোমার প্রয়োজন কি? জিনিষটা পেয়েছো তো? গাড়ীতে অভয় দিই নি যে আমি থাকতে খাওয়ার কষ্ট হবে না।

বীরেনদা বললেন : সে কথা স্বীকার করছি। বেঁচে থাক, আর এমনি করে আমাদের খাওয়াও।

খাবার খাইয়ে বাটিগুলো নিয়ে ওরা আবার ও ঘরে চলে গেল। এইবার বীরেনদা আরাম করে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। অঞ্জনাদের খাবারের রহস্যটা ভেদ করলুম সুনীল বাবুকে জিজ্ঞাসা করে। সকালবেলা ব্রহ্মকুণ্ড থেকে ফেরার পথেই ওরা জলখবার সংগ্রহ করে এনেছিল। আমি সেটা খেয়াল করি নি।

মেয়েরা সর্বাগ্রে সুষ্ঠু গৃহিনীপনার কথা ভাবে। এইজন্য সংসারে মেয়েছেলে না থাকলে সুখ নেই। অবশ্য সংসারী মানুষেরা বলেন, মেয়ে বৌ নিয়ে সংসারের মধ্যে নাকি সোয়াস্তিও নেই। হ্যা, সোয়াস্তি যে নেই, সেটা মিনিট দশেক পরেই টের পেলুম। কেবল সমস্ত দেহের উপর আলস্যটাকে নিবিড় করে টেনে টেনে আনছিলুম। এমন সময় দেখি, একেবারে সেজেগুজে মিনু আর অঞ্জনা এসে হাজির।

সুনীলবাবু চোখ দুটো বুঁজে ছিলেন। অঞ্জনা ডাকল : ঘুমিয়ে পড়লে নাকি, বাবা ?

চোখ মেলে তাকালেন সুনীলবাবু : না না, এই যে, কেন ?

—সন্ধ্যাবেলা ঘুমুচ্ছো কি ? চল, ব্রহ্মকুণ্ডে বেড়িয়ে আসি। সন্ধ্যাবেলাতেই নাকি গঙ্গার ধারে আরাম বেশী। সকলে প্রদীপ ভাসায়, সেটাও নাকি দেখবার মত।

সুনীলবাবু বললেন : আমি আজ আর যাব না, মা। আরো একটা দিন তো আছি, কাল দেখব'খন।

সুনীলবাবুর চোখে-মুখে ক্লান্তির স্পষ্ট ছাপ। সেটা বুঝতে পেরে বুঝি অঞ্জনা আর পেড়াপীড়ি করল না। আমাকে ডাকল সে : সন্তুদা, তুমিও যে শুয়ে ? ওঠ, ওঠ বলছি। তারপর বীরেনদাকে বলল : বীরেনদা, যাবেন না ?

বীরেনদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। রাবড়ি খাবার পর তাঁর মধ্যে আর ক্লান্তির ছায়ামাত্র অবশিষ্ট নেই।

আমি তবু শুয়ে। অঞ্জনা ডাকল : কি সন্তুদা, ওঠ।

হাঁটাব নাম শুনে আমার গায়ে জ্বর আসছিল। অথচ না বলিই বা কি করে। অঞ্জনার সামনে তাহলে নিজেকে বুড়ো বলে প্রমাণ দিতে হয়। আমার রোমাণ্টিক চেতনা কি সেটা সহ্য করতে পারে ? সুতরাং উঠলুম।

মিনু আড়চোখে তাকিয়ে আমাকে দেখে নিয়ে একটু মুচকি হাসল। সে হাসির অর্থ :—অঞ্জনা মিনু নয়, এটা যেন বুঝিয়ে দেওয়া।

পাঞ্জাবীটা গায়ে গলিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। প্রসাধনের কোন প্রশ্ন তো নেই। একটু শীত শীত লাগছিল। গঙ্গার বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া। যত দিন গড়াচ্ছে, ততই যেন হাওয়ার মধ্যে শীতের আমেজ বাড়ছে। সেটা বুঝতে পেরে অঞ্জনা বলল : দাঁড়াও, চাদরটা দিই। নদীর ধারে শীত লাগবে। বেড়াতে বেরিয়ে চাদরটাও সঙ্গে আন নি, বেশ মানুষ তুমি। আজকালকার অধ্যাপকেরা কিন্তু এমন হয় না, সন্তুদা।

চট্ করে ও ঘরে চলে গেল অঞ্জনা। বীরেনদা সেই মোটা তুষটা গায়ে জড়িয়েছেন। ভারি ইকনমিক তুষ। এক তুষে লেপ কম্বল চাদর সব কাজই হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই চাদর নিয়ে এল অঞ্জনা। সুনীলবাবুকে লক্ষ্য করে বলল : বাবা তাহলে আমরা আসি। তুমি একটু সজাগ থেকো। ও ঘরে তালা দিয়ে চললুম। তুমি দরজা বন্ধ করে দিয়ে বোস। চল সন্তুদা। আমার হাতে সে চাদরটা তুলে দিল।

ভারি করিৎকর্মা মেয়ে। খুঁজে এর দ্বিতীয়টি পাওয়া ভার। মিনু যেন এ কয়দিনেই অঞ্জনার পাশে মলিন হয়ে গেছে। মিনু জেদী, গোঁয়ার, কিন্তু অঞ্জনা অনেকটা চঞ্চল, অথচ শান্ত। বেরিয়ে এলুম। দেখি, রাঙামাসী আর অঞ্জনার মাও দাঁড়িয়ে। সুনীলবাবু ঠিকই বলেছিলেন—বেড়ানোর নামে মেয়েদের ক্লান্তি নেই, এমন কি বুড়ি মেয়েদেরও। রাঙামাসী আর অঞ্জনার মার বয়স কম নাকি! কিন্তু ক্লান্তি আছে বলে তো মনে হয় না এতটুকু।

সকলে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলুম। সেই গলিপথে বাজারের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মকুণ্ড। সূর্য তখন ডুবে গেছে। আবছা অন্ধকার। দুধারের দোকানে আলো। রাস্তাতেও আলো জ্বলছে। চলতে চলতে গরম পুরির গন্ধ নাকে আসে। কিন্তু বীরেনদাকে পর্যন্ত সেই পুরির গন্ধে আকৃষ্ট হবার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলতে লাগল অঞ্জনা আর মিনু। বাধ্য হয়ে ওদের অনুসরণ করলুম।

এলুম ব্রহ্মকুণ্ডে! লোকে লোকারণ্য ঘাটের চারদিকে। জীবনের চাঞ্চল্য এত বেশী যে রাত্রি নেমেছে সে কথাটা মনে হয় না। সকাল বেলা এত লোক দেখি নি এখানে। এখন যেন তার বিশগুণ বেশী লোক। কিন্তু বিপণিশ্রেণীর আড়াল ছাড়িয়ে ফাঁকা গঙ্গার ধারে আসতেই হাওয়ার মধ্যে বরফগলা শীতের কামড় অনুভব করলুম যেন। তাড়াতাড়ি চাদরটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিলুম। কার্তিক মাসের প্রথমেই এমন শীত আমাদের কল্পনার বইরে। কলকাতা গিয়ে হয় তো খালি গায়ে এখনো সন্ধ্যা বেলা ছাদে ঘুরে বেড়াব।

গঙ্গার উপর সেতুটা পার হয়ে ওপারে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেশবিদেশের সমস্ত মানুষের ভীড় এখানে। মেয়েরা সব পাতার নৌকোয় ফুল আর প্রদীপ ভাসিয়ে দিচ্ছে জলে। সার বেঁধে সেই নৌকো চলেছে স্রোতের বেগে। সে এক দেখবার মত দৃশ্য।

রাঙামাসী আর অঞ্জনার মা দুজনেই ধরলেন, ওঁরা নৌকো ভাসাবেন। নৌকো কিনে প্রদীপ ধরিয়ে দেওয়া হল দুজনকেই। সিঁড়িতে বসে নৌকো ভাসালেন ওঁরা। সেতুর নিচ দিয়ে ব্রহ্মকুণ্ড ছাড়িয়ে নৌকো চলে গেল ওদিকে। রাঙামাসী আর অঞ্জনার মায়ের মুখে স্বর্গীয় একটা হাসি ফুটে উঠতে দেখলুম। কী নিবিড় বিশ্বাস এঁদের, শুধুমাত্র কতকগুলি রীতি এবং নীতির উপর। এই বিশ্বাস আমরা বর্তমানে হারিয়ে ফেলেছি বলেই বুঝি সমাজে নেমে এসেছে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি। বাংলা সাহিত্যে যাকে বলে অনিকেত ভাব।

ওধারে সেতুর উপর তাকিয়ে দেখি, কয়েকজন ইউরোপীয় সাহেব মেম। দেখতে

এসেছেন উত্তর প্রদেশের এই বাঁধানো ঘাটে হিন্দুদের ধর্মসংস্কার আর প্রকৃতির সৌন্দর্য। মূর্তিপূজো বিরোধী এদের মনে হয় তো অন্ধ সংস্কারের প্রাবল্য হাসির উদ্রেক করছে। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিশ্চয়ই বিমুগ্ধ করেছে ওদের। দেখি, সার বাঁধা প্রদীপের দিকে ওরা তাকিয়ে আছেন, অন্ধকারের মধ্যেও ফ্লাসলাইট দিয়ে ফটো তুলছেন।

কৌতুকের হাসি অঞ্জনা আর মিনুর চোখেও।

অঞ্জনাকে বললুম : তুমি একটি নৌকো ভাসালে না কেন?

অঞ্জনা বলল : জমা রইল। আর একবার এসে ভাসাব।

মিনুকে বললুম : তুমি?

অঞ্জনা বলল : ভুলে যাচ্ছ কেন যে ও বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী। ও নৌকো ভাসাবে তাল দীঘিতে।

বুঝলুম, রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটি মনে পড়েছে অঞ্জনার :

কেয়া পাতার নৌকো গড়ে সাজিয়ে দেব ফুলে
তাল দীঘিতে ভাসিয়ে দেব চলবে দুলে দুলে।

এই সন্ধ্যা বেলায় দারুণ হিমেল হাওয়ায় যেখানে গায়ে চাদর দিয়েও কাঁপুনী লাগে, সেখানে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, সকাল বেলার মত কয়েক জন ছেলে খালি গায়ে শিকল ধরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। গঙ্গা মায়ের নামে উৎসর্গীকৃত কিছু সোনাদানা যদি ভাগ্যে জুটে, এরই জন্য এই কঠিন প্রয়াস।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে নৌকা ভাসানো দেখলুম।

ভীড় সব এদিকেই। ওদিকে অর্থাৎ পেছনে ফাঁকা। যারা ভীড় এড়িয়ে চলতে চান, তারা ওখানে বাঁধানো ঘাটের উপর বসে আছেন। গঙ্গা ব্রহ্মকুণ্ডের কাছে দ্বিস্রোতা। একটি ব্রহ্মকুণ্ড দিয়ে কনখলের দিকে আর একটি ব্রহ্মকুণ্ডের ওধার দিয়ে প্রবাহিত। সেখানেই গঙ্গার বেশী বিস্তৃতি। তবে গভীর সে সর্বত্রই।

অঞ্জনাকে বললুম : চল, ও দিকটা ঘুরে আসি।

উৎসাহের অন্ত নেই অঞ্জনার। বলল : চল।

কিন্তু রাঙামাসীরা ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাট ছেড়ে উঠতে নারাজ। এই দৃশ্যের মধ্যে ধর্মের ভাব জড়ানো। এই ধর্ম করবার জন্যেই তো তাঁরা এসেছেন।

ওঁরা জানালেন : গঙ্গা আরতি হবে এখনি। এখন উঠবো না।

মিনু বলল : গঙ্গা আরতি নাকি দেখবার মতন। থাক, ওদিকে নইবা গেলাম।

বললুম : ভাবে সাবে বোঝা যাচ্ছে আরতির এখনও অনেক দেরী। আরতি হলে বাজনা বাজবে নিশ্চয়ই। ঘণ্টার শব্দ শোনা যাবে। চল, এই ফাঁকে ভীড়ের বাইরে একটু ঘুরে আসি।

বীরেনদার হেফাজতে রাঙামাসীদের ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে বসিয়ে আমরা গেলুম ওদিকে।

ওদিকে গিয়ে খানিকটা ঘুরে দেখে নিয়ে জলস্পর্শী একটা সোপানের উপর আমরা

বললুম। ঘাটের ধারে সর্বত্রই শিকল টাঙিয়ে দেওয়া। হঠাৎ গঙ্গার স্রোতে পড়ে যাতে ভেসে না যায় কেউ, সেইজন্য এই সাবধানতা।

অঞ্জনাকে বললুম: কেমন লাগছে বল?

ও বলল: তোমার কেমন লাগছে সেটাই আগে বল।

বললুম: আমি ইতিহাসের লোক, আমার আর কি মনে হতে পারে? ইতিহাস খুঁজে তো হরিদ্বারের উল্লেখ তত পাচ্ছি না। তবে তৈমুরলঙ্ শুনেছি এই হরিদ্বার পর্যন্ত এসেছিলেন মানুষ হত্যা করতে করতে।

অঞ্জনা বলল: নাও, সন্ধ্যা বেলা এই কলস্রোতা গঙ্গার ধারে বসে তোমার কিনা একজন লুঠেরার কথা মনে পড়ল? তোমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না।

বললুম: এটা আমার ঐতিহাসিকের দৃষ্টি। তুমি দর্শনের ছাত্রী, তোমার দর্শনের দৃষ্টিতে তুমি কেমন দেখছ বল।

অঞ্জনা বলল: বাবার পেড়াপিড়িতে ফিলজফি নিয়েছি বলে সত্যুদা আমাকে দার্শনিক বলে ঠাওরালে নাকি? ও সমস্ত কিছুই মনে পড়ে না আমার।

বললুম: তাহলে সাহিত্যিককে জিজ্ঞাসা করি। এটা পরিপূর্ণভাবেই কাব্যের জায়গা। মিনু, কোন কবিতার লাইন মনে পড়ছে নাকি তোমার?

মিনু বলল: ইতিহাসের ক্লাসে তো শুনি কবিতা আবৃত্তি কর। তুমিই বল না।

বললুম: একটা কবিতা মনে পড়ছে, কিন্তু এখানে ভীড় যদি কম হত খুবই মানাতো।

অঞ্জনা আর মিনু দুজনেই আমার দিকে তাকালো।

আমি বললুম: ভৌগোলিক চেতনাটা ভুলে গিয়ে, এটাকে যদি উত্তর প্রদেশ না ভেবে মালব অবতুম!

অঞ্জনা বলল: বুঝেছি, তুমি কি বলতে চাও?

—বল।

—তুমি একে উজ্জয়িনী ভাবতে, তাই না?

—Exactly so! সূত্র বের করে দিলুম। মিনু তুমি এবার আবৃত্তি কর।

মিনু বলল: আমার মুখস্থ নেই, তুমি বল।

বললুম: ভাব, আর কেউ নেই। শুধু একা বসে আছ। কল্‌কল্‌ শব্দে এই গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যার এই একটানা হাওয়া। ওধারে নীরবে মন্দিরগুলি দাঁড়িয়ে। মনে কর, তুমি চলে গেছ হাজার বছর পেছনে। ঠিক তাহলে দেখতে পাবে, এইখানেই ছিল সেই লীলা নিকেতন, যার খোঁজে কবি তার স্বপ্নকে পাঠিয়েছিলেন—

দূরে, বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে
মোর পূর্ব জনমের প্রথম প্রিয়ারে।

মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে
কর্ণমূলে কুন্দকলি কুরুবক মাথে
তনুদেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে॥

অঞ্জনা বলল : সত্যি সন্তুদা, তোমার আবৃত্তি কিন্তু চমৎকার। এই মুহূর্তে কি যে ভাল লাগছিল! তুমি স্বপ্নের আবেশ সৃষ্টি করতে পার। এত রস থাকতে নিরস ইতিহাস পড়তে গেলে কেন?

মিনু বলল : ইতিহাসকেই কি আর উনি নিরস রেখেছেন? একেবারে সরস করে ছেড়েছেন। ওর বাড়িতে গেলে দেখতে পাবি প্রিয়ম্বদা-ছাত্রীদের ভীড়।

অঞ্জনা বলল : হতেই পারে। আমার তো মনে হচ্ছে আমিই ছাত্রী হয়ে যাই।

মিনু বলল : হয়ে পড় না?

অঞ্জনা বলল : না থাক। অন্য ছাত্রী হয় তো ব্যথা পেতে পারে।

মিনু ঠোঁট উল্টে বলল : বয়ে গেছে। যা না বাড়ি নিয়ে গিয়ে ইতিহাস পড়গে।

অঞ্জনা বলল : ঠিক আছে। সন্তুদা, শুনলে তো। আমি তোমাকে আমার মাষ্টার রাখলুম। কলকাতায় গিয়ে পড়াতে যাবে আমাকে।

বললুম : কি পড়াব? History of Philosophy? ওটা তো জানি না!

অঞ্জনা হেসে বলল : ইতিহাস নয়, কাব্য। দর্শনের ছাত্রী, ইতিহাসের অধ্যাপকের কাছে কাব্য পড়ব সেটাই ভাল।

বললুম : ব্যাপারটা যে ত্রিভুজের তিন কোণ। কখনো মিলবে বলে তো মনে হচ্ছে না।

মিনু হঠাৎ বলল : বিশ্বাস থাকলেই মিলবে। পড় নি অমিয় চক্রবর্তীর 'সঙ্গতি':

মেলাবেন তিনি ঝড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা
মেলাবেন।

অঞ্জনা সহজে হারবার পাত্রী নয়, বলল : কিন্তু একটা মিললে আর একটা ভাঙবে। তখন?

কিন্তু সে কথার উত্তর দেবার সময় পেল না মিনু। ইতিমধ্যেই ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে আরতির ঘণ্টা শোনা গেল। আমি বললুম : চল, এখন বোধ হয় আরতি হবে। মিনু আর অঞ্জনা দুজনেই উঠে দাঁড়াল।

অঞ্জনা বলল : এ জায়গাটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। মনে হয়, চিরকাল যদি এখানে বসে থাকতে পারতুম!

কাললুম ঃ সে জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। ভাল লাগার জিনিষটা কোথাও কোনদিন অফুরন্ত নয়। অফুরন্ত হলে সেটা আর ভাল থাকতো না বোধ হয়। ফুল সুন্দর। সকলের ভাল লাগে। কেন জান? ওর সৌন্দর্য আর অস্তিত্ব বড় অল্প সময়ের জন্য। মানুষের জীবন এই কারণেই প্রিয়। যৌবন আরো ক্ষণস্থায়ী বলে আরো বেশী প্রিয়।

কথা বলতে বলতে ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে এসে উপস্থিত হলুম আমরা। রাণ্ডামাসীদের দেখলুম, তেমনি ঠায় বসে আছেন। এখনি আরতি আরম্ভ হবে এখানে। পাতার নৌকোয় প্রদীপ ভেসে চলেছে তখনো। সেই আলোতে রাত্রি বেলায়ও স্বেচ্ছাবিহারী মাছগুলিকে জলের নিচে স্পষ্ট দেখা যায়। সৌখিন লোকেরা ময়দার ডেলা জলে ছুঁড়ে দিয়ে মজা দেখছে। মাছগুলো ময়দা খাবার জন্য ঝাঁক বেঁধে ছুটে আসছে এক জায়গায়। সত্যি, স্বচ্ছ জলের নিচে এমন মাছের ঝাঁক দেখে বেশ আশ্চর্য আগ্রহ জন্মে ওদের দেখবার জন্যে।

শেষ ঘণ্টা বাজল। সকলে উদগ্রীব হয়ে ওপারে ঘাটের দিকে তাকাল। বিরাট প্রদীপে আলো জ্বালিয়ে পুরোহিত গঙ্গার ধারে গঙ্গা-আরতি করতে লাগলেন। নিষ্পলক দৃষ্টিতে সকলেরই চোখ সেই দিকে। এর মধ্যে বিরাট একটা শিল্প কিছু আছে বলে আমার মনে হল না। বোধহয় শিল্প নয়, এর পেছনে ধর্মের একটা অনুমোদন আছে বলেই সকলের এত আগ্রহ।

আরতি শেষ হল। পাকা দশ মিনিট আরতি চলল। ঘড়ি ধরে কাজ হয় এখানে। একটা প্রদীপের আলোতে যেন ব্রহ্মকুণ্ডের সমস্ত জল আলোকিত হয়েছিল এতক্ষণ। সে আলো নিভে গেলে জমাট বাঁধা লোকের ভীড়ে ভাঙন ধরল।

আরতি শেষ হতেই মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে বীরেনদা উঠে দাঁড়ালেন। রাত্রি বেলা বীরেনদা শিশু। মুহূর্তের মধ্যে আহার শেষ করে তাকে না ঘুমালে চলবে না। সে কথা জানি।

বীরেনদা বললেন ঃ এবার চল।

অঞ্জনা বলল ঃ আর একটু গঙ্গার ধারে ঘুরে যাই। ও ধারটা বেশ ভাল।

কিন্তু সৌন্দর্যের আবেদন বীরেনদার কাছে পেটের আবেদনের চেয়ে বড় নয়। অঞ্জনার প্রস্তাব শুনে তিনি যেন শিউরে উঠলেন ঃ সেকি! এই ঠাণ্ডার মধ্যে কোথায় ঘুরবে? না, না, চল, চল। কাল সকালে আবার দেখা যাবে।

অঞ্জনা বলল : কাল সকালে আবার কখন আসবেন? হৃষিকেশ লছমন ঝোলা যেতে হবে না?

—ঠিক আছে, বিকেলে আসব।

—বিকেলেও তো আবার এমনি ঠাণ্ডা পড়বে?

বীরেনদা এবার তার আসল রূপ প্রকাশ করে দিলেন ঃ কিন্তু সাড়ে সাতটা প্রায় বাজে। খাওয়া দাওয়াটা সেরে নিতে হবে না?

মিনু একটু মুখ টিপে হাসল। অঞ্জনাও যে বীরেনদার এ দুর্বলতাটুকু না

ধরনের [illegible] করা। একটা [illegible] জন্যেই তো এ অবস্থায় [illegible]ছিস।
সে বলল ঃ হোটেলে এখনও ভাত হয় নি বোধহয়। এত সকালে গিয়ে কি হবে ?

বীরেনদা বললেন ঃ কার্তিকের সন্ধ্যা, সাড়ে সাতটা। অনেক রাত। এতক্ষণ নিশ্চয়ই রান্না হয়ে গেছে, চল।

অঞ্জনা আমার দিকে তাকাল ঃ সন্তুদা, এখনি যাবে, না আর একটু ঘুরবে ?

বীরেনদাকে মনকষ্ট দেবার আমার ইচ্ছে হল না। আর অতছাড়া বীরেনদার অভিযোগটা মিথ্যে নয়। সত্যি, দারুন শীত। এই কনকনে হাওয়ায় গঙ্গার তীরে বেশীক্ষণ ঘুরে বেড়ালে নিমোনিয়া হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমি ফেরার পক্ষে রায় দিলুম।

অঞ্জনা বলল ঃ কি আর করি, Majority must be granted.

মিনু বলল ঃ মেজরিটি কি বলছিস্! সবার অপিনিয়ন নিয়েছিস্ ?

অঞ্জনা বলল ঃ তোর অপিনিয়ন কি, বল ?

—ঘুরে বেড়াবো।

বীরেনদার ভ্রূ'দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

বাঁচালেন রাঙামাসীমা। বললেন ঃ না. না। আর বেড়ানো নয়। এবার ফিরি, চল্। দিদি কি বলেন ? রাঙামাসী অঞ্জনার মায়ের দিকে ফিরে তাকালেন। অঞ্জনার মাও ফেরার পক্ষে রায় দিলেন।

অঞ্জনা বলল ঃ তাহলে মেজরিটি ও পক্ষে। চল, ফেরা যাক।

ব্রহ্মকুণ্ড ছেড়ে সকলে রওনা হলুম।

বাজারের গলিপথে হাঁটতে হাঁটতে অঞ্জনা একটি খবারের দোকানের কাছে থামল ঃ দাঁড়াও।

—কি ?

—মাসীমারা তো আর রাতে ভাত খাবেন না। বাবাও খান না। এখান থেকেই মিষ্টিটিষ্টি কিছু কিনে নিয়ে যাই।

এটা ভাল প্রস্তাব। আমাদের মাথায় সে কথা খেলে নি। অঞ্জনা আর বীরেনদা মিষ্টি কিনলেন। বীরেনদা লুব্ধ দৃষ্টিতে রাবড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ রাবড়ি ?

অঞ্জনা বলল ঃ না। বিকেল বেলা রাবড়ি হয়েছে। রাতে আর দরকার নেই। শুধু মিষ্টিতেই হবে।

আমি জনান্তিকে মিনুকে বললুম ঃ তোমার বান্ধবীটি চৌখোস।

মিনু বলল ঃ তোমার চোখে খুব admirable ঠেকছে, না ?

আমি সে কথার কোন জবাব দিলুম না। কারণ ওর মধ্যে প্রচ্ছন্ন যেটুকু ইঙ্গিত ছিল তা ধরতে আমার মোটেও বিলম্ব হয় নি।

ইতিমধ্যে বীরেনদা আর অঞ্জনা খাবার কিনে নিয়ে ফিরলেন। আবার চললুম। দু'পা এগুতেই সেই বাঙ্গালী হোটেল নজরে পড়ল।

বীরেনদা বললেন : একবারেই আমরাও খেয়ে যাই, কেমন ?

সত্যি, আশ্চর্য ছেলেমানুষ বীরেনদা। খাবারের কথা মনে হলে আর এতটুকু তর সইতে পারেন না। কাণ্ডজ্ঞানটুকু ভুলে যান তিনি। বীরেনদার এ ব্যবহার দেখে মিনু আর মুখ না খুলে পারল না। হাজার হোক বীরেনদা তার আপন মাসতুতো ভাই।

মিনু বলল : কি যে বলছ বীরেনদা। মাসীমারা দাঁড়িয়ে থাকবেন আর আমরা খাব নাকি ? ওঁদের আগে পৌঁছে দি। আর তাছাড়া এই নোংরা হোটেলে খাব না। সেই সিন্ধু হোটেলেই খাব।

বীরেনদা আর প্রতিবাদ করলেন না। সকলে ধরমশালাতে ফিরে এলুম। সুনীলবাবু সত্যি দরজা বন্ধ করে বিশ্রাম করছিলেন। আমাদের সাড়া পেয়ে বাইরে এলেন। একা একা বোধহয় অস্বস্তি বোধ করছিলেন তিনি : এই যে এলে ?

অঞ্জনা বলল : দেখলে না, সন্ধ্যা বেলায় সত্যি ভারি সুন্দর দেখায় ব্রহ্মকুণ্ডকে। গঙ্গা-আরতিও দেখবার মত।

সুনীলবাবু বললেন : ভাল থাকি তো কাল দেখব।

ও ঘরের দরজা খুলে রাঙামাসী ঢুকলেন। অঞ্জনা খাবারগুলো মায়ের হাতে দিয়ে বললে : এখন আর ঘরে ঢুকব না। একেবারে খেয়ে আসি। বাবা, তোমার জন্যে মিষ্টি আনলুম। ভাত তো তুমি নিশ্চয়ই খাবে না, কি বল ?

সুনীলবাবু বললেন : ভাল করেছ।

—আচ্ছা, আমরা আসছি, তোমরা বোস।

অঞ্জনা আমাদের দিকে তাকাল। আমরা জুতো খুলে কেউই ঘরে ঢুকিনি। সেই-ভাবেই বেরিয়ে পড়লুম। এ-বেলা টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। রাঙামাসীদের জন্য খাবার আনবারও প্রয়োজন নেই। আমি শুধু অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে দেখলুম। নেতৃত্ব করবার মত একটা ব্যক্তিত্ব নিয়েই যেন সে জন্মেছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কোথাও ওর এতটুকু রুক্ষতা নেই।

সেই সিন্ধু হোটেলে উঠলুম। দেরাদুনের মিহি চালের ভাত আর পনীর। বীরেনদা কিন্তু এ বেলা রুটি নিলেন। রাত্রি বেলা তিনি রুটিই খান।

অঞ্জনা বলল : সেকি বীরেনদা ! ভাতের বদলে রুটি যে ? দেরাদুন চালের গোপন রহস্যটা আবিষ্কার করে বুঝি তার উপর আর শ্রদ্ধা নেই ?

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বীরেনদা নীরবে রুটি গলাধঃকরণ করতে লাগলেন।

বেশী ভাত খাওয়া যায় না, কিন্তু তাই বলে রান্নাটা একেবারে বাজে এ কথাও বলা যায় না। ভাত বেশী খেতে না পারলেও ভালই খেলাম। শ্রান্তি যেন দূর হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলুম ক্লান্তি।

খাওয়া শেষে আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে ধরমশালার পথ ধরলুম। বিদেশাগত যাত্রীরা সকলেই আমাদের মত ছুটে চলেছে। রাস্তায় চলতে চলতে তাদের কথাবার্তা শোনা যায়। বাঙালীদের বেশীর ভাগের হাতেই দেখি, রাবড়ির পাত্র। তাদের

কথাবার্তার মধ্যে রাবড়ি কেনার রহস্য পরিষ্কার : বাংলা দেশে তো এ জিনিস আর মিলবে না। খাঁটি দুধ আর যেখানেই থাক, বাংলায় পাবার উপায় নেই। দুধের সরের বদলে ব্লটিং দিয়ে রাবড়ি তৈরি করে দেবে। মন্ত্রীদের কল্যাণে কলকাতায় তাও পাবার উপায় আছে নাকি? খেয়ে যাই, জন্মে আর চোখে দেখা হবে কিনা কে জানে?

পথচারীদের কথার দিকে অঞ্জনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললুম: শুনলে তো? আমাদেরও রাবড়ি কিনলে ভাল হত নাকি?

অঞ্জনা বলল: আমরা যে দেরাদুন বাইস খেলুম, এটাও বাংলাদেশে আর কোনদিন মিলবে নাকি? দুধ যদিও বা মেলে, খাঁটি চাল আর কোনদিন মিলবে না মনে রেখ।

বললুম. সত্যি বলেছ। বাংলাদেশের রীতিনীতি বোঝা দায়। কলকাতার রাস্তা চীপ স্টোনের অভাবে মেরামত হয় না, অথচ চালের মধ্যে মিহি কাঁকড় অফুরন্ত। দুধ, ঘিয়েতে ভেজাল কল্পনা করা যায়, কিন্তু চালে ভেজাল মিশতে পারে এটা ছিল অকল্পণীয়। কোনদিন হয় তো দেখব, ভেজাল মাছও বাংলাতে আমদানী হচ্ছে।

মিনু বলল: অবশ্য সরকার যদি মাছের রেশন করেন।

বললুম: ঠিক বলেছ। রেশনের চালেই কাঁকড় পাওয়া যায়, বাইরের চালে নয়। এর যে রহস্যটা কি আজ পর্যন্ত ধরা গেল না। অথচ টাকা দিয়ে সরকার পুষছেন আই. বি ডিপার্টমেন্ট।

অঞ্জনা বলল: সব মিস্ট্রি গোড়াতে। শুধু মনে রেখ, সরকারের মত রহস্যময় জিনিস আর জগতে নেই। Political science-এর পাতায় সরকারের বর্ণনা প্রাঞ্জল, কিন্তু বাস্তবে সরকার হল প্রাণান্তকর। এমন একটা পাজলিং ওয়ার্ড শিক্ষাজগতে আর নেই বোধহয়।

অঞ্জনার কথা শুনে আমরা সকলেই হো হো করে হেসে উঠলুম।

আমি বললুম: ভাল 'পান্' দিতে জান দেখি। তুমি নিজেও একটা রহস্য দেখছি। বহু রূপ তোমার। চলনে তুমি আধুনিকা, ধর্মে গৃহিণী—সুকণ্ঠী। গানও জান শুনলুম, অথচ কথাগুলি শিবরাম চক্রবর্তীর মত।

অঞ্জনা চোখে ঠমক এনে বলল: আমি মেয়ে মানুষ না? শাস্ত্রের বচন জান না সন্তুদা—"দেবা ন জানন্তি. কুতো মনুষ্য?" আমাকে সহজেই আঁচ করতে পারবে বলে মনে করেছ নাকি? থাক না দুদিন কাছে, আরো অনেক ভেল্কি দেখিয়ে দেব।

হঠাৎ কি হল, বলে ফেললুম: ভেল্কি দেখানোর অভ্যাস আছে নাকি তোমার?

একটা পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি নিয়ে নীরবে আমাকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখল অঞ্জনা। তারপর বলল: পাশে পাশে তো আছি কদিন, বুঝবে।

মনে মনে একটু আহত হলুম। না, এমন একটা ইঙ্গিত না করলেই হোত। অঞ্জনা যতই বলুক সে মেয়েছেলে, কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওর মনটা হরিদ্বারের গঙ্গার জলের মতই স্বচ্ছ, পরিষ্কার।

কথা বলতে বলতে এসে ধরমশালায় উঠলুম আমরা।

বীরেনদা ঘরে ঢুকবার আগেই বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এলেন। আর বিলম্ব করবেন না তিনি। এবার পপাত শয্যাতলে।

আমি ঘরে ঢুকে তোয়ালে নিয়ে বেরুলাম। ওদিক থেকে মিনু আর অঞ্জনাও এল। হাত-মুখ ধুয়ে সবাই এবার বিশ্রাম নেব। বাথরুম থেকে বেরিয়েই মিনু তাকাল আমার দিকে। আমাকে অ র অঞ্জনাকে, দুজনকেই লক্ষ্য করে বলল : আর কোন কথা নয়, এবার চুপ করে যে যার ঘরে ঢুকে পড়।

অঞ্জনা মৃদু হেসে বলল : কেন, আমার বক্‌বকানি দেখে বুঝি তোর ভয় করছে ?

মিনু দুই ওষ্ঠে তর্জনী ঠেকিয়ে বলল : চুপ, আর কোন কথা নয়।

মিনুর নির্দেশই মেনে নিলুম। আর কোন কথা না বলে আমি ঢুকলুম এ ঘরে, ওরা ঢুকল ও ঘরে।

সুনীলবাবুরা খাওয়া দাওয়ার হাঙ্গামা চুকিয়ে ফেলেছিলেন। সুতরাং আর কোন ঝামেলা নেই। ইতিমধ্যে তিনি বিছানা নিয়েছেন। আমিও আর বিলম্ব না করে সুইচ অফ্‌ করে দিয়ে শুয়ে পড়লুম।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই সকলে মিলে গঙ্গায় স্নান করে এলুম। সত্যি, হরিদ্বারের গঙ্গার একটি বিশেষ মাহাত্ম্য আছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। স্নান করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই পাখির পালকের মত শরীরটাকে যেন হাল্কা বোধ হল। যেন ঝরঝরে শরীর, কোন ক্লেদ আর নেই। নতুন উত্তেজনা পাওয়া যায়। রেগুলার এ গঙ্গায় স্নান করলে কোন রোগ শোক আর থাকবে না বলে বোধ হয়।

স্নান সেরে মাসীমারা আবার ব্রহ্মকুণ্ডে গেলেন পুজো দিতে। আমরাও ওঁদের সঙ্গে ঘুরে এলুম। পুজো করে ধর্মার্জনের মনোবৃত্তি আমাদের নেই। ব্রহ্মকুণ্ডের ধারে প্রাকৃতিক শোভা দেখবার লোভেই গেলুম। এ শোভা যতবার দেখা যায়, ততবার দেখতে ইচ্ছে করে। সকাল বেলার রোদে সুদূর উত্তরে তাকিয়ে দেখলুম। অনেক দূরে হিমালয়ের শৈলশিখরে সূর্যকিরণ ঝলমল করছে। সার বাঁধা সেই হিমালয়শীর্ষ প্রহরীর মত ভারতের সীমান্ত প্রদেশে অতন্দ্র প্রহরা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দার্জিলিং-এ হিমালয়ের শৈল-শিখরকে আরো কাছ থেকে দেখা যায়। সে দৃশ্যেরও তুলনা নেই। কিন্তু তথাপি দুয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। একটা সজল আর একটা গৈরিক—এ কথাই মনে হল আমার। আপন পরিধিতে দুই-ই অতুলনীয়।

মেসোমশাইকে দেখলুম, পুরু লেন্সের চশমার ফাঁকে ধ্যান-গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছেন। একবার মনে হল, তাঁর দার্শনিকের দৃষ্টিতে এ দৃশ্যকে তিনি কেমন দেখছেন, সে কথাটা জিজ্ঞেস করি। কিন্তু তাঁর ধ্যান ভাঙাবার ইচ্ছে হল না।

মিনু আর অঞ্জনা, দুজনেই আজ রাঙামাসীদের সঙ্গে মন্দিরের ভিতরে ঢুকেছিল। সুতরাং তাদের সঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে কথা হোল না। দেখলুম, বীরেনদাও

মন্দিরে ঢুকে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছেন। ভগবান তিনি কতদূর এবং কেমন ভাবে বিশ্বাস করেন জানিনে, কিন্তু পুণ্য সঞ্চয়ের একটা ইচ্ছা যে তাঁর আছে, এ কথা সত্য।

রাঙামাসীরা মন্দির থেকে বেরুলে আর দেরী না করে ধরমশালায় ফিরে এলুম। সেখানেও কালবিলম্ব না করে মিনুদের নিয়ে সেই সিন্ধি হোটেলে গেলুম। খাওয়া দাওয়া সকাল সকাল সেরে নিয়ে হৃষিকেশ লছমন ঝুলাতে বেরুতে হবে। 'মহাপ্রস্থানের পথে' এবং আরো ভ্রমণ কাহিনীতে লছমন ঝুলার কাহিনী পড়েছি। সেই থেকে ঝুলার দিকে একটা দুর্নিবার আকর্ষণ জন্মেছে। যত দ্রুত সম্ভব সেখানে যেতে হবে।

তাড়াতাড়ি খাবার খেয়ে হোটেল থেকে বেরুলুম। মাসীমাদের জন্য টিফিন ক্যারিয়ার করে খাবার নিয়ে এলুম। সকলেরই আজ তাড়াহুড়ো। যাব লছমন ঝুলা আর হৃষিকেশে। নটা নাগাদ সব সেরে এলুম ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে। সেখান থেকে গাড়ী পাওয়া যায় হৃষিকেশ লছমন ঝুলার।

হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশের দূরত্ব চৌদ্দ মাইল, লছমন ঝুলার দূরত্ব সতের। টাঙ্গা করে যাবার উপায় নেই। গেলেও সেটা একান্ত ক্লান্তিকর জার্নি হবে বলে আমার মনে হল। সুতরাং ট্যাক্সির কথা আমিই তুললুম। বীরেনদার এতে কতদূর সম্মতি ছিল জানা গেল না। কিন্তু মেসোমশাইয়ের সম্মতি পেলুম। মিনু আর অঞ্জনাও ট্যাক্সির পক্ষেই কথা বললে। সুতরাং একটা ট্যাক্সিই ধরলুম।

ট্যাক্সি নিল ত্রিশ টাকা। হৃষিকেশ লছমন ঝুলা ঘুরিয়ে এনে দেবে। বাসও আছে, অনেক কমে যাওয়া যায়। বীরেনদা সে কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা আমার মনোমত হল না। এতে এই দূরদেশ ভ্রমণে এসে বিশেষত্ব থাকে না যেন। সুতরাং ট্যাক্সিই ঠিক হল।

কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালা ছ'জনকে এক ট্যাক্সিতে ওঠাতে রাজী নয়। পুলিসের আইনে সেটা সম্ভব নয়। রাস্তায় পুলিশ চৌকিতে ধরবে। কিন্তু এক যাত্রায় পৃথক ত্রিশ টাকা, সেটাও দিতে ইচ্ছে নেই। শেষে অনেক করে বোঝালুম ট্যাক্সিওয়ালাকে—ভারতবর্ষে এত কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, ছ'জন আরোহীকে একটা গাড়ীতে নিতে পারবে না ?

অনেক গাইগুঁই করে সে রাজী হল, কিন্তু তার জন্যে Extra ছয় টাকা হাঁকল। সেটা আর কমানো গেল না। পুলিশচৌকির কাছে গিয়ে একজনকে নেমে যেতে হবে এ কথাটা সে জানিয়ে রাখল। কিছুদূর হেঁটে গিয়ে আবার গাড়ীতে উঠতে হবে। অগত্যা তাতেই রাজী হলুম।

গাড়ী ছাড়ল সাড়ে নটা নাগাদ। সেই পাহাড়ের আঙিনা দিয়ে ধূসর মাটির বুকে মেটালিক রাজপথে গাড়ী চলল সামনে হিমালয়ের কোলে। পেছনে রাঙামাসী অঞ্জনা মিনু আর মিনুর মা। ড্রাইভারের পাশে আমি, সুনীলবাবু আর বীরেনদা।

আজকে মুখ ঘুরিয়ে অঞ্জনাদের সঙ্গে তত কথা বললুম না। আমাদের যৌবন জলতরঙ্গে যে সুর, সবার সামনে তা ফুটতে পারে না। যদিও অঞ্জনার প্রবল যৌবনাবেগ রীতিনীতির বাঁধ মানে না, যে কোন সময় সে কলকলনাদে বাঁধা অতিক্রম করে বেরিয়ে আসতে পারে, তবু আজ আর সেও খুব কথা বলল না!

এই দূর অপরিচিত দেশের পারিপার্শ্বিক আমরা তাকিয়ে দেখতে লাগলুম। চোখে একটা নেশার ঘোর আর মুগ্ধ বিস্ময় সকলেরই। দূরে পাহাড়ের চূড়ার উপর ডিস্ট্রিক্ট টাউনের রেখা, তাকিয়ে দেখবার মত। মোটর পথ সেখানেও উঠে গেছে। ধূসর ধূলি ছাড়িয়ে পথের দুপাশে ধীরে ধীরে আগত অরণ্যের আভাস উঁকি দিল। পথে ছাড়ালুম ছোট্ট পাহাড়ী একটি সহর। ছাড়ালুম হৃষিকেশ।

হৃষিকেশ দেখব ফেরার পথে। গাড়ী এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের কোলে উঠল। দুই-পাশে সু-উন্নত অরণ্য। দার্জিলিংয়ের পথে শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে হিমালয়ের কোলে অরণ্যের সঙ্গে এ অরণ্যের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু দার্জিলিংয়ের মত এ পথ ক্রমশ এঁকেবেঁকে পাহাড়ের উপর উঠে যায় নি। পাহাড়ের একটা উদ্‌বৃত্ত অংশ ছাড়িয়ে আবার এ পথ নেমেছে সমতল ভূমিতে। পথের উপর থেকে ডানদিকে প্রবহমান গঙ্গার ধারা দেখা যায়। তাব গা ঘেঁষেই ঘন অরণ্যাবৃত পাহাড়ের সবুজ ছাউনী। দূরে বাঁদিকে পাহাড়, সামনে পাহাড়, ডাইনে পাহাড়।

ডাইনে পাহাড়ের গা ঘেঁষে নেমেছে গঙ্গার ধারা। অপূর্ব সেই নৈসর্গিক শোভা। কথা বলে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে হয় না। তাই শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম। কিন্তু পুলিশ ফাঁড়ির কাছে এসে সত্যিই একটা হাস্যকর ব্যাপার হল। আগে থাকতেই গাড়ী থামিয়ে ড্রাইভার আমাদের একজনকে নামতে বলল। কথাটা সে বীরেনদাকেই বলল, কারণ তিনি ঠিক দরজার ধারেই বসেছিলেন। বীরেনদার মুখ-চোখ রাঙা হয়ে উঠল। হায় রে বেচারী! টাকা খরচ করে তিনি এসেছেন, আমাদের ভ্রমণের তিনিই উদ্যোক্তা, এবং অগ্রিম টাকা তিনিই এখনো ব্যয় করে যাচ্ছেন, অথচ ভাগ্যের কী পরিহাস, তাঁকেই হাঁটতে হবে, অন্তত আধ মাইল পথ। আর আমরা যাব গাড়ীতে। এটা নেহাৎই ভাগ্য। কারণ, দরজার ধারে না বসলে তাঁকে নামতে হত না। মুখ-চোখ লাল করে বীরেনদা নেমে গেলেন।

পেছনে তাকিয়ে দেখি, মিনু আর অঞ্জনা মুখ টিপে হাসছে। গাড়ী ছেড়ে দিল। মিনু আমায় বলল : তুমি নামতে পারলে না, সন্তুদা?

বললুম : কি করে নামি। আমি যে একেবারে ড্রাইভারের গা ঘেঁষে বসে আছি।

অঞ্জনা বলল : তুমি অত্যন্ত চালাক। নামবার ভয়েই ড্রাইভারের গা ঘেঁষে বসেছ।

বললুম : না, সেরকম দুরভিসন্ধি বিন্দুমাত্র আমার মনে ছিল না। বরং বীরেনদা যে জায়গায় বসেছিলেন, সে জায়গাটার জন্যেই আমার লোভ ছিল। ওখানে বসে আরো নির্বিঘ্নে পাশে তাকিয়ে দেখা যায়, আর এমন করে পেট্রোলের দুর্গন্ধ সইতে হয়

না। বীরেনদা তো সামান্য একটু কষ্ট করবেন, আর সারাটা পথ আমাকে কষ্ট করতে হচ্ছে।

অঞ্জনা বলল : ওটা Lame Excuse, দিব্যি তো সামনের কাঁচ দিয়ে কবির মত বাইরে তাকিয়ে আছ।

ইচ্ছে হল, এরও একটা সুন্দর রোমাণ্টিক জবাব দেই। কিন্তু সুনীলবাবু আর রাঙামাসীদের এত নিকট সান্নিধ্যে বসে আর যাই হোক, আমার পক্ষে কোন মধুর, রোমান্স করা সম্ভব নয়। সুতরাং চুপ করে গেলুম। পুলিশ চৌকি পার হয়ে গাড়ী এসে থামল।

আমরা পেছনে তাকালুম বীরেনদাকে দেখবার জন্যে। পুলিশ চৌকি ছাড়িয়ে গাড়ী মিনিট খানেকের মধ্যে এক মাইল এসে গেছে। বীরেনদার দেখা নেই। অঞ্জনা বলল : আহা বেচারী, কতটা পথ হাঁটতে হবে।

মিনু বলল : ফেরার পথে তুমি ধারে বসবে।

আমি বললুম : যতটা ভাবছ, ততটা কিছু নয়। গ্রামের পথ হেঁটে হেঁটে বীরেনদার রীতিমত অভ্যাস আছে। ঠিক চলে আসবেন। বাসে ট্রামে চড়ে আমরাই না হয় খোঁড়া হয়ে গেছি, বীরেনদা হন নি।

অঞ্জনা চোখে একটা কটাক্ষ টেনে বলল : যত আর্গুমেণ্টই কর না কেন, ফেরার পথে তোমাকেই ধারে বসতে হবে।

মনে মনে একটু শঙ্কিতই হলুম। কি জানি, সত্যি সত্যি আবার ধারেই বসতে না হয় ফেরার পথে। মুখমানা শুকনো করে পেছন দিকে তাকালুম। বীরেনদার মাথা দেখা গেল। তিনি আসছেন। মিনিট দশেক লাগল গাড়ীটার কাছে আসতে। সময়টা কার্তিক মাস হলেও মুখ-চোখ তার লাল হয়ে উঠেছে। প্রথম বেলার সূর্য, দারুন অগ্নি-ঝরা আলো নিয়ে আকাশে হাসছে। বীরেনদার সে মুখের দিকে তাকিয়ে আমার আরো ভয় হল।

ভেতরে ভেতরে বীরেনদা অ্যাটম বোমার মতই বিস্ফোরক হয়ে উঠেছিলেন কিনা কে জানে। আমি আর সেদিকে তাকালুম না। সমবেদনা দেখিয়ে দুটো কথা বলতে গেলে পাছে হিতে বিপরীত হয়, সেই ভয়ে কোন কথাও বললুম না। আবার গাড়ী ছেড়ে দিল।

ক্রমশ রাস্তা উর্ধ্বে উঠছে। হিমালয়েরপাদদেশ এগিয়ে আসছে কাছে। সৌন্দর্য, আরো বেশী সৌন্দর্য দেখা দিচ্ছে। সেই সৌন্দর্য নিবিড় আকর্ষণে টেনে নিয়ে গেল আমাকে। অবশেষে গাড়ী এসে থামল পাহাড়ের ধারে। টাঙ্গা, ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার সব সেখান থেকে ফিরে যাচ্ছে। নিচে প্রবাহিনী গঙ্গার নীল জলরাশী। ওপরে পাহাড়ের গায়ে গীতাভবন—অপূর্ব দৃশ্য।

পাহাড়ের গা ঘেঁষে রাস্তা চলে গিয়েছে আরো দূরে। ছোট ছোট বাস, লরি সব চলেছে। জিজ্ঞেস করে জানলুম, ও রাস্তা গেছে বদ্রিনাথ। এখন বাসে করেই

বদ্রিনাথ যাওয়া যায়। একবার সেই পথের রেখা ধরে অনেকদূরে তাকালুম—ভ্রমণ বিলাসীদের কামনার মোক্ষধাম বদ্রিনাথ। কিন্তু এও বাহ্য। মন ব্যাকুল তখন ঝুলা দেখবার জন্য, লছমন ঝুলা। ঐতিহাসিক দড়ির ব্রীজ—যে ব্রীজের উপর দিয়ে যুগের পর যুগ তীর্থযাত্রীরা গেছে অনন্ত পুণ্যাশায় মহাপ্রস্থানের পথে।

সামনেই ঝুলা। এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে। নিচে সুনীল প্রবহমান স্রোতস্বিনী গঙ্গা।

দৌড়ে ছুটে গেলুম ঝুলার দিকে, আমি, মিনু আর অঞ্জনা। ধীরে ধীরে রাঙা-মাসী, মাসীমা, সুনীলবাবু আর বীরেনদা এলেন পেছনে। এই সে দড়ির ঝুলা—যার বর্ণনা পড়েছি ভ্রমণ কাহিনীতে। নতুন ঝুলা। মোটাসোটা তার দিয়ে পাকানো দড়ি, দুইটি সমান্তরাল রেখাতে পাহাড়ের এপার থেকে ওপারে গেছে। সেই দড়ির সঙ্গে ঝুলন্ত তারের দড়িতে আটকানো স্টীলের পাত। নির্মাণ কৌশলে হাওড়া ব্রীজের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য আছে। সব ব্যাপারটাই যেন ব্যালেন্সের উপর। হিমালয়ের পাদদেশে মিনিয়েচার এই হাওড়া ব্রীজের একটা বিশেষ সৌন্দর্য রয়েছে যেন।

হাওড়া ব্রীজের মত এতে তত গাম্ভীর্য নেই, কিন্তু সমস্ত অঙ্গভবে আছে বিদ্যুৎ রেখার মত একটা চমক। সত্যি চলতে গেলে দোলে ব্রীজটা। তাই বুঝি এর নাম ঝুলা। মাঝখানে উঠে নীচে তাকালে ভয় করে। সেই কত নিচে গঙ্গা। পড়ে গেলে আর দেখতে হবে না। নিচে তাকালে মাথা ঘোরে। যখন দড়ির ঝুলা ছিল, তখন না জানি আরো কত মারাত্মক ছিল এই পথ। অথচ সেই দুর্গম পথকেও পুণ্যার্জনের আশায় কত শতসহস্র যাত্রী অতিক্রম করেছে। সেই ভয়াবহ ঝুলার উপর দিয়ে চলার বেশ একটা অন্য রোমান্স ছিল, যা এখন অনুভব করা যায় না। কিন্তু এই সুসভ্য ব্রীজের উপরে উঠে যদি এখনও শঙ্কিত চমক লাগে, সেটা না জানি কেমন ছিল? শোনা যায়, কোন শেঠ নন্দন এই বর্তমান ব্রীজ করে দিয়েছেন। তার মা তীর্থযাত্রায় এসে দড়ির ঝুলা দেখে তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য এই ঝুলা তৈরীর নির্দেশ দেন। ঝুলাটা যেন প্রাচীন বর্বরদের চিনবৎ সেতুর মত যা পার হয়ে পরলোকে যেতে হত। পুণ্যাত্মা-দের এ সেতু পার হতে অসুবিধা হত না। কিন্তু পাপাত্মারা এ সেতু পার হতে বাধা পেতেন স্বর্গের প্রহরী বা কোন পশুর। লছমন ঝুলাও যেন স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে আছে। ওপারে যেতে পারলেই স্বর্গের পাদপীঠ। দেবতাত্মা স্বর্গের আঙ্গিনা। সেকথাটা মনে হতেই দেহে কেমন একটা রোমাঞ্চ বোধ করলুম। তবুও ঝুলার উপর দাঁড়িয়ে ভয় করলেও বারকয়েক নিচে তাকিয়ে দেখলুম। আর কখনো দেখা হবে কি হবে না কে জানে। খড়ি ওড়ানো দেহ আর নুড়ির মত চুল নিয়ে স্থানীয় মেয়েরা ঝুলার উপর ময়দার গুলি বিক্রী করছে। যাত্রীদের অনুরোধ করছে গুলি কিনে নদীতে ছেড়ে দিতে, মাছে খাবে।

অঞ্জনার কৌতূহল সব চাইতে বেশী। কয়েক আনার গুলি কিনে সে ছাড়তে লাগল নদীর জলে। সেই হরিদ্বারের মত বড় বড় মাছের মুখ ভেসে উঠতে লাগল নদীর উপরে।

রাঙামাসীরা শঙ্কিত পদবিক্ষেপে ঝুলা পার হয়ে ওপারে গেলেন। আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাঙামাসী ডাকলেন : তাড়াতাড়ি চলে আয়। এখানে দাঁড়াস নি।

কম্পিত ঝুলা তাঁর মধ্যে শঙ্কার সৃষ্টি করেছে বুঝতে পারলুম। যে কোন সময় ঝুলা ছিঁড়ে একটা বিপর্যয় হয়ে যেতে পারে এটাই রাঙামাসীর আশঙ্কা। ঝুলার উপর দাঁড়ালে সেরকম আশঙ্কাটা অমূলক নয়। কিন্তু আমাদের যৌবনের রক্তে সেই শঙ্কার দোলা একটা অব্যক্ত শিহরণের সৃষ্টি করছিল। পেলিকান পাখী নিজের রক্ত খেয়ে যে আনন্দ পায়, সেই আনন্দের মত হয় তো।

অঞ্জনা বলল : জান সন্তুদা, সেই কবিতাটা আমার মনে পড়ছে : সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে, সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে। ভারতবর্ষের বুকে কত না সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে!

মিনু বলল : ডি এল রায় বুঝি এসব দেখেই লিখেছিলেন—ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা, তারই মাঝে আছে সে দেশ সকল দেশের সেরা।

অঞ্জনা বলল : তোমার কি মনে হচ্ছে সন্তুদা ?

বললুম : সেটা আমি ঠিক ঠাহর করতে পারছি না। কোন জিনিষের মূল্যায়ন করতে হলে তুলনা দিয়ে বুঝতে হয়, নইলে বোঝা যায় না। যার তুলনা আছে, তাকেই লোকে সহজে বোঝে, যার নেই, সে অকল্পনীয়। ভগবানের তুলনা নেই, তাকে বোঝা যায় না। লছমন ঝুলাকে বুঝতে পাচ্ছি কিনা দেখ। নির্মাণ কৌশলে হাওড়া ব্রীজের সঙ্গে এর অনেকটা সামঞ্জস্য আছে।

অঞ্জনা ব্রীজটাকে ভাল করে দেখে নিয়ে বলল : হ্যাঁ, তা আছে।

আমি বললুম : অথচ দুয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। সেই পার্থক্যই লছমন ঝুলার মূল্যায়ন।

অঞ্জনা আর মিনু দুজনেই আমার দিকে তাকাল।

আমি বললুম : হাওড়া ব্রীজ যদি মেঘ, লছমন ঝুলা বিদ্যুৎ।

ওরা নির্বাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

বুঝলুম, আমার মনের ভাবটা ওদের বোঝাতে পারি নি। বললুম : এ একটা অব্যক্ত অনুভব। ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না। অথচ আমার অন্তর এই একটি উপমাই খুঁজে পেল। এর মধ্যে যদি কোন ইঙ্গিত থাকে, তবে সে ইঙ্গিত তোমাদের অনুভব করতে হবে, তা ছাড়া আমার আর কিছু বোঝাবার শক্তি নেই।

আমার কথা শেষ হতে না হতে ওপার থেকে সুনীলবাবুর ডাক এল : ও সনৎ, অঞ্জনা, তোমরা কি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে ? এস।

হুঁস হল আমাদের। এগিয়ে গেলুম ওপারের দিকে।

কাঁকর বিছানো পথ। পাশে কলস্বনা গঙ্গা নিম্নে প্রবহমান। ওধারে পাহাড়ের গা ঘেঁষে বস্তি। দু একটা পাকা ঘর। পাকা ঘরগুলির সবই মন্দির বা সাধুদের আশ্রম। পথ ধরে হাঁটলুম আমরা হিমালয়ের দিকে।

গঙ্গার ওধারে পাহাড়ী পথ দিয়ে যন্ত্রদানবের গর্জন। লরি, বাস, প্রাইভেট কার সব চলেছে। ও পথ গেছে বদ্রিনাথের দিকে। আমাদের পথও গেছে বদ্রিনাথের দিকে। অসীম সৌন্দর্য তার আঁচল বিছিয়ে বসে আছে পথের দুপাশে। নিবিড় বনানীর ইশারা আরো সামনে। সামনে কি যেন এক চুম্বক আছে, যা মনকে টেনে নিতে চায়।

চলতে চলতে পথের নিচে, বাঁ-ধারে ঘাটের মতন কি নজরে পড়ল।

মিনু বলল : কি ওটা ?

কি, তা আমি জানি না। বললুম : চল দেখি। সিঁড়ি দিয়ে নামলুম।

সুনীলবাবু বললেন : ও বুঝেছি, চটি।

—চটি ! সেটা কি ? মিনু তাকালো সুনীলবাবুর দিকে।

আমার মনের মধ্যে এক চকিত শিহরণ খেলে গেল। ভাবলুম, এই-ই চটি। তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামাগার ! কত শত সহস্র তীর্থযাত্রীর চরণধূলি লেগে আছে এর অঙ্গে। কত ক্লান্তির দীর্ঘশ্বাস, কত মোক্ষধামে পৌঁছুবার স্বপ্ন এখানে লেগে রয়েছে। চটির বারান্দা থেকে প্রবাহিনী গঙ্গার জলস্রোত দেখা যায়, কলধ্বনি শোনা যায়। ঘাটে নেমে স্নানের ব্যবস্থা আছে, রান্নার ব্যবস্থা আছে। আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা আছে। যখন মানুষের বিজ্ঞান অগ্রসর হয় নি, বাস, লরি, ট্যাক্সি আসে নি এখানে—তখন জানি না কী রূপ ছিল এই চটির ! সে কথা ভাবতে গিয়ে অব্যক্ত রোমাঞ্চ অনুভব করতে লাগলুম নিজের মধ্যে। আজ আর এ পথে বদ্রিনাথের দিকে, উত্তুঙ্গ হিমালয় শীর্ষে, গঙ্গার উৎস গঙ্গোত্রীতে হেঁটে কেউ যায় না।

অঞ্জনা বলল : সন্তুদা, এত তন্ময় হয়ে কি ভাবছ ?

বললুম : তন্ময়। ঠিকই বলেছ। সেই সব পূর্বাগত যাত্রীময় হয়ে গেছি আমি এখন। তাদের মনের মধ্যে নিজের মনকে প্রবিষ্ট করিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। পড়নি ভ্রমণ কাহিনীতে চটির কথা ? কম্বল গায়ে আপাদমস্তক ঢেকে দিনের ক্লান্তি শেষে সন্ধ্যাবেলা পথিকদের বিশ্রামের কথা। সেই দৃশ্য মনে কর, দিনের ক্লান্তি শেষে তীর্থযাত্রীরা এসে বসেছে এখানে, আগুন জ্বালছে, কেউ বা সমস্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে নিঝঝুম মড়ার মত পড়ে আছে। সেই দিনগুলির কথা ভাব দেখি। দেখবে এই চটি মনকে টেনে নিয়ে যাবে।

অঞ্জনা বলল : অত ভাবতে পারি নে। কিন্তু বড় ভাল লাগছে। এই পথের শেষে সেই তীর্থগুলিকেও দেখতে ইচ্ছে করছে।

চটির বাঁধানো সিঁড়ির উপর ততক্ষণে রাঙামাসী, সুনীলবাবু, বীরেনদা এঁরা সব বসে পড়েছিলেন। মিনুও বসেছিল। পাহাড়ী পথে হাঁটতে একটা ক্লান্তি লাগে। কি করে সেই জীর্ণ-দেহ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারাও তবে সেদিন এ পথ পার হত। সবই মনের শক্তির উপর নির্ভর করে। আমার ক্লান্তি লাগছে না। কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না এখানে। মনে হয় আরো যাই। পাহাড়ী এ পথটার আড়ালে গঙ্গা গিরিখাতে না জানি আরো কি অপূর্ব রূপ নিয়েছে, দেখি।

সে কথা মনে হতেই আমি চটি থেকে বেরিয়ে পড়লুম। দেয়ালে লেখা যাত্রীদের নাম পড়ছিল অঞ্জনা, সে আমাকে লক্ষ্য করল না।

বৃক্ষশ্রেণীর নিবিড় ছায়াভরা পথ। চলে গেছে বহুদূর। ছোট ছোট পাহাড়ী ঘর। শুয়র, গরু চরে বেড়াচ্ছে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে। এঁকেবেঁকে গভীর পাহাড়ের মধ্যে গেছে পথ। স্থানীয় একজন লোককে বললুম: এ পথ কোথায় গেছে?

সে বলল: বদ্রিনাথ। পায়দলের পথ বাবু।

বহু তীর্থযাত্রীর নীরব চরণসম্পাত আজও মুখর হয়ে উঠছে যেন এখানে। আমি দেখতে পাচ্ছি, এই পথের উপর দিয়ে হাজারো হাজারো তীর্থযাত্রী চলেছে মানস-লোকের সন্ধানে।

ক্রমশ অরণ্য ঘন হয়ে এসেছে লছমন ঝুলার উত্তরে, এ পথে। আঃ! কি অপূর্ব রোমাঞ্চ এই পাহাড়ী বনপথে দুর্গম তীর্থে চলার! আমি যদি সেই অতীত তীর্থযাত্রী-দের সঙ্গে সহযাত্রী হতুম!

হঠাৎ পেছনে ক্ষীণ কোমল কণ্ঠ শুনলুম: সন্তুদা, ও সন্তুদা।

খেয়াল ছিল না। আপন মনে অনেকদূর চলে এসেছি। গঙ্গা আরো দূরে আরো কত মনোরম ভঙ্গীতে নিচে নামছে তাই দেখবার একটা নেশা পেয়েছে আমাকে। ফিরে তাকালুম। দেখলুম, অঞ্জনা প্রায় ছুটে আসছে।

থামলুম। ও কাছে এসে হাঁফাতে লাগল: একি! একা একা কোথায় চলেছ? সকলে তোমাকে খুঁজছে যে।

অঞ্জনা দম নিয়ে কিছুটা শান্ত হল।

আমি বললুম: কী অপূর্ব এ জায়গা, না?

অঞ্জনা বলল: তুলনা নেই।

—কি মনে হচ্ছে তোমার?

অঞ্জনা হঠাৎ একটি কবিতা আবৃত্তি করল:

> 'অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ—
> সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
> দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
> আর দূরে সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
> রাত্রির নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
> আমার ক্লান্তির উপর ঝরুক মহুয়া ফুল,
> নামুক মহুয়ার গন্ধ।'

এমন একটা অপূর্ব কবিতা এই পরিবেশে আমারও মনে আসে নি। মনে হল, আবেগে অঞ্জনাকে জড়িয়ে ধরি। নেহাৎ তখনো আমার সমস্ত চেতনা বিলুপ্ত হয় নি বলে তা করলুম না। বললুম: এটা কার কবিতা? সত্যিই অপূর্ব তো!

অঞ্জনা বলল : তুমি কবি মানুষ হয়ে এর খবর রাখ না ?

—না, রাখি না। সে জন্য সত্যিই লজ্জা পাচ্ছি। এই বিশাল বনের ছায়ার নিচে ; এ যেন আমার আবিষ্কার।

অঞ্জনা বলল : সমর সেনের।

—সমর সেনের। পড়ি নি তো। বাড়ি গিয়ে নিশ্চয়ই পড়ব।

অঞ্জনা বলল : বুদ্ধদেব বসুর আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলনে এটা পাবে।

আবার দূরে তাকালুম। সামনে বাঁকা-পথ অরণ্যের ছায়ার নীচে যেন ডাকছে। অঞ্জনাকে বললুম : এখানে অরণ্যের একটা ডাক শুনতে পাচ্ছো না ?

অঞ্জনা বলল : তা জানি না, তবে কিসের একটা আকর্ষণ অনুভব করছি। মনে হয়, এই পথের উপর দিয়ে যদি অনেক দূর হেঁটে যেতে পারতুম।

অঞ্জনার দুই চোখের দিকে তাকিয়ে দেখি, বিশাল স্বপ্ন তার চোখে ছায়া মেলে ধরেছে।

বললুম : চল, এগিয়ে যাই।

স্বপ্নাচ্ছন্নের মত সে বলল : চল।

আমি পা বাড়ালুম।

হঠাৎ অঞ্জনা ডাকল : সন্তুদা।

—কি ?

—চল ফিরি।

—চল না, আর একটু দেখে আসি।

—না। চল।

—কেন ?

একটু যেন ক্লান্তি অঞ্জনার মুখে : তুমি বুঝতে পাচ্ছ না। কেউ তো ব্যথা পেতে পারে।

জানি সে কে। মিনু তো ? দূরে অরণ্য আবেগে তখনো ডাকছে। অঞ্জনাকে বললুম : কেন এলে তুমি ?

—কি বলছ ?

বললুম : না, কিছু নয়। চল, ফিরি। ফেরার জন্য পা বাড়ালুম।

অঞ্জনা ফিরতে ফিরতে বলল : আমার কিন্তু ইচ্ছে করছিল, হাঁটতে হাঁটতে তোমার সঙ্গে এই পথ ধরে সেই দূরে চলে যাই।

আমি অঞ্জনার রক্তিমাভ লজ্জানম্র মুখের দিকে একবার তাকালুম। কিন্তু কোন উত্তর দিলুম না।

বছর আটেক আগে আর একবার আমি একা এসেছিলুম এই লহমন ঝুলায়। সেবার পাহাড়ী পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গিয়েছিলুম দুধ চটি পর্যন্ত। দুধ চটির পথের ধারে খাদের কিনারে ছোট এক পাহাড়ী কুঠিরে সেবার এক অলৌকিক

সাধুর সন্ধান পেয়েছিলুম। যাঁর কথা আমার সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে ১ম খণ্ডে উল্লেখ করেছি। পরম সত্যকে কিভাবে জানতে পারব, সে কথা জিজ্ঞাসা করতে তিনি বলেছিলেন, গঙ্গার স্রোতকে হিমালয়ের দিকে ফেরাবার চেষ্টা কর সন্ধান পাবি। সেদিন তাঁর কথা বুঝতে পারিনি। কিন্তু আজ হিমালয়েরই কোন মহাপুরুষের করুণায় কুলকুণ্ডলিণীকে যখন উর্ধে উঠিয়ে নিজেরই ভেতর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষাৎ পেয়েছি এখন বুঝতে পেরেছি সে কথার তাৎপর্য ছিল কি। আজ সেই ২৫ বছর আগেকার আমি সত্যিই সম্পূর্ণ জন্মান্তরিত মানুষ। তবু স্মৃতিচারণার পাতা খুলে বসেছি। সেই অতীতই থাকুক, বর্তমান যাক। সেই আগেতেই আবার ফিরে চলি।

চটিতে ফিরে এলুম। সুনীলবাবুরা দেখি, উৎকণ্ঠায় আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। সুনীলবাবু বললেন : আরে, কোথায় গিয়েছিলে সনৎ ?

বললুম : কি জানি, পথটা কেন যেন ডাকল। একটু এগিয়েই গিয়েছিলুম। অঞ্জনা না ডাকলে হয় তো আরো অনেকদূর এগিয়ে যেতুম।

মিনু দেখি গম্ভীর চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

অঞ্জনা তা লক্ষ্য করে বলল : ইতিহাস যে এমন বাস্তব চেতনাহীন হয় কি করে, ভেবে পাই নে।

মিনু সে কথার কোন জবাব দিল না।

ঝুলার উপর দিয়ে আমরা এসেছিলুম। কিন্তু ফিরব অন্য পথে, ঘাট দিয়ে, যেখানে গীতাভবন আছে। ড্রাইভার গাইড হয়ে সে সব দেখবার নির্দেশ দিয়েছিল আমাদের। গীতাভবনের ওপারে ঘাটের কাছে গাড়ী নিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকবে বলে দিয়েছিল। বাঁধের পাশেই কার-পার্ক। যাত্রীদের জন্য সেখানেই গাড়ীগুলো অপেক্ষা করে।

কিছুদূর হেঁটে লক্ষ্মীজীর মন্দিরে এলুম। মন্দিরে লক্ষ্মীজী ও ধ্রুবের মূর্তি। প্রায় একশ হাত নীচে গঙ্গা। আগে সিঁড়ি ছিল না, এখন হয়েছে।

জুতো খুলে সবাই মন্দির ঘুরে দেখে এলুম। পাশে যাত্রীদের মনোহারী একটি দোকান। সৌখিন জিনিস, মূর্তি, এই সব বিক্রী হয়। মাওমাসীরা তীর্থের নিদর্শন স্বরূপ কিছু জিনিস কেনবার জন্য সেখানে দাঁড়ালেন। অঞ্জনা আর মিনুও সেখানে ভীড় করে দাঁড়ালো। এটা মেয়েদের সহজাত কৌতূহল।

অঞ্জনা দেখি একটা জিনিস সকলের আড়ালে কিনে নিয়ে এসেছে আমার জন্যে : সন্তুদা, তোমাকে present করছি।

—এটা কি ?

অঞ্জনা আমাকে জিনিসটির তাৎপর্য্য বুঝিয়ে দিল। একটি কাঠের ছোট পাইপ। সিগারেট খাওয়া যায়।

—এটা আমার জন্যে ?

অঞ্জনা বলল ঃ তুমি যে সিগারেট খাও, এটা আমাকে এড়াতে পার নি।

হেসে বললুম : তীক্ষ্ম চোখ তোমার।

অঞ্জনা বলল : কিন্তু ক্ষতিকর নয়, এটা জেন।

লজ্জা পেলুম। বললুম ঃ আমি তো সে কথা বলি নি।

অঞ্জনা বলল ঃ ও নিয়ে আর কথা নয়, চল।

আমি তাকিয়ে দেখছিলুম ছোট একটা গুহা-মন্দির। একজন যৌবনবতী আমেরিকান মহিলা ভারতীয় গৈরিক বসন পরে গুহা থাকে বেরিয়ে উপরে উঠে গেলেন। সেখানে নাকি নতুন মন্দির তৈরী হচ্ছে।

অঞ্জনাকে বললুম ঃ দেখলে তো ? বিবেকানন্দ এখন বেঁচে নেই। কে এ অসাধ্য সাধন করল ? একজন পশ্চিমী মহিলা এমন কৃচ্ছ্রসাধন করছেন হিমালয়ের পাদদেশে এসে, তাও আবার হিন্দুদের সাধন-পথে। ভাবছি হিন্দু সাধনার গূঢ় রহস্য কিংবা হিমালয়ের নিসর্গপ্রীতি তাকে উদাসীন করে ঘর ছাড়া করেছে ? সাধু সন্ন্যাসীদের বাইরে হিমালয়ের এই গৈরিক আহ্বানের ক্ষমতাও কিন্তু কম নয়!

অঞ্জনা বলল ঃ থাক, এই গৈরিক আহ্বানের দিকে তোমাকে আর কান পাততে হবে না। চল দেখি, ওরা এগিয়ে গেছে।

লক্ষ্মীজীর মন্দির ছাড়িয়ে পথ গেছে ঘাটের দিকে। প্রায় মাইল খানেক পথ হাঁটতে হয়। সমস্ত পথটাই নিবিড় পত্রছায়ায় ঢাকা। কিন্তু অরণ্য যেন এখানে সুসজ্জিতা! যেন মজঃফরপুরের কোন জমিদার আম বাগান তৈরী করেছেন। পাহাড়ের কোলে ছোট ছোট ঘর, সাধু সন্ন্যাসীদের থাকবার জায়গা। ঘর ছেড়েও আবার ছোট ঘরের মায়ায় পড়লেন কেন সন্ন্যাসীরা ? ভাবলুম, পথের ধারেও সন্ন্যাসীরা বসে। কিন্তু পরনেই শুধু মাত্র তাদের গৈরিক বসন, মনে গৈরিক উদাসীনতার দোলা লাগে নি। তীর্থযাত্রী দেখলেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পয়সা চাইছে। যার জন্যে গৃহত্যাগী, সেই মহান ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভরশীল হয়ে এরা অনুদ্বিগ্ন হতে পারে নি। সেই অরণ্যপথ, ভিক্ষুক, সাধু, সব অতিক্রম করে আমরা হাঁটতে লাগলুম। মেসোমশাই দার্শনিকের দৃষ্টিতে ভাব ভোলা, রাঙামাসীরা দেখছেন সবকিছু পুণ্যকামী তীর্থযাত্রীর দৃষ্টিতে, মিনু আর অঞ্জনা যৌবনের রোমান্টিক স্বপ্ন নিয়ে। শুধু বীরেনদা এখানে অন্য দৃষ্টি মেলে ধরেছিলেন।

তিনি মেসোমশাইকে বললেন : এখানে আমের বাগান ভাল হয়। ভাল চাষ করলে অনেক আম চালান দেওয়া যায়। বছরে তাতে মন্দ আয় হবে না।

মেসোমশায় 'হু' বলে অত্যন্ত সংক্ষেপে তাঁর উত্তর সারলেন—সৌন্দর্যতত্ত্ব, নীতি-শাস্ত্র এবং দর্শন, এর কোনটোতেই এ প্রশ্নের উত্তর মেসোমশাইয়ের জন্য লেখা নেই।

বীরেনদার এ প্রশ্ন শুনে শুধু আমি মিনু আর অঞ্জনা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে হাসলুম।

আমি মিনুকে বললুম : মিনু, আমের কথা তোমার মনে পড়ছে নাকি ?

মিনু বলল : তুমি শুনেছি কবিতা লেখ। তোমার মনে পড়ছে নাকি ?

অঞ্জনা বলল : কবিতা লিখলে আমের কথা মনে পড়ে বুঝি ?

মিনু বলল : কেন, পড়ে না ? রবীন্দ্রনাথ লেখেন নি :

সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম
অতি ভোরে উঠে তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।

অঞ্জনা বলল : ওটা রবিঠাকুরের পক্ষেই সম্ভব। আর কারো নয়। কিন্তু আমি জানি সন্তুদার মনে এই মুহূর্তে কি মনে পড়ছে ?

আমি তাকালুম অঞ্জনার মুখের দিকে।

অঞ্জনা বলল : সত্যি করে বল তো, অভিজ্ঞান শকুন্তলমের সেই কণ্ব মুনির আশ্রমের কথা তোমার মনে পড়ছে কিনা ?

আশ্চর্য হয়ে গেলাম অঞ্জনার মধ্যে সৌন্দর্যানুধাবনের একটা সহজাত শক্তি দেখে। সেই অরণ্যছায়াতে সে সমর সেনের কবিতা আবৃত্তি করেছে। এখন বলল শকুন্তলার কথা। ব্যাপারটা কৃত্রিম নয়। একটা সংবেদনশীল হৃদয় না হলে এটা সম্ভব নয়। অঞ্জনার গভীর অন্তরালে বিরাট সৃজনশীল একটা মন অনবরত কাজ করে। হয় তো সে সম্পর্কে সে নিজেই সচেতন নয়।

অঞ্জনা বলল : কি দেখছ ?

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললুম : কিছু না।

অরণ্যপথ ছাড়িয়ে আমরা আশ্রমে উঠলুম। পাহাড়ের কোণে একটা সুন্দর আশ্রম। আশ্রমের প্লেট নাম পড়ে চমকে উঠলুম : বাবা কালীকমলিওয়ালার আশ্রম। এই আশ্রমের নামই না বীরেনদা যাত্রার প্রাক্কাল থেকে বলতে আরম্ভ করেছেন।

ডাকলুম : বীরেনদা বীরেনদা, এই আপনার বাবা কালীকমলিওয়ালার আশ্রম। বহুদিন থেকে বীরেনদা এই আশ্রমের কথা কল্পনা করে আসছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল হরিদ্বারেই এ আশ্রম। যা হোক, শেষে লছমন ঝুলাতে এসে তার সাক্ষাৎ মিলল। একটা মমতা মাখানো দৃষ্টিতে বীরেনদা আশ্রমের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। যেন এ আশ্রম তাঁর নিজের।

আমিও লক্ষ্য করে দেখলুম আশ্রমটি। অতিথিদের থাকবার জন্যে ধর্মশালা আছে এখানেও। বাইরে বাঙ্গালী মধ্যবয়সী মেয়ের শাড়ি শুকোচ্ছে। চওড়া লাল পেড়ে শাড়ী। ফাঁকা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা। হরিদ্বারের চেয়ে থাকার পক্ষে এটা আরো ভাল জায়গা। কিন্তু ঘুরে বেড়াতে হলে হরিদ্বারকেই কেন্দ্র করতে হয়। তাই যাত্রীদের ভীড় হরিদ্বারেই বেশী।

আশ্রমের প্রাঙ্গণটা ঘুরে ঘুরে দেখলুম। পাহাড়ী আঙ্গিনায় এ আশ্রমটা বড় সুন্দর।

অঞ্জনাও সে কথা বলল : বেশ ভাল, না ?

আমি বললুম : জানি না তোমাদের কাছে কেমন লাগছে, কিন্তু আমার লাগছে অপূর্ব ! পাহাড়ের একটা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করি আমি। তাই পাহাড়ে আমার ক্লান্তি আসে না কখনো। সমুদ্রের স্বপ্ন দেখেছি অনেকদিন। মন যখন ক্লান্ত, তখন ভেবেছি, দিগন্তব্যাপী সমুদ্রের সামনে বেলাভূমিতে শুয়ে থাকলে বুঝি এ ক্লান্তি যাবে। কিন্তু পুরীর সমুদ্র যখন দেখলুম, দুদিন দেখবার পর আবার ক্লান্তি এল। সেই দূর থেকে ভেসে আসা সমুদ্রের গর্জন, বেলাভূমি, কিছুই আমার মনকে তত বেশী টানতে পারল না। কিন্তু দার্জিলিংয়ে দাঁড়িয়ে প্রহরের পর প্রহর হিমালয়ের শিখর-দেশে তাকিয়ে মন ভরে নি আমার। কেন যে এমন হয় তার ব্যাখ্যা দিতে পারব না আমি। ছোটবেলা পাহাড়ের কোলে মানুষ হয়েছি, তাই পাহাড় বোধ হয় একটা শাশ্বত ছায়া ফেলেছে আমার মনের ওপর।

(প্রসঙ্গত বলে রাখি—পাহাড়ের প্রতি এই অনুরাগ আমার চেতনার প্রবাহে বয়ে আসা জন্ম-জন্মান্তরের অভিজ্ঞতাজাত। কুলকুণ্ডলিনী জাগরণে আমি যে আমার সাতটি পূর্বজন্ম দেখেছি, তাতে চারবার ছিলুম এই হিমালয়ের আঙ্গিনায়। তুষারমৌলি গিরিগুহায়, আশ্রমে, বৃহতি বৃক্ষনিম্নে, কোথায় কোথায় ছিলুম, সবই দিব্যনয়নে ধ্যানকালে দেখতে পেয়েছি আমি। হিমালয়ের প্রতি অনুরাগ তাই চেতনার প্রবাহে পূর্ব জন্ম থেকেই বয়ে এসেছে—য়ুঙের সেই collective unconscious-এর মত। সেই জন্য পাহাড় বোধহয় আমার এত ভাল লাগে। অথচ এ জন্মের ঠিক পূর্বজন্মে আমি ছিলুম বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ। বর্ণ ছিল গৌর। কিন্তু সেসব কথা থাক। ২৫ বছর আগের সেই রোমান্টিক অভিজ্ঞতাতেই ফিরে যাওয়া যাক।)

অঞ্জনা বলল : কি জানি নিজের মনকে অত করে ব্যাখ্যা করতে জানিনে। তবে ভাল লাগছে, খুব ভাল লাগছে।

মিনুর দিকে ফিরে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল : তোর কেমন লাগছে ?

মিনু বলল : তোর মত অত ভাষা নেই আমার, বুঝিয়ে বলতে পারব না।

অঞ্জনা বলল : কাব্য করে বল না। সমস্ত দেখে শুনে নির্বাক হয়ে গেছিস। শুধু মনে মনে বলছিস, 'এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে।'

যেন একটু বিরক্ত হল মিনু, এমন ভাব করে বলল : সে কাব্য তোরা কর। আমায় নিয়ে টানাটানি কেন। একটা কবিসত্তা তো আবিষ্কার করেছিস।

মিনু যেন কেমন অনেকটা নীরব হয়ে গেছে। এই জন্যে মিনু সম্পর্কে আমার মনে একটা ভয় ঢুকে গেছে। ওকি অঞ্জনাকে ঠিক প্রীতির চক্ষে দেখতে পারছে না ? আমার ভুল বুঝছে ? কিন্তু অঞ্জনার যৌবনোদ্ধত তরঙ্গকে তো অস্বীকার করা যায় না। মিনু সেই যৌবন-তরঙ্গের কাছে অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

রাঙামাসীমা নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঘুরে ঘুরে এ মূর্তি সে মূর্তি দেখে প্রণাম করে পুণ্যার্জনের প্রসাদ সঞ্চয় করছেন মনে মনে। সুনীলবাবুও দেখছেন। আমাকে কাছে পেলে তিনি টেনে নিচ্ছেন। অধ্যাত্ম ভারতের পীঠস্থানে এসে

ভারত-দর্শনের অনেক কথাই হয় তো আলোচনা করতেন, কিন্তু অঞ্জনা আর মিনুর জন্যে সেটা পারছেন না। অঞ্জনা তো সব সময় আমার পাশে পাশেই রয়েছে। এমন অনাবৃত সরল মন তার যে, আমি কিছু মনে করতে পারিনে।

একটা ঘরে ঢুকে আবার দেখি ফোনের কারবার। গদির উপর মারোয়াড়ীরা বসে। দর্শনার্থীরা এসে প্রমাণী রাখছে, প্রণাম করছে। দেওয়ালে টাঙ্গানো বাবা কালী কম্‌লীওয়ালার বিরাট ফটো। চোখ দুটো বিরাট বড়, উজ্জ্বল। একটু ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপা ভাব। জ্যান্ত ও রকম মানুষ সামনে দাঁড়ালে ভয় করতো। বীরেনদা বললেন: খুব বড় সাধু ছিলেন।

আমি ভাবতে লাগলুম, ভারতের সাধক গ্রন্থে এর কাহিনী পড়েছি কি?

আমার মনের ভাব বুঝি সুনীলবাবু বুঝলেন, বললেন: ঐশী ক্ষমতা তাঁর কতদূর ছিল জানিনে, তবে বিরাট organiser ছিলেন তিনি। বহু জায়গায় এঁর আশ্রম আছে, ধরমশালাও আছে।

কম্‌লীওয়ালার গুরুত্ব কিছুটা অনুধাবন করতে পারলুম আমি। কিন্তু টাইটেলটা যেন কেমন, পরমহংস নয়, সরস্বতী নয়, কালীকম্‌লীওয়ালা। সে কথাটা সুনীলবাবুকে জিজ্ঞেস করতে উত্তর পেয়ে গেলুম।

সুনীলবাবু বললেন: বড় একটা কালো কম্বল সর্বদা গায় দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন বাবাজী, সেই থেকে কালীকম্‌লীয়ালা নাম হয়েছে।

এই বিদ্‌ঘুটে উপাধীটার অর্থ এতক্ষণে আমার কাছে পরিষ্কার হল।

কম্‌লীওয়ালার আশ্রম দেখে আবার আমরা পথে বেরুলাম। ওপাশে গীতাভবন দেখবার মত জিনিষ। সেখানে গেলুম। গোরক্ষপুরের গীতা প্রেসের ধনী মাড়োয়াড়ীরা এই গীতাভবন তৈরী করছেন। মনোরম অট্টালিকা গঙ্গার ধারে। সাধু সন্ন্যাসীরা এখানে আসেন, থাকেন। বহু ধর্মার্থীর চরণরেণুতে ধন্য গীতাভবন। কিন্তু এই প্রকৃতির কোলে মানুষের সৃষ্টিকে ভাল লাগে না আমার। গীতার সারমর্ম বোধহয় এখানকার আবহাওয়ার মধ্যে রয়েছে, আমার তাই ভাল লাগে। (আজ বুঝি গীতা সম্পূর্ণ যোগগ্রন্থ। যোগযুক্ত হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হতে না পারলে গীতার সারমর্ম পার্থিব পাণ্ডিত্য দিয়ে কিছুই বোঝা যাবে না। গীতার সেই অধ্যাত্ম তাৎপর্যের কথা পরে আমি আমার 'গীতা চণ্ডী ও ভারতের দেবদেবী' গ্রন্থে বোঝাবার চেষ্টা করেছি)।

মিনুরা সব ঘুরে ঘুরে ভেতর দেখতে লাগল। কিন্তু আমি এসে বসলুম বাইরের বারান্দায়। প্রবহমান গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম।

সমস্ত দেখে শুনে বাইরে এল মিনুরা। আমাকে বাইরে একা চুপ করে বসে থাকতে দেখে অঞ্জনা বলল: একি সন্তুদা, বাইরে একা বসে? ঘুরে দেখলে না। ভারি সুন্দর গীতাভবন।

বললুম: কি জানি, ভগবানের সৃষ্টি যেখানে জীবন্ত, মানুষের সৃষ্টিকে তার পাশে

ভাল লাগে না আমার। এই গঙ্গার জলের রেখাতে, পাহাড়ে, প্রান্তরে, অরণ্যে, গীতার যে মর্মবাণী আমি অনুভব করি, মানুষের কাজের মধ্যে তা নেই। তাই বাইরে ভাল লাগছে আমার।

অঞ্জনা বলল : কি জানি, কেমন তোমার মন। ও মনটা আমার হলে একবার নতুন করে তাকিয়ে দেখতুম বিশ্বটাকে।

অঞ্জনাকে বললুম : শত্রুরও আমার মত মন না হোক। তোমার ঐ নিটোল নির্মেঘ মনের পরিবর্তে তুমি কখনো অন্য মন প্রার্থনা কোরো না কোনদিন। তুমি জান না, কি অপূর্ব এক মনের অধিকারী তুমি।

অঞ্জনা বলল : তবু যদি একটা স্রষ্টামন হোত আমার।

বললুম : স্রষ্টা মনের অসীম দুঃখ অঞ্জনা। 'ভাষা ও ছন্দে' রবীন্দ্রনাথকে বলতে শোন নি : অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাঁহারে দেন তাঁর বক্ষে বেদনা অপার। তাঁর নিত্য জাগরণ।'

অঞ্জনা সে কথার কোন উত্তর দিল না। মিনুকে দেখলুম, ওখানে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনছে। আমি জানি, সে আর বেশী কথা এখন বলবে না। কিন্তু আমার মনের অবস্থাটা সেকি বুঝতে পারছে?

গীতাভবন দেখা শেষ করে, আবার এলুম বাবা কালীকমলীওয়ালার আশ্রমে। সেখানে ঘাট থেকে পারাপারের খেয়া, নৌকা আর লঞ্চ দুটোই আছে। এলুম ঘাটে। পাশে মর্ডান রেস্তোরা, একটু উপরে। এর প্রয়োজনীয়তা যে কেন হল বুঝিনে। মানুষের শিল্পরুচি নেই নাকি? এখানে জীর্ণ ভাঙ্গা ঘরে ভাত রুটি মানায়, রেস্তোরা মানায় না। কোন মাড়োয়ারী নন্দন হয় তো করে থাকবে এটা।

লঞ্চে পার হওয়া গেল না ভীড়ের চোটে। নৌকো ধরলুম। একপাল বাঙ্গালী ছেলে মেয়ে উঠল সেখানে। কিন্তু কলকাতার রকবাজী মনোভাবকে পরিত্যাগ করে আসতে পারে নি। অশ্রাব্য এবং অশ্লীল কথাবার্তা। মিনু প্রায় মাথা গরম করে ফেলল শুনে : এগুলো বেড়াতে আসে কেন যে!

আমি মুখে হাত চাপা দিয়ে ওকে চুপ করালুম। এইসব অসভ্য ছেলেপেলেদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করা মানে নিজের সম্মান হারানো। এসব হয়েছে রাষ্ট্রের দোষে। র‍্যাবলুসের দেশে গণতন্ত্র লাইসেন্স হয়েছে। শাসনযন্ত্র যেখানে শিথিল আর দুর্নীতিতে ভরা, সেখানে মানুষ সৃষ্টি হয় না, হয় এইসব হুলিগান। বীরেনদা গ্রামে থাকেন, এত বেয়াদব ছেলেপেলেদের সম্মুখীন হন না, তিনিও গজগজ করতে লাগলেন। কলকাতায়, বিশেষ করে কলকাতার নোংরা অঞ্চল শহরতলীতে হামেশা দেখছি আমরা এ জিনিষ। চোখ মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে। কাকে বলব। রাজনীতির ধাপ্পায় দেশটা এমন উচ্ছন্নে গিয়েছে যে বলবার আর কিছু নেই। তবে এই যদি বাংলার ভাবিকালের চেহারা হয়, তবে তার ভ্রমণবিদ্যা, শিল্পসাধনা অর্থহীন। গোখেলের কথাটাকে যেন ভারতবাসী আর অনুসরণ না করে, 'what Bengal thinks today,

India thinks tomorrow' আজকের বাংলার ভাবনা যদি কাল ভারতবর্ষ ভাবে, তবে পরশু সে গোল্লায় যাবে।

সমস্ত মেজাজ মর্জিটাকে যেন বিশ্রী করে দিল এইসব হতচ্ছাড়া ছেলেগুলো। বাংলার কুলাঙ্গার, বাংলার অপমান এগুলো! এতো অসভ্য আর দেখেছি মাড়োয়াড়ীগুলোকে। ওরা যেখানে চলে, সেখানে যাওয়া যায় না। ওরা কোন গাড়ীর কামড়ায় উঠলে, সে কামড়া ত্যাগ করতে হয়। সৌজন্য আর ভদ্রতাবোধে বাঙ্গালী কি ওদের পর্য্যায়ে নামল নাকি!

পার হয়ে এপারে এলুম। নীল গঙ্গার জলস্রোতটা আর ভাল করে লক্ষ্য করতে পারলুম না। ডাঙায় নেমে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। কার-পার্কে গাছের ছায়ার নিচে আমাদের গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। সেখানে এসে রাস্তার ধারে বাঁধানো রেলিংয়ের ওপর বসলুম। এখান থেকে ওপারের দৃশ্য, গীতাভবনকে ছবির মত দেখা যায়।

সকলেই এপারের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ওপারের দিকে তাকাল।

অঞ্জনা স্বভাব অনুযায়ী বলে উঠল: চমৎকার! অপূর্ব! কিন্তু কি ভুল যে হয়ে গেল, আসবার সময় ক্যামেরাটা আনতে ভুলে গেলুম। এমন ভুল আর কখনো হয় নি আমার।

আমি বললুম: যান্ত্রিক ক্যামেরা তুচ্ছ। মনের ক্যামেরায় ফটো তুলে নিয়ে যাও। ও ছবি মুছবে না কোনদিন।

ও বলল: তোমার মত তো আর কবি নই। মনের লেন্স অত স্পষ্টও নয়। সব কিছুর অত পরিষ্কার ছায়া পড়ে না ওখানে। তাই বাইরের ক্যামেরার কথা সহজেই মনে পড়ে আমাদের।

বললুম: তা হলেও ক্যামেরার জন্য দুঃখ নেই। ব্যবসায়ী ফটোগ্রাফারেরা অনেক মুহূর্তে এসব দৃশ্যকে ধরে রেখেছে। হরিদ্বারের ঘাটে বিক্রী হয়। কাল সকালে কিনে নিও।

মিনু যেন আমার কথায় বিরক্ত হল। পিছনে তাকিয়ে সে বলল: যত সব উদ্ভট suggestion.

আমি বললুম: ভ্রমণ কাহিনীতে এটা trade secret তুমি জান না।

মিনু বলল: আমরা তো আর ভ্রমণ-কাহিনী লিখতে যাচ্ছি না। জানি না, তোমার মনে সেরকম কোন দুরভিসন্ধি আছে কিনা?

বললুম: থাকলেও সেরকম ক্ষমতা আমার কোথায়? কিন্তু ব্যাপার কি জান? ঐ যে ওদের ফটো তুলতে দেখছ পাশে কয়েকটি ছেলেমেয়ে ফটো তুলছিল ওরা কেউই ভ্রমণ কাহিনী লিখবে না। ওটা একটা ফ্যাসন। আর বেড়াতে যে এসেছিল, তার প্রমাণ নিয়ে যাচ্ছে। আমরাও বেড়াতে এসেছিলুম, তার একটা নিদর্শন চাই তো। বিশেষ করে তোমাদের তো প্রয়োজন হবেই। সুতরাং...

মিনু বলল: থাক, সে নিয়ে আর তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

বললুম ঃ তা হলে থাক।

ইতিমধ্যে সমস্ত দেখাশোনা হয়ে গেছে আর সকলের। বীরেনদা এসে বললেন ঃ এবার চলো।

—চলুন।

আর একবার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে চতুর্দিকের দৃশ্যটা দেখে নিলুম। তারপর গাড়ীতে উঠলুম।

গাড়ীতে উঠে দেখলুম, আমি ড্রাইভারের পাশে। তারপর সুনীলবাবু। বীরেনদা সেই দরজার কাছে।

মিনু বলল ঃ একি সন্তুদা, তুমি যে আবার ওখানে বসলে ?

ততক্ষণ গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। বললুম ঃ কি আর করি বল, সবই ভাগ্য।

অঞ্জনা শুধু হাসছিল। গাড়ী আবার ফিরে চলল। এবারও পুলিশ চেক্‌পোস্টের কাছে বীরেনদাকে নামতে হল। ভদ্রলোকের গ্রহ-বৈগুণ্য। মাইল খানেক হেঁটে এসে আবার গাড়ী ধরলেন তিনি। এবার হৃষিকেশ। গঙ্গার ধারে হৃষিকেশেরও সৌন্দর্যের তুলনা নেই। আমরা সকলে ঘাটে বসে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলুম অনেকক্ষণ। অঞ্জনা বলল ঃ জানি না এ স্বপ্নের দেশে আবার কোনদিন আসা হবে কিনা।

বললুম ঃ আবার কোনদিন এলেও আজকের এইসব হয় তো সেদিন থাকবে না। দুটো করুণ চোখ তুলে যেন অঞ্জনা আমার দিকে তাকাল।

হৃষিকেশ থেকে হরিদ্বার ফিরে আসতে বেলা পাঁচটা বাজল। নামলুম স্টেশনের কাছে। সেখান থেকে হেঁটে ফিরতে হবে ধরমশালায়।

অঞ্জনাকে দেখলুম রোমান্টিক দৃষ্টি হলেও বাস্তব জ্ঞানবর্জিতা সে নয়। স্টেশন রোডে খাবারের দোকানের পাশে এসে থামলো। গরম পুরি, তরকারি, আর রাবড়ি কিনল। তা লক্ষ্য করে বীরেনদার মুখে হাসি ফুটে উঠল। পূর্বাহ্নে এ চিন্তাটা মাথায় এসেছিল বলে, নইলে ধরমশালা থেকে নিচে নেমে খাবারের খোঁজ করতে হত। সেই বেলা নটায় খেয়ে আর যার পক্ষেই সম্ভব হোক, বীরেনদার পক্ষে বেলা পাঁচটায় জলখাবার না খেয়ে থাকা সম্ভব নয়।

ধরমশালায় ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে জল খাবার খেয়ে সকলে একটু জিড়িয়ে নিলুম। সমস্তটা দিন রোদের তাপে অনেকেই ঝলসে গিয়েছিলুম। কিন্তু গঙ্গার জলভেজা বাতাস আবার বইতে শুরু করেছে বিকেল বেলা। বেশ শীত শীতই বোধ হচ্ছে এখন।

অঞ্জনারা দেখি ইতিমধ্যে আবার সেজেগুজে রেডি। মেসোমশাই ঠিকই বলেছেন, বেড়াবার নামে মেয়েদের ক্লান্তি নেই। রাঙামাসী, অঞ্জনার মা, সকলেই প্রস্তুত। অঞ্জনা এসে কড়া তাগিদ লাগালো ঃ কৈ, প্রস্তুত হয়ে নাও। ঘাটে যাবে না ?

সুনীলবাবু বললেন ঃ আবার ?

অঞ্জনা বলল ঃ সেকি ! তুমি যে কাল সন্ধ্যেবেলা ঘাটে প্রদীপ ভাসানো দেখ নি। এত কাছে থেকে এ জিনিষটা দেখে যাবে না ?

একটা ক্লান্ত কণ্ঠে সুনীলবাবু বললেন : চলো। তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন।

আমি তখনো ক্লান্তি অপনোদন করছিলুম। অঞ্জনা ডাকল : কে, সন্তুদা, চল।

বললুম : আমি তো কাল দেখেছি।

অঞ্জনা জোর তাগাদা লাগাল : বাব্বা, তুমি বুড়ো হয়ে গেলে নাকি ? ওঠ, ওঠ।

বীরেনদাকে বলতে হল না। তিনি প্রস্তুতই, শুধু গায়ে তুষটা জড়ানো। অগত্যা উঠলুম। জামা কাপড় পরে অঞ্জনার দেওয়া চাদরটা গায়ে জড়ালুম। সকলে মিলে চললুম ঘাটের দিকে।

আবার সেই ব্রহ্মকুণ্ডের ধারে এসে দাঁড়ালুম। তখন সূর্য ডুবে গেছে। আজ আর অঞ্জনারা আমার সঙ্গে থাকল না। রাঙামাসীদের নিয়ে বাঁধানো ঘাটের ধারে বসল। প্রদীপ ভাসানো দেখতে লাগল। কিন্তু বসে থাকতে আমার তত ভাল লাগল না। উঠে দাঁড়ালুম। ব্রহ্মকুণ্ডের চেয়ে ওধারটা আমার আরো ভাল লাগে। আমি ক্লক-টাওয়ারের দিকে এগিয়ে গেলুম। দেখি, বীরেনদাও আমার পাশে পাশে আসছেন।

ক্লক-টাওয়ারের পাশে একজন নবীন সন্ন্যাসী বসে। গায়ে কম্বল জড়ানো। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলুম, একজন দেহাতি লোক তাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

মুখে যতই লজিক নিয়ে তর্ক করি না কেন, সন্ন্যাসী দর্শনের জন্য আমাদের গোপন মনে সকলেরই একটা দুর্বলতা আছে। দৈবশক্তির অধিকারী এইসব লোকেরা মানুষের ভূত ভবিষ্যত সব বলে দিতে পারেন। অনেক সময় will force প্রয়োগ করে ভাগ্যকেও চাঙ্গা করে তুলতে পারেন। অবচেতন মনের সেই বিরাট কৌতহুল আমাকেও ঠেলে দিল। বীরেনদাকে বললুম : চলুন, ওখানে বসি।

দৈবশক্তির সাহায্যে সহজে ভাগ্য ফিরুক, এটা বীরেনদাও চান। কে জানে কার মধ্যে কি আছে, হয়েও যেতে পারে একটা কিছু!

সন্ন্যাসীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম! সদা হাস্যময় মুখ। অল্প বয়স, আমাদের দেখে হেসে অভ্যর্থনা জানালেন : বৈঠিয়ে।

বসলুম। কিন্তু চুপ করে তো বসে থাকা যায় না। আলাপ আলোচনা চাই। ভাল হিন্দী জানি না। তাই ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে তাঁকে হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানের তীর্থ-মাহাত্ম্য নিয়ে প্রশ্ন করলুম। আলোচনাতে সন্তুষ্ট হয়ে যদি সন্ন্যাসী প্রবর ভূত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলেন।

বললুম : এত লোক যে তীর্থে এসেছে, সকলেরই কি পুণ্যি হবে ?

—হোগা নেই কাঁহে, জরুর হোগা!

—কিন্তু আমার মনে হয় এরা অনেকে তীর্থস্থানকে কলঙ্কিত করছেন।

একটু হাসলেন সন্ন্যাসী। ইংরাজীতে বললেন : সবই ভগবানের মর্জি। তবে জানেন, স্থান মাহাত্ম্যে মন পাল্টায়।

দেখলুম, সন্ন্যাসী ইংরেজী জানেন।

কিন্তু আলোচনার মধ্যে একবারও আমার ভূত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হিন্টস্ দিচ্ছেন না। অবশেষে না পেরে জিজ্ঞেস করে বসলুম : আমার কিছু হবে না?

—কাঁহে নেহি হোগা?

—বড় হতে পারব?

—জরুর।

মনটা একটু ভাল লাগল। বললুম : ধর্ম কর্ম আমার কিছু হবে?

সদাহাস্যময় মুখ সন্ন্যাসীর। কিন্তু হঠাৎ একটি রূঢ় সত্য বললেন আমাকে। সে কথা শুনে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল যেন। স্বচ্ছ আয়নার মত তাঁর মনের দর্পণে আমাকে দেখতে পাচ্ছেন তিনি। বুঝলুম, সন্ন্যাসীর মধ্যে কিছু আছে, জানেনও। কিন্তু জাহির করেন না।

প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললুম : আপনি কি এখানেই থাকেন?

না, থাকি বদ্রিনাথ, কেদারনাথে। এখন শীত, তাই নিচে নেমে এসেছি। শীতের সময় ওখানে থাকা যায় না।

বললুম : বদ্রিনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী সব দেখবার বড় ইচ্ছে, কিন্তু এখন হল না। আবার আসব।

—জরুর আযেগা।

সন্ন্যাসী কয়েকদানা প্রসাদ বের করে আমার আর বীরেনদার হাতে দিলেন। আমার ভাল লাগল। কিছু দৈবশক্তি এঁর আছে এটা আমার বিশ্বাস হল। ভক্তিভরে প্রসাদ মুখে দিলুম। মনে হল, কিছু দিই এ সন্ন্যাসীকে। পকেট থেকে একটা টাকা বের করে দিলুম।

সন্ন্যাসী বললেন : টাকা নিয়ে কি হবে? বাবুজী, আমি জমিদারের ছেলে। সব ছেড়ে দিয়ে বাইরে এসেছি।

বললুম : মহারাজ, টাকাটা আপনাকে দিচ্ছি না। আমার নাম করে পুজো দেবেন।

সন্তুষ্ট হলেন যেন সন্ন্যাসী। বললেন : দিন তবে।

একা আমি পুণ্য সঞ্চয় করে ফেলছি, বীরেনদার সেটা সহ্য হল না। তাড়াতাড়ি নিজের পকেট থেকে একটি টাকা বের করে দিলেন।

আপত্তি করলেন না সন্ন্যাসী।

ওধারে সন্ন্যাসীর পাশে এক মধ্যবয়সী দম্পতি আমাদের লক্ষ্য করছিলেন। তাঁরা বাঙালী। কিন্তু অভিজাত। কথাবার্তার ভগ্নাংশ যেটুকু কানে এল তাতে তাই মনে হল। স্বামী স্ত্রী দুজনেই চোস্ত ইংরেজী বলছেন। কিন্তু গলায় টাই আর মুখে মুখে ইংরেজী, যা-ই থাকুক না কেন, মনে আমাদেরই মত দুর্বলতা। সাগ্রহে লক্ষ্য করছিলেন আমাদের। সুযোগ খুঁজছিলেন ফাঁকা পেলে সন্ন্যাসীকে পাকড়াও করবেন।

আমরা উঠতেই ওঁরা এসে সন্ন্যাসীর গা ঘেঁষে বসলেন। প্রণাম করলেন। মনের মধ্যে তাদের কি বেদনা, কি আকাঙ্ক্ষা কে জানে।

বীরেনদা ফাঁকে এসে বললেন : সন্ন্যাসীকে ভাল বলেই মনে হল আমার।

বললুম : কিছু জানেন। কিন্তু নিরহঙ্কার, শিক্ষিতও। চলুন, রাঙামাসীদের নিয়ে আসি। ওঁরাও দেখবেন।

—চল।

প্রায় ঘণ্টা খানেকের উপর কাটিয়ে দিয়েছি সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলোচনায়। ওধারে গঙ্গা আরতি তখন হয়ে গেছে।

ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে যেতে অঞ্জনা বলল : এতক্ষণ কোথায় ছিলে সন্তুদা ?

বললুম : তোমাদের চেয়ে বড় জিনিষ পেয়েছি ওধারে। রাঙামাসীকে বললুম : রাঙামাসী সন্ন্যাসী দেখবে ? চল।

রাঙামাসীর আগ্রহ যেন সঙ্গে সঙ্গে উথলে উঠল : কৈ, কোথায় ? চল্।

মিনু আমাকে বলল : তুমিও সন্ন্যাসীতে বিশ্বাস কর নাকি ?

বললুম : সন্ন্যাসীর মত সন্ন্যাসী দেখলে কার বৈকি।

—কিন্তু কাশী থেকে হরিদ্বার, সারা পথ তো সমালোচনাই করে এলে ?

বললুম : সমালোচনা করি ভণ্ডামীর। সেটা আজো করি।

অঞ্জনা বলল : তাহলে একে সন্ন্যাসী বলতেই হবে। চলুন রাঙামাসী, দেখে আসি।

ওদের সবাইকে এনে সেই তরুণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলুম। সত্যি, সকলেই মুগ্ধ হলেন। সন্ন্যাসী তখনো সেই বয়স্ক দম্পতির সঙ্গে কথা বলছিলেন। সুতরাং বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়ালুম না। সকলকেই শুষ্ক কয়েকদানা প্রসাদ দিলেন সন্ন্যাসীটি।

একটি জিনিস লক্ষ্য করলুম : সঙ্গে সঙ্গে সকলেই সেটা গলাধঃকরণ করলেন। ঘরের জন্য, বাড়ির জন্যে নিয়ে যাবার কথা কারো মনে থাকল না। এমন কি রাঙামাসী আর অঞ্জনার মার মত মাযের প্রাণও সে গৃহিনীপনার কথা ভুলে গেল।

সে কথা রাঙামাসীকে মনে করিয়ে দিতে জিব্ কাটলেন তিনি : তাইতো, চল্ আর একটু নিয়ে আসি।

নির্লজ্জভাবে আর একটু প্রসাদ চেয়ে এনে রাঙামাসীর হাতে দিলুম। শীত বেশ কামড়াতে আরম্ভ করেছে। ঘাট ছেড়ে রওনা হলুম। সুনীলবাবু বললেন : প্রদীপ ভাসানোটা সত্যি দেখবার মত, না সন্তু ?

তাঁর কথায় সায় দিলুম। তিনি গঙ্গা আরতিরও ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

কথা বলতে বলতে ফিরে এলুম ধরমশালায়। সিঁড়িতে পা দিয়ে রাঙামাসীকে জিজ্ঞেস করলুম : প্রসাদটা আছে তো ?

—ঐ যাঃ ! লজ্জায় আবার জিভ্ কাটলেন রাঙামাসী।

—কেন, কি হল ?

সে কথা বলবার মত নয়, নিতান্তই লজ্জার। রাঙামাসী চলতে চলতে কোন্ ফাঁকে সমস্তটা প্রসাদই মুখে পুরে দিয়েছেন।

বললুম যাক, দুঃখ কোরো না। ও প্রসাদ ঘরে যাবার জন্য নয়। সন্ন্যাসী ঠাকুরের তেমন ইচ্ছে নেই।

সুনীলবাবু বললেন : সত্যি, কিছু দৈবক্ষমতা আছে বুঝি সন্ন্যাসীটির।

মিনু আর অঞ্জনা সে সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করল না।

ধরমশালায় ফিরে আমরা আর বিশ্রাম করলুম না। রাঙামাসীদের ঘরে রেখে টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে হোটেলের দিকে বেরলুম। সেই বিশিষ্ট হোটেল। সেই দেরাদুন রাইস আর শাক্তি। বীরেনদা অবশ্য রুটি খেলেন। খাওয়া শেষে মাসীমাদের জন্য খাবার নিয়ে ফিরে এলুম।

খাওয়া দাওয়া শেষে বীরেনদা প্রশ্ন তুললেন : কালই তাহলে রওনা হওয়া যাক ?

মিনু আর অঞ্জনা আমাদের ঘরেই ছিল তখনো। আমি ওদের দিকে তাকালুম : তোমাদের কি মত ?

—কিসের ?

—হরিদ্বার তো দেখা হল, কাল তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক ?

অঞ্জনা বলল : হ্যাঁ, যেতে হবে বৈকি, হাতে তো সময় নেই।

বীরেনদা বললেন : এখান থেকে তাহলে কোথায় যাব ?

আমি সুনীলবাবুর দিকে তাকালুম : আপনারা মথুরা বৃন্দাবন যাবেন তো ?

সুনীলবাবু বললেন : হ্যাঁ, চল। একসঙ্গে যখন হয়ে গেছি, এক সঙ্গেই ঘুরি।

বললুম : তাহলে কালই রওনা হওয়া যাক। দিল্লীর টিকিট কাটি। কি বীরেনদা ?

বীরেনদার ইচ্ছা মথুরা বৃন্দাবন। তিনি স্পষ্ট করে কিছু বললেন না। কিন্তু দিল্লী আগ্রা দেখবার জন্যেই আমি বেরিয়েছি। বললুম : মথুরা বৃন্দাবন তো দিল্লী হয়েই যেতে হবে, সুতরাং দিল্লীতেই নামব প্রথম।

বীরেনদা বললেন : কিন্তু দিল্লীতে থাকবার অনেক খরচা। আর তাছাড়া সময় হাতে নেই জেনো। দশ দিনের বেশী আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।

টাকা পয়সা আমি নিয়ে আসি নি, এসেছেন বীরেনদা। ট্যাঁকের জোর তাঁর কতখানি তিনিই জানেন। কিন্তু দিল্লী তো দেখতেই হবে। বর্তমান দিল্লীর প্রতি আমার লোভ নেই। সেই প্রাচীন দিল্লীর মাঠে প্রান্তরে আমার স্বপ্ন ছড়িয়ে আছে।

বললুম : সেটা ঠিক করা যাবে'খন। এখন দিল্লী যাবেন কি করে সেটা ভাবুন। হরিদ্বার থেকে ট্রেন এবং বাস দুটোতেই দিল্লী যাওয়া যায়।

বীরেনদা ট্রেনের ভীড়কে ভয় করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। বললেন : বাসে গেলে কেমন হয় ?

বললুম : বাস দিনে ছাড়ে, সকালে। সন্ধ্যেয় পৌঁছয়। অপরিচিত জায়গায়

রাত্রিতে গিয়ে সুবিধে হবে না। বরং সন্ধ্যাবেলা এখান থেকে দিল্লীর ট্রেন আছে। ভোর বেলা পেঁছিবে। ভাল হবে। দিল্লীতে হোটেলে থাকা বিরাট খরচার ধাক্কা। তেমন প্রস্তুত হয়ে বেরুই নি। অথচ দেখতে হবে। আমি বলি, রাত্রির ট্রেনে ভোরে পেঁছানো ভাল। সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি করে সারাদিন দিল্লী ঘুরে দেখা যাবে। তারপর বাসে করে মথুরা পেঁছে সেখানে রাত্রি কাটানো যাবে। মথুরাতে ধরমশালার অভাব হবে না।

সুনীলবাবু বললেন: তোমার প্রস্তাবটা ভাল। তবে বার্থ রিজার্ভ পাওয়া যায় কিনা দেখ। সারাদিন দিল্লী ঘুরতে হলে রাত্রিতে ঘুমিয়ে যাওয়া দরকার।

বললুম: Booking Office-এ সিট্ রিজার্ভ সর্ট নোটিশে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তবে Sleeping arrangement করে নিতে পারব, নিশ্চিন্ত থাকুন। কাল সকালে City Booking Office-এ খোঁজ করা যাবে।

বীরেনদা বললেন: সেই ভাল।

মিনু আর অঞ্জনার দিকে তাকালুম: তোমরা কিছু বলবে?

অঞ্জনা বলল: হাতে আর সময় নেই। এই ভাল, কি বলিস মিনু?

মিনু বলল: হ্যাঁ, সেই ভাল।

অবশেষে ঠিক হল কাল রওনা হব দিল্লী।

পরদিন সকাল বেলা City Booking Office থেকে টিকিট কেটে আনলুম। সিট রিজার্ভ পাওয়া গেল না। কিন্তু সিট রিজার্ভের কলাকৌশল আমি শিখে নিয়েছি। সে জন্য ভয় করলুম না। যদিও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।" কিন্তু মধ্যবিত্ত ভ্রমণবিলাসীর পক্ষে সব সময় সেটা মেনে চলা সম্ভব নয়। বিশেষ করে বর্তমান Indian Administrative Set Up-এর পরিপ্রেক্ষিতে।

সকাল বেলাটা ব্রহ্মকুণ্ডের ধারে ঘুরে এলুম। রাঙামাসীরা আর একবার মন্দিরে ঢুকে বিগ্রহ দেখলেন। আমরা আর একবার প্রাণভরে হরিদ্বারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে নিলুম। হরিদ্বারের গায়ে লাগানো পাহাড়ের উপর মনসা মন্দির দেখলুম। শুধু যাওয়া হল না চণ্ডী পাহাড়ে। তারপর বেলা সাড়ে এগারটার মধ্যে হোটেল থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে ধরমশালায় ফিরলুম। ধরমশালায় ফিরে মিনু আর অঞ্জনাকে বললুম: আর কথা নয়, এবার বিশ্রাম। রাত্রিতে সিট রিজার্ভ পাব কিনা জানিনে। সুতরাং দিনের বেলায় শরীরটাকে জিরিয়ে নাও। সারা দিন সকলেই বেশ করে ঘুমালুম। বিকেল বেলা ভাল করে জলযোগ সেরে সন্ধ্যায় এলুম ষ্টেশনে: চল দিল্লী।

গাড়ী ষ্টেশনেই ছিল, তবে ওধারে। তখনো প্ল্যাটফর্মে ইন্ করে নি। রাত আটটায় ইন্ করবে। অঞ্জনা বলল: এত সকালে তবে এলে কেন?

আমি বললুম: নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে, সেটা বুঝবে পরে। এখন একটু চুপ করে বস।

আমি ওদের খাঁসয়ে খোঁজ করতে লাগলুম টি. টি. সি-র। দু'একজনকে মিলেও গেল। সরাসরি প্রশ্ন করলুম ঃ ভাইয়া, দিল্লী যাব। শুয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন ?

ওরা বলল ঃ সে কি করে হয়। এতে sleeping accomodation নেই।

—দেখুন, কোন রকমেই কি হতে পারে না ?

—না। আগে স্লিপিং বার্থ রিজার্ভ করেছেন ?

—না। করি নি বলেই ধরছি।

—তবে হবে না।

—দেখুন, হলে ভাল হত। আপনাদের হাতেই তো সব। সঙ্গে মেয়েছেলে আছে। কত লাগবে বলুন।

শেষ কথা শুনেই যেন কেমন রঙ বদলে ফেলল টি. টি. সি-রা। তিনজন ছিল। পরস্পর তিনজনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

আমি সাগ্রহ অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকলুম।

একজন বলল ঃ কত দেবেন ?

—যত চান।

—পার হেড দু'টাকা করে দিতে হবে।

বললুম ঃ তাই দেব। কিন্তু পাব তো ?

—পাবেন।

—ঠিক তো ?

—জরুর।

—গাড়ী ইন্ করবে কটায় ?

—আটটাতে। আপনাদের ভাবতে হবে না। ওখানটায় বেঞ্চে বসে থাকুন। সময় মত ডেকে নেব।

বললুম ঃ ধন্যবাদ, নমস্কার।

—নমস্তে।

হাসিমুখে ফিরে এলুম মিনুদের কাছে। ওরা সবাই একটা বেঞ্চ অকুপাই করে বসে আছে। সবারই আমার ওপর সাগ্রহ দৃষ্টি।

অঞ্জনা বলল ঃ কি খবর ?

বললুম ঃ তোমাদের ঘুম পাড়িয়ে নিয়ে যাব দিল্লীতে, সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পার।

ও বলল ঃ দেখো, কবি মানুষের কথায় বিশ্বাস করে আবার পস্তাতে না হয় ?

বললুম ঃ আর লজ্জা দিও না। কবে কোথায় দুছত্তর লিখে তোমাকে জানিয়ে দেখি বিপদ করেছি।

অঞ্জনা সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মিট্‌মিট্‌ করে হাসতে লাগল।

সুনীলবাবু বললেন ঃ সত্যি সনৎ, কোন ব্যবস্থা করে এলে নাকি ?

বললুম ঃ হ্যাঁ, মেসোমশাই।

—সিট্‌ রিজার্ভ পেলে ?

—পেলুম।

টি. টি সি-র সঙ্গে আলাপ করে সিট্‌ রিজার্ভ করা বোধহয় বীরেনদার মনঃপূত নয়। কাশী থেকে হরিদ্বার আসতে যা গুনাগারি দিতে হয়েছে তা তাঁর এখনো মনে আছে। শুনে যেন একটু মুখ গম্ভীর করে ফেললেন তিনি। তবু নির্মম সত্য কথাটা তাকে আগে থাকতেই জানিয়ে দেওয়া ভাল মনে করে বীরেনদাকে শুনিয়ে জোরে জোরে সুনীলবাবুকে বললুম ঃ হ্যাঁ, তবে পার হেড দু'টাকা করে দিতে হবে।

—দুটাকা !

—কি আর করা যাবে। রাত্তিরে ভীড়ের মধ্যে জেগে জেগে দিল্লী গেলে শরীর খারাপ হবে। তা ছাড়া সারা দিনটাতে তো আবার ধকল যাবে। শরীরের দিকে যত্ন না নিলে চলবে কেন।

সুনীলবাবু নিতান্ত মনঃপূত না হলেও সায় দিলেন ঃ হ্যাঁ, তা বটে।

বীরেনদা কিছু বললেন না। তবে সংবাদ শুনে খুব সন্তুষ্ট হলেন বলেও বোধ হল না।

ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করবার পর গাড়ী প্ল্যাটফর্মে ইন্‌ করল। টি. টি. সি-রাই ডেকে নিল আমাদের। টু টায়ার বা থ্রি টায়ার কম্পার্টমেণ্ট নয়। এর মানে স্লিপিং এ্যাকমডেশনের কোন ব্যবস্থা নেই। এখানে সিট রিজার্ভ হবে কেমন করে ভাবতে লাগলুম।

তখনো লোক উঠতে দিচ্ছে না গাড়ীতে। ভেতর থেকে বন্ধ। এক দিকে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল একজন T.T.C ঃ রুপিয়া দিজিয়ে।

—সিট্‌ কোথায় ?

—দিচ্ছি।

আছি সাতজন। চৌদ্দ টাকা দেবার কথা। কমিয়ে দশ করলুম। দশটা টাকা গুজে দিলুম হাতে।

দুটো বেঞ্চ দেখিয়ে ও বলল ঃ এখানে বিছানা পাতুন। পাশের একটা বেঞ্চেও বিছানা পাততে বলল সে। উপরের বাঙ্কেও তিনটে বিছানা বিছালুম। বিছানা বিছানো হলে T.T C বলল ঃ এখন শুয়ে পড়ুন।

ঘড়িতে তখনো আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকী। বললুম ঃ সে কি !

—হ্যাঁ বাবুজী। এখনি লোক উঠে হল্লা করবে ত্যা হলে। একবার শুয়ে পড়লে আর কিছু বলবে না।

বললুম : Reserve করলেন তার একটা রিসিট দিন ?

ও বলল : রিসিট লাগবে না।

—মানে! কেউ যদি এসে চেক্ করে ?

—করবে না বলছি তো।

টাকা তখন দেওয়া হয়ে গেছে। বেকুব বনলুম নাকি! সত্যি এনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল।

বীরেনদা বললেন : এই তো গাড়ী খালি ছিল। বেশ বসে যেতে পারতুম। খামোখা···

সুনীলবাবু বললেন : যা হবার হয়েছে। গতস্য শোচনা নাস্তি। এখন T.T.C-র কথামত শুয়ে পড়া যাক।

সন্ধ্যা না হতেই বীরেনদার ঘুমোন অভ্যাস, এতে তাঁর আপত্তি নেই। শুধু টাকাটার জন্যে মনটা তার খচ্ খচ্ করতে লাগল। নইলে···। তিনি বাংক উঠে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। আর একটা বাংকে উঠলেন সুনীলবাবু। উঠতে কষ্ট হল তাঁর। রাঙামাসী আর অঞ্জনার মাকে জোর করে শুইযে দিলুম। ওরা বললেন : ঘুম হবে না। সুতরাং এক বেঞ্চ দু'জনে ভাগাভাগি করে নিলেন। কিন্তু এটা যে সন্তানের প্রতি স্নেহ বশতই করলেন, সেটা আমি বুঝতে পারলুম। মিনু আর অঞ্জনাকে দুটো বেঞ্চ ছেড়ে দিলেন ও'রা।

আমি তখনো বসে ছিলুম। TTC এসে প্রায় ধমকে উঠল : উঠে পড়ুন বলছি না!

সুনীলবাবু বললেন : ওহে সনৎ, উঠে শুয়ে পড়, নইলে ঠকতে হবে।

ততক্ষণ লোকজন উঠতে আরম্ভ করে দিয়েছে। T. T. C-রা আর কতক্ষণ থাকবেন। ভাব দেখে কবির কথা মনে পড়ল : 'রোধিবি কি দিযা বালির বাঁধ' ?

অঞ্জনাকে বললুম : অঞ্জনা, তাহলে আজকের মত মুখ বন্ধ, কি বল ?

অঞ্জনা বলল : ঘুমিয়ে ঘুমিযে দিল্লীর স্বপ্ন দেখবে নিশ্চয়ই আজ ?

বললুম : 'দিল্লী জন্মে দেখি নি। স্বপ্ন দেখব কি করে ? ফ্যান্টাসির জন্যেও তো সামান্যতম একটা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে। তুমি বাচালতা ছাড় তো, এবার শুযে পড়।' সেদিন একথা বলেছিলুম বটে, কিন্তু আজ জেনেছি, স্বপ্নে মানুষের সূক্ষ্ম দেহ অপরিচিত স্থান ভ্রমণ করে এসে সে সম্পর্কে পূর্বেও জানতে পারে। parapsychology-তে এর ভূরি ভূরি বর্ণনা আছে)।

আমি উঠে গেলুম বাংকে। অঞ্জনা আর মিনু শুয়ে পড়ল।

কিন্তু মনের মধ্যে একটা শংকা। Legal right নেই সিটের উপর। কি জানি কি হয়!

আমার আশংকাটা অমূলক নয়। লোকজন উঠে মিনু অঞ্জনাদের শুয়ে থাকতে দেখে চেঁচামেচি করতে লাগল। তবে বাঙ্কের দিকে হাত বাড়ালো না। কারণ—Indian Rly-তে কনভেনশনালি বাংকটা যে শুযে থাকে, তারই।

কিন্তু মিনুদের বাঁচিয়ে দিল T. T. C-রাই। গম্ভীরভাবে সকলকে 'এসব সিট রিজার্ভ' বলে হটিয়ে দিল। বিপদ সাময়িকভাবে কাটল বটে, তবু আশঙ্কা কাটল না। বীরেনদা বলেছিলেন, খালি কামরা, বসে যাওয়া যেত। কিন্তু পিঁপড়ের মত লোক উঠতে লাগল। আগে থাকতে ব্যবস্থা না করলে ভীড়ের মধ্যে গুঁড়িয়ে যেতুম। চেঁচামেচি, হৈ-হুল্লোর, গালিগালাজ চলতে লাগল বেশ খানিকক্ষণ।

T. T. C-রা মিনুদের জানিয়ে গেল: কিছুতেই উঠবেন না, বুঝলেন? শুয়ে থাকবেন।

অপরের অধিকার যে হরণ করে সে টাইরাণ্ট। আমরা বলপূর্বক হরণ না করলেও কৌশলে করলুম।

আটটা ত্রিশ মিনিটে গাড়ী ছাড়ল। লোকেরা বেঞ্চে জায়গা না পেয়ে মেঝেতে শতরঞ্জ বিছিয়ে বসল। মনে হল, বীরেনদাকে ডেকে দৃশ্যটা দেখাই। তিনি তো আপাদমস্তক চাদরে ঢেকে আছেন, ব্যাপারটা টের পেয়েছেন কি? কিন্তু এখন আর উচ্চবাচ্য করা যাবে না। ঘুমের ভান করে পড়ে থাকাই ভাল। সুতরাং মট্‌কা মেরে পড়ে রইলুম। মিনুরাও ঘুমের অভিনয়ে চুপ করে পড়ে থাকল। দেখলুম, কৌশল কাজে লাগল। ন্যায্য অধিকার হারিয়েও ঘুমন্ত লোকদের বিরক্ত করল না কেউ।

পাঁচ

অঞ্জনার ডাকে ঘুম ভাঙল। গাড়ীর মধ্যে আলো জ্বললেও বাইরে রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে সূর্যরশ্মির আভাস দেখা দিয়েছে। ধরমড়িয়ে উঠে বসলুম: কি হল? সিট নিয়ে গোলমাল হল নাকি?

মনের মধ্যে ঐ শঙ্কাটা আমার নিজেরই অজ্ঞাতে সারারাত ধরে কাজ করে গেছে।

অঞ্জনা বলল: তুমি স্বপ্ন দেখছিলে নাকি সন্তুদা? গোলমাল কোথায়? সারারাত নির্বিঘ্নে কেটে গেছে। ভোর হয়ে গেছে তা জান?

—তাই নাকি! যা বাব্বা! কাল এক ঘুমে রাত কেটে গেছে। গাড়ীর যা একটানা দোল্‌না, আমি তো দূরস্থান, ইনসম্নিয়ার রোগীরও এখানে ঘুম হবে। তাকিয়ে দেখি, বীরেনদা, সুনীলবাবু সবাই উঠে গেছেন। তাদের বিছানাপত্র পর্যন্ত বাঁধা-ছাদা শেষ।

মিনু ডাকল: কি, ঘুমের ঘোর কাটে নি নাকি! ওঠ, বিছানা বাঁধতে হবে না? সামনের ষ্টেশনই যে দিল্লী।

তাড়াতাড়ি নীচে নামলুম। বিছানাটা গুছিয়ে নিলুম। জানালার ফাঁকে বাইরে তাকিয়ে দেখলুম, সত্যি উষার স্নেহস্পর্শ ঝরে পড়েছে।

অঞ্জনা বলল : সূর্য ওঠবার আগেই দিল্লী স্টেশনে গাড়ী পৌঁছুবে। সন্তুদা, তোমার ইতিহাসের পীঠস্থান দিল্লী এসে গেল বলে। কেমন লাগছে?

আমার সত্যিই কেমন লাগল! কিন্তু সে অনুভবের ব্যাখ্যা মিনুদের কাছে করতে না বসে আমি বাইরে তাকালুম। গাড়ীর গতি শ্লথ হয়ে এসেছে। গাড়ী এবার স্টেশনে ইন্ করবে। দিল্লী স্টেশন। নতুন দিল্লীর প্রতি আমাব বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। নয়া দিল্লী ইংরেজের সৃষ্টি। বর্তমানে সেখানে কংগ্রেস। কংগ্রেস ভাবতের সম্মান কতদূর রাখতে পেরেছে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। স্বাধীন ভারতের নয়াদিল্লী অনেকেই দেখতে চায়। আমাকে দেখালেও দেখব না। বর্তমান সভ্যতার মধ্যে উগ্রতা আছে, রোমাঞ্চ নেই। স্বপ্নে যদি ভাবা যায় সেই মধ্যযুগের ইতিহাস, কিম্বা আরো অতীতের কথা, মনেপ্রাণে কেমন একটা শিহরণ জাগে। আমার দৃষ্টি প্রাচীন দিল্লীতে, তার মিনার, প্রাসাদ, অট্টালিকাতে। আমার মনের গঠন প্রাচীন ভঙ্গিতে বলেই কি পুরাণের প্রতি আমার আকর্ষণ? জানি না। কিন্তু আমি দেখতে চাই প্রাচীন দিল্লীকে।

গাড়ী স্টেশনে ইন্ করল। তাড়াহুড়ো করে কুলি ডেকে নিচে নামলুম। দিল্লীতে থাকতে আসি নি। একদিনের মধ্যেই দর্শনীয় প্রাচীন কীর্তিগুলি দেখে চলে যাব মথুরাতে।

বাইরে এসে দাঁড়াতেই টাঙ্গাওয়ালারা ঘিরে ধরল : কোথায় যাবেন?

বললুম : যাব না কোথাও, শুধু ঘুরে ঘুরে দেখব।

--চলুন, ঘুরিয়ে আনব।

প্রাচীনেব প্রতি মোহ থাকলেও, প্রাচীন পরিবহন ব্যবস্থার প্রতি দুর্বলতা নেই। এখানে সময়ের প্রশ্ন। বললুম : না, টাঙ্গা নেব না।

ওরা তবু ঘুরঘুর করতে লাগল।

আমাদের দাঁড় করিয়ে মিনু, রাঙামাসী, ওরা সবাই বাথরুমে গেল।

সুনীলবাবু বললেন : কি করবে তাহলে?

আমি বীরেনদার দিকে তাকালুম। তিনি বললেন : তুমিই ঠিক কর।

বললুম : প্রাচীন কীর্তি দিল্লীর অনেক। নতুনও গড়ে উঠেছে। দিল্লীতে এসে স্বভাবতই এসব কিছু দেখবার ইচ্ছে জাগবে। সমস্তটা দেখতে গেলে সপ্তাহেও কুলোবে না। অথচ আমাদের হাতে পূর্ণ একটা দিনও নেই। তাড়াতাড়ি করতে হবে সবকিছু। টাঙ্গায় হবে না। ট্যাক্সি নিতে হবে দুটো।

বীরেনদা বললেন : খরচা তো অনেক পড়বে?

বললুম : উপায় কি। আর তা ছাড়া দিল্লীতে থাকার খরচাটা তো বেঁচে যাচ্ছে। সেই খরচা গাড়ীর পেছনে করি।

সুনীলবাবু বললেন : হ্যাঁ, সেই ভাল।

ঠিক করলুম—ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে দুটো ট্যাক্সি করে এই সাত সকালেই বেড়াতে বেরুব।

বীরেনদা বললেন: ট্যুরিস্ট বাস আছে শুনেছি।

বললুম: মালপত্র নিয়ে সেখানে চলা অসুবিধে। ট্যাক্সিই ভাল।

বীরেনদা আর আপত্তি করলেন না। ট্যাক্সিই ঠিক হল। মিনুরা বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে।

অঞ্জনা বলল: কি ঠিক করলে সন্তুদা?

বললুম: সব ঠিক, এবার চল গাড়ীতে উঠি।

বীরেনদার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে অঞ্জনা বলল: চা টা খেয়ে নেবে না?

তখনো সূর্যই ওঠে নি। ষ্টেশনে চা আছে বটে, তবে টায়ের খবর পাওয়া গেল না।

বীরেনদাকে বললুম: চা চলবে? অবশ্য কিছু খাবার নেই।

চা বীরেনদা খান না। একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন: থাক।

সুনীলবাবু বললেন: দু'এক জায়গা ঘুরে সূর্য উঠলে কোন দোকানে বসে গ'ম কিছু খেয়ে নেওয়া যাবে। এখন তো বেরিয়ে পড়া যাক।

সুতরাং কুলির মাথায় জিনিসপত্র চাপিয়ে সদলবলে বাইরে এসে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে দাঁড়ালুম। এত ভোরেও ট্যাক্সি পাওয়াতে অসুবিধা হল না। তা ছাড়া দিনটা ছিল রবিবার। দুটো ট্যাক্সি নিলুম।

বললুম: দেখবার জায়গা যা আছে ঘুরিয়ে দেখাতে হবে।

—টাকা উঠবে অনেক। ঘুরাতে আপত্তি কি। ওরা রাজী হল।

দুটো ট্যাক্সি পাশাপাশি ছাড়ল। মাসীমারা, বীরেনদা আর সুনীলবাবু একটাতে উঠলেন। মিনু, আমি আর অঞ্জনা উঠলুম আর একটাতে।

ড্রাইভার বলল: প্রথমে তাহলে কুতবমিনার দেখে আসা যাক?

বললুম: যা খুশি। কিন্তু সব ঘুরিয়ে দেখাতে হবে।

ওরা বলল: সে ভাববেন না। সব দেখাব।

ষ্টেশন কম্পাউণ্ড ছেড়ে গাড়ী বেরুল। মধ্যযুগের সাক্ষী বিরাট লালকেল্লা দাঁড়িয়ে। দেখে চিনতে আমার বিলম্ব হল না। ভালই হল, প্রথম দর্শনেই সুবিখ্যাত লালকেল্লা। কত না ইতিহাস, কত না হাসি-কান্না এর মধ্যে রয়েছে।

অঞ্জনা চেঁচিয়ে উঠল: সন্তুদা, কি এটা?

বললুম: দেখে চিনতে পারলে না? এই সেই সুবিখ্যাত লালকেল্লা। মধ্যযুগে তৈরি করেছিলেন সম্রাট শাহাজান। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, প্রমথনাথ বিশী।

শুনে মিনু একটু মুচকি হাসল মাত্র।

অঞ্জনা বলল: এবার তোমার এক্তিয়ার। কিন্তু গাড়ী এখানে থামবে না? কেল্লায় ঢুকবে না?

ড্রাইভার বলল ঃ আটটার আগে কেল্লা খুলবে না। টিকিট করে যেতে হয়। ভিতরে এখন মিলিটারি থাকে কিনা।

কেল্লার দুর্গপ্রাকার চোখে পড়ছে, লাল পাথরে তৈরী। ভেতর থেকে দু'একটি গৃহশীর্ষও নজরে পড়ে। সু-উচ্চ কেল্লা। গাড়ী চলেছে পাশের রাস্তা দিয়ে কুতুবমিনারের দিকে। কিন্তু আমার লুব্ধ দৃষ্টি বারববার কেল্লাব দিকেই তাকাতে লাগল। বিরাট কেল্লা। অতিক্রম করতেই লাগল কয়েক মিনিট। কিন্তু অবশেষে কেল্লার নিশানাটুকু পেছনে ফেলে এগিয়ে চলল গাড়ী। ইতস্তত এখানে সেখানে হারানো দিনের ভগ্নাবশেষ। মনে হয় সর্বত্রই থামি। সব ত্রই হৃদয়েব মমতা বুলিয়ে দেখি সেই ঐশ্বর্যের জাঁকজমক, প্রণয়ের দেয়ানেয়া, দুর্যোগের ঘনঘটা, সব। 'হে অতীত তুমি কথা কও, কথা কও।' অতীত ইতিহাসের এমন কিছু আকর্ষণী ক্ষমতা আছে যা তীর্থস্থানেব পুণ্যকীর্তিগুলির মধ্যেও নেই। অঞ্জনার মত মুখরা মেয়েও যেন নীরব হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। পুরানো দিল্লী পার হয়ে India Gate-এর ভেতর দিয়ে নতুন দিল্লী। বিরাট প্রকাণ্ড রাস্তা। মেটালিক রোড। দু'পাশে তখনো ধুলো। কাজ শেষ হয় নি, হবে। হতে আরো সময় লাগবে। পুরানো কীর্তিগুলোকে সরিয়ে নতুন গড়ে উঠছে। অসহায় মূক বেদনায় প্রাচীন দাঁড়িয়ে আছে এখানে সেখানে হারানো দিনের নীরব, দুর্বল সাক্ষী হয়ে। সহরের সীমা ছাড়িয়ে গাড়ী চলেছে বাইরে, সেখানেই মধ্যযুগের স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন— কুতবমিনার।

রাজধানী দিল্লীর চতুর্দিকেও নির্মম খরাক্লিষ্ট অঞ্চল। মাঠে শস্য নেই। কার্তিক মাস, অথচ চৈত্র দিনের ধুলো উড়ছে। বহু বিস্তির্ণ অঞ্চল জুড়ে মাঠে মাঠে আবাদ। কোন অংশ সংরক্ষিত। নতুন শহর উঠবে। হবে extension। কাজ হচ্ছে। প্রাচীন ইতিহাসের ধূসর রুক্ষ প্রান্তর ছাড়িয়ে গাড়ী চলেছে কুতবমিনারের দিকে। দিল্লী থেকে অনেক দূর কুতবমিনার। ন'দশ মাইলের কম হবে না।

আমাদের সকলেরই হৃদয়ে রোমাঞ্চ। যে ইতিহাস বইয়ে পড়েছি, সে ইতিহাসের বাস্তব সাক্ষী দেখব এখনি চোখের উপর।

অবশেষে গাড়ী এসে থামল কুতবমিনারের কার-পার্কে। কুতবের ছায়ায় সবুজ ঘাস। ছোট পার্ক। সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতেই হবে। যাত্রী আসে দেশবিদেশ থেকে। কুতবের জন্যে, দিল্লীর প্রাচীন ঐতিহ্যেব জন্য Foreign money কম আয় হয় নাকি। আমার দৃষ্টি প্রথমেই আটকে গেল উর্দ্ধে, উন্নত কুতবশীর্ষে। ঐ, ঐ সেই কুতবমিনার! মরুতীর্থ হিংলাজ দেখে সাধুদের মনে প্রাণে প্রথম কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল জানিনে। তবে আমার সমস্ত মনপ্রাণ চকিতে বিস্ময়ের এক অব্যক্ত আকর্ষণে সেই দিকে তাকিয়ে থাকল। অঞ্জনা আর মিনুর কথাও বুঝি ভুলে গেলুম।

গাড়ী থেকে নামলুম সকলে। আমার দৃষ্টি সম্পূর্ণ কুতবমিনারের গায়। ইতিহাসেব পাতায় এর ছবি দেখে বিন্দুমাত্র কি আগে ধারণা করতে পেরেছি যে,

বিশাল হিমাদ্রিশিখরের মত গম্ভীর, সু-উন্নত, মনোরম এই বিরাট বিজয় স্তম্ভ। আপাদমস্তক, ভিত্তি থেকে উর্ধ্বে শীর্ষদেশ পর্যন্ত বার বার তাকিয়ে দেখতে লাগলুম। সুন্দর কারুকার্য। কোরাণের উদ্ধৃতি। কত দিনের অবহেলিত, অথচ কত গৌরব নিয়ে সে আজো বিদ্যমান। এর কাছে কলকাতা ময়দানের মনুমেন্ট। তুচ্ছ। অতীতের হৃদয়স্পন্দন বুঝি আজো এর বুকে কান পাতলে শোনা যাবে।

অঞ্জনা বলল : অপূর্ব ! না সন্তুদা ?

আমি বললুম : ভাষা হারিয়ে ফেলেছি আমার ইতিহাসের তীর্থে এসে। কি বলব বল !

আমার দুই চোখের স্বপ্ন নিশ্চয়ই অঞ্জনার দৃষ্টি এড়ায় নি। কিন্তু তার চোখেও স্বপ্ন এখন।

সুনীলবাবু বললেন : এ মিনারটা কে তৈরী করেছিল হে সন্তু ? কুতবুদ্দিন নাকি ?

বললুম : না মেসোমশাই। নাম শুনে সে রকম ধারণা প্রায় প্রত্যেকেরই হয়। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। এটা তৈরি করেছিলেন ইলতুৎমিস। সময় প্রায় খৃষ্টীয় ১২৩১-৩২ সাল। বাগদাদের কাছে উস্ থেকে একজন দরবেশ এসেছিলেন হিন্দুস্থানে —খাজা কুতবুদ্দিন বক্তিয়ার কাকি। দিল্লীতে এসে কিলখিরে কাছে বাস করতেন। ইলতুতমিস তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরই সম্মানে ইলতুৎমিস এই মিনার আরম্ভ করেন। অনেকে মনে করেন, ইলতুৎমিস তাঁর পূর্ব প্রভু সুলতান কুতবুদ্দিনের নামে এটা করেছেন। কিন্তু মিনারের গায় যে আরবি হরফ উৎকীর্ণ আছে, সেটা পড়তে পারলে দেখবেন, সে রকম কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই এখানে। তবে কুতব মিনার সম্বন্ধে এটা ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ধারণা। এটা আসলে পৃথ্বীস্তম্ভ। ভারতের শেষ হিন্দু সম্রাট (যদিও কথাটা অসত্য) মহারাজ পৃথ্বীরাজ চৌহান এটা নির্মাণ আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর পত্নী সংযুক্তা প্রত্যহ সূর্যোদয়ের মুহূর্তে যাতে যমুনা দর্শন করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে পৃথ্বীরাজ এই সু-উচ্চ মিনারের পরিকল্পনা করেছিলেন। সুলতানদের পদবি ও কোরাণের যে-সব কবিতা এই মিনারের গায়ে খোদাই করা রয়েছে, সে সব নাকি পরের ঘটনা। পৃথ্বীরাজ পরাজিত হবার পর কুতবুদ্দিন ১২০০ খৃষ্টাব্দে নতুন ভাবে এটা নির্মাণ আরম্ভ করেন। কুতবুদ্দিন শুধুমাত্র নিম্নতল ছাড়া আর কিছু তৈরী করে যেতে পারেন নি। ইলতুৎমিস এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তল নির্মাণ করেন। চতুর্থ ও পঞ্চম তল, আর ঐ যে দেখেছেন গোলাকৃতি গম্বুজ, ওটা নাকি নির্মাণ করেছিলেন ফিরুজ তোগলক। বর্তমানে এর উচ্চতা ২৩৮ ফুট। নিচের ব্যাস ৪৩ ফুট। চূড়ার কাছে ব্যাস ৯ ফুট। লোকের বিশ্বাস এর সাতটি তল ছিল। উচ্চতা ছিল ৩০০ ফুট। কিন্তু এর প্রমাণ নেই কোন। এখন গুণে দেখুন পাঁচটি তলের বেশী নেই। তবে ঐ গম্বুজের উপর নাকি ছিল ষষ্ঠ তল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সেটা ভেঙে পড়ে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এখানে নতুন গম্বুজ বসানো হয়।

অঞ্জনা বলল : তাহলে কোন্ ইতিহাসটাকে সত্য বলে মনে কর তুমি ?

বললুম : ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস উদ্ধার করা বড় কষ্টসাধ্য। ইতিহাস লেখা হত গল্প দিয়ে। সত্য মিথ্যা অনেক ঢেকে যেত। ইউনির্ভার্সিটি-পাঠ্য ইতিহাসকে বিশ্বাস করে এখন বলতেই হবে, এর নির্মাতা ইলতুৎমিস। তবে মহাভারতের মত এটাও ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে পারে।

মিনু বলল : পৃথ্বীরাজের যে এটা নয় তাই বা জানা যাবে কেমন করে ?

বললুম : তা বলছি এই কারণে যে, এর সঙ্গে সংযুক্তার নাম জড়িত আছে। আসলে সংযুক্তা বলে কোন মেয়ে ছিল কিনা জানা নেই। পৃথ্বীরাজের দরবারের আসল তথ্যপূর্ণ যে পুস্তক, 'পৃথ্বীরাজ বিজয় মহাকাব্য', তাতে সংযুক্তার কথা নেই। গল্পটা এসেছে চাঁদ বর্দইয়ের 'চাঁদরাইসা' থেকে। চাঁদের কাহিনী পড়লে দেখবে, যথেষ্ট উদ্ভট কল্পনা করতে পারতেন তিনি। সেইজন্য এ ঘটনাটাকে বিশ্বাস হয় না।

—তা হলে এ প্রবাদ এল কোত্থেকে ?

বললুম : দেখ, দিল্লী মুসলমান শাসনের কেন্দ্র হলেও হিন্দুরাই ছিল চতুষ্পার্শ্বের এলাকাতে সংখ্যাধিক। এখানে হিন্দু সেন্টিমেন্ট প্রবল। কাহিনীটি হিন্দু গৌরব প্রকাশের জন্য সৃষ্টি হতে পারে।

সুনীলবাবু দর্শনের একজন উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক হলেও মনে মনে বোধহয় Sectarian outlook পোষণ করেন। বললেন : তা হলে পৃথ্বীরাজের কথাকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না বল ?

বললুম : না, একেবারে নিঃসন্দেহে সে কথা বলা যায় না।

অঞ্জনা বলল : শুনতে কিন্তু বেশ ভালই লাগছে।

আমি বললুম : না, এখন শোনার চেয়ে দেখতে হবে বেশী।

অঞ্জনা বলল : তা হবে কেন ? এখন শুনব, দেখবও, দুটোই তো নাগালের মধ্যে।

—অত করতে গেলে সময় permit করবে না।

—ঠিক করবে। অত ভয় কিসের। বিকেলে মথুরার গাড়ী ধরলেই হবে।

আর একবার ভাল করে সমস্ত কুতবমিনারের দেহে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললুম : চল। ধারে কাছে আরো অনেক জিনিষ আছে। কুতুবমিনারের গায়ে লাগানো কোয়াতুল মসজিদ আর আলাই দরওয়াজা। মুসলিম স্থাপত্যের সে নাকি একটা অপূর্ব নিদর্শন।

আমরা এগুলাম। কুতবের ঠিক নিচেই একটি প্রাচীন ইমারতের ভগ্নাবশেষ। অপূর্ব কারুকার্য এতে। পলেস্তারার ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা থামে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির আভাস। অঞ্জনা তা দেখে আমাকে চিৎকার করে ডাকল : এই যে সন্তুদা, দেখে যাও।

—কি ?

—এ যে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি মনে হচ্ছে !

আমি হেসে বললুম : হ্যাঁ, ব্যাপারটা তাই। ঐতিহাসিক কানিংহামের অভিমত, ১১৮০-৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পৃথ্বীরাজ এখানে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধদের জন্য সতেরটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এর পাঁচটি সারি, এবং প্রত্যেক সারিতে ৬৪টি করে স্তম্ভ ছিল। প্রত্যেক স্তম্ভে ছিল একটা করে দেবমূর্তি ও শেকলে বাঁধা ঘণ্টা। মুসলমানেরা তরাইনের যুদ্ধে জয়লাভ করে দিল্লী অধিকার করে হিন্দু মন্দিরের উপর পলেস্তারা লাগিয়ে তাতে ফুলপাতা ও কোরানের বাণী খোদাই করে দেয়। সেই পলেস্তারা খসে আবার আসল মূর্তি বেরিয়ে পড়েছে। বুঝলে কাল নির্মম এবং নিরপেক্ষ বিচারক। যা সত্য তাকে সে একদিন না একদিন উদঘাটিত করবেই।

মিনু বলল : তা হলে পৃথ্বীরাজ একদা এখানে ছিলেন বল ?

—হ্যাঁ, ছিলেনই তো। একসময় এটা খুব সুন্দর জায়গা ছিল।

—তাহলে মিনার তৈরির ব্যাপারটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না ?

—সেটা যায় না বলছিই তো।

মিনু বলল : তোমরা এবার দেশীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাস লেখ তো দেখি।

হেসে বললুম : ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশী বিদেশী নেই মিনু। তিনি সবসময়, সব অবস্থাতে নিরপেক্ষ। নইলে ঐতিহাসিক হওয়া যায় না।

মিনু বলল : তা যাই বল, তোমাদের দেশাত্মবোধের অভাব আছে।

মিনুর মনের কথাটা বুঝলুম, কিন্তু তা নিয়ে তর্ক করলুম না আমি। মিনু একটা সন্দেহ দৃষ্টি বুলিয়ে সেই প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তি দেখতে লাগল। এরই মধ্যে আছে লৌহ স্তম্ভ। সকলের ভীড় দেখি সেখানে। আমরাও গেলুম।

অঞ্জনা বলল : এটা কি সম্ভুদা ?

—স্তম্ভ। মহারাজ ধাবা তৈরী করেছিলেন বলে বিশ্বাস।

—অনেক দিনের প্রাচীন ?

—সেত নিশ্চয়ই। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের মত সময়ে হয় তো তৈরী হয়েছিল। অবশ্য সঠিক সময় আজো জানা যায় নি। অনেকে মনে করেন গুপ্ত যুগের তৈরি। বর্তমানে একে গুপ্তযুগের ধাতু শিল্পের এক অনবদ্য নিদর্শন বলে ধরা হয়। নির্মাতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত।

অঞ্জনা বলল : কিন্তু দেখ, আজো কেমন চকচক করছে। একটু মরচে ধরেনি। সেকালেও তাহলে বড় কেমিষ্ট ছিল ?

বললুম : ছিল বৈকি। তবে কথা কি জান, সেকালের ইঞ্জিনিয়াররা অদ্দেকের মত contract নিয়ে কাজ করত না। এত দুর্নীতিপরায়ণও ছিল না, তাই সময়কে অস্বীকার করে আজো এসব বেঁচে আছে। রাজা ধাবা অথবা কোন গুপ্ত সম্রাট যদি কংগ্রেসের একজন বড় কর্তা হতেন, তাহলে কি হত বলতে পারিনে।

সুনীলবাবু হেসে বললেন : কথাটা মন্দ বল নি, সনৎ।

অঞ্জনা আড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বলল : কথাটা মন্দ শিখলে অ র ভক্ত জুটতো এমন করে ?

ভক্ত বলতে কাকে যে ইঙ্গিত করল অঞ্জনা, সেটা স্পষ্ট বুঝলুম না।

লৌহস্তম্ভটি মাটি থেকে ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চি উঁচু। ব্যাস মাটির কাছে ১৬ ফুট ৪ ইঞ্চি. মাথার দিকে ১২ ফুট ৫ ইঞ্চি।

হাত দিয়ে বেড় মাপবার চেস্টা করলুম। ঠিক বেড় পাওয়া যায় না। দর্শকদের নানাজনের নানা কথা।

অঞ্জনা বলল : এর ভিত নাকি এত নিচে যে এখনো কোন হদিস মেলে নি ?

বললুম : এ সবই লোকের বাড়ানো কথা। অনুসন্ধান করে জানা গেছে. এর ভিত মাটির নিচে তিন ফুট পর্যন্ত। পাথরের উপর আটটি দণ্ডের উপর এটা দৃঢ় করে আটকানো। লোকের বিশ্বাস. যতদিন থাবার স্তম্ভটি থাকবে. ততদিন দিল্লীর হিন্দু রাজত্ব টিকে থাকবে। কিন্তু সেটা যে ছিল না সে প্রমাণ তো এখানে অনেকই মিলছে।

অঞ্জনা বলল : দেখ, কি যেন লেখা রয়েছে এর গায়।

তাকিয়ে দেখলুম। সত্যি অক্ষরগুলো আজো স্পষ্ট।

অঞ্জনা বলল : কি লেখা, সন্তুদা ?

বললুম : পরাজয় স্বীকার করছি অঞ্জনা, এ লেখা আমি পড়তে জানিনে। প্রাচীন ইতিহাসের ছেলে যারা. তারা হয় তো পারবে। তবে কোন এক রাজা চন্দ্রের নাম মনে হচ্ছে, হয়তো গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত।

মিনু ঘুরে ঘুরে দেখে বলল : অপূর্ব কাজ কিন্তু।

বললুম : সত্যি অপূর্ব। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এর শিল্পকর্মের মূল্যায়ন হয় তো আমরা করতে পারব না। কিন্তু এর ইস্থেটিক আবেদন সকলের কাছে সমান। বুঝলে অঞ্জনা, ইতিহাসের প্রতি শুধু মাত্র এই কারণেই, বিশেষ করে প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি আমার দুর্বলতা আছে। প্রাচীন ইতিহাস আমাকে টানে। সে দিনগুলো না জানি কেমন ছিল, না ?

—সত্যি।

—চল, ওদিকে দেখি।

সকলে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম। প্রাচীন কুতব মসজিদ। গেটে প্লেটে লেখা আছে, এখানেই কোথাও সুলতান আলতামাসের সমাধি। আমি খোঁজ করতে লাগলুম। কিন্তু ঠাহর করে উঠতে পারলুম না। প্রত্যেকটা ভগ্ন ইমারতের কাছে প্লেট রাখা উচিত ছিল, তাতে বুঝতে সুবিধে হত। ভারত সরকার যে এটা কেন করেন নি, কে জানে। অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্যগুলির দিকে এদের তেমন আগ্রহ নেই বোধ হয়। অথচ বিদেশী প্রতিনিধি লর্ড কার্জন ইণ্ডিয়ান মনুমেন্টগুলি রক্ষার জন্যে আইন পর্যন্ত করেছিলেন। অতীতে আমাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টি ছিল না। বর্তমান স্বাধীন ভারত

সরকারও ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলে মনে হয় না। বছর খানেক আগে গৌড়ে গিয়ে নিদর্শনগুলিকে প্রায় অরক্ষিত পড়ে থাকতে দেখেছি।

কুতব মসজিদ থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে আলাউদ্দিনের কলেজ ও সমাধি। এখন সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রায়। সমাধিব কথা আঁচ করবার উপায় নেই। তবে কলেজের ধ্বংসাবশেষ থেকেও একদা এর বিরাটত্বের কথা মনে পড়ে যায়। একটা চতুষ্কোণ সৌধ রয়েছে এখানে। সম্ভবত এটাই আলাউদ্দিনের সমাধি। একদা প্রবল প্রতাপান্বিত সুলতান আলাউদ্দিনের সমাধি পর্যন্ত আজ খুঁজে বের করবার উপায় নেই। হায়রে মানুষের অহংকাব!

এই সমস্ত কিছুব মধ্যেও আমাব লক্ষ্য ছিল আলাই দরওয়াজার দিকে। প্রত্যেক ইতিহাসেই মুসলিম স্থাপত্যের বিচার করতে গিয়ে আলাই দরওয়াজার উল্লেখ আছে। কুতবমিনারের কাছে এটা। কিন্তু কোন্ জায়গায়? বর্ণনা দেখে শেষ পর্যন্ত আলাই দরওয়াজা আবিষ্কার করলুম। আলাই দরওয়াজায় চতুষ্কোণ একটি হলঘর আছে। একটি মাত্র গম্বুজ দিয়ে ছাদ নির্মিত। স্থাপত্যশিল্পের সেটাই একটা আশ্চর্য ব্যাপার। মুসলমান স্থপতিদের বিশেষত্বই ছিল এই গম্বুজ নির্মাণে। লাল রংয়ের বেলে পাথরে নির্মিত আলাই দবওয়াজা অবশেষে দেখে চিনতে পারলুম। দরজার কাজ ও অলংকরণ ইতিহাসের পাতায় ছবি দেখে দেখে প্রায় মুখস্ত। স্থাপত্যশিল্পের কাজের জন্য আলাউদ্দিন বিখ্যাত। আলাই দরওয়াজাতে তিনি চিরস্থায়ী খ্যাতি রেখে গেছেন।

আলাই দরওয়াজার কাজ মেশোমশাইকেও খুব আকৃষ্ট করল। তিনি বললেন: বাঃ! অপূর্ব তো?

বললুম: এটা খুবই বিখ্যাত স্থাপত্য নিদর্শন। প্রত্যেক ইতিহাসে এর উল্লেখ আছে।

অঞ্জনা বলল: এ ছেড়ে যেন আর যেতেই ইচ্ছে করছে না।

মিনু আত্মভোলা হয়ে দেখছিল। বললুম: কি মিনু, তোমার সাহিত্য এই ইতিহাসের প্রাচীন নিদর্শনগুলিকে অনুমোদন করছে তো?

মিনু বলল: তোমার কাজ তুমি কর। বক্‌বক্ কোর না।

বললুম: কিন্তু এখানে আমাকেই গাইড হিসেবে নিতে হবে, জেনো।

মিনু একটু মুখ বাঁকিয়ে বলল: বয়ে গেছে আমার।

ওপাশে বিরাট একটি অসমাপ্ত মিনার। ওটা গড়ে উঠলে একটা জায়েন্ট মিনার হত বলে আমার বিশ্বাস। অঞ্জনা আমায় বলল: ওটা কি সন্তুদা?

ঐ অসমাপ্ত মিনার সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না। সুতরাং বলতে পারলুম না। অঞ্জনাকে জানালুম: বাইরে প্লেট থেকে জানতে হবে ওটা কি।

অসীম আগ্রহ অঞ্জনার। বলল: চল।

এগিয়ে গেলুম সেই অসমাপ্ত মিনারের দিকে। প্লেট পড়ে বুঝলুম, এটা আরম্ভ করেছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন। কুতবমিনারের দ্বিগুণ করে এই মিনার তৈরি করবার

ইচ্ছা ছিল আলাউদ্দিনের। কিন্তু কাজ শেষ হয় নি। ৮৭ ফুট পর্যন্ত উঠে বন্ধ হয়ে আছে।

আমি আর অঞ্জনা গিয়ে দাঁড়ালুম সেখানে। মিনু তখনো আলাই দরওয়াজা দেখছে। আমরা দেখতে লাগলুম আলাউদ্দিনের অহংকৃত উচ্চাকাঙ্ক্ষার অসমাপ্ত পরিণাম।

অঞ্জনা বলল : তৈরি হলে না জানি এটা কেমন আশ্চর্য ব্যাপার হত, না ?

বললুম : কিন্তু Man proposes, God disposes.

অঞ্জনা বলল : মানুষের ট্রাজেডি তো এখানেই।

বললুম : চল, ভেতরে যাই।

—চল।

দু'জনে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলুম। কেমন ভয় ভয় করে যেন ঢুকতে। আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে কয়েকটি বাদুর হঠাৎ মিনারের বাতাস কাঁপিয়ে পাখা ঝাঁপটে উঠল। ভয় পেয়ে অঞ্জনা প্রায় আমাকে জাপটে ধরে আর কি। আমিও তাকে ধরলুম। হাত দুটো কাঁপছে তার।

আমি বললুম : বাবা, তুমি এত ভীতু মেয়ে ?

হাত ছাড়িয়ে নিল অঞ্জনা। মুখ তার আরক্তিম। একবার আমার দিকে তাকিয়ে মুখ নিচু করে নিল।

—কি, ভয় পেয়েছ ?

—হ্যাঁ।

—কিসের ভয় ?

—আমায় নিজেকে ?

আমি ঠিক বুঝতে না পেরে বললুম : কি বলছ ?

অঞ্জনা বাইরের দিকে পা বাড়াল : কিছু না, এবার চল।

কিন্তু অঞ্জনার পদক্ষেপ লক্ষ্য করতেই সব কিছু যেন পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। ডাকলুম : অঞ্জনা।

আমার দিকে চকিতে তাকিয়েই আবার দৃষ্টি নামিয়ে নিল অঞ্জনা : চল, মিনু ব্যথা পাবে সন্তুদা।

আমার বুকটা হঠাৎ চিড়িক দিয়ে দুলে উঠল।

ফিরে আসতেই সুনীলবাবু বললেন। ওটা কি ?

বললুম : একটা অসমাপ্ত মিনার : মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষার ব্যর্থ সাক্ষী।

অঞ্জনা কথাটা শুনেই আমার চোখের দিকে তাকাল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কুতব মিনারের সু-উচ্চ চুড়ার দিকে লক্ষ্য করতে লাগল।

বুঝলুম, নিজেকে লুকোতে চায় অঞ্জনা। সে একটু সময় নিচ্ছে। আমার অনুমানই সত্য হল। হঠাৎ যেন যৌবনের কলহাস্যে আবার নেচে উঠল অঞ্জনা।

মিনারের সিঁড়ি বেয়ে ভ্রমণ বিলাসীরা সব উপরে উঠেছে। অঞ্জনা বলল, আমরাও উপরে উঠব বাবা ?

সুনীলবাবু হাসিমুখে বললেন : পারিস তো ওঠ। আমি পারব না জানিয়ে দিচ্ছি।

—সন্তুদা, তুমি ?

আমার বুকটা তখনো কাঁপছে। সহজ ভাবে যেন কথা বলতে পাচ্ছি না অঞ্জনার সঙ্গে। তবু যথা সম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক করলুম। মিনুকে কিছুই বুঝতে দিলে চলবে না। বললুম, চল।

অঞ্জনা তাকাল মিনুর দিকে : উঠবি ?

মিনু উচ্চতাটা বার দুয়েক লক্ষ্য করে বলল : না রে, থাক। অতদূর উঠতে পারব না।

আমি মিনুকে লক্ষ্য করে দেখলুম। সে বোধ হয় কিছু বোঝে নি।

বীরেনদা বললেন : আর মিনারে উঠে দরকার নেই। উঠতে গেলে টিকিট কাটতে হবে। ওতে সময় যাবে। সময় নষ্ট করে কি হবে ?

সুনীলবাবু বীরেনদার কথায় সায় দিয়ে বললেন : সেটা ঠিক।

অঞ্জনা যেন হতাশার ভঙ্গি করে বলল : কি আর করব তবে, Majority must be granted. থাক।

আমি বললুম : সেই ভাল। তার চেয়ে চল জলযোগটা সেরে নি। দেখবার তো আরো অনেক জিনিস আছে। কিছু কিছু করে সবটাই দেখতে হবে তো ?

বীরেনদার মুখে একটু হাসির রেখা দেখলুম। আমার প্রস্তাবকে তিনি সর্বান্তকরণে সমর্থন জানালেন মনে হল।

বাইরে খাবারের দোকান। মিণ্টি থেকে গরম পুরি, সব মেলে সেখানে। সকলেই কিছু কিছু খেয়ে নিলুম। রাঙামাসীরই যা অসুবিধা। বললুম : বিদেশে নিয়ম নাস্তি। তাছাড়া মিষ্টি ছোঁয়াছুঁয়ির বাইরে। দুটো মিষ্টি খেয়ে নাও মাসী। কিন্তু দোকান ঘরে মুসলমান দেখে মাসী সরাসরি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। অবশেষে সিঙ্গাপুরী কলা কিনে দিলুম মাসীর হাতে। বললুম : এতেই অন্তত উপোস ভাঙ তো। এ প্রস্তাব অস্বীকার করলেন না রাঙামাসী।

জলযোগ শেষে আবার বেরুলাম। দেখলুম, যোগমায়া মন্দির। কুতবমিনার থেকে এক ফার্লং দূরে এই মন্দির অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের বোন যোগমায়ার মন্দির। সমগ্র ভারতবর্ষে যোগমায়ার ঐ একটিই মন্দির। অনুমান খ্রীষ্টপূর্ব তিনহাজার বছর আগে এখানে আসল মন্দির ছিল। বর্তমান মন্দির ১৭২৭ খ্রীঃ নির্মিত। যোগমায়া দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণের পরিবর্তে স্বয়ং এসেছিলেন মহামায়া হয়ে। কংস তাঁকে হত্যা করতে পারেননি। যোগমায়া ঊর্ধ্বে উঠে বলেছিলেন : 'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।' যোগমায়া থেকে বেরিয়ে আদম খাঁর সমাধি, বাওলি, সুলতান ঘোরির

সমাধি, কুতব দরগা, সিকন্দর লোদীর সমাধি, হাউস খাস, শিরি, জাহাঁপনা (দুনিয়ার আশ্রয়) লালকোট, এই সব দেখলুম। জাহাঁপনা তৈরী করেন মহম্মদ তোগলক শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। কিন্তু তৈমুর লঙ যখন হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন, তখন জাহাঁপনাকে তিনি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

লালকোট তৈরী করেছিলেন রাজপুত রাজা অনঙ্গপাল। সব কিছুই আজ ধ্বংস-স্তূপে পরিণত। শুধু পাহাড়ের উপর নির্মিত পশ্চিম দিকের প্রাচীরগুলি এখনো সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। ঐ প্রাচীরগুলি আর লৌহস্তম্ভই হল লালকোটের ঐতিহাসিক স্মারকচিহ্ন। মুসলমানদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে এখানেই পৃথ্বীরাজ রায় পিথোরা দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন।

লালকোট থেকে ড্রাইভারকে বললুম : কোন্ দিকে তোগলকাবাদ ?

ড্রাইভার বলল : অনেকদূর। যাবেন ?

বললুম : যাওয়া প্রয়োজন। দিল্লীর তোগলক সুলতানেরা ওটা তৈরী করেছিলেন। দেখে যাই।

বীরেনদা আপত্তি তুলে বললেন : অযথা খরচা। লালকোটের মত গিয়ে হয় তো দেখব, কিছুই নেই। শুধু শুধু...

বীরেনদাকে কি করে বোঝাব যে, ঐ শূন্যতার মধ্যে বিরাট এক রোমাঞ্চ লুকিয়ে আছে। সেটা ইতিহাস-চেতনা ও রোমান্টিক মন যার আছে, সে ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।

অঞ্জনা কিন্তু আমাকে সমর্থন করে বলল : চল তোগলকাবাদ। দেখে যেতেই হবে। আর কখনো আসা হবে কিনা কে জানে।

অগত্যা গাড়ী চলল তোগলকাবাদ। কুতব থেকে প্রায় চার মাইল দূরে এই তোগলকাবাদ। দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন গিয়াসুদ্দিন তোগলক। এক কালে এত দুর্ভেদ্য দুর্গ তখন ভারতবর্ষে আর ছিল না। সমকালীন সমরনীতির কোন কৌশল প্রয়োগ করেই দুর্গে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। দুর্গের পনেরটি প্রবেশদ্বার ছিল। সাতটি জলাশয়। কঠিন নিরেট পাহাড় ভেদ করে খনন করা হয়েছিল ৮০ ফুট গভীর কূপ। ব্যাপক ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আজো দুটো সৌধের অস্তিত্ব আন্দাজ করা যায়—জুমা মসজিদ ও বুরুজ মিনার। এখনো অনুমান করা যায় গিয়াসুদ্দিনের সমাধি। গিয়াসুদ্দিন নিজে এই সমাধি আরম্ভ করেছিলেন—শেষ হয় তাঁর মৃত্যুর পর।

বীরেনদা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন : কিছুই তো দেখছি না। শুধু শুধু অর্থদণ্ড।

আমি বললুম : আমি কিন্তু অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি। শুনুন বলি : এই গিয়াসুদ্দিন ছিলেন সীমান্ত প্রদেশের একজন শিপাহশালার। খিলজী বংশের শেষ সুলতান মুবারক শাহকে হত্যা করে তাণ্ডব শুরু করল একজন দেশীয় পারিয়া-মুসলমান, খুসরভ শা। আগে সে ছিল হিন্দু। দিল্লীতে ত্রাহি ত্রাহি রব। শেষে

মুসলমানদের আকুল আবেদনে সাড়া দিয়ে গিয়াসুদ্দিন খুসরভকে জাহান্নামে পাঠালেন : কৃতজ্ঞ দিল্লীর আমীরেরা বললেন, আমাদের জান মান বাঁচিয়েছেন আপনিই, এবার তক্তে বসুন। কিন্তু গিয়াসুদ্দিন ছিলেন এত ভাল মানুষ যে, সিংহাসনে বসতে চান না। জোর করে বসানো হল তাঁকে সিংহাসনে। সিংহাসনে বসে কিন্তু তিনি শাসনের মত শাসন করলেন। দুর্বলতা দেখালেন না এতটুকু। আগের জালিমটা (খুসরভ শা) টাকা ছড়িয়ে দিল্লীর আমীরদের হাত করতে চেয়েছিলেন। নতুন সুলতান হুকুম করলেন—খুসরভের কাছ থেকে যারা টাকা নিয়েছে তাদের টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে। ফিরিয়ে দিলেন সবাই। শুধু ফেরৎ দিলেন না একজন দরবেশ, শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া। বললেন, টাকা নেই। আমি সঙ্গে সঙ্গেই দরিদ্রদের বিলিয়ে দিয়েছি। কিন্তু গিয়াসুদ্দিনের বিশ্বাস হল না। মনে মনে রেগে থাকলেন খুব। আউলিয়া সাহেব এমন অনেক কাজ করতেন যা মুসলমান ধর্ম অনুমোদন করে না। তিনি মুসলমান মৌলভিদের দিয়ে আউলিয়ার বিচার করতে চাইলেন। কিন্তু এত ভয় পেত আর শ্রদ্ধা করত সকলে নিজামুদ্দিন আউলিয়াকে যে, কেউ তাঁর বিরুদ্ধে যেতে সাহস পেল না। সুলতান ক্ষুণ্ণ হলেন। মনে মনে আরো রেগে গেলেন। সুযোগ খুঁজতে লাগলেন শাস্তি দেবার জন্যে। কিন্তু উপায় কি, তাঁর নিজের পুত্র জুনাই ছিল দরবেশ সাহেবের নাম্বার ওয়ান চেলা।

একবার বাংলায় গেলেন সুলতান বিদ্রোহ দমন করতে। কিন্তু বিদ্রোহ দমন করে ফিরে আসবার মুখে শুনলেন—জুনা খুব বেশী মেলামেশা করছে নিজামুদ্দিনের সঙ্গে। নিজামুদ্দিন নাকি জুনাকে বলেছেন, শীগ্‌গীরই সে রাজা হবে। শুনে তো গিয়াসুদ্দিন ক্ষেপে লাল। পুত্রকে ধমকে চিঠি পাঠালেন দিল্লীতে এই বলে যে, ফিরে এসে সকলকে তিনি শাস্তি দেবেন। ভয় পেয়ে জুনা গেল দরবেশ সাহেবের কাছে। নিজামুদ্দিন বললেন, ভয় নেই বেটা। তোর আব্বাজান আর দিল্লীতে ফিরবে না কোনদিন। দিল্লী ওর কাছে অনেকদূর—হনুজ দিল্লী দূর অস্ত্। এঁরাই হলেন দশমাত্রিক জীব। যাঁরা অনন্ত শক্তিকে জাগরিত করে শক্তির dimension বাড়িয়ে অলৌকিকত্ব অর্জন করেন তাঁরা ত্রিকালজ্ঞ হন। হিন্দু-মুসলমান এঁদের কোন জাত বিচার নেই। এঁরা শুধু মানুষ। বরং তারো একটু বেশি। অতিমানব।

সত্যি গিয়াসুদ্দিন আর দিল্লী এসে পৌঁছুতে পারলেন না। বাংলার বিদ্রোহ দমন করে ফিরে আসছিলেন সুলতান। বিজয়ীর অভ্যর্থনার জন্য সাজানো হল তোগলকাবাদ। সহর থেকে কয়েক মাইল দূরে আফগানপুরে জুনা নিজে এগিয়ে গেলেন পিতাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। সাময়িক একটা কাষ্ঠ মণ্ডপ তৈরী করা হল। জুনা তার Special Engineer দিয়ে মণ্ডপ তৈরী করিয়েছিলেন। বাংলা থেকে হাতী এনেছিলেন গিয়াসুদ্দিন। সেই হাতী মণ্ডপে ঢুকতে গিয়ে সমস্ত মণ্ডপটাই পড়ল ভেঙে। পড় তো পড় একেবারে সুলতানের মাথার উপরে।

সুলতানের প্রিয় পুত্র মামুদ খাঁ বসে ছিল বাবার পাশে। সে শুদ্ধ চাপা পড়ল।

রেস্ক্যু স্কোয়াড এসে যখন জঞ্জাল সরিয়ে সুলতানের দেহ উদ্ধার করল, তখনো নাকি তিনি ধুক্‌ছিলেন। বুকের কাছে চেপে ধরে ছিলেন প্রিয় পুত্র মামুদকে। ঐ অবস্থায়ই তুলে এনে গোর দেওয়া হল তাঁদের এই কবরে।

এখানে আপনি কিছু না দেখলেও আমি অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি। আরো কত গল্প। সে-সব আমার অতি পরিচিত।

অঞ্জনা আব্দার ধরল : বল না, সন্তুদা।

বললুম : সে গল্প করতে গেলে সারাদিনে কুলোবে না। যখন প্রয়োজন হবে বলব। এবার চল।

সকলে গাড়ীতে উঠলুম।

অঞ্জনা উঠতে উঠতে বলল : গল্পগুলো কিন্তু সব বলতে হবে।

বললুম : আরো কত দেখার বাকী। সেখানেও গল্প অনেক। বলব, চল।

তোগলকাবাদ থেকে আবার গাড়ী ছাড়ল। আমি ড্রাইভারকে বললুম : বাইরের যত দেখবার জিনিষ সে সব দেখাবে আগে। লালকেল্লাতে ঢুকব সবার পরে। সেখানে একটু সময় লাগবে আমাদের।

ড্রাইভার বলল : আপনাদের যেমন ইচ্ছে।

তোগলকাবাদ থেকে দেখলুম ওখ্‌লা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অফুরন্ত এখানে। পথ থেকে দেখলুম কালকাজী।

শেষে এলুম নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগাতে। ইতিমধ্যেই দেখে এসেছিলাম মহাত্মাজীর স্মৃতি উদ্যান রাজঘাট, আর নেহেরুর শান্তিবন।

আউলিয়ার দরগা মুসলমানদের একটা তীর্থক্ষেত্র। এখানেও সেই ভিখারী, সেই ফুলওয়ালা, সেই পাণ্ডা। পাণ্ডা এখানে গাইডের ছদ্মবেশে।

গাড়ী থেকে নামতেই ফুলওয়ালারা চেঁচাতে লাগল : ফুল নিন, ফুল নিন। ভিক্ষারীরা ঘিরে ধরল : পয়সা দাও।

অঞ্জনা বলল : এ যে দেখছি কালীঘাট!

বললুম : তা তো বটেই। আমরা এখানে ইতিহাসের কাছে এসেছি, ওরা এসেছে তীর্থে।

অঞ্জনা বলল : ফুল কিনব নাকি সন্তুদা?

বললুম : নিশ্চয়ই। দরগাটা কার জানো? নিজামুদ্দিন আউলিয়ার। এই-মাত্র তাঁর গল্প বললুম না তোগলকাবাদে?

অঞ্জনা আশ্চর্যভাব করে বলল : সেই নিজামুদ্দিন!

—হ্যাঁ তিনি, যিনি সুলতানকে পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছাশক্তিদ্বারা দিল্লীতে ঢুকতে দেন নি। মুসলমানদের কাছে এরকম বড় দরবেশ খুব কমই আছে। এতটা সম্মান ছিল আউলিয়া সাহেবের যে, তাঁর পার্শ্বে নিজেদের কবর হোক, এমন আশা অনেকেই পোষণ করতেন। এর আশেপাশে অনেক সুলতান বাদশার কবর আছে সেইজন্যে।

অঞ্জনা আর কোন প্রশ্ন না করে কয়েক আনার ফুল আনতে গেল।

মিনু সেই ফাঁকে বলল ঃ সব কথা ইতিহাস থেকে বলছ না বানিয়ে বলছ ?

—তোমার কি মনে হয় ?

—তোমাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না।

বললুম ঃ Facts are stranger than fiction, একথা মনে রেখ।

কথা বলতে বলতে অঞ্জনা ফুল নিয়ে এল।

সুনীলবাবু বললেন : নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগার নাম আছে। আমাদের দেশের মুসলমানেরা মানত করবার জন্য এখানে অনেকে আসতো জানতাম। চল সমাধিটা দেখে আসি।

রাঙামাসী আমাকে বললেন ঃ আমিও যাব ?

রাঙামাসীর মনের দ্বন্দ্ব বুঝতে পারি। বললুম ঃ মাসী, প্রকৃত সাধু সন্তরা সব জায়গাতেই এক। তুমি নিশ্চিন্তে চলে আসতে পার। জেনে, তাতে তোমার পুণ্যের মাত্রা বাড়বে বই কমবে না।

দরগায় পা দিতেই গাইড ধরল ঃ আসুন, আমিই এ দরগা দেখাশুনা করি। সব দেখাব ঘুরে ঘুরে।

হিন্দুদের পাণ্ডা হলে ধমকে উঠতুম নিশ্চয়ই। কিন্তু মুসলমানদের ব্যাপার। রীতিনীতি জানি না। গাইড প্রয়োজন।

ভেতরে ঢুকলুম। ঘোরানো গলির মত পথ দিয়ে যেতে হয়। পথের ধারে ধারে ভিখারীর ভীড়। একটা বড় পুকুর। শেওলা পড়া পচা জল। দুর্গন্ধ উঠছে। সেই জলে দেখি দিব্যি স্নান করছে কয়েকজন।

গাইড বলল এই পুকুরের জলে স্নান করলে সব রোগ সেরে যায়।

মনে মনে ভাবলুম সবই বিশ্বাস। এই পুকুরে স্নান করলে আমার তো সঙ্গে সঙ্গেই রোগের সৃষ্টি হবে। আসলে ধর্ম কর্ম যা-ই বলি, বিশ্বাস থেকে যে আত্মশক্তি জাগ্রত হয়, তারই ফল পাই। নইলে কলকাতায় কলুষিত গঙ্গার জলে স্নান করে পুণ্য করার চাইতে চর্মরোগ হবার বেশি সম্ভাবনা। তবু তো নিত্য সেখানে প্রাতঃস্নানের কমতি নেই। বিজ্ঞানীদের সতর্কবার্তাও সংস্কারের কাছে হার মেনে গেছে সেখানে।

দরগার মূল অঙ্গনে প্রবেশ করতে ডানদিকে একটি প্রাচীন সৌধ। গাইড বলল ঃ সুলতান আলাউদ্দিন এটা তৈরী করে দিয়েছেন।

মনে মনে হাসি পেল। ভাল গাইড নিয়েছি। ওরা সব বুঝল কিনা কে জানে, কিন্তু আমার বুঝতে বাকী থাকল না।

নিজামুদ্দিন আউলিয়া গিয়াসুদ্দিন তোগলকের আমলের লোক। মারা গেছেন মহম্মদ তোগলকের আমলে। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর সময় ১৩১৬ খৃষ্টাব্দ। গিয়াসুদ্দিনের ১৩২৫ খৃষ্টাব্দ। আলাউদ্দিন কি করে সমাধি সৌধ তুললেন ? অবশ্য

হতেও পারে। পূর্বাহ্নেই হয়তো সমাধি সৌধ নিজেই শুরু করেছিলেন তোগলকাবাদে। কিন্তু গাইডদের বর্ণনার মধ্যে ক্রনোলজিকাল ত্রুটি থাকে হাস্যকর ভাবে। গৌড়ে কদম রসুল (কবরখানা) দেখতে গিয়ে লক্ষণ সেন আর গৌড়ের সুলতানদের পাশাপাশি বসিয়ে ছেড়েছিল সেখানকার গাইড। অথচ এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, লক্ষণ সেনকে বিতাড়িত করেই মুসলমানেরা গৌড়ে আসে। ইতিহাসও বিশ্বাসে নতুন রূপ নেয় বৈকি। তাই তো নারদ বাল্মীকিকে বলতে পারেন :

"যা রচিবে তাই সত্য তুমি—
কবি তব মনোভূমি রামের জনম স্থান
অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেন"

পাণ্ডা এবং গাইডদের জ্ঞান বুদ্ধি সর্বত্রই এক। কালীঘাটে বিদেশীরা মাতৃমূর্তি দেখতে এসে যে বর্ণনা শোনে সেটা যে কোন ধর্মের পক্ষেই লজ্জার বিষয়। মহামায়ার সেই মায়ার খবর রাখে কে? primordial এনার্জি Blackhole থেকে বেরিয়ে গিয়ে, যে সময় সৃষ্টি করে—কালের জন্মদাত্রী হিসেবে কালী হয়েছেন এ খবর ভারতের কোন পাণ্ডারই জানা নেই। তাঁর কালো রঙ যে পাঁচলক্ষ বছরের ধাবমান অন্ধকার স্রোত এটা সাধুসন্তরাই জানে না তো পাণ্ডা কোন্ ছাড়। কালীর গলার পঞ্চাশটা মুণ্ড এবং হাতের একটি, সর্বসাকুল্যে এই একান্নটি মুণ্ডকে, শক্তির একান্নটি quantum leap একথা তাঁরা চিন্তা করতেও পারে না। কালীর চার হাত যে symmetry breaking-এর চারটি শক্তি—Strong nuclear force, weak nuclear force electromagnetic force এবং gravity—একথা বহু ভারতীয়ের মস্তিষ্কে আজও আসা সম্ভব নয়। এবং পুরাণের কাহিনীই তাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে আছে। কল্পনা এখানে সত্য অপেক্ষা অনেক বড়।

আমার আত্মমগ্নতা ভাঙলো গাইডের কথা শুনে।

—এই নিজামুদ্দিন আউলিয়ার কবর। ইনি অসাধ্য সাধন করতে পারতেন মাথাটা নোয়ালুম একটু। অঞ্জনা ফুল ছড়িয়ে দিল। দেখলুম, রাঙামাসীও হাত জোড় করে নমস্কার করছেন।

—ইনি আমীর খসরু।

অঞ্জনা আর মিনু দু'জনেই আমার দিকে তাকাল : আমীর খসরু কে সন্তুদা?

বললুম : মস্ত বড় কবি। ভারতে ইনিই প্রথম উর্দু কবি। ভারতবর্ষের মুসলমান যুগের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন, এঁর কথা তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন। ফারসী ভাষাতে যাঁরা কবিতা রচনা করেছেন তাঁদের সবার চেয়ে এক বাক্যে ইনি বড়। আসল নাম ইয়ামিন উদ্দিন মহম্মদ হাসান। আমীর খসরু বা খুসরও নামে বেশী পরিচিত। জাতিগতভাবে তুরস্কের লোক। এঁর বাবা তুর্কীস্তানের কাশ নামক নগরীর অধিবাসী। চিঙ্গিস খাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গলেরা মধ্য এশিয়া উৎখাৎ করে দিলে ভারতে এসে আশ্রয় নেন। পাতিয়ালাতে ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে কবির জন্ম হয়। আলাউদ্দিন খলজির দরবারে

সভাকবির চাকুরী নেন তিনি। কিন্তু শেষ জীবনে দরবারের চাকুরী ছেড়ে দেন। পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষাও পরিত্যাগ করেন এবং নিজামুদ্দিন আউলিয়ার শিষ্য হন। চল্লিশ হাজারেরও বেশী কবিতা তিনি লেখেন। মৃত্যুর পর নিজামুদ্দিনের পাশেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়েস হয়েছিল বাহাত্তর। ইনি হিন্দীতেও কবিতা লিখতেন।

গাইড বাংলা বোঝে না। তথাপি আমি যে আমীর খসরুর কবর সম্পর্কে কিছু জানি সেটা সে বুঝল। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বলল : Do you know him ?

—Yes I know.

এগিয়ে গেল সে আর একটি কবরের পাশে : জাহানারার কবর। Jahanara's Tomb !

আমার নিজেরই যেন চমক লাগল : জাহানারা ! শেষে এইখানেই সেই ভাগ্যহীনা রমনী শুয়ে আছেন ? হায় রে দুর্ভাগিনী শাহজাদী, তোমার সব থেকেও কিছু ছিল না।

অঞ্জনাকে বললুম : অঞ্জনা, ফুল আছে ?

—কেন ?

—দাও না।

—সব যে আউলিয়ার সমাধিতে দিয়ে এলুম।

—কিন্তু এখানেও যে দিতে হবে।

মিনুর হাতে দুটো ফুল ছিল। বলল : এই নাও।

বললুম : এই জাহান আরা। নাম নিশ্চয়ই জান। মোগল হারেমে ঐ একটি মাত্র নারী, যিনি সন্ধ্যাদীপের মত জ্বলেছেন।

ফুল ছড়িয়ে দিলুম কবরের উপর : হে শাহজাদী, তোমার আত্মা বেহেস্তে শান্তি লাভ করুক। সেই দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের যে উত্তাল তরঙ্গে ক্ষতবিক্ষত হয়ে তুমি নিঃসঙ্গিনী অবস্থাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছ—সে বেদনা তোমার দূর হোক।

মিনু আর অঞ্জনাকে বললুম : জান, ভাল কবি ছিলেন জাহান আরা। বেদনার করুণ মুহূর্তগুলিকে তিনি তাঁর শায়েরের মধ্যে রেখে গেছেন। সব হারিয়ে তিনি রিক্তা হয়ে ছিলেন। কোন আকাঙ্ক্ষা রাখেন নি আর। মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র প্রার্থনা ছিল :

> সৌধ তুলে দিও নাক, আমার কবর ঢাকবে ঘাসে,
> ভাগ্যহীনার যোগ্য কবর, এই ছাড়া আর কিইবা আছে।

এর আরো একটি সুন্দর বয়েত আছে :

> মেদি পাতা সে স্নিগ্ধ শ্যামল, ও যে শুধু ওর বাহিরে
> ভিতরে অবাক শুধু রক্তরাগ, দেখি না আমরা চাহি রে !

ঔরংজেবের কন্যা জেবুন্নেসার মধ্যেও এই বেদনার ছায়া ছিল।

সুনীলবাবু বললেন : বাঃ ! কবিতাগুলো অনুবাদ করল কে হে ?

আমি কোন কথা বলতে পারলুম না।

অঞ্জনা বলল : তুমি জান না বুঝি বাবা, কাল বললুম না, সন্তুদা নিজেই কবিতা লিখতে পারে।

—তাই নাকি ?

সলজ্জভাবে বললুম : লিখতুম আগে।

—এ অনুবাদও তোমার ?

—আজ্ঞে। অনেক ছোট বেলায় স্কুলে পড়তে অনুবাদ করেছিলুম।

—বল কি হে। এ কথাটা তো আগে জানি নি। বাঃ ভাল, ভাল। তোমার উন্নতি হোক। খুব ভাল লাগল অনুবাদ দুটি। আমায় দিও তো, টুকে নেব। সত্যেন দত্ত এমন সুন্দর অনুবাদ করতে পারতেন।

সলজ্জভাবে বললুম : আচ্ছা।

অঞ্জনাকে দেখি দুটো উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

গাইডের কণ্ঠ শুনলুম : Padisha Mohammod Shah's Tomb.

এগিয়ে গেলুম। অঞ্জনা আর মিনু দুজনেই বলল : চেন নাকি ?

বললুম : চিনব না ? ইনি একজন হতভাগ্য মোগল বাদশা। এঁরই আমলে নাদির শা ভারত আক্রমণ করে তছনচ্ করে দিয়েছিলেন। চরিত্রগত ভাবে নিতান্তই দুর্বল ছিলেন এ সম্রাট। বাজারের একজন বাঈজী—উধমবাঈকে সাদি করেছিলেন। সাম্রাজ্যের মর্যাদা তাতে আরো নেমে গিয়েছিল। সেই বাঈজীর পুত্র ছিলেন আহম্মদ শা, তিনিও বাদশা হয়েছিলেন।

অঞ্জনা বলল : কার পরে মহম্মদ শা, বল দেখি ?

ফিরিস্তি দিলুম : ঔরংজেবের পর বাহাদুর শা, তারপর জাহান্দার শা, তারপর ফররুক শিয়র, তারপর মহম্মদ শা, তারপর...

অঞ্জনা বলল : এ যে অনেক দেখছি, ঔরংজেবের পরে আর কারো নামই তো জানি না।

বললুম : জান অঞ্জনা, মোগল ইতিহাসকে আমি কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। বাবর থেকে আকবর, সংগ্রাম। জাহাঙ্গীর থেকে শাজাহান, বিলাস। ঔরংজেব থেকে দ্বিতীয় বাহাদুর শা, ট্র্যাজেডি। বুঝলে, মোগল ইতিহাস যদি আকর্ষণীয় কোনখানে হয়ে থাকে, সেটা তার বীর্যে নয়, কর্মে নয়, বিলাসেও নয়—সে শুধু অশ্রুতে। সেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিও সেখানে দাঁড়াতে পারে কিনা আমার সন্দেহ আছে। চল লাল কেল্লায়, সে-সব কিছু কাহিনী বলব সেখানে।

অঞ্জনা বলল : তোমার গল্প বলার ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে এখানেই বসে পড়ি। সত্যি, বলার কায়দাটা তুমি ভাল ম্যানেজ করেছ সন্তুদা। কোথায় শিখলে ?

মিনু বলল : অত গ্যাস দিস নি। ফুলে উড়ে যাবে, তখন আর নাগাল পাওয়া যাবে না।

অঞ্জনা একটা দুষ্টু হাসি চোখে ছড়িয়ে মিনুকে বলল : তাতে আমার ক্ষতি কি ? সন্তুদা তো আমার হাতের বাইরে। যাবে তোর যাবে।

চোখের দৃষ্টিতে একটা শাসানী টেনে এনে মিনু তাকাল অঞ্জনার দিকে, কোন কথা বলল না।

দরগা দেখা শেষ হতে গাইড একটা খাতা নিয়ে এল : বাবুজী, অপিনিয়নটা লিখে দিন।

পাতা উল্টে দেখলুম, ভিজিটরস্ অপিনিয়নে ভরা।

কি লিখব ? বাংলা লেখা এখানে অর্থহীন যদিও কাঁচা বাংলা হরপ সেখানে অনেক আছে। অল্প শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান যাঁরা আসেন, তাঁদের অভিমত। আমি ইংরেজীতে ছোট করে লিখে দিলুম : "MD. S. the present guide of Nizamuddin Aulia's Dargah is a nice man. His profound knowledge has charmed me. I belive that Dargah runs very well under his management." S Mukharjee.

অঞ্জনা বলল : সে কি সন্তুদা! গাইডের কাজ করলে তুমি, আর প্রশংসাটা দিচ্ছো ওকে!

বললুম : এটাই এটিকেট।

গাইড বলল : বাবুজী, কিছু donation দিন।

—ডোনেশান, সে কি!

—সব ভিজিটররাই দেন। এই দেখুন।

—না না, দেখার প্রয়োজন নেই। একটা টাকা বের করে দিলুম।

—এক টাকা!

—আবার এলে দেব।

—আর কিছু দিন।

বললুম : আবার এলে দেব। এখন হাতে নেই।

গজ্ গজ্ করতে লাগল গাইড। কিন্তু সে দিকে দৃকপাত না করে বাইরে বেরুবার জন্য পা বাড়ালুম।

হঠাৎ পাশে বাংলা কথা শুনে চমকে উঠলুম : বাবুদের বাড়ি কোথায় ?

দেখি, একজন মধ্যবয়স্ক মুসলমান। বললুম : কলকাতা।

—আমার বাসা রাজাবাজার।

—তীর্থে এসেছেন বুঝি ?

—আজ্ঞে বাবু। আজমীর গিয়েছিলাম। ফিরতি পথে দিল্লীতে এসেছি। প্রতিবারই আসি। এখানকার মুয়াজ্জিন খুবই ভাল।

বক্তার সাইকোলজিটা সঙ্গে সঙ্গেই ধরতে পারলুম। ধর্মাধর্মের ঊর্ধ্বে বিদেশে বাঙ্গালী দেখে তার বড় আনন্দ হয়েছে। দোরগোড়া পর্যন্ত সে আমাদের এগিয়ে দিলে।

ভিখারীরা ঘিরে ধরল : পয়সা, পয়সা ।

কিন্তু সেদিকে আমরা কর্ণপাত করলুম না। অবচেতন মনে নিশ্চয়ই ধর্মবোধটা কাজ করছিল ।

হতাশ ভিখারীদের মধ্যে কে একজন বলে উঠল : বাঙ্গালী লোকেরা এমনই হয় ।

হঠাৎ সেই বাঙ্গালী মুসলমানটিকে প্রতিবাদ করতে শুনলুম : এই বাঙ্গালীকে দুষ্‌বিনে। সাবধান ।

—পয়সা দিলে না কেন ?

বেশ করেছে, যা ।

ধর্মাধর্মের উর্ধ্বে ভাষার একটা আত্মীয়তা আছে। সেটা কম নয়, এটা বুঝলুম। আবার গাড়ী চাপলুম। বিরাট একটা সৌধের কাছে এসে গাড়ী থামল ।

অঞ্জনা বলল : এটা কি ?

—হুমায়ুনের সমাধি ।

নামলুম সকলে ।

গেট পেরিয়ে ভেতরে সবুজ ঘাসের লন। লন পার হয়ে সমাধি। স্থাপত্য কৌশল অপূর্ব এই সমাধির। গম্বুজ যেন তাজমহলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য তাজমহল এখনো চোখে দেখি নি ।

মিনু বলল : এ সম্বন্ধে তুমি কিছু জান নাকি, সন্তুদা ? তুমি তো সবজান্তা ।

বললুম : কিছু নিশ্চয়ই জানি, তবে সব জানি না। হুমায়ুন নিজে এই জায়গা তাঁর সমাধিক্ষেত্র নির্মাণের জন্য পছন্দ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তার পত্নী হাজি বেগম এটা তৈরী আরম্ভ করেন। শেষ করেন আকবর। তখনকার দিনে এটা তৈরী করতে ব্যয় হয়েছিল পনের লক্ষ টাকা। আকবর নিজে শিল্পী ছিলেন, তাই ওই সৌধে একটা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এখানে একটা কলেজও ছিল শুনেছি। চল ভেতরে যাই ।

—চল ।

চলতে চলতে অঞ্জনাকে দেখি লুব্ধ দৃষ্টিতে সবুজ লনের দিকে তাকিয়ে আছে। বললুম : দিল্লীর সব দর্শনীয় জায়গাতেই এমন লন দেখতে পাচ্ছি। বেড়াবার পক্ষে দিল্লী খুব প্রশস্ত দেখছি। দিল্লীতে যারা থাকে, বিকেল বেলাটা তাদের ভালই কাটে বোধ হয়। বিশেষ করে কপোত কপোতির। এমন জায়গাতে কপোত কপোতির মত নিবিষ্ট হয়ে বসলে বেশ ভাল জমবে মনে হয় ।

কথাগুলো বলেই হঠাৎ লজ্জা পেলুম। মেশোমশাইরা শুনলেন না তো ! পিছনে তাকিয়ে নিশ্চিত হলুম, ওরা এখনো একটু দূরে ?

অঞ্জনা বলল : অধ্যাপক হয়েও তোমার মনে এই ! সন্তুদা ?

বললুম : অধ্যাপক বলে যৌবনটা তো এখনো আমার যায় নি ।

মিনু বোধহয় একটু রাগ করল। বলল : খুব দেখি মুখ খুলেছে তোমার ।

ভাবলুম এমন রসিকতা অন্যায়ই হয়ে গেছে। তাই চুপ করে গেলুম।

আর কয়েক পা এগুতেই উঠলুম সমাধি প্রাঙ্গণে। গম্বুজের ঠিক নীচে বাদশা হুমায়ুনের সমাধি।

মিনু আর অঞ্জনা গভীর শ্রদ্ধায় সেই সমাধির দিকে তাকাল।

পাশেই সিঁড়ি দেখে বললুম : দাঁড়াও, একটু ওপরে ঘুরে আসি।

অঞ্জনা বলল : বারে, আমরা যাব না মনে করেছ না কি। চল্ মিনু, ওপরে উঠি।

মিনু বলল : আমি ওপরে উঠছি না, তুই যা।

অঞ্জনা বলল : এখনি বুড়ো হয়ে গেছিস্ নাকি ? কি যে হয়েছিস্ ?

আমি ততক্ষণে দু'পা উঠে গেছি। পেছন পেছন এল অঞ্জনা।

দ্বিতলে উঠে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখতে সত্যি ভালই লাগে। কিন্তু কেমন যেন গা ছমছম ভাব। লোকজন খুব নেই কি না। দু একটা ছোট ছোট ছেলে। স্থানীয় বোধহয়। দেখি, ওপরে উঠেছে।

একটা আশ্চর্য কৌশলে দ্বিতল সৃষ্টি। ভয় দেখানো কারবার আর কি। নামতে গিয়ে আর পথ পাই না। চতুর্দিকেই পথ, অথচ পথের সন্ধান মিলছে না। আশ্চর্য স্থাপত্য কৌশল তো !

বললুম : অঞ্জনা, পথ পাচ্ছি না যে। আমি একটু ভয় পেয়ে গেলুম।

অঞ্জনার মুখে হাসি : ভালই হল। এখানে দু'জনে আটকে থাকব। পথ না পেলে আমি দুঃখ করব না।

অঞ্জনার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালুম। এই সেই কাশীর স্টেশনে দেখা অঞ্জনা ! কাশী থেকে হরিদ্বার, হরিদ্বার থেকে দিল্লী। কত আপন হয়ে গেছে সে ইতিমধ্যে ! অথচ ছেড়ে তো আমাদের যেতেই হবে !

আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে অঞ্জনা। বলল : কি ভাবছ সন্তুদা ?

বললুম : ভাবছি, কেন মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় হয়।

—কেন ? একথা ভাবছ কেন ?

—এই ধর কাশীর আগে তোমাকে জানতুমও না। কাশী থেকে দিল্লী, এরই মধ্যে কত আপন হয়ে গেলে। অথচ আবার তো তুমি চলে যাবে।

—ভালই তো, তোমার সামনে থেকে একটা কাঁটা দূর হবে।

বললুম : অমন করে বোল না, অঞ্জনা। তুমি বুঝবে না, এই বিচ্ছেদে সেদিন আমি কত ব্যথা পাব।

অঞ্জনার চোখেও একটা ম্লান বেদনা ফুটে উঠল। ধীরে ধীরে সে চোখ তুলে বলল : এ পরিচয় না হলেই ভাল হত, না ?

বললুম : তোমার ব্যথা লাগবে না, অঞ্জনা ?

অঞ্জনা বলল : সে কথা আর তোমাকে বুঝিয়ে বলতে চাই না, সন্তুদা। সে কথা আমার মনের মধ্যেই থাক।

বললুম : আজ বুঝি Browning-এর 'The Last Ride Together'-এ মুহূর্তকে অনন্তে তৈরী করবার সাধ জেগেছিল কেন কবির মনে। আমারও মনে হচ্ছে আমাদের এ যাত্রা যদি কোনদিন শেষ না হত!

সে কথার কোন উত্তর দিল না অঞ্জনা। শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। একটু নীরব থেকে বলল : কলকাতায় গেলে আমাদের বাসায় যেও।

—যাব।

আবার চুপ করল অঞ্জনা। কি একটু ভাবল। যখন মুখ তুলে তাকাল, দেখি, চোখে অশ্রুর আভাস।

ডাকলুম : অঞ্জনা।

—মিনুকে ব্যথা দিও না তুমি সন্তুদা, এই আমার অনুরোধ।

আমার মনে হল, আমিও সেই মুহূর্তে কেঁদে ফেলব।

অঞ্জনা বলল : চল।

—পথ খুঁজে পাচ্ছি না যে।

—পাব, চল।

পথ পেলুম ভাগ্যে। সেই বাচ্চা ছেলেদুটো নামছিল। তাদের পেছন ধরে পথের সন্ধান পেলুম। হাতের কাছেই পথ, অথচ খুঁজে পাচ্ছিলুম না। সত্যি যে স্থপতি এ সমাধি তৈরী করেছিল তার বাহাদুরী ছিল।

নীচে নেমেই অঞ্জনা একদম পাল্টে গেল : বাব্বা! গিয়েছিলুম আর কি।

সুনীলবাবু বললেন : ব্যাপার কি?

—একটু ওপরে ওঠ, বুঝবে।

—কেন?

—কি সাংঘাতিক, নামবার সময় আর পথ খুঁজে পাইনে। ভাগ্যিস ছেলে দুটো ছিল।

আমিও সায় দিয়ে বললুম : সত্যি, আশ্চর্য কৌশল, মেসোমশাই। এবার বুঝতে পাচ্ছি কেন সিপাহী বিদ্রোহের পর বাহাদুর শার ছেলেরা হুমায়ুনের কবরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সমাধিগুলো শুধু সমাধি নয়, এক একটা দুর্গও।

সুনীলবাবু বললেন : আশ্চর্য তো!

অঞ্জনা বলল : হ্যাঁ বাবা, আশ্চর্য। আর কোন সমাধির দোতলায় উঠছি না।

মিনুর মুখে একটা সন্দেহের কালো ছায়া লক্ষ্য করছিলুম, কিন্তু আমাদের কথা শুনে সেটা সরে গেল। সে অঞ্জনাকে বলল : সবটাতেই তোর বাড়াবাড়ি। বললুম তখন যাসনে।

অঞ্জনা হেসে বলল : আমি না গেলে আরো বিপদ হোত। সন্তুদা হয় তো নামতেই পারত না।

মিনু বলল ঃ ভাল হত। ইতিহাস জানে বলে যেন ইতিহাসের অলিগলিও ওর জানা আছে।

উত্তর দেবার কিছু নেই। আমার মনের মধ্যে তখন অন্য ঢেউয়ের আন্দোলন। সেই আন্দোলনটাকে আড়াল করতে হবে।

আবার গাড়ী। গাড়ী থামল অতি প্রাচীন এক কেল্লার কাছে।

— এটা কি ?

ড্রাইভার বলল ঃ ইন্দ্রপ্রস্থ।

-- মানে ? সেই মহাভারতের পাণ্ডবদের রাজধানী !

—জী বাবুজী।

গাড়ী থেকে লাফিয়ে নামলুম। বলে কি ! সেই প্রাগৈতিহাসিক কালের নিদর্শন আজো বেঁচে আছে। প্রাচীন ভারতের সেই হারানো সভ্যতার কেন্দ্র তাহলে এই ! দিল্লীর কাছেই কুরুপাণ্ডবের রাজ্য ছিল জানতুম। কিন্তু তার অস্তিত্ব আজো মহাকালকে অতিক্রম করে বেঁচে আছে, কে জানতো ! রাঙামাসীকে ডাকলুম ঃ রাঙামাসী তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নামো, পরম পবিত্র তীর্থ। ঐ সামনে পাণ্ডবদের রাজধানী।

মাসী বললেন ঃ ঠিক বলছিস তো ? শুধু তো কবরই দেখে আসছি।

বললুম ঃ নাম, এটা কবর নয়।

নামলেন রাঙামাসীরা, সুনীলবাবু, বীরেনদা। অঞ্জনা আর মিনু আমার সঙ্গেই নেমেছিল। দুর্গের দেওয়াল ছাড়া আর কিছু নেই প্রকৃতপক্ষে। প্লেটে পরিচয় লেখা। খ্রীস্টপূর্ব তিন হাজার বছর পূর্বে এখানে ছিল আসল ইন্দ্রপ্রস্থ। সে দুর্গ নেই। নেই সে প্রাসাদের চিহ্ন। কিন্তু নামটা আছে। এটা নিঃসন্দেহ যে, এখানেই ছিল সেই রাজধানী। ইন্দ্রপ্রস্থের এক পাশে বর্তমান দুর্গ। হুমায়ুন আরম্ভ করেছিলেন, শেষ করেন শেরশাহ। দুর্গের অভ্যন্তরে শেরের একটি মসজিদ ছাড়া আর কিছু নেই। এখানে ওখানে ঢিবি পড়ে আছে। সেইসব প্রাচীন অট্টালিকাশ্রেণীর চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু এইখানেই তো সেই ময়দানব তার স্থাপত্যজাদু দেখিয়েছিল। এইখানেই কোথাও দুর্যোধন হয়েছিল অপমানিত। ওধারে হয় তো কোথাও ছিল দ্রৌপদীর রন্ধনশালা। রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠির। ভীষ্মের আজ্ঞায় দ্বারকার রাজা কৃষ্ণকে দিয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। তরবারি খুলে শিশুপাল জানিয়েছিলেন প্রতিবাদ। শ্রীকৃষ্ণ...মনের আঙ্গিনায় সমস্ত মহাভারত যেন ছবি হয়ে ফুটে উঠছিল চলচ্চিত্রের মত।

— সন্তুদা !

চমকে উঠলুম। ভাবতে ভাবতে আমি যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছিলুম। সেই কয়েক হাজার বছরের হারানো অতীতের মধ্যে বিচরণ করছিলুম আমি।

—কি ভাবছিলে তুমি ?

—না, কিছু না। কেমন যেন সেই হারানো দিনের সুর বেজে উঠছিল।

মিনুরা সেই দূরে মসজিদের কাছে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে অঞ্জনা। আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়েছে সে-ই।

অঞ্জনা বলল : সত্যি তুমি ঠিক সাধারণ মানুষের মত নও, সন্তুদা। তুমি যখন স্বপ্ন দেখ, তোমার ধ্যানগম্ভীর মূর্তিকে তুমি কখনো নিজে দেখ নি, দেখলে বুঝতে পারতে তুমি কি। আমি দেখছি আর মুগ্ধ হয়ে তোমায় ভালবাসছি সন্তুদা!

বললুম : আমি কিছু জানি না. বুঝিও না, অঞ্জনা। কখনো কখনো এই নিখিল বিশ্বের হৃদয় থেকে কি এক ধ্বনি উঠে আমাকে ব্যাকুল করে দেয়, আমি হারিয়ে যাই। লোকে ঠিক বোঝে না। আমিও বোঝাতে পারি না।

অঞ্জনা বলল : তুমি অধ্যাপক নও, ঐতিহাসিকও নও, আসলে তুমি কবি। তোমার সমস্ত সত্তায় জড়ানো মরমিয়া আবেদন।

সুনীলবাবুরা ফিরে এলেন মসজিদ দেখে। আমাকে দেখে তিনি বললেন : এই যে সনৎ, তুমি এখানে কি করছিলে?

অঞ্জনা বলল : পাণ্ডবদের রাজপ্রাসাদটা কোথায় ছিল সেই location খোঁজ করছিল সন্তুদা!

সুনীলবাবু বললেন : তা হবে, ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আলাদা। চল।

আবার এসে গাড়ীতে চাপলুম সকলে।

—এবার কোথায়?

—চলুন, অনেক দেখবার আছে। ঐ ফিরোজ কোটলা। ফিরোজ তোগলকের রাজধানী। ঐ অশোক স্তম্ভ। নামবেন?

মিনু বলল : না সন্তুদা, এখানে আর নেমে দরকার নেই। তাহলে সারা দিনে কুলোবে না। গাড়ী বরং এখানে ধীরে ধীরে চলুক, দেখে যাই।

ড্রাইভারকে সে কথাই বললুম।

অঞ্জনা বলল : ফিরোজ তোগলক যেন কে সন্তুদা?

বললুম : মহম্মদ তোগলকের নাম শুনেছ তো? পাগলা মামুদ?

—তা আর শুনব না?

—ফিরোজ তোগলক তাঁরই কাজিন। মহম্মদ তোগলকের পর তিনিই সিংহাসনে বসেন। লোকটার সহর তৈরী করবার একটা নেশা ছিল। যেখানে দুদিন করে বসেছেন, সেখানেই একটি করে সহর গড়েছেন। বর্তমানে যেমন A. I. C. C. যেখানেই অধিবেশন, সেখানেই সহর।

—তা অশোক স্তম্ভ এখানে এল কোত্থেকে?

—ফিরোজ তোগলক এনেছিলেন। ১৩৫১ খৃষ্টাব্দ থেকে ৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি এই স্তম্ভটাকে আনেন। ইতিহাসে এর উল্লেখ আছে। তবে অশোক স্তম্ভই

এনেছিলেন, অশোকের সেই অহিংস মানবিকতাকে আনতে পারেননি। হিন্দু জননীর পুত্র হয়েও ফিরোজ ছিলেন অত্যন্ত ধর্মান্ধ। হিন্দুদের দারুন ঘৃণা করতেন।

ফিরোজ কোটলা পার হয়ে গাড়ী বাঁক নিল। গাড়ীর স্পীড দুর্দান্ত।

দূরে কি একটা দেখিয়ে ড্রাইভার বলল : ঐ বিজয় চৌক।

—সে কি ?

—ওখানে শাস্ত্রীজীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়েছে।

দেখতে দেখতে সে অঞ্চল ছাড়িয়ে গেল গাড়ী।

গাড়ী চলেছে।

—কালান মসজিদ।

—এটা কার ?

—ফিরোজ শার। সবচেয়ে প্রাচীন মস্‌জিদ।

গাড়ী তখনো চলছে।

—জুম্মা মসজিদ।

—রোখ গাড়ী।

চোখের সামনে দেদীপ্যমান গম্বুজগুলো জ্বলে উঠল। ইতিহাসের প্রথম পাঠ যে শিখেছে সেও এই মসজিদের কথা জানে! এটা পৃথিবীর অন্যতম সর্ববৃহৎ মসজিদ। দিল্লীতে যখন শাজাহান তাঁর নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন, তখন এই মসজিদ নির্মিত হয়। প্রত্যেক দিন পাঁচ হাজার রাজমিস্ত্রী অনবরত কাজ করে পাঁচ বছরে এ মসজিদ শেষ করে। লাল বেলে পাথর আর শ্বেতপাথর দিয়ে নির্মিত। নেমে ভাল করে দেখে নিলুম। প্রায় দুশ ফিট দৈর্ঘ্য, প্রস্থে একশ কুড়ি ফুট। বিরাট গম্বুজ। দেখলে বিস্ময় জাগে। পাশে দুটি বিরাট মিনার। মসজিদে প্রবেশ করবার জন্যে তিনটি পথ। প্রাঙ্গণের মাঝখানে একটি জলাশয়। নামাজ পড়বার আগে এখানে হাত-মুখ ধুয়ে ওজু করে সকলে। বিরাট প্রাঙ্গণ। হাজার হাজার মানুষ একসঙ্গে বসে নামাজ পড়তে পারে। রাজকীয় প্রবেশ পথ দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই একটা চমক লাগে। অগুন্তি কবুতর নিশ্চিন্তে বাসা বেঁধেছে। দেখবার মত জিনিস। বিশেষ নামাজের দিনে আজো হাজার হাজার মানুষ জড় হয় এখানে।

দেখে সকলেই তৃপ্ত। বেরিয়ে এসে বীরেনদা বললেন : আর বাকি কি ?

ড্রাইভার বলল : বাকি আছে অনেক। একদিনে কি সব দেখা যায়!

এ তো পুরানো, নতুনের তো সবই বাকি এখনো। পুরানোর মধ্যে সফদর জঙ্গের সমাধি বাকি। দেখবার মত। যাবেন ?

সফদর জঙ্গ। পড়ন্ত মোগল সাম্রাজ্যের দিনে এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। বাদশা আহমদ শায় ওয়াজীর ছিলেন তিনি। তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে না গন্না বেগমের কাহিনী ? সফদর জঙ্গ, ইমাদ উল্ মুলক্।

অঞ্জনা বলল ঃ সফদর জঙ্গ কে ? চেন ?

বললুম ঃ চিনব না আবার ! মোগল ইতিহাসের ট্র্যাজেডির সঙ্গে ইনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনিই সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। যেদিন তাঁর ওয়াজিরত্ব গেল, মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘনিয়ে এল সেইদিনই। তার ছেলে সুজাউদ্দৌলা ছিলেন অযোধ্যার নবাব। বক্সারের যুদ্ধে ১৭৬৪ খ্রীঃ ইংরেজরা তাকে হারিয়ে ভারতে তাদের গদি কায়েম করে। ইতিহাসের বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে "Boxer deserves more than plassey to be considered a battle.'' কিন্তু কথা কি জান ? এসব কোন কিছুর জন্যই সফদর জঙ্গকে আমার মনে পড়ছে না। এই সফদর জঙ্গ, সুজাউদ্দৌলা, ইমাদ উল্ মুলক, এদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি ভাগ্যহীনা মেয়ের নাম, গন্না বেগম। সেই সূত্রে সফদর জঙ্গের নামটা চমক লাগিয়েছে আমার মধ্যে।

অঞ্জনা বলল ঃ গন্না বেগম ? সে কে ?

বললুম ঃ সে এক করুণ কাহিনী। শুনবে তো কোথাও বসি, চল। বেলা তো অনেক হয়েছে। সামনে চায়ের দোকান। চল, চা খেতে খেতে গল্প করা যাক।

এ প্রস্তাবটা বীরেনদারও মনোমত হল। তিনি রাজী হয়ে গেলেন। রাঙামাসীদের গাড়ীতে বসিয়ে রেখে আমি, মিনু অঞ্জনা আর বীরেনদা গেলুম চায়ের দোকানে।

অঞ্জনার মন তখন চায়ে নেই, গন্না বেগমের মধ্যে রয়েছে। বসতে না বসতেই সে আব্দার ধরল, গল্পটা বল সন্তুদা।

আমি বলতে আরম্ভ করলুম।

ওদিকে বীরেনদা চা আর খাবারের অর্ডার দিলেন।

তখন ভারতবর্ষের বাদশা মহম্মদ শা, যে মহম্মদ শার সমাধি দেখে এলুম নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগাতে। মোগলদের গৌরবরবি তখন নেই। বাদশার ব্যক্তিত্ব স্তিমিত। নর্তকী আর সিরাজীতে তিনি আসক্ত। বিবাহ করেছেন একজন বাজারের নর্তকীকে, নাম উধমবাঈ। দরবারে নিত্য বিরোধ, তুরাণী আর ইরাণীদের মধ্যে। সেই দিনে ভারতে আশ্রয় প্রার্থনা করতে এলেন পারস্যের এক কবি—আলিকুলি খাঁ। ইরাণে তখন মেষপালক নাদিরের অভ্যুত্থান হয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে বিপ্লব। আলিকুলি ভালবাসতেন একটি মেয়েকে—খাদিজা সুলতান। কিন্তু দস্যু অনুচরেরা খাদিজাকে হরণ করে নিয়ে গেল নাদিরের হারেমে। মর্মাহত কবি এলেন ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষ আশ্রয় দিল তাঁকে। মহম্মদ শার দরবারে সভাকবি হলেন তিনি। বহুদিন বিষণ্ণ থাকবার পর সেখানেই একজন নর্তকীকে বিবাহ করলেন তিনি। সেই নর্তকীও শিল্পরুচির অধীশ্বরী ছিলেন। তাদের একমাত্র কন্যা, তার নাম হল গন্না বেগম। মনের মত করে মা বাবা তাকে মানুষ করলেন। মেয়ে শিখলো নাচ, গান। হল কবিত্বশক্তির অধিকারিণী। অপূর্ব সুন্দরী কন্যা। নাম ছড়িয়ে পড়ল দিল্লীর অভিজাত মহলে। বাদশার পুত্রেরা পর্যন্ত তার পাণি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু মেয়ের বাবা মা এই রূপগুণসমন্বিতা কন্যার স্বামী হিসাবে বাদশা

পুত্রদেরও গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁরা স্বপ্ন দেখতে লাগলেন, বিরাট একজন ব্যক্তির গৃহিণী হবে গন্না। সে হবে সুখী। কিন্তু বিধাতার পরিহাস কে বোঝে। তখন দিল্লীতে অন্তর্কলহ। আলিকুলিকে স্নেহ করতেন নতুন ওয়াজীর সফদর জঙ্গ। বাদশা মহম্মদ শাহের তখন মৃত্যু হয়েছে। নতুন বাদশা আহমদ শা। সফদর জঙ্গ ইরাণী দলের। তার ঘরে যাতায়াত করতেন আলিকুলি। গন্নাকে সফদর জঙ্গ স্নেহ করতেন আপন কন্যার মত। সেইখানে একদিন সূত্রপাত হল ট্র্যাজেডির। সফদর জঙ্গের পয়লা নম্বরের শত্রু তুরাণী নেতা নিজাম উল্ মুলকের মৃত্যু হল দাক্ষিণাত্যে। পারিবারিক কলহে বিব্রত হয়ে নিজামের সতের বছর বয়স্ক পুত্র ইমাদ উল্‌মুলক আশ্রয় প্রার্থনা করল পিতৃশত্রু সফদর জঙ্গের কাছে। সফ্দর জঙ্গ লোক হিসাবে ছিলেন সরল। নির্দ্বিধায় তিনি ইমাদকে আশ্রয় দিলেন। বাদশার দরবারে তাকে একটা উল্লেখযোগ্য পদও দিলেন তিনি। কিন্তু সেই ইমাদই করল শত্রুতা। সফদর জঙ্গের গৃহেই একদিন সে গন্নাকে দেখল। দেখেই মুগ্ধ হল। কিন্তু সে জানতে পারল, সফদর জঙ্গ স্বীয় পুত্র সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে গন্নার বিবাহ দিতে চান। কিন্তু ইমাদ পণ করে বসল, গন্নাকে তার চাই-ই। সে হল সফদর জঙ্গের প্রবল শত্রু। দরবারে ষড়যন্ত্র করে সে ই একদিন কৌশল করে হটিয়ে দিল সফদর জঙ্গকে। তাতে সফদর জঙ্গ ফনা তুলে ধরলেন বাদশা আহমদ শার বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে বাদশা-বাহিনীর নেতৃত্ব করলেন ইমাদ। যুদ্ধ আরম্ভ হল। ইমাদের পরামর্শে বাদশা ইরাণী দলের লোকদের রাজপদ থেকে বরখাস্ত করলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, আলিকুলির পদমর্যাদা আরো গেল বেড়ে। ইমাদ চাইলেন আলিকুলিকে সন্তুষ্ট করে তার কন্যার পাণি গ্রহণ করতে। কিন্তু আলিকুলি তখন সফদর জঙ্গের শিবিরে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সফদর জঙ্গ গেলেন অযোধ্যাতে নিজের সুবাতে। সঙ্গে গেলেন আলিকুলি ও তাঁর পরিবার। যে জন্য ইমাদের এত চেষ্টা, সেই গন্নাকেই সে পেল না। ইমাদ এরজন্য দায়ী করল বাদশা আহমদ শাকে। ফলে বাদশা নিজেই হলেন গদিচ্যুত। নতুন বাদশা বসলেন সিংহাসনে—দ্বিতীয় আলমগীর।

অযোধ্যায় ফিরে বেশী দিন বাঁচলেন না সফদর জঙ্গ। কিন্তু তাঁর মৃত্যুশয্যায় আলিকুলি প্রতিজ্ঞা করলেন, গন্নাকে সুজার হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু সাদি হবার আগেই সফদর জঙ্গ মারা গেলেন। এদিকে ইমাদের সঙ্গে মিটমাটের জন্য আলিকুলিকে পাঠানো হল দিল্লীতে। সপরিবারে আলিকুলি দিল্লী এলেন। ইমাদ যথেষ্টই সম্মান করলেনও আলিকুলিকে। সাদির প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু কন্যা তখন বাগদত্তা সুজার কাছে। আলিকুলি রাজী হতে পারলেন না। এদিকে পাঞ্জাবে বিদ্রোহ দমন করতে গেলেন ইমাদ। পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্রী মুঘলালি বেগম। তার কন্যা উমদাবানুর সঙ্গে বিবাহের চুক্তিতে আবদ্ধ ইমাদ। গন্নাকে সাদি করলে পাছে মুঘলানি ক্রুদ্ধ হন এইজন্য দিল্লীতে ফেরবার সময় তাঁকেও বন্দী করে নিয়ে এল ইমাদ।

ইতিমধ্যে ইমাদের অনুপস্থিতিতে সুজাউদ্দৌলাকে দিল্লীর ওয়াজীর করবার জন্যে

একটা ষড়যন্ত্রে যুক্ত হয়ে পড়েছেন আলিকুলি। এই ষড়যন্ত্রের নেতা ফরাক্কাবাদের নবাব আহমদ বঙ্গাস। ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়ে দ্রুত দিল্লীর দিকে ছুটলেন ইমাদ। এমন সময় বিপর্যয়। হঠাৎ মারা গেলেন আলিকুলি। তার বিধবা স্ত্রী গন্নাকে নিয়ে বিব্রত বোধ করলেন! ইমাদ দিল্লীতে ফিরলে কি শাস্তি দেবে কে জানে। রাত্রির অন্ধকারে দিল্লী ছেড়ে পালিয়ে গেলেন ওরা। গন্না বেগমের সৌন্দর্য ও গুণের কথা তখন দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে। আগ্রার কাছে জাট দস্যু জওয়াহির সিং তাকে বন্দী কববার চেষ্টা করল। কোন রকমে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল গন্নারা আহমদ বঙ্গাসের কাছে। ধুরন্ধর আহমদ বঙ্গাস ইতিমধ্যে ইমাদের সঙ্গে মিটমাট করে নিয়েছেন। গন্নার মা যখন অযোধ্যাতে ফিবে যাবার জন্যে বঙ্গাসের সাহায্য চাইলেন—বঙ্গাস তাকে অন্যরকম বোঝালেন। বোঝালেন, সুজার চাইতে ইমাদ পাত্র ভাল, সেখানেই মেয়ের সাদি দাও। ইমাদ মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে গন্নাকে। গন্নার মা রাজী হলেন। মনে মনে তিনি সুজাকে পছন্দ করতেন না এই কারণে যে, সুজা লম্পট, চরিত্রহীন। বিয়ে হয়ে গেল। সকলেই সুখী। ইমাদের প্রণয়েব স্বপ্ন সফল। কিন্তু হল বিপরীত। বিয়ের রাতে মুঘলানি বেগম পালিয়ে গেলেন পাঞ্জাবে। ইমাদের উপব তিনি ভয়ানক ক্ষিপ্ত। ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে এসেছেন তখন আহমদ শা আবদালি। মুঘলানিকে তিনি 'বেটী' বলে ডাকতেন। স্নেহ করতেন। ইমাদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা মুঘলানি নালিশ করল আহমদ শা আবদালির কাছে। আহমদ শা প্রতিশ্রুতি দিলেন যে এর প্রতিকার তিনি করবেনই। মুঘলানি কি চায়? মুঘলানি জানাল, ইমাদ তার বাগদত্তা কন্যা উমদাবানুকে বিবাহ করুক। আহমদ সেই প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এদিকে আহমদের সংবাদ পেয়ে ইমাদের পক্ষ ত্যাগ করে অনেকে আবদালির পক্ষে যোগ দিয়েছে। আবদালি এগিয়ে এলেন দিল্লীর দিকে। হঠাৎ সংবাদ শুনে দিশেহারা হয়ে পড়লেন ইমাদ। তাড়াতাড়ি সৈন্য সংগ্রহ করে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন আহমদ শাকে। কিন্তু দেখা গেল, তার দলে কেউ নেই। সবাই বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে ত্যাগ করেছে।

দিল্লীর কাছে বাদলিতে শিবির সাজালেন আহমদ। ইমাদকে সস্ত্রীক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। অসহায় ইমাদ বাধ্য হয়ে গেলেন দেখা করতে। আহমদ শা প্রথমেই তাকে তিরস্কার করলেন, অভিজাত ঘরের ছেলে হয়ে নর্তকীর মেয়ে গন্নাকে ইমাদ বিবাহ করেছে বলে। হুকুম দিলেন—ওকে তালাক দিতে হবে। সাদি করতে হবে মুঘলানির কন্যা উমদাকে। অসহায় ইমাদের আর কিছু করবার থাকল না। উমদার কাছে এক কড়ির বিনিময়ে গন্নাকে বিক্রী করে দিলেন ইমাদ। গন্না হল উমদার ক্রীতদাসী। হায়! যার মা বাবা তাদের কন্যাকে সর্বাপেক্ষা বেশী সুখী দেখতে চেয়েছিলেন তার হল এই পরিণাম! সর্বগুণসম্পন্না বিদুষী গন্না নিজেও কি একথা কল্পনা করতে পেরেছিল? প্রেমের স্বপ্ন তার স্বপ্নই থেকে গেল। অনবদ্য রূপ যৌবন আর অপ্রতিদ্বন্দ্বী গুণরাশী নিয়ে সে হল উমদাবানুর ক্রীতদাসী। এইভাবেই তাকে প্রায় আঠার বছর

থাকতে হয়েছিল। তারপর মুক্তি পেয়েছিল। তখন সে বিগত যৌবনা প্রৌঢ়া। গোয়ালিয়রের তের মাইল উত্তরে নুরোবাদে তার কবর আছে। পৃথিবীর কাছে কিছু চায় নি গন্না। শেষ প্রার্থনা করে গিয়েছিল শুধু এইটুকু যে, তার মৃত্যুর পর তার কবরের উপর যেন তার নিজেরই লেখা দুটো পয়ার উৎকীর্ণ করে দেওয়া হয়ঃ ওহ্ ঘম-ই গন্না বেগম—"হায়, গন্না বেগমের জন্য একটুখানি কাঁদ।" কবরের উপর সে অশ্রু আজো আছে।

গল্প শেষ হল। দেখি, রুদ্ধশ্বাসে ওরা শুনছে।

অঞ্জনাকে বললুমঃ কেমন লাগল?

জীবন চঞ্চল এই যে অঞ্জনা, সেও দেখি ম্লান। কোন উত্তর দিল না।

মিনুকে বললুমঃ মিনু, facts are stranger than fiction, একথা কি সত্য বলে মনে হয় না?

মিনু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললঃ হয় তো তাই। জীবনের কতটুকু আমরা জানি বল!

বললুমঃ জীবনের যতটুকু জানি, জীবনাতীতের কথা তাও জানি না। জীবনের ঊর্ধ্বে আছেন অদৃশ্য ভাগ্যনিয়ন্ত্রক—তাঁর খেয়াল বোঝা ভার। চল উঠি এখনও লাল কেল্লা বাকি।

উঠলুম। গাড়ীতে আসতে আসতে অঞ্জনা বললঃ লাল কেল্লাতেও এমন বেদনার কাহিনী আছে বুঝি?

বললুমঃ হাসি কান্না সবই আছে সেখানে। তবে বেদনার চেয়ে আছে নৃশংসতা বেশী। চল, ওখানকার কাহিনী ওখানেই শোনাব।

মিনু বললঃ বেদনার গল্প শুনলে ব্যাথা লাগে। অথচ কি আশ্চর্য, আরো শুনতে ইচ্ছে করে।

বললুমঃ এ-কথা তো শেলী আগেই বলে গেছেনঃ our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

মাথার ওপর তখন সূর্য অনেকদূর উঠে গেছে। আমাদের সকলের দেহেই একটা ক্লান্তি নেমেছে। সুনীলবাবু আমাদের দেখে বললেনঃ এবার কোথায় যাবে সনৎ?

আমি বললুমঃ এবার লালকেল্লা। এই শেষ। আর যা কিছু এ যাত্রায় দেখা হবে না। বহুদিবস ব্যাপী গড়ে ওঠা দিল্লীকে একদিনে দেখবার আশা দুষ্পর্ধা মাত্র।

ড্রাইভারকে বললুমঃ কেল্লা চলো।

গাড়ী এল সেই বিরাট দুর্গের কাছে। লাল পাথরের দেওয়াল। ভেতরে প্রাসাদ। একদিকে সামরিক ছাউনী। মধ্যযুগের সমস্ত দুর্গেই এমন ব্যবস্থা থাকত। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান রাজাদের, বিশেষ করে মোগলদের প্রাসাদই ছিল শিবির, আর শিবিরই প্রাসাদ।

বিরাটায়তন লাল কেল্লার গম্ভীর অবস্থানের দিকে তাকিয়ে অঞ্জনা বলল : লাল কেল্লা কে তৈরী করেন, সন্তুদা ?

বললুম : বর্তমান যে কেল্লা দেখা যাচ্ছে, এটা তৈরী করেন বাদশা শাজাহান। আগ্রায় বছর দশেক থাকবার পর শাজাহান অতিরিক্ত গরমে সেখানে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তখন থেকেই দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরের কথা চিন্তা করেন। আগ্রা দুর্গের মধ্যে স্থানের অভাব ছিল, আর আগ্রা সহরে জমি ছিল অসমান। এই জন্যে দিল্লীতে তিনি নতুন সহর শাজাহানাবাদ তৈরী করেন, সঙ্গে এই দুর্গ। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়ে ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ নির্মাণ শেষ হয়। এই দুর্গের পরিধি দেড় মাইল। এটা কিন্তু গোল নয়, অষ্টভূজাকৃতি। দৈর্ঘ্য ৩000 ফিট। প্রস্থ ১৮00 ফিট। নদীর দিকে যে প্রাচীর, তার উচ্চতা ৬0 ফিট। স্থলভাগের দিকে এর উচ্চতা ১১0 ফিট, সমতল ভূমি থেকে ৭৫ ফিট। চারিদিকে এই যে পরিখা দেখছ, প্রস্থে প্রায় ৭৫ ফিট। পরিখার গভীরতা ৩0 ফিট।

লাহোর দরওয়াজার কাছে আমাদের গাড়ী থামল।

দর্শনী মূল্য হিসাবে দু'আনা করে টিকিট দিতে হয় দুর্গে ঢুকতে গেলে। টিকিট করে আমরা দুর্গে ঢুকলুম। গাইড পাকড়াও করল।

অঞ্জনা বলল : গাইডের প্রয়োজন কি, সন্তুদা ?

বললুম : না, কোন প্রয়োজন নেই।

নিজেরাই এগুলাম আমরা।

নহবৎখানার ভিতর দিয়ে এলাম, দওয়ান-ই-আমে। কিন্তু দেওয়ান-ই-আমে ঢুকবার আগে একটু দাঁড়ালুম।

অঞ্জনা বলল : দাঁড়ালে কেন ?

বললুম : এখান দিয়েই দরবারে ঢুকতো লোকেরা, তাই না ?

—হ্যাঁ, সে রকমেই তো মনে হয়।

—আমার একটা গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে।

মিনু বলল : এবার তো তোমার গল্প অফুরন্ত।

বললুম : এবার হাসি কান্না দুই-ই আছে।

অঞ্জনা গল্প শুনবার জন্য অধীর। বলল : গল্পটা কি তাই বল।

—তখন দিল্লীর বাদশা শাজাহান। দরবারে তাঁর নানা দেশের দূত। কিন্তু সবচেয়ে বেয়াদপ দূত পারশ্যের শাহ আব্বাসের। মোগল প্রথায় আভূমি নত হয়ে সেলাম পর্যন্ত জানান না তিনি। নানা ভাবে তাকে অপমান করবার চেষ্টা করেন শাজাহান। কিন্তু অপমান করবেন কি, প্রতিবার তিনি নিজেই অপমানিত হন। সেই মজার কথা কয়েকটি বলছি, তবে মনে রেখ এই গেটের সঙ্গে লজ্ অব্ এসোসিয়েসনে সবই যুক্ত।

একবার টেবিলে খাওয়া হচ্ছে। পারশ্যের দূত খুব হাড় চিবুচ্ছেন দেখে শাজাহান

ঠাট্টা করে বললেন : কুকুরগুলোর জন্য কিছু রাখুন। তার উত্তরে পারশ্যের দূত পোলাওয়ের দিকে অঙ্গুলী তুলে বলল : ঐ তো রেখেছি। শাজাহান খুব পোলাও খেতে ভালবাসতেন। শুনে তো আকর্ণ লাল হয়ে উঠলেন বাদশা, কিন্তু কি করবেন!

নতুন দিল্লী তখন তৈরি হচ্ছে। শাজাহান পারশ্যের দূতকে জিজ্ঞেস করলেন, ইস্পাহান ভাল, না দিল্লী ভাল? উত্তরে পারশ্যের দূত বিস্মা বিস্মা বলে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন : ইস্পাহানকে দিল্লীর ধুলোর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। শাজাহান তো মহা খুশী। ভাবলেন, ইস্পাহান বুঝি দিল্লীর ধুলোর যোগ্যও নয়। কিন্তু যখন এর আসল অর্থ বুঝলেন, তখন বাদশার মুখ লাল। পারশ্যের দূত বলেছিলেন : দিল্লীতে এত ধুলো যে ইস্পাহানের সঙ্গে তার তুলনা করা বাতুলতা।

অঞ্জনা বলল : বাঃ! বেশ মজার লোক ছিল তো দূতটি!

বললুম : শোন না আরো দু'একটা। একদিন শাজাহান পারশ্যের দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন, শক্তি হিসাবে হিন্দুস্থান বড় না পারশ্য বড়? দূত উত্তর দিলেন, হিন্দুস্থান পূর্ণচন্দ্র, আর পারশ্য দ্বিতীয়ার চাঁদ। শাজাহান তো ভারি খুসী। হিন্দুস্থান তাহলে পূর্ণ শক্তির অধিকারী, পারশ্য এখনো শিশু। কিন্তু অনেক তলিয়ে যখন আসল অর্থটা বের করলেন, তখন আর ক্ষোভের সীমা থাকল না। পূর্ণিমার পরেই চাঁদ ধীরে ধীরে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আর দ্বিতীয়ায় চাঁদ বাড়তে থাকে। অর্থাৎ হিন্দুস্থান পতনের দিকে আর পারশ্য বৃদ্ধির দিকে।

সুনীলবাবু বললেন : বাঃ বাঃ! অপূর্ব! বেশ witty লোক ছিলেন তো?

আমি বললুম : এবার এই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এ-গল্প বলছি কেন তার অর্থ পরিষ্কার করছি। এই দরজাতেই শেষ ডেসপারেট এটেম্পট্ নিয়েছিলেন শাজাহান। পারশ্যের দূত কিছুতেই নত হয়ে অভিবাদন জানান না। একদিন শাজাহান এক অদ্ভুত উপায়ে তাকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করবার পরিকল্পনা করলেন। আমখাসের দিকে দরবারে ঢুকবার যে প্রবেশ পথ সেটা বন্ধ করে দিয়ে একটু মাত্র ফাঁক রাখলেন, যাতে পারশ্যের দূতকে নত হয়ে ঢুকতে হয়। তিনি নিজে সেই প্রবেশ পথের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেন। যেই নত হয়ে পারশ্যের দূত ঢুকবেন, তিনি বলবেন : হিন্দুস্থানের লোকেরা নত হয়ে অভিবাদন জানায় বটে, তবে এতটা নত হয় না।

কিন্তু ধুরন্ধর পারশ্যের দূত দেওয়ানী-আমের কাছে আসতেই ব্যাপারটা আঁচ করে নিলেন। সুতরাং প্রবেশ পথে এসে সম্রাটের দিকে পেছন ফিরে নীচু হয়ে ঢুকলেন।

এতেও যখন পারশ্যের দূত হার মানলেন না, শাজাহান রেগে বললেন : হায় আল্লা! আপনি কি মনে করেন, এখানে আপনার মত গর্দভের আস্তাবল আছে, যে ঐভাবে প্রবেশ করলেন?

দূত বলল : আপনি ঠিকই বলেছেন! আমি গর্দভই বটে। আমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি পারশ্যের দরবারে আছেন। কিন্তু পারশ্যের শাহ, যিনি যেমন সম্রাট তাঁর কাছে তেমন দূতই পাঠানো উচিত মনে করে আমাকে পাঠিয়েছেন।

উত্তর শুনে শাজাহান রেগে টং।

আর এ-গল্প শুনে অঞ্জনা ও সকলে হেসে অস্থির।

মিনু বলল: এ গল্পগুলো ভালো। কিন্তু তোমার ঐ গন্না বেগমের কাহিনী শুনলে মনটা ভার হয়ে যায়।

আমি তো আগেই বলেছি: অম্লমধুর দুই-ই আছে এখানে। চল, এবার দেওয়ান-ই আম দেখি।

আমরা এগুলাম দেওয়ান-ই-আমের দিকে। অপূর্ব কারুকার্য খচিত দেওয়ান-ই-আম। দেখলে দৃষ্টি ফেরানো যায় না। সেইসব শিল্পীদের কথা মনে পড়ে, যারা তাদের মনপ্রাণ ঢেলে একে তৈরী করেছিলেন। মুগ্ধ দৃষ্টি বুলিয়ে সকলে দেখতে লাগলুম।

সুনীলবাবু বললেন: সনৎ, দেওয়ান ই আমের কি ইতিহাস জান, বল।

বললুম: এটা সভাকক্ষ। মূলত, ৫৫০ ফিট দীর্ঘ, ৩০০ ফিট প্রস্থ। আর ঐ যে হলঘর, ওটা ৮০ ফিট দীর্ঘ, ৪০ ফিট প্রস্থ, ৩০ ফিট উঁচু। লাল বেলে পাথরের থামে সোনার কাজ করা। শঙ্খের গুড়ো দিয়ে চিত্রবিচিত্রিত। পেছনে দেওয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় ঐ যে মর্মর প্রস্তর, এটাই 'বালদা চিনো'। একে 'নসমন জিল ইলাহি' ঈশ্বরের দয়ার বসবার আসন নামেও বলা হোত। জনসাধারণ এটাকে জানতো ঝরোকা বলে। সম্রাট প্রত্যেক দিন এখানে বসে দরবার করতেন। আর নিচে ঐ যে মর্মর মঞ্চ, ওটা দৈর্ঘ্যে সাতফুট, প্রস্থে তিনফুট। ওয়াজীর এখানে বসতেন। এর সামনে ছিল ৪০ ফুট দীর্ঘ আর ৩০ ফুট প্রস্থ রৌপ্য নির্মিত আসন। গণ্যমান্য আমীরেরা এখানে বসতেন। বাকি অংশে বসতেন উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা। 'গুলাল বারি' বা বাইরে বসতো নিম্নপদস্ত কর্মচারীরা। মঞ্চের সামনে ঐ ওখানে দর্শনার্থী জনসাধারণরা এসে দাঁড়াতো। ঐ যে প্রাচীর গাত্রে কারুকার্য দেখছেন, এটা একজন বিদেশী শিল্পী পিয়েত্রা দুয়ার কাজ। শোনা যায়, আসল কাজ করেছিলেন শাজাহানের প্রিয়পাত্র অষ্টিন দ্য বোরডকস নামক একজন পলাতক ইউরোপীয়ান। দেখুন, কারুকার্যে ফুল ফল ও পাখিগুলি কেমন স্বাভাবিক রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা যখন দুর্গে ঢুকে, তখন মণিমানিক্যের লোভে তারাও যথেচ্ছ লুণ্ঠন করে। এইসব লুণ্ঠন, অত্যাচারের পর আজও যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা দেখেই চোখ ফেরানো যায় না। তাহলে সেইদিনের কথা চিন্তা করুন, যখন প্রথম এর সৃষ্টি হয়েছিল?

সুনীলবাবু বললেন: হ্যাঁ, সেটা বুঝতেই পাচ্ছি। সত্যি charming।

অঞ্জনা বলল: গল্প নেই?

বললুম: আছে, সময়মত বলব। চল।

দেওয়ান-ই-আম থেকে এগুলাম রঙমহলে। বাইরে জীর্ণভাব ফুটে উঠেছে। অপূর্ব রূপসজ্জায় একে সাজানো হয়েছিল বলে এর নাম হয় রঙমহল। সবটাই

পাথর দিয়ে তৈরী। ভেতরে এখনো স্তম্ভগুলি ও ছাদটি উজ্জ্বল। তবে আসল ছাদ আর নেই।

সুনীলবাবুকে বললুম : ঐ যে ছাদ দেখছেন, আসলে ওটা ছিল রুপোর। তার ওপর সোনার কাজ করা ছিল। কিন্তু বাদশা ফারুকশিয়রের রাজত্বকালে সোনারুপো খুলে নিয়ে গলিয়ে ফেলা হয়।

হলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অঞ্জনা বলল : এটা কি, সন্তুদা ?

বললুম : ছোটখাট একটা পুকুর। পুকুরের মাঝখানে ঐখানটায় ঝর্ণা ছিল। দেখ, দেখতে ঠিক হাতের পাতার মত। কত রঙবেরঙয়ের পাথর দিয়ে তৈরী।

—এখানে কি হোত ?

—হারেমের মহিলারা আসতেন, স্নান করতেন, আমোদ করতেন। ঐ যে পেছনে প্রাচীর দেখছ—ঐ প্রাচীরের গায় নদীর দিকে মুখ করে পাঁচটি বাতায়ন। এখান থেকে রাজকুমারীরা, বেগমেরা এবং হারেমের অন্যান্য মহিলারা, হাতী ও অন্যান্য বন্য জন্তুর লড়াই দেখতেন। নদীর বালুতটে এই সব খেলা হত। এবার চল, ওধারে দেওয়ান-ই-খাস দেখি।

এলুম দেওয়ান ই-খাসে। এটা দরবার কক্ষ বা শাহমহল নামেও পরিচিত। অপূর্ব হল। শ্বেতমর্মরের একখণ্ড কবিতা যেন। দেখলুম, লুব্ধ দৃষ্টিতে সকলেই তাকিয়ে আছে, চোখ ফেরে না আর।

সুনীলবাবুকে বললুম : কেমন লাগছে মেশোমশাই ?

তিনি বললেন : বর্ণনা করতে পারছি না।

বললুম : স্বর্গ দেখি নি, মর্ত্যের স্বর্গ এইখানে। ঐ যে কাছে আরবি হরফ দেখতে পাচ্ছেন ? ওতে উর্দুতে বোধহয় এই কথাটি লেখা আছে :

অগর ফিরদৌস্ বর, রু-ঈ জমীন্ অস্ত্
হমিন্ অস্ত্, উ হমিন অস্ত্, উ হমিন অস্ত্।

অর্থাৎ পৃথিবীতে স্বর্গ যদি কোথাও থেকে থাকে, তবে তা এইখানে। অন্য কোথাও নয়, অন্য কোথাও নয়।

অঞ্জনা বলল : সত্যিই তাই, সন্তুদা।

আমি বললুম : কিন্তু নরকও এইখানে ছিল সে কথা বলছি শোন। রঙিন খিলানের ওপর ভর দিয়ে ঐ যে ঢালাও ছাদ দেখছ, আসলে এটি ছিল সম্পূর্ণ রুপো দিয়ে তৈরী। তখনকার দিনে রত্নবণিক ট্রাভানিয়ার এর মূল্য নির্ধারণ করেছিলেন ৭৫০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক। এর মধ্যে ছিল ময়ূরাসন যা নাদির শা পারস্যে লুঠ করে নিয়ে যান। আর সম্পূর্ণ রুপোর ছাদ গলিয়ে নিয়ে যায় মারাঠারা ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে। এই ঘরে সেই দিনগুলোর চিত্র মনে পড়ে। তখন মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহআলম। নামে সম্রাট, কাজে মহাজাদী সিন্ধিয়ার হাতের পুতুল। অন্তর্বিপ্লব চলেছে। চারিদিকে লুঠতরাজ। আফগানেরা আহমদ আবদালীর নেতৃত্বে বার বার সীমান্তে ঢু মারছে।

সিন্ধিয়া গেছেন বাইরে। রোহিলা প্রধান নিষ্ঠুর গোলাম কাদির এসে ঢুকলেন লাল কেল্লাতে। বাধা দেওয়া গেল না তাকে। দূর থেকে টেনে বের করে আনা হল বৃদ্ধ দ্বিতীয় শাহআলমকে। টেনে হিচরে এনে ফেলা হল দেওয়ান-ই-খাসের কাছে : ধন দৌলত, টাকা পয়সা কোথায় আছে, বের কর ? ধন দৌলত টাকা পয়সা কি তখন আর মোগলদের ছিল ? শাহআলম বহুদিন ঘুরেছেন পলাতক রাজপুত্র হিসাবে বাইরে বাইরে। দিল্লীর দোর্দণ্ড প্রতাপ ওয়াজীর ইমাদ উল্ মুল্কের ভয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে ছিলেন তিনি। বাদশাহের পারিবারিক অবস্থায়ই বা কি ছিল—কোনদিন খাওয়া জোটে, কোনদিন জোটে না। শাহআলম যখন শাহজাদা ছিলেন, একদিন দেওয়ান সাকির খাঁ লঙরখানা থেকে দরিদ্রদের বিতরণের জন্য যে লপ্সি তৈরী করা হয় তাই-এক মগ তাঁকে দেখাবার জন্যে নিয়ে এল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শাহজাদা দেওয়ানকে সেই এক মগ লপ্সি হারেমে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন, কারণ তিন দিন হারেমের সবাই অনাহারে আছেন। একটি দানা পর্যন্ত পেটে পড়ে নি কারো। ক্ষুধাক্লিষ্ট হারেমের জেনানারা এমন অস্থির হয়ে উঠলেন একদিন যে, পর্দা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, জনারণ্যে বসে ভিক্ষে করবেন বলে। কিন্তু বেরুবার উপায় আছে কি ? বাদশার হারেমের ইজ্জত নষ্ট হতে পারে না। গেট থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হল তাদের। হায় রে বাদশাহী! অথচ ওয়াজীর নিত্য ঐশ্বর্যে ফুলছেন, বাদশ কপর্দকহীন। এই তো তখনকার অবস্থা। বাদশার হাতে টাকা থাকবে কোথায় ? শাহ আলম কৃপণতা করে কিছুকিছু সঞ্চয় করেছিলেন বটে, তবে তা বের করে দিতে তিনি রাজী নন। গোলাম কাদির ভয় দেখালেন, বাদশা আর শাহজাহাদের ধরে ক্ষুদ্র মস্জিদে বন্দী করে রাখলেন। দেওয়ান-ই-খাস আর হায়াৎবক্স উদ্যানে তাণ্ডব নৃত্য চলল রোহিলাদের। সারারাত ধরে হারেমে শোনা গেল বেগমদের কান্না।

অর্থ না পেয়ে ক্রুদ্ধ গোলাম কাদির পরদিন সকালবেলা পূর্বের বাদশা আহমদ শার ছেলে বিদরবখ্তকে নাসিরুদ্দিন মহম্মদ জাহানশা নাম দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিল। আগের দিন সন্ধ্যাবেলা প্রাসাদ লুণ্ঠন আরম্ভ হয়েছিল, পরদিন সমস্ত দিন ধরে চলল।

বেগমমহলের প্রতিটি প্রকোষ্ঠ খুঁড়ে খুঁড়ে অনুসন্ধান চালাল রোহিলারা। গোলাম কাদির আবার ভয় দেখালো শাহ আলমকে : অর্থ কোথায় বের কর। শাহ আলম উত্তর দিলেন : যা আছে, তুমি তো নিয়েছ। আর কিছু নেই। একটা বকাটে ছেলের মত বাদশার গলায় বাহু জড়িয়ে ধরে তামাকের ধুঁয়ো তাঁর মুখে ছাড়িয়ে দিল গোলাম কাদির। তারপর ঐ ভাগ্যহীন বাদশাকে অনাহারে রোদের মধ্যে বসিয়ে রাখল।

বারে বারে চাপ দেওয়াতে শেষে বিরক্ত হয়ে শাহ আলম বললেন : আমার ধন-ভাণ্ডারে যা ছিল তা ত নিয়েছে। আমি কি আমার পেটের মধ্যে সব কিছু লুকিয়ে রেখেছি নাকি ? অসভ্য রোহিলা বলল : তা হলে তোমার পেটটা ফাঁক করে দেখব ? পরদিন আরও নৃশংস দৃশ্যের অবতারণা করল গোলাম কাদির। উন্মুক্ত আকাশের

নিচে বাদশাকে চিত করে ফেলে সে তাঁর বুকের উপর চেপে বসল। তারপর ছুরি দিয়ে চোখ দুটো উপরে নিতে লাগল। প্রাসাদের শিল্পীদের সেই দৃশ্যের একটা ছবি আঁকতে বাধ্য করল সে।

অন্ধ বাদশা সেই অবস্থাতেই কয়েকদিন পড়ে থাকলেন। এক ফোঁটা জল পর্যন্ত তাঁকে দিতে দেওয়া হল না। বাদশার তিনজন ভৃত্য তাঁকে খাবার দিতে গিয়েছিল বলে গোলাম কাদিরের তরবারিতে তারাপ্রাণ দিল। দু'জন ভিস্তিওয়ালা জল দিতে গিয়ে আহত হল। কেউ যাতে গোপনে বাদশাকে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত না দিতে পারে, সে জন্য সকলেব মনে ভয় ঢুকিয়ে দিল গোলাম কাদির।

মহলের বাঁদীরা বর্ণনাতীত অত্যাচারের সম্মুখীন হল। কয়েকজন খোজাকে মারতে মারতে মেরেই ফেলা হল। বেগম আর শাহজাদীরাও অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। চারদিন পর্যন্ত বাদশার পরিবারের কারো মুখে খাদ্য বা পানীয় কিছুই পড়ল না। যখন শাহজাদা আকবর বিদরবখতকে এক ফোঁটা জল আর কিছু খাবার দেবার জন্যে কাতর অনুরোধ জানাল, নতুন বাদশা উত্তর দিলেন : হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য আমাদের সকলেরই পূর্ব-পুরুষদের। অথচ ত্রিশ বৎসর তোমার বাবার রাজত্বকালে আমরা কত না দুঃখ পেয়েছি। ত্রিশ বছর নীরবে এ দুখ আমরা সহ্য করেছি। এখন রাজপদ এসেছে আমার হাতে, তুমি দুঃখ ভোগ কর। এক ফোঁটা জল দেওয়া হল না। অনাহারে অনেক শিশু আর বেগম মরা গেলেন! দু'জন প্রাক্তন সম্রাজ্ঞী অত্যাচারে প্রাণ হারালেন। রোহিলার হুকুমে অনাবৃত ভাবে তাঁদের ফেলে রাখা হল তিন দিন। শেষে পচে ফুলে উঠল। দুই দিনে সবশুদ্ধ একুশ জন শাহজাদা, শাহজাদী এবং বেগম মারা গেলেন। অবশেষে গোলাম কাদির এসে দাঁড়াল অন্ধ বাদশার কাছে। চোখের সামনে হাত রেখে বলল : কিছু দেখতে পাও ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাদশা বললেন : হ্যাঁ, তোমার আমার মধ্যে রয়েছেন খুদা।

আর সময় নেই। ওদিকে খবর পাওয়া গেল, সিন্ধিয়ার মারাঠা বাহিনী আসছে দিল্লীতে। তারা সহর ঘেরাও করছে। গোলাম কাদির লুঠের দ্রব্য নিয়ে পালাল গাউসগড়ের দিকে। সিন্ধিয়ার সেনাপতি রানা কান্ এসে ঢুকলেন দুর্গে। অনাহাব-ক্লিষ্ট পরিবারকে সর্বাগ্রে দেওয়া হল খাদ্য। শাহ আলমকে আবার সিংহাসন দেওয়া হল। ওদিকে রোহিলা গোলাম কাদিরকে ধরে মারাঠারা তার চোখ উপরে নিয়ে নাক আর কান কেটে কাঁচের পাত্রে ভরে পাঠিয়ে দিল শাহ আলমের কাছে। মথুরার বার মাইল দূরে কোন এক জায়গাতে নিয়ে গিয়ে একের পর এক রোহিলার দেহ থেকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে টুকরো টুকরো করে কাটা হোল। শাহ আলম বলেছিলেন, তোমার আর আমার মধ্যে খুদা আছেন। খুদা বিচার করতে ভুল করলেন না।

দেখলুম সুনীলবাবুর সর্বাঙ্গ শিউরে উঠেছে। বললেন : উঃ, কি নৃশংস! জঘন্য! হায় রে বাদশাহী!

আমি বললুম ঃ এইখানে অমন ঘটনা আরো ঘটেছিল ঠিক এই দিওয়ান-ই-খাসে। বাদশা ফররুক শিয়রের সময়।

অঞ্জনা বলল ঃ থাক, এ নৃশংসতার কাহিনী আর শুনতে চাই না। অন্য গল্প জানতো বল।

হেসে বললুম ঃ তাই হবে। চল, এবার খাসমহলে যাই।

খাসমহল সম্রাটের নিজস্ব অন্দরমহল। তিনটি মহল নিয়ে গঠিত এই অট্টালিকা দিওয়ান-ই-খাসের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। মহল তিনটি পরস্পর সংলগ্ন—তসবিখানা বা প্রার্থনা গৃহ, খোয়াব ঘর বা স্বপ্নপুরী এবং 'বৈঠক' বা লোকজন মিশবার ও আলোচনা করবার স্থান। তিনটি মহলের মধ্যে খোয়াব ঘরই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, দৈর্ঘে প্রায় ৪৫ ফুট ও প্রস্থে ১৮ ফুট। এর তিনটি কক্ষ। দেওয়াল মূল্যবান পাথরে খচিত। খোয়াব ঘরের কাছে বিচারের মানদণ্ড আঁকা একখানা খুব চমৎকার পর্দা রয়েছে। ইতস্তত আরো ঘর। সব ঘরের পরিচয় নেই। বর্তমানের গাইডরাও পরিচয় দিতে পারে না। বাদশাহের তো শুধু একটি মাত্র বেগম নয়, আরো বেগম থাকতো, তাদের জন্য হয় তো ঐ সব ঘর।

অঞ্জনা বলল ঃ সন্তুদা, এখানকারও গল্প আছে নাকি ?

বললুম ঃ মোগল হারেমের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গল্প অঞ্জনা। কোথায় গল্প নেই ? নীরবে কান পাতলে বোধ হয় বহু গোপন কান্না তুমি এখনো শুনতে পাবে। সে সব কথা বলতে গেলে মহাভারত হয়। এখানে রয়েছে ষড়যন্ত্র, এখানে নৃশংসতা, এখানে বেদনা। দু-একটা কাহিনী আমি তোমাদের বলছি। ধর, সম্রাট শাজাহানের কন্যা জাহানআরার কথা। আকবর বাদশা নিয়ম করেছিলেন, মোগল রাজকন্যাদের সাদি হবে না, যাতে সিংহাসনের দাবিদার না বাড়ে। কিন্তু যৌবন কি অনাদৃত পড়ে থাকতে চায় ? বসন্তের হাওয়া যখন তাকে উন্মনা করে দেয় সান্নিধ্যের জন্য, তখন সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। এমনি উন্মাদ হলেন একদিন জাহানআরা। গোপনে প্রিয়তমকে নিয়ে এলেন হারেমে। অনেক দিনই যাতায়াত চলছিল। ব্যাপারটা টের পেয়েছিল অনেকেই। সে কিন্তু শাজাহান নিজে ধরলেন। গোপন প্রেমিক যখন শাহজাদীর কক্ষে, বাদশা স্বয়ং কন্যার সংবাদ নেবার ছলে তার ঘরে এসে ঢুকলেন। জাহানআরা আর কি করেন, তাড়াতাড়ি গরম জলের টবের মধ্যে লুকিয়ে ফেললেন তাকে। শাজাহানের কিছুমাত্র বুঝতে বাকি থাকল না। কিন্তু সে বিষয়ে তিনি সামান্যতম আগ্রহও দেখালেন না। যেন কিছু বোঝেন নি, এমনি ভাব। কথায় কথায় কন্যাকে অভিযোগ করলেন যে, জাহানআরা দেহের প্রতি যত্ন নিচ্ছে না। সাবান দিয়ে তার স্নান করে আরো পরিষ্কার থাকা উচিত। সেই মুহূর্তে তিনি বান্দাদের ডেকে আদেশ করলেন—গরম জলের ফোয়ারা ছেড়ে দিতে, শাহজাদী স্নান করবেন। জাহানআরার মুখ শুকিয়ে উঠল। বাদশার আদেশে সেই টবের মধ্যে ফুটন্ত গরম জল পড়তে লাগল। হতভাগ্য প্রেমিক জীবন্ত সেদ্ধ হয়ে মারা গেল। যতক্ষণ না তার জীবনান্ত হল ততক্ষণ বাদশা ঠায় বসে থাকলেন।

মিনু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল : যাঃ, এমন আবার হয় নাকি ?

বললুম : হয় মিনু। ইতিহাসেই এর উল্লেখ আছে। ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়েরের এ্যাকাউন্ট পড়লেই এসব ঘটনা জানতে পারবে। এই মহলের মধ্যে চোখ মেলে আমি যেন বহু জিনিস দেখতে পাচ্ছি। সেই সেদিনকার নায়ক নায়িকারা অনেকেই দাঁড়িয়ে আছেন এখানে।

দিল্লীর বাদশা তখন দ্বিতীয় আলমগীর। এই দিল্লীর খাসমহলে বাদশার হারেমে, জেনানাদের মধ্যে এক অপূর্ব পুষ্প প্রস্ফুটিত হল—স্বর্গত বাদশা মহম্মদ শার কন্যা হজরত বেগম। সময়টা ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ। কন্যার বয়েস তখন ষোল, অর্থাৎ প্রথম বসন্তের প্রস্ফুটিত ফুল। এমন সৌন্দর্য যে, বার্ধক্যের পথযাত্রী বাদশা দ্বিতীয় আলমগীরকেও সে পাগল করে দিল। মুগ্ধ বাদশা উন্মাদ হয়ে উঠলেন কন্যার পানি পাবার জন্যে। কিন্তু উদ্‌গত যৌবনের প্রথম নেশা সেই কন্যার। স্বপ্ন দেখছে সে অনাগত ভবিষ্যতে এক মধুর জীবনের। কন্দর্পকান্তি কোন যুবক তার প্রণয় সঙ্গী। প্রস্তাব শুনে কন্যা বলল এরকম শাদি করবার চেয়ে আমি আত্মহত্যা করব। কন্যার জেদ দেখে বার্ধক্যে তরুণী ভার্যার সখ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন আলমগীর।

কিন্তু অদৃশ্যে নিয়তির হাসিটুকু কি দেখেছিল হজরত বেগম ? মানুষের স্বপ্ন আর প্রাপ্তির মধ্যে থাকে বিরাট পার্থক্য। এমন দিনে নিষ্ঠুর আহমদ আবদালী আক্রমণ করলেন ভারতবর্ষ। বার্ধক্যের জীর্ণতা এসেছে আবদালীর দেহে। ত্বকে কুঞ্চনের রেখা। কান আর নাক খেয়ে গেছে কুষ্ঠতে। দিল্লীতে এসে শুনলেন তিনি—রাজকুমারী হজরত বেগমের অপূর্ব রূপ লাবণ্যের কথা। বললেন : কন্যাকে সাদি করবেন তিনি।

প্রস্তাব শুনে হারেমে কান্নার রোল উঠল। প্রাক্তন দু'জন রাজমাতা চিৎকার করে উঠলেন : হতভাগীকে আমরা নিজেদের হাতে খুন করব। তবু ঐ নোংরা আফগানটার হাতে কিছুতেই ছেড়ে দেব না।

বেগমেরা গোপনে আবদালীর প্রিয়পাত্রী মুঘলানী বেগমকে ধরলেন, তিনি যেন আবদালীকে বোঝান যে, কন্যা আসলে মোটেই সুন্দরী নয়। প্রচুর টাকা পয়সার লোভ দেখালেন মুঘলানীকে তারা। কিন্তু ফল হল না। অবশেষে বাদশা দ্বিতীয় আলমগীর নিজে বোঝাবার চেষ্টা করলেন আবদালীকে যে, কন্যা ইতিমধ্যে একজন দিল্লীর শাহজাদার কাছে বাগদত্তা হয়ে আছেন। কিন্তু কিছুতেই হল না। আবদালী জেদ ধরলেন, কন্যাকে চাই-ই। আফগানের ক্রুদ্ধ আক্রোশ থেকে লাল কেল্লাকে বাঁচাবার জন্যে অবশেষে কন্যাকে দিতেই হল গলিত এক কুষ্ঠ রোগীর কাছে।

১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দ, ৬ই এপ্রিল। কন্যাকে সাজিয়ে পাঠানো হল আবদালীর শিবিরে। ক্রন্দনাতুর কন্যার সঙ্গে চললেন প্রাক্তন বাদশা মহম্মদ শার দুই বিধবা পত্নী, মালিকা-ই-জামানি ও সাহিবা মহল। দিল্লীর স্বপ্ন অশ্রুর ধারাতে ভারতবর্ষের অঙ্গন ত্যাগ করে চলল আফগানিস্তানে।

গল্প শেষ করে অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে দেখি, তার মুখ গম্ভীর, বিষাদে ম্রিয়মান।
তার দিকে তাকাতে সে বলল : বাদশার ঘরে জন্মে তবে কি সুখ ?

বললুম : বাদশার সুখ মানুষের ভ্রান্তিতে। রাজা বাদশার জাঁকজমক ঐশ্বর্য দেখে মানুষ মনে করে, ওরা কত না সুখী। কিন্তু অন্তরে যে ওদের কত যন্ত্রণা, সে কথা জানলে এ ধারণা আর থাকতো না। যেখানে প্রেম নেই, সেখানে কি সুখ থাকতে পারে ? প্রেমের এক নির্মম অভিশাপ অজস্র অশ্রুর কান্নায় বইছে মোগল হারেমে। বাইরের ইতিহাসে তার ঐশ্বর্যের ঘনঘটা, অন্তরের ইতিহাসে অশ্রুর ফল্গুধারা। সেই ফল্গুধারাই আমার সমবেদনা লাভ করেছে অঞ্জনা।

অঞ্জনা বলল : এই সব শুনে আমার যেন কিছুই দেখতে ইচ্ছে করছে না সন্তুদা। মনে হচ্ছে, একটা অভিশপ্ত পুরীর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের নায়কের মত এখানে রাত্রিবেলা যদি কেউ একা থাকে তো এইসব চাপা কান্না আর দীর্ঘশ্বাস শুনে একরাত্রেই সে পাগল হয়ে যাবে।

বললুম : মোগল ইতিহাসের করুণ কান্নার এতো একটি ভগ্নাংশ মাত্র। আরো কত আছে। লিখিত যত আছে, তার চেয়ে অলিখিত আরো বেশী। ফররুকশিয়রের কথা বলছিলুম না তখন ? শোন…

অঞ্জনা বলল : না, ও কাহিনী আর নয়। অন্য কি দেখবে, চল।

—চল।

আর গল্প করলুম না। এবার শুধু ঘুরে বেড়ালুম। দেখলুম, হামাম, মোতিমসজিদ, সাম্মাম বুরুজ, মমতাজ মহল (মমতাজ মহল এখন পুরাতত্ত্ব বিভাগের যাদুঘর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে) শাওন ভাদো, হায়াৎ বক্স উদ্যান, এই সব।

দেখা শেষ হল। এবার কেল্লার বাইরে। গাড়ীতে উঠতে ড্রাইভার বলল : আরো কিছু দেখবেন ?

অঞ্জনা বলল : পুরাণো আর নয়। পুরাণ শুধু অভিশাপ। এবার চলো নতুন দিল্লী, চলতে চলতেই দেখে যাই। দিল্লী আর নয়। কে বলে এটা রাজধানী। অশ্রুর সাগর এই দিল্লী।

কে জানে মানুষের মনে কি আছে। এত যে চঞ্চলা অঞ্জনা, শেফালীর হলুদ বৃন্তের মত এই ম্লান স্পর্শ তার লাগল কি করে! তবে কি সে তার নিজের মধ্যেও এক ট্র্যাজেডির সুর খুঁজে পাচ্ছে এখন ? বিয়োগান্ত নাটকের এক করুণ রাগিণী আমার নিজের হৃদয়েই এখন বাজছে।

গাড়ী ঢুকল নতুন দিল্লীতে। কনট প্লেস, যন্তর মন্তর, বেতার ভবন, বিড়লা মন্দির, কেন্দ্রীয় দপ্তর, পার্লামেণ্ট ভবন, রাষ্ট্রপতি ভবন, প্রধান মন্ত্রীর বাসভবন, এই সব। দেখলুম ব্যুরোক্র্যাটিক অফিসারদের সারবাধা একই ধাঁচের বাড়ি। দেখলুম স্বাধীন

ভারতে মানুষের শ্রেণী-বিন্যাস। নেমে দেখলুম শুধু যন্তর মন্তর। অদ্ভুত-আকৃতি এই ইমারত দেখে কৌতূহল বশে নামতে বাধ্য হলুম। ভেবেছিলুম পার্ক। নেমে দেখলুম এর সৃষ্টি অনেক আগে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠাতা জয়পুরের রাজা জয়সিংহ। নামটা তারই দেওয়া। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে খেয়ালীপনা। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা মান মন্দির। আকাশের সূর্য আর নক্ষত্র মণ্ডলীর গতি নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হত।

একদিনে দিল্লী দেখা একটা দুঃসাহসিক পরিকল্পনা। রোজ গাড়ী করে ঘুরে দেখলেও সব দেখতে এক সপ্তাহ লাগে। একদিনে শুধু দর্শনীয় জিনিষ দেখে আঁচ করে নিলুম। যেন রুপালী পর্দায় চোখের উপর দিয়ে কতগুলি ছবি চলে গেল। কিন্তু তবু এর এক উন্মাদনা, তবু এক তৃপ্তি। ভারত ইতিহাসের পাদপীঠ দিল্লী—তা আমি চোখে দেখে গেলুম।

নতুন দিল্লী ঘুরে দেখে গাড়ী চলল বাইরে। বাস স্ট্যাণ্ডে যাব এবার আমরা। এখান থেকে বাসে করে পাড়ি দেব মথুরাতে। সমস্ত পুরাণো দিল্লীটাই প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সেদিন সহরকেও দুর্গের মত সুরক্ষিত করতে হত। বাইরের ধূলিকীর্ণ রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে সেই প্রাচীন দিল্লীর দীর্ঘবৃত্ত প্রাচীর দেখতে লাগলুম। সেই মধ্যযুগেও এই সহরের প্রাচীরের মধ্যে কুড়ি লক্ষ লোক বাস করত। সেই হারানো অতীত চোখের সম্মুখ থেকে মুছে যাচ্ছে। মায়াভরা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম।

ধূলি উড়িয়ে গাড়ী থামল সহরের বাইরে বাস স্ট্যাণ্ডে। পর পর আমাদের দুটো গাড়ী। স্ট্যাণ্ডে নেমেই শুনলুম, মথুরার বাস ছাড়বে পাঁচ মিনিটের মধ্যে। আমরা তাড়াহুড়ো করে বাসে উঠলুম জায়গা রাখবার জন্যে। বীরেনদা আর সুনীলবাবু ড্রাইভারদের ভাড়া মিটিয়ে এলেন। বীরেনদার মুখ দেখি গম্ভীর। গাড়ী ভাড়া বেশ কিছু লেগেছে সেটা বুঝতে পারলুম।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বেলা একটা বেজে গেছে। সকাল ছটা থেকে এক নাগাড়ে সাত ঘণ্টা ঘুরে বেড়িয়েছি। আকাশে সূর্য দক্ষিণ পশ্চিমে ম্লান ম্লান ভাব।

কার্তিকের বেলা একটাতে অপরাহ্নের ছায়া পড়বেই।

বাস ছাড়াল একটা পাঁচে।

প্রাচীন দিল্লীর দেয়ালের ধার দিয়ে বাস চলল। অজস্র প্রাচীন ইতিহাস ঊর্ধ্বে গম্বুজ তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বাস থেকে দিল্লীর লালকেল্লার দেওয়ান-ই- আম, দেওয়ান-ই-খাস দেখা যায়। দেখা যায় জুম্মা মসজিদের চুড়ো, আরো কত অপরিচিত ইমারতের দেওয়াল। দিল্লী থেকে মথুরার পথে অনেক দূর পর্যন্ত দীর্ঘ সারি বেঁধে এইসব প্রচীন কীর্তি দাঁড়িয়ে। আমি মুগ্ধ দৃষ্টি ফেলে সেইসব দেখতে লাগলুম, আর ভাবতে লাগলুম, সেই হারানো দিনগুলিতে না জানি এসব স্থান কেমন ছিল, কেমন ছিল সেই সব মানুষ, তাদের চলা ফেরা, আচার বিচার। আজ আমরা

এগিয়ে এসে পেছনের মানুষকে কল্পনা করছি। ওদের মধ্যে কি সেদিন কেউ ছিল, যে তিনশো বছর এগিয়ে এই আজকের দিনকে কল্পনা করেছে? এ বুঝি শুধু রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব : আজি হতে শত বর্ষ পরে · ।

যে অঞ্জনা এত চঞ্চল, গাড়ীর মধ্যে বক্‌বক্‌ করে, সে এখন চুপ। দিল্লী কি একটা বেদনার রেখা টেনে দিয়েছে ওর মনের উপর? মিনুও চুপ। বীরেনদার মুখ ম্লান। ক্ষুধা তিনি সহ্য করতে পারেন না, জানি। সুনীলবাবু, রাঙামাসী, মাসীমা, কারো মুখে কথা নেই।

দিল্লী ছাড়িয়ে বাস এসেছে অনেক দূরে। মাঠের বুকের মধ্য দিয়ে বাস চলেছে। সেই নির্মম প্রকৃতি খরাক্লিষ্ট করাল দ্রংণ্টা মেলে এখানেও মহাশ্মশানের মত দাঁড়িয়ে আছে। ভারতবর্ষের বুকে কি ভগবানের অভিশাপ নেমে এসেছে? কিন্তু সেই নির্মম অগ্নি ঝরা মাঠের মধ্যেও আমার স্বপ্ন সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলল। নয়ন খুঁজছে, কখন সেই ব্রজভূমির প্রান্তদেশ দেখা যাবে যেখানে ঘাগড়াপরা ব্রজাঙ্গনারা তেমনি করেই পথ চলে আজো অজস্র কদম্ব বৃক্ষ পথের দুধারে ছায়া ফেলে। আমার অক্লান্ত চোখ তাকিয়ে থাকল অবুঝ আকাঙ্ক্ষায়।

ছয়

ঠিক সন্ধ্যার মুখে মুখে বাস থেকে নামতেই পান্ডার দল ঘিরে ধরল। যত বলি, পান্ডার প্রয়োজন নেই, ওরা তবু গুন্‌গুন্‌ করে। সেদিকে না তাকিয়ে প্রথমে ধরলুম গাড়ী। দুটো টাঙ্গা। একজন পান্ডা আমাদের টাঙ্গাতেই উঠে বসল, সে যাবে। কিন্তু তার চেহারা দেখে আমার intution বলল, একে নিও না। লোকটি ভাল নয়। সে যতই জেদ ধরুক না কেন, তাকে পাত্তা দিলুম না। শেষে অল্প বয়সের এক পান্ডাকে পছন্দ হল। আমার এক ছাত্রের সঙ্গে মুখের আদলে দারুণ মিল। বললুম : চল, তোমার সঙ্গে যাব।

সে উঠল আমাদের টাঙ্গাতে।

অদ্ভুত ধৈর্য এই পান্ডাদের। দুটো টাকার জন্যে এরা কি না করতে পারে?

মথুরা পবিত্র তীর্থস্থান। কংস রাজার রাজধানী। কৃষ্ণ এখানে অত্যাচারী কংসকে বধ করে ব্রজবাসীদের মুক্তি দিয়েছিলেন। ইতিহাসেও খ্যাতি অর্জন করে আছে মথুরা। সুলতান মামুদ মথুরাও লুন্ঠন করেছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের দিনে জাটদের ঘাঁটি ছিল এই মথুরা।

পঁচিশ বছর পরে আবার আমি যখন স্মৃতি প্রসঙ্গে মথুরায় এসেছি মনে পড়ছে বর্তমান আমির কথা। পঁচিশ বছর আগে যখন মথুরায় এসেছিলুম তখন আমি ছিলুম মনুষ্যরূপী একটি স্থূল প্রাণী মাত্র। রক্তের ধারায় ঐতিহ্য বহন করে পুরাণ কাহিনীকে মাথায় নিয়ে এসেছিলুম এখানে। ব্রজলীলার কাহিনী সত্য হতে পারে কি পারে না সে কথা বিচার করিনি। ভেসে গিয়েছিলুম অবিবেকী তারুণ্যের পাশবন্ধ স্থূলদেহী ভাবপ্রবাহে। ২৫ বছর পরে অন্তর্জগতে আজ আমি খুঁজে পেয়েছি যথার্থ সত্য কি, তার সন্ধান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপ কাহিনীতে আমার বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস নেই আর। পরমাত্মায় অতীতের সে ইতিহাস অঙ্কিত থাকতে দেখে আমি নিশ্চিতপ্রত্যয় যে পুরাণ-কাহিনীর সবটা সত্য না হলেও অনেক কিছুই ছিল তার সত্য সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই আর আমার মনে। তবে অনেক কিছুই যে ছিল পরবর্তী কালের ভাবগত সৃষ্টি সে কথাও অনস্বীকার্য। বাস্তব ইতিহাস এখানে কিছুটা প্রাণধারা সঞ্চার করলেও সবই যে তার সত্য তা নয়।

বস্তুবাদী ঐতিহাসিকদের ধারণা কৃষ্ণকাহিনীর আবির্ভাব মথুরা অঞ্চলে এসেছিল দক্ষিণ ভারতের আভির উপজাতির কাছ থেকে। আভিরেরা কৃষ্ণকান্ত মায়ন দেবতাব পুজো করতেন। তিনিও ছিলে বংশীবব এবং গোপীনীদেব সখা। পশুচারক এই আভির উপজাতি দক্ষিণ ভারতের মালভূমি থেকে নেমে এসে উত্তর ভারতেব মথুরা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। কৃষ্ণকান্ট তাব পবই ছড়িয়ে পড়ে আর্যাবর্তে। আভিব-দের এই মায়নদেবতা বংশীধরও ছিলেন। পবে এবা মথুরা ছেড়ে দ্বাবকার দিকে চলে যায়। সেখানেও কৃষ্ণভজন রীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। এই যে কৃষ্ণ যাঁর উৎপত্তি দক্ষিণভারতে তিনি উপনিষদেও আত্মপ্রকাশ করেছেন ঘোর ঋষির শিষ্য হিসাবে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধার সংযোজনা নাকি বাঙ্গালীদের সৃষ্টি। জয়দেবের সামান্য কিছু কিছু আগে বাংলার শাক্তধারার অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি হিসেবে তাঁকে কল্পনা করা হতে পারে বলে বিশ্বাস। অনেকের মতে রাধার উৎস খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে। এই সময় ধরিত্রীকে বিষ্ণুর শক্তি হিসেবে বৈষ্ণবী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ কেউ, যেমন B. K. Goswami Sastr. রাধাকে বেদের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন বলে দাবি করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণ cult-এ গভীর তত্ত্ব সংযোগ করে এতে আধ্যাত্মতা দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ধরেছেন বিষ্ণুর অবতার হিসেবে। পরমপুরুষ বিষ্ণুর মধ্যে যে সত্ত্ব রজ ও তমগুণ নিযে মহাপ্রকৃতি ছিল সেই প্রকৃতিই গুণক্ষোভে পুরুষ থেকে বহির্নিগমণের সময় ত্রিভঙ্গ হয়েছে। সেই ত্রিভঙ্গ যুগল মূর্তিই রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। গুণক্ষোভ জাত অর্থাৎ বিস্ফোরণ জাত ওঁ শব্দই ভগবানের হাতে বাঁশী-প্রতীকের মধ্য দিয়ে নেমে এসে শব্দব্রহ্মরূপে জগৎ সৃষ্টি করেছে। মানুষের এই দেহ ব্রহ্মাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। এর ষটচক্রই হল বাঁশরীর ষড়রন্ধ্র।

বৈষ্ণব পঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের মতে বাসুদেব কৃষ্ণ ও তাঁর পরিবার সৃষ্টিরহস্যের কাহিনীই রূপকের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। বাসুদেব হলেন আদি পুরুষ। তা থেকেই সংকর্ষণ (কৃষ্ণের ভাই)-এর উৎপত্তি। অর্থাৎ সংকর্ষণই হলেন প্রকৃতি ও কালের উদ্ভব স্বরূপ। এই দুইয়ে মিলে জন্ম দিয়েছে প্রদ্যুম্নের। প্রদ্যুম্ন অর্থ মন। এই মন থেকেই জাত হলেন অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ হলেন অহংতত্ত্বের প্রতীক। এর পরই তিন গুণের উদ্ভব। এই তিনগুণ থেকেই ব্রহ্মার জন্ম।

বিষ্ণুর অবতার হিসেবে কৃষ্ণ। এই বিষ্ণুর চিন্তা ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে (O D. B. L.) দ্রাবিড় চিন্তা। দ্রাবিড় ভাষায় 'বিন্' নীল বর্ণ আকাশ থেকে নীলকান্ত বিষ্ণুর উদ্ভব। তাঁর শঙ্খ, চক্র গদা ও পদ্মের তাৎপর্য হল এই যে, শঙ্খ বিস্ফোরণ জাত শব্দ ওঁ-এর প্রতীক। এই শব্দের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই কালের বিকাশ। চক্র সেই কালের প্রতীক। পদ্ম হল যোনির প্রতীক, ব্রহ্মযোনি, যার (Neutron Field) মধ্য দিয়ে জগৎ আত্মপ্রকাশ করেছে। গদা হল স্থূলতার অর্থাৎ স্থূল জগতের ভাবব্যঞ্জক।

বিষ্ণু বেদে এসেছেন পরে (দেশ হিসেবে)। সেই দেখেও অনেকে মনে করেন যে, তিনি মূলত অনার্য। পরে শিবের মত আর্যসাহিত্যে স্থান লাভ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ইন্দ্রের সংঘর্ষ দেখেও মনে হয় কৃষ্ণ-cult, অনার্য-cult।

এই cult ভারতবর্ষে একটি ক্রমবিকাশের পথে গড়ে উঠেছে। প্রাচীন ভারতের বসন্তোৎসব ছিল বর্বর জাতির-Bonfire dance—অর্থাৎ উৎসবাগ্নি ঘিরে নৃত্য, যে নৃত্যের দ্বারা তারা দেহে যৌন উন্মাদনা জাগাবার চেষ্টা করত; সেই উৎসবাগ্নি-নৃত্যই প্রাচীন ভারতে রূপ নিয়েছিল বসন্তোৎসবের। সেই বসন্তোৎসবই কৃষ্ণ-cult ঘিরে হোলি উৎসবের রূপ নিয়েছে।

কৃষ্ণ সম্পর্কিত যে মিথ্ সেটাও গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে বিভিন্ন মিথ্ থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে। গ্রীসের হেরাক্লিসের সর্পহত্যার কাহিনী থেকে সম্ভবত গোকুলের শিশুকৃষ্ণ কালীয় দমনের উপাদান আহরণ করেছেন। হেরাক্লিস যেমন বহু জিনপরীদের বিবাহ করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও তেমনই বিবাহ করেছিলেন বৃন্দাকে। জিনপরী জাতীয় সে মহিলার রীতি ছিল প্রতিবছর প্রাক্তন স্বামীকে হত্যা করে নতুন স্বামী গ্রহণ করা। শ্রীকৃষ্ণ হেরাক্লিসের মত তাকেও বশীভূত করেছিলেন। ব্রজবাসীরা প্রাচীন সেই অভ্যাসের ধারা আজও প্রতিবছর বৃন্দার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নতুন করে বিবাহ দিয়ে পালন করে। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রের দুর্ভেদ্য হলেও পায়ের নীচে ছিলেন ভেদ্য। সম্ভবত গ্রীক বীর একিলিসের পায়ের গোড়ালীর দুর্বলতার গল্পটিই এখানে এসে কৃষ্ণ মিথ্‌কে আরো স্ফীত করে তুলেছে। পায়ের গোড়ালিতে প্যারিসের শরাঘাতে একিলিসের মৃত্যু হয়। পায়ের নিচে ব্যাধ কর্তৃক শরাহত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও দেহত্যাগ করেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই হল বাস্তব ইতিহাস ও তত্ত্বের ইতিহাস। অথচ এর

সঙ্গে বিজ্ঞানও যুক্ত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা শ্রীকৃষ্ণের দোল'খেলাকে দেখে উদ্ভূত অণু-পরমাণুর cosmic dance বলে মনে করেন, যে পরমাণুগুলি নানা বর্ণে অনবরত ফুটে উঠে অনবরতই ডুবে যাচ্ছে। সংস্কৃতে গোপী শব্দের যে ব্যাখ্যা তাই এখানে বিজ্ঞানকে এগিয়ে আসতে সাহায্য করেছে। সংস্কৃতজ্ঞরা গোপী শব্দের অর্থ করেছেন এইভাবে ঃ— গো ইতি আপ্যায়তি পী=গোপী। গো অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতি, যা নৃত্যো নৃত্যো পরম পুরুষকে আপ্যায়িত করে তাই-ই গোপী। বিশ্বে cosmic dance এই ভাবে শূন্যতাকে আনন্দ দান করে বলে এই dance-কেই গোপীনৃত্য বলা যেতে পারে। আর শূন্যতা যে অনুভূতিহীন নয়, তা বর্তমানে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে Field-তত্ত্বের সাহায্যে, যেখানে দেখা যায় যে, কোথাও কোন চার্জ তৈরী হলে শূন্যতাও সেই চার্জের চতুর্দিকে বেঁকে যায়। সুতরাং নিশ্চিন্তে ধরা যেতে পারে যে, শূন্যতারও সাড়া দেবার ক্ষমতা আছে।

জগৎ সৃষ্টিতে Astrophysics-এর ব্যাখ্যা মেনে নিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গোকুল, মথুরা ও বৃন্দাবন লীলার নতুন ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে। যেমন, বৈকুণ্ঠ—যেখানে কোন কুণ্ঠা বা আলোড়ন নেই। বৈকুণ্ঠ থেকে জগতের উৎপত্তি হয় সত্ত্ব রজ ও তম গুণ যেখানে সূক্ষ্ম অবস্থায় বন্দীদশা প্রাপ্ত হয়ে একত্রে রয়েছে সেই মথুরারাজ কংসের কারাগার ভেঙ্গে। মহাশক্তি (কুলকুণ্ডলিনী-সর্প) তখন এগিয়ে চলেন কালস্রোতে সর্পের সাহায্যে (পুরাণ কাহিনীর বাসুকীর সর্পছত্রতলে বসুদেব কর্তৃক যমুনা পার হওয়া)। তারপরই শক্তি বিস্ফারিত হয়ে বিন্দুরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বিন্দুরূপে আত্মপ্রকাশ করার পূর্বে শক্তি যার গর্ভে ছিল তাই দিব্যক্ষেত্র বা দেবকী। স্থূলতার প্রতীক বসুদেবই হলেন তার বীজ। এই বিন্দুই গোকুল—কারণ, সংস্কৃতে (বৈদিক) গো অর্থ আলো। কুল (দ্রাবিড় ভাষায়) অর্থ শক্তি। সেই জন্য আলোরূপ বিন্দুই হল গোকুল—সত্ত্ব রজ ও তম (Three fundamental particles) গুণ যা ক্ষোভ তৈরী করে জগতের প্রকাশ ঘটায় অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি তৈরী করে। গোকুল থেকে মথুরায় ফিরে আসা মানে শক্তির বন্ধন মুক্ত হওয়া। এর পর সে যায় বৃন্দাবনে। 'বৃ'-অর্থ স্ফীত হওয়া, সেই অর্থে বৃন্দাবন বৃহৎ জগৎ। সেই বৃহৎ সূক্ষ্ম জগৎ স্ফীত হতে হতে প্রান্তভাগে স্থূল জগৎ তৈরী করে। এই প্রান্তভাগের পরেই আবার শূন্যতা। শূন্যতার দুয়ারে যে জগৎ তাই দ্বারকা, যে দ্বারকা বা দুয়ার থেকে পুনরায় শূন্যতায় ফিরে যাওয়া যায়। দ্বারকায় জীব জগতের তটে বাস করে বলে বৈষ্ণব শাস্ত্রে জীবকে বলে তটস্থা। জগৎ ভারতীয় মতে শক্তি (স্ত্রীলিঙ্গ)-জাত বলে জগতের জীবও স্ত্রীশক্তি স্বরূপ। সেই জন্য তটস্থা। সেখানে সংসার-জগতে সংগ্রাম করে (কুরুক্ষেত্রে) অবশেষে ভগবদ্গীতারূপ মহৎ বাণী হৃদয়ঙ্গম করে জীব মুক্তি লাভ করে। এই হল শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের কথা। এই তত্ত্ব যখন গল্পের রূপ লাভ করে তখন পরমাত্মার বুকে সত্য হয়ে ফুটে উঠে। সেইজন্য মথুরা-গোকুল-বৃন্দাবনের পৌরাণিক কাহিনী তত্ত্বও বটে। এই তত্ত্বের

ভিত্তিতেই ভগবান জীব-জগতে লীলা করে গেছেন। যখনই কোন তত্ত্ব গল্প হয়ে ফুটে ওঠে তখনই তা পরমাত্মায় সত্য হয়ে ফুটে থাকে। কারণ গল্পের মূল স্রষ্টা যে মনুষ্য দেহের অন্তরালের পরমাত্মা (সচ্চিদানন্দ) তা স্বয়ং ঈশ্বর নিজে। আমাদের কাহিনী যেমন exactly সত্য না হলেও কোন ছায়া-ঘটনার স্ফীত কায়া তেমনই জগতের সকল পুরাণকাহিনীও সত্য। ২৫ বছর আগে এই ধরনের তত্ত্ব বা সত্যে আমার কোন ধারণা ছিল না। ২৫ বছর পরে আবার যখন তার স্মৃতিচারণা করতে বসেছি তখন আজকের পরিপ্রেক্ষিতে সেই হারানো দিনের কথা ভাবতে গিয়ে সত্যিই মনে হচ্ছে একেই বলে জন্মান্তর। কিন্তু থাক। পঁচিশ বছর পরের এই অভিজ্ঞতার কাহিনী আজ থাক। আবার ফিরে যাওয়া যাক পঁচিশ বছর আগে।

সরু চাপা পথ। জনাকীর্ণ রাস্তা। সংধ্যার ছায়াতে মথুরার ঘরবাড়ি অতীত কয়েক হাজার বছরের ইঙ্গিত দিতে লাগল যেন আমাকে।

অঞ্জনাকে বললুম: কেমন লাগছে মথুরা, অঞ্জনা ?

—কেন সন্তুদা ?

—ঠিক কংস রাজার রাজধানী বলেই মনে হচ্ছে, না ?

—হঠাৎ তোমার এরকম মনে হচ্ছে কেন ?

—বাড়িঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ, অতীতের একটা স্পর্শ যেন এখনো লেগে রয়েছে। সমস্ত সহরটাই বোধহয় একটা দুর্গ। ইঁট দিয়ে গাঁথা নয়, যেন এক একটা আস্ত পাথর কেটে তৈরী। কী সরু রাস্তা !

—রাস্তাগুলো সত্যি সরু, কেন বল তো ?

বললুম: একদিন মথুরা মাঝে মাঝেই আক্রমণকারীর সম্মুখীন হত। শত্রুকে বাধা দেবার জন্যেই বুঝি এমন পরিকল্পনা। সুলতান মামুদ এখানে এসেছিলেন। মথুরার সৌন্দর্য নাকি তাকে লুব্ধ করেছিল। কিন্তু ঘরবাড়ির প্রত্যেকটিকে এক একটি দুর্গ বলে বোধ হয়েছিল তাঁরও। "Around it ··· they had placed 4000 castles built of stones, which they had made idol temples." উট্‌বির সেই বর্ণনাটা মনে পড়ছে। এর এক একটা বাড়ি যেন এক এক খণ্ড ম্যাসিভ স্টোন।

অঞ্জনা বলল: সবখানেই বুঝি তোমার ইতিহাসের কথা মনে পড়ে? এটা যে তীর্থস্থান সে কথাটা মনে পড়ে না ?

বললুম: শ্রীকৃষ্ণের এখানেই জন্ম। কিন্তু কারাগারে। শত্রুপুরীর মধ্যে। যেমন হয়েছিল প্রভু যিশুর। পশ্চিমী ঐতিহাসিকেরা তাই একে বলেন হিন্দুদের বেথেলহেম। বেথেলহেমে যিশু থাকেন নি, শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমিও মথুরা নয়, গোকুল। কেন যেন তীর্থস্থান মনে না হয়ে দুর্গ বলেই মনে হচ্ছে একে। অতীতের

আক্রমণকারীরা এ সহরের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু সৌন্দর্য দেখা তো দূরের কথা, শুধু ভয় ভয় করছে আমার।

—কেন ?

—ঐ তো বলছি, একে কারাগার বলে, দুর্গ বলে মনে হয় আমার। আর ঐ পাণ্ডা ব্যাটার চেহারা দেখলে না ? যেন স্বয়ং কংসের চর।

—তা যা বলেছ।

বললুম : এটা যাদবদের বাসভূমি হওয়া উচিত। কিন্তু লোকেদের দেখে গোপ-নন্দন বলে বোধ হয় না। এটা ছিল জাট-ইতিহাসের কেন্দ্র। মনে হয়, লোকগুলো আসলে জাট জাতীয়।

অঞ্জনা বলল : কি জানি, এখন আর এত ভাবতে পারছিনে। বড় ক্লান্ত। আগে বিশ্রাম করে নিই তো !

বললুম : তুমিও ক্লান্ত ?

—দিল্লী দেখে অবধি কেন যেন ক্লান্তি লাগছে।

বললুম : দিল্লী নয়, দিল্লীর অন্তর্নিহিত করুণ সুর তোমার মধ্যে ক্লান্তি এনেছে।

অঞ্জনা বলল : জানি না, হয় তো তাই।

টুং টুং করে টাঙ্গা চলেছে। মথুরার হৃদপিণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করছি আমরা। যতই এগুচ্ছি, ততই প্রাচীন মথুরাব ছায়া ফুটে উঠছে। সেই প্রাচীন ধরনের অলিন্দ। সেই দুর্গের মত প্রবেশপথের দরজা। সব যেন অতীত ইতিহাসের জ্বলন্ত সাক্ষী।

সেই মধ্যযুগ পার হয়ে ইংরেজরা শাসন করে গেছে ভারতবর্ষ। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। বিদেশী দস্যুর আক্রমণের আশংকা এখন কম। কিন্তু নতুন পরিকল্পনা নিয়ে নতুন সহর গড়ে ওঠে নি। সেই প্রাচীনই বর্তমান। এমন করে ঘর বাড়িগুলো তৈরী যে, আগামী কয়েকশ বছরে এর কিছু পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। মথুরাকে অদ্ভুত লাগছে। বোধহয় এই কারণে যে, মুসলিম সংস্কৃতির স্থাপত্য দেখে এসেছি এতক্ষণ পর্যন্ত। নয়াদিল্লীতে দেখেছি বর্তমান স্থাপত্য। এর কোনটাই হিন্দু প্যাটার্নের নয়। বস্তুত মন্দিরগুলি ছাড়া হিন্দু ধরনের ঘরবাড়ি আমরা খুব কমই দেখেছি। বাংলা দেশে তো সে পুরাণের চিহ্নমাত্র আর উপস্থিত নেই বললেই চলে। বাংলার বিশেষ স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন মেলে বিষ্ণুপুরে আর বাঁকুড়ায়। কালের আঘাত সয়ে সয়ে জরাজীর্ণ হয়ে আছে তারা। বাড়িঘরের মধ্যে হিন্দু প্যাটার্ন শুধু উত্তর ভারতেই আছে বুঝি ! তাব সন্ধান আরো গুজরাটে গেলে মিলবে। এই মথুরায় দেখছি মধ্যযুগের হিন্দু স্থাপত্য। এই স্থাপত্যের শিকড় হয় তো আরো অতীতে, সেই কংস রাজার সময় থেকে। অতীত ভারতের এমন একটা সুর এই কংস রাজার রাজধানীতে লেগে রয়েছে যে, তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে, কিন্তু প্রেম ভক্তি জাগায় না।

পাণ্ডাকে বললুম : ভাল একটা ধরমশালায় নিয়ে গিয়ে ওঠাবে।

মথুরার মন্দিরের আশেপাশে, রাস্তার দুধারে, গলির মধ্যে বহু ধর্মশালা।

বিশ্রামঘাটই মথুরার তীর্থকেন্দ্র। ধর্মশালাগুলি এর আশেপাশেই গড়ে উঠেছে। পাণ্ডা আমাদের একটি ধরমশালার কাছে নিয়ে গেল। মনে ভয়, জায়গা পাওয়া যাবে কি যাবে না। কিন্তু নেমে দেখি শূন্য ধরমশালা। একটা পুরাণো দুর্গের মত পরিত্যক্ত নীরবতায় দাঁড়িয়ে। বললুম: না, এখানে নয়, অন্য কোথাও চল।

গলিতে গলিতে আরো কয়েকটি ধরমশালা। কিন্তু কোথাও লোকজন নেই। আর কেমন একটা বিশ্রী ছায়া। এ-সব ধর্মশালায় থাকতে ভয় করে। মথুরার রাস্তায় চলমান জনকল্লোল। কিন্তু মথুরার অন্তরে এমন ভৌতিক নীরবতা কেন?

কারণটা পাণ্ডাকে জিজ্ঞেস করতে জানতে পেলুম। বৃন্দাবনের এটা off season. এখানে জমাজমাট ভীড় হয় শ্রাবণ মাসে। আশ্বিন-কার্তিকে এখানে তীর্থযাত্রীরা বড় আসে না।

বুঝলুম, ধরমশালাগুলির এই ভৌতিক নৈঃশব্দের কারণ কি? শ্রাবণ মাসেই কদম ফুল ফোটে, ধরার আঙ্গিনায় শ্যামলের ছায়া পড়ে। আকাশে কালো সজল মেঘের আনাগোনা চলে। ময়ূর পেখম তুলে নাচে ঠিক সেই সময়ই। সেই তো রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের যোগ্য সময়। আর হয় তো মথুরা বৃন্দাবনে যৌবনের সাড়া পড়ে যায়, ফাল্গুনে! তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণ তো চাঞ্চল্যে নয়, তন্ময়তায়। শ্রাবণেই বিরহের করুণ ঝঙ্কারে ফোটে আষাঢ়ের মেঘে আছে মেঘদূতের করুণ কান্না। শ্রাবণের ধারাতে শ্রীরাধিকার বিরহের আকুল নিবেদন। জানি না, সেই শ্রাবণের ঝঙ্কারে মথুরার এই কর্কশ অথচ গম্ভীর পাষাণ দেয়ালে কোমল ছায়া পড়ে কি না, কিন্তু বৃন্দাবনের পথে পথে বোধ হয় সপ্রেম সঙ্গীত ফুটে উঠে।

কোন ধরমশালাই পছন্দ হচ্ছে না। বীরেনদা ক্লান্ত। যে কোন একটাতেই তিনি ঢুকে পড়তে চান। কিন্তু অন্তর সাড়া না দিলে কোন কারাগারে ঢুকতে আমার ভয় করে। আমি ওদের অনেক করে বুঝিয়ে ভাল একটি ধরমশালার খোঁজে থাকলুম। অবশেষে ঠিক রাস্তার উপরে কলকাতার মাড়োয়ারীদের একটি ধরমশালা পাওয়া গেল

পাণ্ডা বলল: এখানে বাংলাদেশের কয়েকজন লোক আছেন। তীর্থে এসেছেন।

বললুম: তবে এখানেই খোঁজ কর।

ধরমশালার প্রবেশপথেই একজন প্রৌঢ় বাঙালী দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতের ছড়ি, ধুতি, চাদর ও পাঞ্জাবী দেখে বুঝলুম, ইনি বাঙালী।

নমস্কার জানিয়ে বললুম: এই ধরমশালায় আছেন আপনি?

—হ্যাঁ, কেন?

—কেমন জায়গা? ভাল তো?

—বেশ ভাল, এখানে উঠছেন নাকি? নির্ভাবনায় থাকুন।

দুশ্চিন্তা কাটল। সদলবলে ধরমশালায় উঠলুম। এখানেও লোক খুব নেই। একঘর বাঙালী, আর কয়েকজন বিহারী গুজরাটী উঠেছে। বিহারীরা দেখি ঘর ছেড়ে

বারান্দাতেই শুয়ে আছে। ওটা বোধহয় ওদের অভ্যেস। দুটো ঘর নিলুম। একটাতে মেয়েরা উঠলেন। আর একটাতে আমরা। বীরেনদা ঘরে ঢুকেই বিছনাপত্র খুলবার আগেই জামা গেঞ্জি খুলে ব্যাগ থেকে তেলের শিশি বের করে গায়ে মাখতে বসলেন। রীতিনীতির ক্ষেত্রে সত্যি একটি আশ্চর্য জীব বীরেনদা।

সুনীলবাবু বললেন : কি বীরেনবাবু, এই সন্ধ্যায় স্নান করবেন নাকি ?

—হ্যাঁ। শরীরটা যেন পচে গেছে। স্নান না করলে আর স্বস্তি নেই। তিনি ঘটি নিয়ে বাথরুমের দিকে চলে গেলেন।

বিছানা খুলে নিয়ে একটু বসলুম আমরা। তারপর সেই তরুণ পাণ্ডার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে লাগলুম : কত দিতে হবে, এবারে বল ?

পাণ্ডা বিনয়ের অবতার। বলল : যা খুশি দেবেন। আমাদের কাজ তীর্থ-যাত্রীদের মন্দির দর্শন করানো। খুশি হয়ে তাঁরা যা দেন।

এই দূর মথুরাতেও দেখি পাণ্ডাটি ভাল বাংলা বলতে পারে। বললুম : এত ভাল বাংলা শিখলে কোথায় ?

পাণ্ডা বলল : আমরা ব্রজবাসীরা বাংলাও জানি। তাছাড়া আমাকে তো মাসে মাসেই বাংলাদেশে যেতে হয় তীর্থযাত্রী সংগ্রহের জন্যে।

মনে পড়ে গেল ছোটবেলার দৃশ্য। গ্রামে গ্রামে পাণ্ডা যেতো তীর্থের মরশুমে। বালবিধবা পিসিমা আমার। পিসিমার ছিল তীর্থের বাতিক। ভারতবর্ষে হেন তীর্থস্থান নেই যা তিনি ঘোরেন নি—এই মথুরা থেকে পুরী, রামেশ্বরম থেকে নেপালে পশুপতির মন্দির। সেই ছোটবেলায় দেখতুম আমাদের গ্রামে যেত পাণ্ডারা। আর স্থানীয় বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও বিধবারা সেই পাণ্ডাদের সঙ্গে তীর্থে বেরিয়ে পড়তেন। এখনো আবছা আবছা মনে পড়ে দাশরথি পাণ্ডার কথা। পুরীর পাণ্ডা। দেশে গেলেই আমাদের বাড়িতে উঠতেন। সুপুরী কেটে খেতেন। একটা থলেতে সুপুরী আর জাঁতি থাকতো। বৈচিত্র্যের মধ্যে এঁরাই ছিলেন ঐক্যের সংযোগ।

পাণ্ডাকে বললুম : দেখ, কথাবার্তা আগে ঠিক করে নাও। শেষে একটা যা তা হেঁকে বসবে সেটা ভাল নয়।

পাণ্ডা বলল : আমি সে রকমের পাণ্ডা নই। কাজ করে দেখুন।

বললুম : কাজে সন্তুষ্ট হলে, যা করবার আমরা করব। এখন কথা ঠিক কর।

—কত দেবেন ?

—তিন টাকা।

—সে কি হয় বাবু। পাঁচ টাকা দেবেন।

—না। ঐ তিন টাকাই রইল।

পাণ্ডা বলল : কিছুই দেবেন না। সেজন্য চিন্তা নেই। চলুন, আগে দর্শন করাই তো সব।

আমি বললুম : আজ তো আর কোন দর্শন হবে না। দর্শন হবে কাল। কাল খুব সকালেই বেরুবে। আসবে।

—আজ একবার ঘাটেও যাবেন না? যমুনা মাইজীকে দর্শন করবেন না? স্নান করবেন না?

বললুম : এই ভর সন্ধ্যায় স্নান করে মারা যাব নাকি?

—কিছু হবে না বাবু। চলুন।

—না। আজ নয়। সমস্ত দিন ঘুরেছি। সকাল থেকে দিল্লীতে গাড়ীতে গাড়ীতে। তারপর সারাদিন ধরে মথুরার পথে। শরীর এখন চলছে না। আজ আর স্নানে যাব না।

কথা বলতে বলতে অঞ্জনা আর মিনু এল এ-ঘরে। হাতে ওদের তোয়ালে।

অঞ্জনা বলল : বীরেনদা কোথায়?

—উনি তেল মেখে বাথরুমে চলে গেছেন।

—কাজের কাজ করেছেন। তোমরা স্নান করবে না?

—মাথা খারাপ। ভর সন্ধ্যেয় স্নান করব কি। গা হাত পা ধুয়ে নেব।

—সে কি! সারাদিন ধুলো খেয়ে স্নান না করে থাকতে পারবে?

সুনীলবাবু বললেন : তোরা কি স্নান করবি নাকি?

—হ্যাঁ বাবা।

—না, না, অসুখ বিসুখ করে যাবে।

অঞ্জনা বলল : স্নান না করলেই মাথা খারাপ হয়ে যাবে বাবা। সন্তুদা, স্নানটা সেরে নাও, নইলে রাতে ঘুমোতে পারবে না।

বললুম : সারাদিন এই ক্লান্তির পর রাত্তিরে যদি ঘুম না হয়, তবে আমাকে রাঁচীর জীব বলে ধরে নিতে হবে।

অঞ্জনা রাগ করে বলল : নাও, তোমার সঙ্গে তর্ক করে পারা যায় না। যা ভাল বোঝ করবে। হ্যাঁ, নিচে কোথায় খাবার দোকান আছে, খাবার আনতে হবে। সেটা এনে রেখো।

বললুম : জল খাবার, না, আসল খাবার?

—এখুনি খাবার কি! সন্ধ্যে সাতটা এখনো বাজে নি।

—আজকে সন্ধ্যে সাতটাই অনেক রাত। জল খাবার আর খাবারের জন্য দুটো পৃথক সময় করে লাভ নেই।

অঞ্জনা বলল : তুমি এত অলস কেন, সন্তুদা? এই সন্ধ্যেবেলাই ঘুমোবে? তা হবে না। মথুরাটা ঘুরে দেখবে না?

আমার চোখ দুটো কপালে উঠে যাবার উপক্রম। এই সারাদিন ঘুরেও ঘোরার সখ মেটে নি অঞ্জনাদের। মেসোমশাই ঠিকই বলেছেন—ভ্রমণের ক্ষেত্রে মেয়েরা অক্লান্ত। সাজগোজ করে বাড়ি থেকে ওদের বেরুতে দেরী, আবার বেরুলে ফিরতে আরো দেরী।

নামে ওরা গৃহিণী, আসলে ওদের মধ্যে বোধ হয় একটা যাযাবর বৃত্তি আছে। ওদের ভড়ং দেখে পুরুষেরা 'পাখীর নীড়ের মত চোখ তুলে' ওদের তাকাতে দেখে। আশ্রয় আশা করে ঘর বাঁধতে গিয়ে দেখে ডাঙশের খোঁচা অনবরত। শান্তি তখন নিত্য অশান্তিতে পরিণত। হায় রে স্ত্রী চরিত্র!

অঞ্জনা বলল: কি ভাবছ, হাত মুখ ধোও, কিংবা স্নান কর। যা হয় একটা কিছু করে খাবার আনতে যাও।

সমস্ত দিন পিত্তি পড়েও শরীরটা এতক্ষণ পর্যন্ত স্নিগ্ধ ছিল। এবার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। মনে হল স্নান করি। বললুম: আচ্ছা যাচ্ছি। তোমরা যাও।

পাণ্ডাকে বসতে বলে তোয়ালে কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্নান সেরে ফিরে এলুম আমি। দেখি, বীরেনদাও ফিরে এসেছেন।

বললুম: চলুন বীরেনদা, জল খাবার কিনে আনা যাক।

বীরেনদা, বললেন: হ্যাঁ, এখন আর কিছু পেটে না দিলে চলছে না।

পাণ্ডাকে নিয়ে বীরেনদার সঙ্গে খাবারের সন্ধানে বেরলুম। দেখলুম, পাণ্ডার বাঁধা দোকান আছে। শেয়ারের ব্যবস্থা এসব জায়গায় আছে কিনা কে জানে। খাবার বলতে গরম পুরি আর শব্জি। মিষ্টির চেহারা দেখলে ভক্তি আসে না। মিষ্টি তৈরীতে উত্তর ভারতে কেউ ওস্তাদ নয়। হরিদ্বারে শুধু রাবড়ি দেখেছি। রসগোল্লা আছে বটে, কিন্তু বাদ। কলকাতার স্পঞ্জের রসগোল্লার স্বাদ যে একবার পেয়েছে, এ-সব মিষ্টি কোনদিনই তার মুখে রুচবে না। অগত্যা পুরিই কিনলুম। আর কিনলুম দহি। মোষের দুধের দই বা দধি না বলে একে দহি বলাই সঙ্গত। মোষের দুধের দই। হোয়াইট ওয়াসের চেয়েও সাদা রঙ। এ দহির স্বাদ যে কি, তা জানি। ছোটবেলা বিহারে মানুষ হয়েছি। 'দহি চুড়া'র স্বাদ জানি। এ দহি মুখে দিলে মাথার চুলগুলো পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠবে।

পাণ্ডাকে বললুম: এখানে হোটেলে ভাতটাত পাওয়া যায় না?

পাণ্ডা বলল: ভাতের হোটেল খুব বেশী নেই।

ভেতো বাঙালী, সে কথা শুনেই শিউরে উঠলুম: ভাত না হলে তো চলবে না!

পাণ্ডা বলল: এখানে একটা দোকানে ভাতের ব্যবস্থা আছে। চলুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।

ওর সঙ্গে আমি সে দোকানের দিকে এগুলুম। দোতলায় হোটেল। ভাত মেলে, কিন্তু চার্জ অত্যধিক। দু'টাকার নিচে কোন প্লেট নেই। মাছ মাংসের প্রশ্নই উঠে না। ঐ শব্জি আর ভাত।

যা হোক, দু'মুঠো ভাত হলেই যথেষ্ট। সেই ভাতের আশ্বাস নিয়ে ফিরলুম।

পাণ্ডা বলল: বাবুজী, আমাকে যেতে হবে। কোথাও বেড়াতে বেরুবেন কি এখন?

বললুম : না, তুমি এবার যেতে পার। আজ রাতে আর কিছু দেখব না।

পাণ্ডা বলল : তা হলে কাল সকালে আবার আসব।

—আচ্ছা।

পাণ্ডা নামেই পাণ্ডা। হাতে রোলেক্স। পরনে ফিন্‌ফিনে ধুতি। গায়ে মখমলের পাঞ্জাবী। বয়েস অল্প। যে-কটি পাণ্ডা রাস্তায় ধরেছিল, তাদের সব কটিকেই বাবু দেখলুম। কাশী আর হরিদ্বারে পাণ্ডাদের এ প্রাচুর্য নেই। প্রাচীন সহর মথুরা। এখানে মডার্ণ পাণ্ডা সৃষ্টি হল কি করে? যে যাই বলুক, এরা জাতিতে গোপ নয়। জাট অরিজিন নিশ্চয়ই। চেহারা প্রত্যেকেরই উন্নত। দীর্ঘ নাসা। গৌরবর্ণ। কারো কারো চেহারার উগ্রতা এমন যে, রণক্ষেত্রে তরবারি ধরলে মানাতো ভাল।

খাবার দেখে মিনু বলল : একি এনেছ? পুরি ছাড়া আর কিছু নেই?

বললুম : পুরি ছাড়া আর কিছু উড়িষ্যার পুরীতে মিলতে পারে, মথুরাতে নয়। এর জিয়োগ্রাফিক্যাল অবস্থানটা বিচার কর, লোকগুলোর অরিজিন আর চাল-চলন বিচার কর, তবেই আর কি খাবার মিলতে পারে সেটা আঁচ করতে পারবে। উত্তর বিহার থেকেই ভাতের চলন উঠে গেছে। এখানে ভাত নিতান্তই অবহেলিত।

মিনু বলল : নাও, তোমার বিদ্যে আর ফলাতে হবে না। সব সময় কেবল বক্‌বক্‌। আমরা কি আর লেখাপড়া করি নি?

বললুম : তুমি পড় সাহিত্য। তুমি কথা বললে তো সেটা সুরের মত বেরুবে। আমি ইতিহাস বলে বক্‌বকানী হয়। আমরা মিষ্টি বললে কষ্ট হয়। আর তোমাদের বক্‌বকানীতে কবিত্বের ভাব মাখানো থাকে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কে যেন লিখেছিলেন :

> থাক্‌ থাক্‌ থাক্‌ পায়রা কবি
>
> খোপের ভিতর থাক ঢাকা,
>
> তোর বক্‌বকানী ফোঁস্‌ফোঁসানী
>
> তাও কবিত্বের ভাব মাখা।

মিনু বলল : সত্যি প্রফেসারি করে তোমার মাথাটা একেবারে গেছে। সারাদিন শুধু বিড়বিড় করছ।

বললুম : অঞ্জনা তো অধ্যাপনা করে না। ও তবে সারাদিন বক্‌বক্‌ করে কেন?

মিনু এবার হেসে ফেলল। অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে বলল : ওর বায়ুর ধাত।

অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে বললুম : কি অঞ্জনা সত্যি তাই নাকি?

অঞ্জনা বলল : দোষটা তাহলে আমি তোমাকেই দিচ্ছি। এত বক্‌বক্‌ সত্যি আমি করি না। তোমার ছোঁয়াচ লেগে বোধহয় এটা হয়েছে। কিংবা তোমার অনেক গুণ : মূকং করোতি বাচালং।

আমি বললুম : তাহলে আমার পক্ষেও বক্তব্য আছে। তুমি যা বললে তার উল্টোটা :

আমি বাচালং করোতি মূকং। আমার সঙ্গে দেখা হওয়া অবধি মিনু বোধ কথাবার্তা কমিয়ে দিয়েছে।

মিনু মুখ না তুলেই বলল : আমি চিরকালই এমনি। তোমার জন্যে আমার কিছু বাড়েও নি, কমেও নি।

অঞ্জনা বলল : একটা জিনিষ বেড়েছে।

—কি ?

—বলব ?

—বল্ না।

—অহংকার।

মিনুর মুখটা রাঙা হয়ে উঠল।

কথাটা হচ্ছিল মিনুদের ঘরে। রাঙামাসীরা তখন বাথরুমে গিয়েছিলেন, তাই আমরা একটু মন খুলে নিতে পেরেছিলুম।

মিনু বলল : তোর কিছু বাড়ে নি ?

—বল।

—তুই-ই বল না ?

—আমি জানি তুই একটা জিনিষ বেড়েছে বলে বলবি।

—কি ?

—হিংসা।

ঠোঁট উল্টে মিনু বলল : ইস্, বয়েই গেছে আমার।

—মনে মনে ঠিক ভাবছিস্, বল্ ?

—না।

—তাহলে ভাবাবো ?

—যা খুশী।

অঞ্জনা হেসে আমার দিকে তাকাল।

আমি উঠতে উঠতে বললুম : তোমরা তর্ক কর। আমি যাই।

অঞ্জনা আমার হাত ধরে টান দিল : দাঁড়াও।

—কি।

শালপাতার উপর তিনখানা গরম পুরি আর শবিজ্র দিয়ে ও বলল : নাও।

পুরি খেতে খেতে আমি ও ঘরে এলুম। টিফিন ক্যারিয়ারের ঢাকনাতে করে মেসোমশাই আর বীরেনদার জন্যে খাবার নিয়ে ওরাও এল এ ঘরে।

মেয়েরা লক্ষ্মী। তাই বলে শান্ত একথা মনে করা চলে না। লক্ষ্মীর চরিত্র যারা জানেন তাঁরা নিশ্চয়ই বলবেন না তিনি অনড়। সবচেয়ে বেশী চঞ্চলা লক্ষ্মী। পড়ন্ত অভিজাত ঘর বা ব্যবসায়ীকে একথা জিজ্ঞেস করলেই এর সদুত্তর পাবেন।

জলখাবার শেষ হতেই অঞ্জনা বলল : চল সন্তুদা, মথুরা সহরটা একটু ঘুরে আসি।

সুনীলবাবু বললেন : তোদের কি ক্লান্তি বলতে কিছুই নেই নাকি ?

অঞ্জনা বলল : কি করব ? এই ভর সন্ধ্যেয় শুয়ে থাকব নাকি !

সুনীলবাবু বলছেন : যা ইচ্ছে কর। তোমার মাও যাবে নাকি ?

—হ্যাঁ।

মুখ গম্ভীর করে সুনীলবাবু বললেন : যাক। তবে এই বিদেশে অসুখে পড়লে আমাকে বোল না বাপু।

কিন্তু সুনীলবাবুর সে অভিযোগে এতটুকু কর্ণপাত করল না অঞ্জনা। আমাকে বলল : চল।

শরীরে আমিও ক্লান্তি অনুভব করছি। কিন্তু যে পাল্লায় পড়েছি, রেহাই পাব না বুঝলুম। অগত্যা উঠলুম। অঞ্জনাদের শুনিয়ে আপন মনেই বললুম :

"হায় রে প্রলাপি কবি
পারে কি কেহই মুছিয়া লইতে
ললাটের রেখা সবই !
মথুরার রাজা টানিছে যে ভাই কালের রজ্জু ধরে।"

মিনু দেখি মুচকি মুচকি হাসছে।

পাঞ্জাবীটা গায় চড়িয়ে আমি অঞ্জনাকে বললুম : কবিতাটা কে লিখেছিলেন বল তো ?

হেসে অঞ্জনা বলল : কেন ?

—ওটা কালের রজ্জু না হয়ে কানের রজ্জু হলে ভাল হত। কংসের পর যিনি মথুরার রাজা হয়েছিলেন, তিনি এক নম্বরের শয়তান ছিলেন জান। নইলে এতদূরে টেনে এনে এত সাজা দিতে উদ্যত হবেন কেন ?

অঞ্জনা বলল : নাও, এবার কাব্য রাখ। চল, সময় হাতে করে তো কেউই বেরই নি। থাকবে তো মাত্র কালকের দিন। এর মধ্যে বৃন্দাবন আছে, গিরি-গোবর্ধন আছে, গোকুল আছে। এত সব একদিনে দেখে শেষ করা যাবে ? এতদূরে পয়সা খরচ করে এসে কিছুই দেখব না, এটা হয় ?

বললুম : তর্কে কাজ নেই, চল। তোমরা তো নিমিত্ত, টানছেন সেই মথুরার রাজা।

অঞ্জনা বলল : বৈষ্ণব তীর্থে এসে বৈষ্ণব বনে গেলে নাকি ?

—সবই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা। চল।

অঞ্জনা বীরেনদার দিকে তাকাল : যাবেন নাকি, বীরেনদা ?

জলযোগের কিছুটা পেটে পড়ায় চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন বীরেনদা। বললেন : চল। টাকাই যখন ব্যয় হল, তখন কিছুটা উঠিয়ে নেওয়া যাক, এই হল বীরেনদার থিওরি। বললুম : কোথায় যাবে ?

অঞ্জনা বলল : শুনেছি, বিশ্রামঘাট এখানে দেখবার মত জায়গা। ওখানে চল।

বললুম : নাম শুনে ভুলেছ বুঝতে পারছি। কিন্তু বিশ্রামঘাটে গিয়ে ক্লান্তি বাড়বে বই কমবে না, জেনে রেখো।

আমরা বেরুলাম। রাঙামাসীরাও বেরুলেন। মেয়েদের দেহ ভগবান কি দিয়ে তৈরী করেছেন জানি না। ভ্রমণে যে ওদের ক্লান্তি আসে না কেন, এর একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা উচিত। বাউল দেহতত্ত্ব গানের মধ্যে এর কোন ইঙ্গিত আছে কিনা ভাবতে চেষ্টা করলুম।

দরজা দিয়ে বেরুবার সময় ধরমশালার ম্যানেজার বলল : দশটার মধ্যে ফিরে আসবেন। দশটার পর কিন্তু গেট বন্ধ হয়ে যায়।

পথে নামলুম।

আমাদের ধরমশালা মথুরা তীর্থের একেবারে কেন্দ্রে। এখানে ভীড় বেশী। হাজারো বিপণী ধর্মভীরু তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণ করবার জন্যে। অধিকাংশই মনোহারী দোকান। জিনিষপত্র যা অছে তা কলকাতাতেও মেলে। কিন্তু একটা জিনিষ এ পর্যন্ত লক্ষ্য করে দেখেছি যে, তীর্থস্থানে সাধারণ জিনিষও একটা বিশেষ আকর্ষণী ক্ষমতা নিয়ে দাঁড়ায় যেন। কোন কিছুর দিকে তাকালেই তা মানুষকে প্রলুব্ধ করে। পুজো উপাচারের ছোট পেতলের জিনিষ, সিংহাসন, মুকুট, রুপোর বাঁশী, শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি, রাধাকৃষ্ণ, গোপাল, এইসব অনেকগুলো দোকানে সাজানো। দেখেই রাঙামাসীরা প্রলুব্ধ হলেন। একটা দোকানের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। অনন্ত কৌতূহল মেয়েদের। যা দেখে তাই খোঁজ করতে চায়। একটু উপরের পর্যায়ে এই কৌতূহল থাকলে জ্ঞানে বিজ্ঞানে পৃথিবী আরো উন্নত হত। দোকানে দাঁড়াতে দেখলেই বীরেনদার ভয়। দু-এক টাকা পকেট থেকে খসবেই। তিনি একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

রাঙামাসী বললেন : বীরেন, এই গোপালটা দাম কর তো।

অসন্তুষ্ট চিত্তে বীরেনদা এগিয়ে গেলেন।

তীর্থযাত্রীদের মনের দুর্বলতা দোকানদারদের জানা আছে। উত্তর প্রদেশের এক প্রান্তে, জাট অঞ্চলে বাঙ্গালীরা নিশ্চই তীর্থ করতে বা বেড়াতে এসেছে। এইসব লোকদের কাছ থেকেই দাও মারতে হয়।

সামান্য একটা পাঁচ ইঞ্চির পেতলের গোপালের দাম হাঁকল ওরা পাঁচ টাকা। রাঙামাসীর খুবই পছন্দ। কি আর করেন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও বীরেনদা কিনলেন। কিনলেন অপ্পনার মাও। বিধাতার কি পরিহাস, যে বীরেনদা হিসেব করে ব্যয় করেন, অনিচ্ছাকৃত ভাবে এগিয়ে গিয়ে স্বইচ্ছায় তিনিও ফাঁদে পা দিলেন। যুগলমূর্তি রাধাকৃষ্ণের। শ্বেত পাথরের মূর্তি। আমি জানি এটা শ্বেত পাথর নয়, প্লাস্টার অব্ প্যারিসের। যে অঞ্চলে বীরেনদার বাস, সেখানে বৈষ্ণব প্রাধান্য। দুর্গোৎসবের চেয়ে দোলে আনন্দ বেশী। অষ্টপ্রহর আর মহোৎসব লেগে আছে মাঝে মাঝেই। কি জানি, মানুষের মনে কি আছে। মনে মনে হয় তো বীরেনদা পরম বৈষ্ণব। মূর্তিটির দাম টানা হিচ্ড়ের পর ঠিক হল, চোদ্দ টাকা। কিনে ফেললেন বীরেনদা। মূর্তি কিনলে হবে কেন, তাকে বসাবার

জন্যে আসন চাই। আটটি টাকা গেল আসনে। যুগলমূর্তির হাতের বাঁশী চাই। রূপোর বাঁশী নিলেন দশ টাকাতে। বত্রিশ টাকা বেরিয়ে গেল ধরমশালা থেকে বাইরে পা দিতেই। মথুরার রাজা সত্যিই রসিক। শুধু পঙ্গুকে তিনি গিরি লঙ্ঘন বা মূককে বাচাল করেন না, কৃপণকেও তিনি দরাজহস্ত করেন।

কেনাকাটার শেষে বীরেনদার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলুম—মনটার মধ্যে তার খচ্‌খচ করছে কিনা।

বীরেনদা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : ঠকি নি, কি বল ?

বললুম : জিনিষ মনের মত হলে কেউ ঠকে নাকি কখনো !

দোকান ছেড়ে আবার চলতে আরম্ভ করলুম।

অঞ্জনাকে বললুম : সামনে একটা ঘাঘ্‌রার দোকান আছে, যাবে নাকি ?

—মানে ?

—মথুরায় এসেছো, তার নিদর্শন নিয়ে যাবে না ?

অঞ্জনা বলল : ঠাট্টা করছ ? মেয়েছেলে বলে জিনিসপত্র কেনার বায়না ধরব এটা ভেবেছ বুঝি ? কিন্তু আমরা যে এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, সে কথাটা ভুলে যাচ্ছ কেন ?

বললুম : ইউনিভার্সিটিতেই যাও আর ডক্টরেটই নাও, আঠারো হাত শাড়ী দিলেও কাছা এঁটে তো আর চলতে পারবে না।

মিনু বলল : সেই পুরাণো বুলি ভুলে যাও সন্তুদা। মেয়েরা এখন রীতিমত মাঠে ময়দানে লড়াইয়ে যায়।

বললুম : সর্বত্র খোঁজ নিতে পারিনে। তবে লাল পতাকা হাতে কম্যুনিস্টদের কল্যাণে মেয়েরাও যে ময়দানে ভিড় করে সেটা জানি। অফিস এবং মনুমেণ্টের তলা পর্যন্ত তোমাদের দৌড় নিশ্চয়ই হয়েছে।

মিনু বলল : বড় বড় কথা বোলো না। নিজের দেশটার কথা একবার ভেবে দেখেছ ? একজন মেয়েছেলেই তো তোমাদের প্রধান মন্ত্রী।

এবার মুখ বন্ধ। কথা বলবার উপায় নেই। শুধু বললুম : যুগের হাওয়া বদলেছে। এখন ছেলেরা বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে থাকে। এবার সকাল আর সন্ধ্যায় উনুনে কয়লা ধরাচ্ছে এইটুকু দেখতে বাকী। কল্কিপুরাণে কিন্তু এমন হিন্টস্ ছিল না।

মিনু বলল : নাও, এবার বক্‌বক্ থামাও। মেয়েছেলের মত কেবল বকর বকর করতে শিখেছ।

—কি করব বল। মেয়ে যেখানে পুরুষের ভূমিকা নিচ্ছে, পুরুষকে বাধ্য হয়ে সেখানে মেয়ের ভূমিকা নিতেই হবে। তবে এই পরম বৈষ্ণব ভূমিতে দাঁড়িয়ে এইটুকু সান্ত্বনা যে, একজন পুরুষের মাটিতে যা হোক দাঁড়িয়ে আছি। বৈষ্ণব তত্ত্বে [illegible] তিনিই পুরুষ আর সবই প্রকৃতি।

মিনু অঞ্জনাকে ঠেলে দিয়ে বলল : তোর ব্যাপার, দর্শনের কথা।' ইচ্ছে হয় তর্ক কর।

অঞ্জনা বলল : এখন বিশ্রামঘাট দর্শনই বড় দর্শন। এই দেখ ঘাটের কাছে এসে গেছি।

মথুরার মেন রোড ধরে স্টেশনে যাবার পথে বাঁ দিকে বিশ্রামঘাট। অঞ্জনারা এ পথ চিনল কেমন করে ?

জিজ্ঞেস করতে অঞ্জনা বলল : মথুরার রাস্তা টানছে যে।

মথুরার ঘাটে প্রদীপ ভাসাচ্ছে মেয়েরা। সোপান বেয়ে জলের ধারে গিয়ে আমরাও দাঁড়ালুম।

অঞ্জনা তো প্রায় চিৎকার করে উঠল : মিনু, দেখ্ দেখ্।

ঘাটের দিকে তাকিয়ে আমিও অবাক! ঘাটে সোপানের কাছে জল দেখা যায় না, শুধু কচ্ছপ আর কচ্ছপ।

আশ্চর্য! নিঃশঙ্ক কচ্ছপগুলো। এতটুকু ভয় নেই। চোখের দৃষ্টিতে অহিংসা। গোল গোল চোখ মেলে পুণ্যার্থীদের দিকে তাকিয়ে আছে।

হিন্দুস্থানী মেয়েরা দেখি কচ্ছপগুলোকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে জলে প্রদীপ ভাসাচ্ছে। কিন্তু প্রদীপ ভাসাবার উপায় আছে নাকি! প্রদীপের আগুনকে খাবার মনে করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে কচ্ছপগুলো। ছোট মেয়েরা ছোলা বিক্রী করছে কচ্ছপের খাবার হিসেবে। কৌতূহলে দু আনার ছোলা কিনে জলে ছিটিয়ে দিতে লাগলুম। খাবারের সন্ধান পেয়ে জলের মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিল কচ্ছপগুলো। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা wireless বার্তা চলে গেল যমুনার এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত। ঝাঁকে ঝাঁকে দল বেঁধে কচ্ছপেরা ঘাটে আসতে লাগল। ঘাটের জল আর দেখা যায় না।

অঞ্জনা বলল : এত কচ্ছপ এখানে কেন ?

বললুম : এই ঘাটের যিনি রাজা, সেই কৃষ্ণ ছাড়া এ কথার উত্তর কে দিতে পারেন বল ? তবে আমার ব্যাখ্যা এই যে, মথুরাটা বরিশাল নয়। তা হলে কচ্ছপের টিকিটিও দেখা যেত না। যেমন দেখা যেত না হরিদ্বারের গঙ্গায় মাছ, যদি সেটা বাংলাদেশে হত।

অঞ্জনা বলল : বরিশালের সঙ্গে কচ্ছপ থাকা না থাকার সম্পর্ক কি ?

আমি বললুম ? ও মা, তুমি জান না বুঝি ? কলকাতার লোকে যেমন রুই ফেলে চিংড়ি কেনে, বরিশালের লোকে তেমনই কচ্ছপের মাংস পেলে পাঁঠার মাংস কিনবে না। কলকাতার কচ্ছপের মাংসের দোকান তো ওদেরই জন্যে।

—তাই নাকি! বরিশালের লোকেরা এত কচ্ছপের মাংস ভালবাসে জানতুম না তো! আমাদের বীথিকা বরিশালের মেয়ে, ওকে বলব।

বললুম : কিন্তু আশ্চর্য বিষয় কি জান ? কচ্ছপের মাংসের effect ঠাণ্ডা। অথচ

বরিশালের মানুষের মাথা সব চাইতে গরম। সুতরাং কথাটা বলবার আগে দুবার করে ভেবে নিয়ে বোল।

মিনুর দেখি মুখ গম্ভীর। আসলে ও তো বরিশালের মেয়ে। তার পূর্বপুরুষেরা বরিশাল থেকেই এসেছিল। সে বললে : বরিশালের আঞ্চলিকতা নিয়ে একটা রিসার্চ করলেই পার।

আমি হাতজোড় করে বললুম : আমার এনালিসিস যদি আমার অজ্ঞাতে তোমাকে আঘাত করে থাকে, তবে মাপ কোরো মিনু। আমি ভুলেই গিয়েছিলুম যে তোমরা…

অঞ্জনা বলল : ও, মিনু বুঝি বরিশালের ? এই যা…। হো হো করে সে হেসে উঠল।

আমরা যখন কচ্ছপতত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত, ইতিমধ্যে দেখি রাঙামাসীরা এক ডালাওয়ালীর কাছ থেকে থেকে প্রদীপ কিনে নিয়ে ঘাটে ভাসাতে যাচ্ছেন। রাঙামাসীর সাহস অসীম। দিব্যি কচ্ছপগুলোর পিঠে সস্নেহ হাত বুলোতে বুলোতে ও গুলোকে সড়িয়ে দিয়ে প্রদীপ ভাসালেন।

মিনু বলল : রাঙামাসী অমন করে হাত দিও না, কামড়ে দেবে।

রাঙামাসী বললেন : না, কিছু বলে না। হাত দিয়ে দেখ্ না।

রাঙামাসীর মত এমন অগাধ বিশ্বাস মিনু, অঞ্জনা বা আমার, কারো নেই।

অঞ্জনা বলল : এই কচ্ছপগুলোর religious significance কিছু আছে ?

আমি বললুম : নেই আবার ! কচ্ছপ তো অবতার বিশেষ। দ্বিতীয় অবতার। মৎস, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ইত্যাদি। এই কচ্ছপকে তুমি যা তা ভেবো না।

অঞ্জনা বলল : কচ্ছপের রহস্য এতক্ষণে বুঝলুম।

যমুনার জলে হরিদ্বারের গঙ্গার সে খরস্রোত নেই। শেকল লাগাবার প্রশ্ন ওঠে নি এ ঘাটে। কিন্তু বাঁশ দিয়ে একটা ঘেরাও তৈরী করা হয়েছে। সব তীর্থযাত্রীই সাঁতার জানবে, এমন তো কথা নেই। রাত্রিবেলা জলের অবস্থাটা আন্দাজ করা যাচ্ছে না। তবে ঘাটের ওধারে অনেকগুলো নৌকা দাঁড়িয়ে। কাশীর মত যমুনার বুক থেকে মথুরাকে দেখবার ব্যবস্থা আছে। কাশীর ঘাটে নৌকা চেপে সহরের দৃশ্য দেখবার অভিজ্ঞতা আছে মিনুর। সন্ধ্যার এই আবছা অন্ধকারে বসে জলের বুকে ভাসতে ভাল লাগে।

মিনু বলল : চল সন্তুদা, নৌকোয় চাপি।

ঘাটের নৌকো সম্পর্কে আমাদের সাবধান করে দিয়েছিল কাশী থেকে কয়েকজন।

মাঝি-মাল্লারা সব সময় ভাল হয় না। গুন্ডাদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে। কাশীর ঘাটে অনেক নৌকো, অনেকে বেড়াচ্ছেন। সেখানে তবু সাহস হয়। কিন্তু মথুরার ঘাটে সে সাহস আমার হল না। কাশীর ঘাটের সেই ভীড় মথুরার ঘাটে নেই। জাট অধ্যুষিত এই অপরিচিত স্থানে মেয়েদের নিয়ে নৌকোয় বেড়াবার দুঃসাহস আমার নেই।

বললুম : না, আজ থাক।

অঞ্জনা বলল : কেন, চল না। নৌকোয় তো তেমন চাপি না।

বললুম : নৌকোয় চাপবার সখ হয় দক্ষিণেশ্বর গিয়ে বেলুড়ে যাবার জন্য নৌকোয় চেপো। নৌকোর আনন্দ পাবে। এই অপরিচিত জায়গায় নৌকো থাক। সব সময় নৌকোয় চাপা নিরাপদ নয়।

—কি হবে ?

—অনেক কিছুই হতে পারে। এইসব তীর্থস্থানে ঘাটের মাঝিদের সম্পর্কে তোমার ধারণা নেই। আজ এখন চল, ফিরি।

বীরেনদাও ফেরার কথা বললেন।

ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি পৌনে আটটা। ফিরতে ফিরতে বললুম : ধরমশালাতে গিয়ে আর দেরী না করে হোটেলে যেতে হবে। খাওয়া দাওয়াটা তাড়াতাড়ি সারতে হবে।

এ প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে বীরেনদার অনুমোদন পেল।

ধরমশালাতে ফিরে, মাসীদের রেখে, টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সেই দ্বিতল জীর্ণ গৃহ। হাঁফানী রোগাক্রান্ত হোটেলের মালিক। ভাত আর শব্জি নিলুম। আর একটু টক। রাতেও ওরা টক দেয়। এই দূর উত্তর ভারতেও ঝাল খাবার দিকে ঝোঁক আছে বলে মনে হল।

ক্ষুধার মুখে যা মুখে দিলুম তাই ভাল। খাওয়া শেষ হলে অঞ্জনাকে বললুম : মাসীদের জন্য কি নেবে ? রুটি ?

অঞ্জনা বলল : না, ভাত। সারাদিন আজ কারো পেটে ভাত পড়ে নি। সুতরাং ভাত নেওয়াই ভাল।

খাওয়া দাওয়ার পর দেহে ক্লান্তিটা বেশ জমে উঠল। সারা দিন দেহের উপর দিয়ে একটা অমানুষিক ঝাঁকুনী গিয়েছে। মেশোমশায়ের খাওয়া হতে আর বিলম্ব করলুম না, শুয়ে পড়লুম। শোবার আগে দরজা আটকাতে গিয়ে দেখি, দরজার খিল্ নেই। ভেতর থেকে শিকল টেনে দিতে হয়। মধ্যযুগের দুর্গের দরজার মত মোটা মোটা কবাট। অথচ আটকানোর ব্যবস্থা সামান্য একটা শেকল। কেন যে এ ব্যবস্থা, কে জানে!

যে কোন মুহূর্তে চোর ঢুকে একটা বিপদ করে দিতে পারে। বীরেনদাকে ব্যাপারটা বললুম। তিনি কোন গা করলেন না।

কিন্তু আমার মনটা এসব বিষয়ে নিতান্তই খুত্‌খুতে। মনের মধ্যে কেমন একটা দুশ্চিন্তা হতে লাগল। কিন্তু ক্লান্তি এত নিবিড় হয়ে জমে উঠেছিল যে দুশ্চিন্তাটাকে অনেকক্ষণ সে আমল দিতে পারল না।...

পরদিন ঘুম না ভাঙতেই দেখি, সেই পাণ্ডা এসে হাজির। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করে সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে সে। বললে : পুজো দেবেন না ?

বললুম : এত সকালে ? স্নান করা হয় নি যে। বসুন, স্নানটা সেরে নি।

ও বলল : স্নান করবেন ঘাটে। মথুরা এসে যমুনা মাইজীর ঘাটে নামবেন না ?

রাঙামাসীরা ইতিমধ্যে দেখি প্রস্তুত। কখন উঠে এরা প্রস্তুত হলেন কে জানে। বীরেনদা দেখি তেল মাখছেন।

মিনু বলল : সন্তুদা, তুমি ঘাটে যাবে না ?

বললুম : না, তোমরা যাও। আমি এখানেই স্নান সেরে নেব।

পাণ্ডা বলল : সে কি! যমুনায় স্নান করবেন না ? না না, সে হবে না। যমুনায় চলুন।

আমি যেতে চাই না। পাণ্ডা বলে, যেতেই হবে। অগত্যা রাজী হলুম।

অঞ্জনা মেশোমশাইকে বলল : তুমি এখানেই স্নান কর বাবা।

কিন্তু পাণ্ডা বৃদ্ধ বলে সুনীলবাবুকেও রেহাই দিল না। বলল : মথুরা এসে যমুনায় স্নান করবেন না, এটা হয় নাকি। চলুন।

অঞ্জনা বলল : না থাক, বুড়ো মানুষ।

পাণ্ডা বলল : কিছু হবে না, চলুন, চলুন।

সুনীলবাবু বললেন : ঘাট কত দূর ?

অঞ্জনা বলল : দূরে নয়, কাছেই। যাবে ?

—চল।

অগত্যা সকলেই রওনা হলুম ঘাটের দিকে।

তখন সূর্য কেবল উঁকি দিয়েছে। সকালটা যেন হাসছে। যমুনার ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হলুম। স্নানের সময় অবশ্য লোকজন দেখা গেল বেশ। অধিকাংশই হিন্দুস্থানী। ব্রজবাসী, মেয়ে বৌ-রা ঘাটের চাতালের মধ্যভাগে যে মন্দির, সেই মন্দির ঘিরে গান গেয়ে গেয়ে নৃত্য করছে।

ঘাটে দাঁড়িয়ে পাণ্ডা বলল : এই হল বিশ্রামঘাট। শ্রীকৃষ্ণ মামা কংসকে বধ করে এখানে এসে বিশ্রাম করেছিলেন।

বিশ্রামঘাট নাম করণের অর্থ এতক্ষণে আমার কাছে পরিষ্কার হল। ঘাটটা কিন্তু গভীর। নামলেই এক বুক জলের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়। স্টেপ বাই স্টেপ জলে নামবার ব্যবস্থা এখানে নেই।

বীরেনদা জলে পা দিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন : এই রে কচ্ছপ!

—সর্বনাশ! বলে কি! আমি জল থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালুম।

অঞ্জনা তখনো জলে নামে নি। বলল : এত ভীতু তুমি ?

বললুম : যাও, তুমি নাম। কচ্ছপে কামড়ে ধরলে মেঘ না ডাকা পর্যন্ত ছাড়ে না।

—কে বললে ?

—আমি জানি।

পাণ্ডা আমার ভয় দেখে হেসে আকুল। বললে : ভয় করবেন না। এ কচ্ছপ কিছু বলবে না।

বললুম : এটা বৈষ্ণব তীর্থ বলেই কচ্ছপেরাও যে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে এ কথার প্রমাণ কি।

মিনু আমার দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম ক্রোধে বলল : তুমি কি সবার সঙ্গেই সাহিত্য করতে চাও নাকি? নাও, তাড়াতাড়ি স্নান সেরে ওঠ।

সে কথা আর মিনুকে বলতে হবে না। কচ্ছপকে আমার বড় ভয়। দুটো ডুব দিয়েই উঠে পড়লুম।

হরিদ্বারের গঙ্গার মত যমুনার জলে সে মাহাত্ম্য নেই। স্নান করে ওঠা মাত্র শরীরটাকে একটা পাখির পালকের মত হাল্কা বোধ হয় না। একটা অতীন্দ্রিয় স্নিগ্ধতায় মন প্রাণ ভরে ওঠে না। পূর্ববঙ্গের যে কোন একটা নদীতে স্নান করবার মতই।

হরিদ্বারে যে এত শীত, তবু স্নান করে উঠলে হাওয়ার তাড়না অনুভব করা যায় না। কিন্তু কার্তিকের সাত সকালে স্নান করে ওঠা মাত্র আমার কাঁপুনী ধরল।

মিনুদের বললুম : তোমরা স্নান কর, আমি যাই।

ওদের ফেলে রেখে চলে এলুম।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরাও ফিরে এল। সঙ্গে সেই পাণ্ডা। এক্ষুনি আবার বেরুতে হবে। পুজো দিতে হবে। আর তা ছাড়া মূল মন্দির খুলবে আটটায়। দর্শনটা করা চাই তো। প্রসাধন সেরে সকলেই বেরিয়ে পড়লুম।

আবার সেই ঘাট। এখানে বহু মূর্তি। মেয়েরা চাতালের মধ্যভাগে মন্দিরকে ঘিরে নৃত্য করছে। কৃষ্ণকে ঘিরে এই নৃত্যে অনেক পুণ্য। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন। রাঙামাসীরাও এর মধ্যে দুপাক ঘুরে এলেন।

আজ পঁচিশ বছর পরে ভাবছি। সত্যি সত্যি রাখালরাজ কৃষ্ণকে ঘিরে গোপীরা এমন নৃত্য করত, না কি। কিংবা cosmic dance কে কেন্দ্র করে যে গোপীতত্ত্ব গড়ে উঠেছে তার যথার্থ ভাব বুঝতে না পেরে এই স্থূল নৃত্য? তবে এই নৃত্য সেই প্রাচীনতম কাল থেকেই মানুষের সঙ্গী। সেই নৃত্য ছিল জাদু-নৃত্য। জাদু-নৃত্যের দ্বারা প্রকৃতির শক্তিকে আয়ত্তে আনা যায় এটাই ছিল বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের কোন সত্যতা আছে কিনা জানি না। হয়তো বিশ্বনৃত্যের সঙ্গে একাত্ম হতে পারলে প্রাকৃত শক্তিকে অর্জন করা যায় কিংবা এটা ভারতীয়দের শব্দ উচ্চারণের মত। শব্দব্রহ্মের বিভিন্ন পর্যায়ের তরঙ্গে তরঙ্গে শব্দ উচ্চারণ করা গেলে সেই পর্যায়ের শক্তি মানুষের আয়ত্ত হয় বলে ভারতীয়েরা বিশ্বাস করে। এ বিশ্বাস যে একেবারে ভিত্তিহীন তা নয়। যোগকালে স্বতই নাভিক্ষেত্র থেকে 'ওঁ' শব্দ উচ্চারিত হতে শুনেছি—এতেতীন্দ্রিয় জগতের অপূর্ব অনুভূতি লাভ করা যায়। জগতের সমস্ত মিথ্ বা পুরাণ কাহিনী গুলির মধ্যে কিছু একটা আছে, যা আমরা বুদ্ধি দিয়ে আজ আর ধরতে পারি না। কিন্তু যাক, বর্তমানের এ চিন্তা থাক। যা বলতে যাচ্ছিলাম তাই বলি—

অঞ্জনাকে বললুম : ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মেয়েদের। অংশ গ্রহণ করলে হোত না ?

কি যেন ভাবছিল ও। বলল : নাও, বক্‌বক্‌ করতে হবে না।

মাসীমারা বেরিয়ে এলে ঐ চাতালের সব গুলো মন্দির একের পরে এক ঘুরে দেখা হল। কোথাও এক আনা, কোথাও দু আনা প্রণামী রাখতে হল। অবশ্য ওগুলো সব মাসীমারা করলেন। বাহ্যিক ভক্তিটাকে আমার ধর্মাদর্শ কখনই স্বীকার করে না। তাই কোন মন্দিরে সহজে কখনো মাথা নোয়াতে দেখে না আমাকে কেউ। মিনু এ নিয়ে আমাকে অনুযোগ করেছে, আমার ভক্তি নেই বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাই ?

ঘাটে ঢুকতে বাঁ দিকে একটা মন্দির। এটাই ঘাটের আসল মন্দির। মর্মরখচিত শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি। পাণ্ডা সব শেষে সেখানে নিয়ে গেল। শ্বেত পাথরের বারান্দা। সকলে সেখানে বসলুম।

পাণ্ডা বলল : কত পুজো দেবেন, বলুন ? যত বেশী দেবেন, ততই পুণ্য। দেখুন, মেঝের পাথরগুলোতে ভক্তেরা তাদের নিজেদের নাম খোদাই করে দিয়েছেন। ইচ্ছা করলে এই পাথরে নামও খোদাই করতে পারেন।

আমরা সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলুম। পাণ্ডার সঙ্গে পুজো নিয়ে তো কোন কথা ছিল না।

সেবায়েত যে বসেছিল, সে বলল : ভাববেন না ঠকিয়ে নিচ্ছি। এখানে যত টাকার পুজো দেবেন, তার রসিদ পাবেন। আপনাদের প্রসাদ দেওয়া হবে। আর যদি ইচ্ছে না হয়, পুজো দেবেন না। সেজন্য জোরও করব না।

বীরেনদা বললেন : ঠিক আছে, পাঁচ সিকের পুজো দাও মাসী।

পাণ্ডা হেসে বললে : পাঁচ সিকে! সে কি বলছেন ? সাড়ে আট টাকার কম কোন পুজো নেওয়া হয় না এখানে।

সুনীলবাবু বললেন : সে কি কথা ঠাকুর ? ভগবানকে ভক্ত নিজের সাধ্য অনুযায়ী পুজো করবে। এর মধ্যে আবার কোন বাধা ধরা নিয়ম আছে নাকি ?

সেবায়েত বললে : এখানে সাড়ে আট টাকার কমে কোন পুজো হয় না, এই নিয়ম। সাড়ে আট টাকা দিলে ছ'মাস নাম আর গোত্র উল্লেখ করে নিত্য পুজো হবে।

রাঙামাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি লুব্ধ। তীর্থস্থানে এসে পুজো দিতে না পারলে মনের তৃপ্তি এঁদের নেই। এঁরা তো নতুন দেশ বা প্রকৃতি দেখতে আসেন নি, এসেছেন এই নিবিড় বিশ্বাস নিয়ে যে, তীর্থস্থানে এসে পরকালের জন্য সঞ্চয় করে যাবেন। এ পৃথিবীতে কোন কিছুরই মূল্য নেই, একমাত্র বিশ্বাস ছাড়া। কতদিনই বা মানুষ বাঁচবে ? তাঁর বিশ্বাসে আঘাত দেওয়া কোন ক্রমেই উচিত নয়। রাঙামাসীর সমস্ত ব্যয়-বরাদ্দের ভার বীরেনদার উপর। তিনি ব্যয় করলে হবে, নইলে নয়। টাকা পয়সার যেখানে প্রশ্ন, সেখানে জোর করে তিনি কিছু বলতে পারেন না। রাঙামাসীর সমস্ত মনের অবস্থাটা যেন আমি আমার হৃদয়ের অনুভব দিয়ে বুঝতে

পারলুম। বীরেনদাকে বললুম : দিন সাড়ে আট টাকারই পুজো। জীবনে তো বার বার ওরা তীর্থে আসবেন না।

বীরেনদা সন্তুষ্ট চিত্তে না হলেও বললেন : আচ্ছা দিন সাড়ে আট টাকার পুজো।

দশটা টাকার নোট বাড়িয়ে দিলেন তিনি সেবায়েতের দিকে।

নিতান্ত লাজুক টাইপের মানুষ অঞ্জনার মা। কোন অবস্থাতেই মুখ বড় তিনি খোলেন না। এমন শান্তশিষ্ট টাইপের মানুষ এ যুগে আছে বলে বিশ্বাস হয় না। তিনি অঞ্জনার দিকে তাকালেন। মায়ের এ চাহনীর অর্থ ধরতে অঞ্জনার মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হোল না। বলল : তুমিও পুজো দেবে নাকি মা ? দাও পুজো। সুতরাং অঞ্জনার মারও পুজো গেল।

রসিদের ব্যবস্থা সত্যি আছে। সঙ্গে সঙ্গে টাকা প্রাপ্তির রসিদ লিখে দিল সেবায়েত। ফাঁকী দিচ্ছে না, একথা প্রমাণ করতে চায় ওরা। কিন্তু ফাঁকিবাজী কি সত্যিই এখানে কিছু নেই।

পুজো কিন্তু তখনি হল না। পুজো হবে পরে। আমাদের নাম গোত্র সব লেখা থাকল ওদের খাতায়।

পাণ্ডাকে বললুম : আর কত জায়গায় এমন পুজো দিতে হবে ?

ও বলল : আর কোথাও পুজো দিতে হবে না বাবু। এবার যে সব মন্দিরে যাবেন, ইচ্ছে হয় কিছু দেবেন, না হয় দেবেন না। তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

—মন্দির কত আছে এখানে ?

—মন্দির আছে অগুন্তি বাবু। কিন্তু আসল মন্দির একটি। খুলবে বেলা আটটায়। এখান থেকে বেরিয়েই রাস্তার ও পাশে সেই মন্দির।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সাতটা দশ। ছোট ছোট মন্দির ঘুরে দেখবার ইচ্ছে নেই। মূল মন্দির দেখলেই চলবে। দর্শনীয় যা কিছু, সে তো বৃন্দাবন। মথুরার মন্দিরের পেছনে সময় নষ্ট না করে বৃন্দাবন যাব। কিন্তু আর একবার ঘাটটাকে দেখে নিতে ইচ্ছে হল। মথুরা সহর মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রের একটা ছাপ নিয়ে আছে। কিন্তু বিশ্রামঘাটের দৃশ্যটা ভাল। এখানে কলঙ্কের কোন ছাপ নেই। যমুনার জল বয়ে গেছে সহরের গা ঘেঁষে। আমরা সকলে এসে দাঁড়ালুম।

পাণ্ডা আমাকে বলল : নদীর ঐ ওধারে হল গোকুল।

দূরে তাকালুম। গোকুলের রেখা এখান থেকে দেখা যায় না। কৃষ্ণ গোকুলে প্রেমিক, মথুরায় রাজা, বৃন্দাবনে দেবতা।

বৈষ্ণব সাহিত্যের পরকীয়া প্রেমের উৎস তো গোকুল।

ওপারে গোকুল, এপারে মথুরা, মাঝখানে যমুনা। হঠাৎ একটা কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল জসিমুদ্দিনের।

কখনো কখনো একটা রোমান্টিক ভাব আমাকে দারুণ বিহ্বল করে তোলে। তখন

বোধহয় ধ্যানী বুদ্ধের মত আমি ভাবি। আমার দৃষ্টির মধ্যে সেই এক আচ্ছন্নভাব ফুটে উঠেছিল কিনা কে জানে।

অঞ্জনা বলল : কি ভাবছ, সন্তুদা ?

চমক ভাঙল : ভাবছিলুম বুঝি ? ঐ গোকুলের কথা শুনে একটা কবিতার কথা মনে পড়ে গেল আমার :

"ওপারে গোকুল এপারে মথুরা মাঝে যমুনার জল
নীল নয়নের ব্যথা বুঝি হায় বয়ে যায় অবিরল।"

কৃষ্ণলীলার সবগুলো কথা ভাব দেখি। কথাটাকে কত না সত্য মনে হবে। ওপারে গোকুলে যে প্রণয়ের সজল রাগিনী, এপারে মথুরায় কর্তব্যের মধ্যে তার অবসান। এ যেন মানুষের নিজেরই জীবন-কৈশোরের স্বপ্ন, আর যৌবনের সংসার। কৈশোর আর যৌবনের মধ্যে যে রেখা, সেই তো যমুনা. নয় অঞ্জনা ?

অঞ্জনা দেখি, বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে। বলল : তোমার মত সে অনুভূতি আমার নেই, অতটা বুঝিনে সন্তুদা। তবে তুমি যখন হঠাৎ কখনো কখনো অনুভূতির এক বিশাল রাজ্যে চলে যাও, তখন তোমাকে ভাল লাগে। তুমি নিজেও তোমার সেই মুহূর্তটি সম্পর্কে তেমন সচেতন নও।

যমুনার বুকের উপর দিয়ে রেলওয়ে ব্রীজ চলে গিয়েছে। গোকুল আর মথুরার মধ্যে যাতায়াতে আর কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু ব্যবধানটা ঘুচেছে কি ? কোনদিনই ঘুচবে না।

পাণ্ডাকে বললুম : গোকুল কতদূর ?

—আট ন' মাইল হবে।

—এখান থেকে কত সময় লাগবে টাঙ্গাতে ?

—ঘণ্টা দেড়েক তো নিশ্চয়ই। কিন্তু গোকুলে তো কিছু নেই বাবুজী।

গোকুলে কিছু নেই কি! গোকুলে অনেক কিছুই আছে—তার ইতিহাস পাণ্ডা জানে না। মথুরা বৃন্দাবন উত্তর প্রদেশে হতে পারে, কিন্তু গোকুলের সুর তো সর্বাপেক্ষা বেশী ধ্বনিত বাংলাদেশে। বাংলার পদাবলী সাহিত্যে আর পদকীর্তনে গোকুলের বেদনা যে অনন্ত ক্রন্দনের মূর্চ্ছনায় আকুল, সে খোঁজ ব্রজবাসী এই পাণ্ডা জানবে কি করে। সেই পরম পুরুষের লীলাক্ষেত্র যে মথুরা বৃন্দাবনের চেয়ে মানুষের অন্তরের ক্ষেত্রে অনেক বেশী প্রসারিত। কৃষ্ণ যেদিন গোকুল ছাড়লেন, সে বিরহের হাহাকার ওপারের আকাশে লেগে নেই, কিন্তু বঙ্গকবির সে লেখনীতে বেদনা আজো প্রতিধ্বনিত :

"গোকুলে মধু ফুরায়ে এল আঁধার আজি কুঞ্জবন
আর ডাকে না পাখি, ফোটে না কলি, নাহিক অলি গুঞ্জরণ।"

কৃষ্ণ নিশ্চিন্তই আজ গোকুলে নেই। সেখানকার তৃণলতা কি আজও কৃষ্ণ বিরহে মুহ্যমান ?

পাণ্ডা বলল : চলুন, এবার আসল মন্দিরে যাই। মন্দির খুলবে এখনই।

—চল।

সকলে এবার মূল মন্দিরে এলুম।

পথের ওধারে মূল মন্দির। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ভেতরে যেতে হয়। দ্বারে প্রাচীন ধরনের শিল্প। মন্দিরের ছাদে দেওয়ালে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক চিত্রাবলী। মন্দিরের দুয়ার এখনো বন্ধ। দালানে অপেক্ষমান ভক্তেরা। বাজনা বাজছে। করুণ রাগিণীতে বাঁশী বাজছে। একটা অতীন্দ্রিয় ভাব যেন সমগ্র অঞ্চল জুড়ে। আমি চিত্রগুলি তাকিয়ে দেখতে লাগলুম। সবই আমার পরিচিত।

পদকীর্তনে কত শতবার এই চিত্রগত কাহিনী শুনেছি। বাজনা বাজছে। আমার মনে হচ্ছে, ধীরে ধীরে যেন মন্দির জাগ্রত হচ্ছে। চিত্রগুলো যেন সজীব কাহিনী হয়ে ফুটে উঠতে চাইছে। ঐ মল্ল যুদ্ধে কৃষ্ণ হত্যা করছেন মাতুল কংসকে। ঐ পুতনার আর্ত চিৎকার। ঐ তৃণাবর্ত অসুর কালীয় দমন। বসুদেবের যমুনা অতিক্রম। ঐ কুঞ্জবন। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি।

আজ জানি এসবই সত্য। মনজাত যে-কোন কল্পনাই সত্য—কারণ এই কল্পনার যিনি উৎস, অন্তরের অন্তরতম সেই পরম পুরুষই তার স্রষ্টা। নিজের স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল সত্তায় নিজের মহামানসকে তিনি ফটোর নিগেটিভে ধরা ছবির মতন ধরে থাকেন। কিন্তু সে যাক, পঁচিশ বছর আগের সেই কাহিনীই বলা যাক।

পুজো আমি কখনো করি নি। তীর্থের চেয়ে বিদেশ দেখবার নেশা আমার বেশী। মথুরার চেয়ে আগ্রার স্বপ্ন আমি বেশী দেখছি। তবে হঠাৎ এই মথুরার মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আমার এমন লাগছে কেন? দুই চোখের কোণ অকারণে সিক্ত হয়ে উঠছে।

কে এক উড়িষ্যার সর্বহারা দুঃখী ছিল। এসেছিল বৃন্দাবনে, মথুরায়। একা ছিল শুয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে। নিশীথরাতে মন্দিরের দুয়ার গেল খুলে। অপূর্ব করুণ রাগিণীতে বাঁশী বাজছে। ষোড়শী অনিন্দ্য সুন্দরী নারী নাচছে সে বাঁশীর তালে তালে। সর্বহারা দুঃখী তাকিয়ে দেখছে। সে এক অলৌকিক প্রেমস্নিগ্ধ নৃত্য। কে নাচে এমন স্বর্গীয় দেহভঙ্গিমায়? কে আনন্দ দেয় শ্যামরায়কে? হে স্বর্গ-লোকসম্ভবা দেবী, শ্যামের মনোরঞ্জন করছ তুমি। তোমার চরণরেণু একটুখানি দাও। দীন ভক্তের ক্ষীণ দুটি বাহু এগিয়ে যায়। শোকাতুরা, বিহ্বলা রমণী চকিত পরশে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ভীরু হরিণীর শঙ্কার্ত আবেগে মুহূর্তে উধাও হয়ে যায় সে। আত্মচেতনায় ফিরে আসে দুঃখী। হাতে তার ছোট্ট একটি সোনার নূপুর। এ কি!

পরদিন সকালে মন্দিরের দুয়ার খুলে পুজারী বলল, এ কি! কি হল? শ্রীরাধার চরণের একখানি সোনার নূপুর চুরি করেছে কে? সাড়া পড়ে গেল সমগ্র এলাকাতে। চুরি হয়েছে শ্রীরাধার নূপুর। চোর ধর।

বৃন্দাবনের গোসাইজী। তার কাছে কেঁদে দুঃখী বলল: প্রভু আমি তো কিছু জানি না। সে নূপুর যে আমার হাতে!

যে নূপুর হারিয়েছে, এ নূপুর যে ঠিক সেই মাপের, সেই নূপুরই! কাহিনী শুনে দুঃখীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন গোঁসাইজী: কে বলে ভাই তুমি দুঃখী। তুমি যে শ্যামপদ। শ্যামকে আমার আনন্দ দেন যে রাধিকা, সেই রাধিকার তুমি দর্শন পেয়েছ। তুমি ভাগ্যবান।

হে পরমা প্রকৃতি, দুঃখী কি এখানে, এই মন্দিরেই তোমার জ্যোতির্ময় প্রেমের পরশ লাভ করেছিল?

হঠাৎ কেন জানি না, চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল আমার।

অঞ্জনা বলল: এ কি সন্তুদা, তুমি কাঁদছ?

তাড়াতাড়ি লজ্জা লুকোবার জন্যে চোখ বুজে বললুম: কই, না তো!! চোখে কি পড়েছিল যেন।

মথুরার রাজার কি ইচ্ছা তিনিই জানেন। কেন যেন একটা কান্নার ঢেউ বুক ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল আমার। কেন এ অকারণ কান্নার ঢেউ? কোনদিন কি তার অর্থ পরিষ্কার হবে?

ঘণ্টা বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে খুলল মন্দিরের দরজা। উৎসুক ভক্তবৃন্দ ঝুঁকে পড়ল রাধাকৃষ্ণের মূর্তি দেখার জন্যে।

আমিও দেখলুম। সমস্ত মন্দিরের প্রাঙ্গণ জুড়ে কি এক অতিপ্রাকৃতিক চেতনা যেন হিল্লোল তুলেছে: হে মথুরাপতি, তোমারই জয় হোক।

বিগ্রহ দেখা হল। বীরেনদা বললেন: এবার চলুন বৃন্দাবন। আর দেরী করা যাবে না।

রাঙামাসী যেন একটু বিরক্ত হলেন: তোমার সবতাতেই তাড়াতাড়ি। এমন করে তীর্থ হয় নাকি! কাশীতে তেরাত্তির বাস করতে হয়, করলে না। হরিদ্বারেও তাড়াহুড়ো। মথুরা না আসতে আসতেই বৃন্দাবন।

বীরেনদা বললেন: দোষ আমার নয় মাসী। আমি তো ষষ্ঠীর দিন রওনা হতে চেয়েছিলুম, তুমি এলে দশমীর পরে। কিন্তু আমার সময় কোথায়? সরকারী চাকরী করি। সময়মত গিয়ে পৌঁছুতেই হবে। এমনিতেই তিন দিন দেরী হয়ে যাবে।

রাঙামাসী বললেন: শোন কথা, পুজোর সময় ছেলেপুলেদের ফেলে তীর্থে বেরুব নাকি!

বীরেনদা বললেন: তা হলে আমি কি করব? আমার হাতে তো সময় নেই।

বললুম, আমার কিন্তু মন্দ লাগছে না। এমন ঝঞ্ঝার মত ঘুরে বেড়াচ্ছি, এরও একটা আনন্দ আছে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে পথে এলুম। ঘরে ফিরে যাবার আর প্রশ্ন নেই। একটা দোকানে সকলে জলখাবার খেয়ে নিলুম। ধরমশালায় এখন আর ফিরব না। বৃন্দাবন ঘুরে এসে বিকেলবেলা আবার সেখানে উঠব। মথুরা থেকে বৃন্দাবন দেখা শেষ করব।

কিন্তু রাঙামাসীর ইচ্ছা, অন্তত এক রাত বৃন্দাবনবাস করেন। অত টানা-হেঁচড়া করতে বীরেনদা রাজী নন, আমরাও নই।

সুতরাং ধরমশালায় না ফিরে রাস্তা থেকেই দুটো গাড়ী ধরা হল ; দুটো টাঙ্গা। পাণ্ডাকে বললুম : সঙ্গে চলুন।

পাণ্ডা বলল : আমি যাব না। এই আমার দাদা, ইনি যাবেন।

—একেও আবাব আলাদা পয়সা দিতে হবে নাকি ?

হেসে ও বলল : না।

আমাদের পাণ্ডার বৃন্দাবন না যাবার কারণ পরে বুঝলুম। মথুরার পাণ্ডা বৃন্দাবন যেতে পারে না। যে যাবে, কোন পুজো দেবার অধিকার তার নাই।

টাঙ্গা চলল। কয়েক মিনিটের মধ্যে মথুরার গলিপথ পার হয়ে সে চওড়া পথ ধরল। বহু গাড়ী, বহু টাঙ্গা, দল বেঁধে চলেছে বৃন্দাবনের দিকে। Off season হলেও কম তীর্থযাত্রী আসে নি এখানে। ধরমশালাগুলি থেকে এতটা পূর্বাহ্নে আঁচ করা যায় নি। এখনই যদি এই, তবে শ্রাবণ মাসে এ পথের কি দৃশ্য হতে পারে কল্পনা করবার চেষ্টা করলুম।

সাধু-সন্তদের আস্তানা পথের দুপাশে। আমাদের বৃন্দাবনের পাণ্ডা গাড়ীতে বসে বসে সে-সবেব পরিচয় দিয়ে যেতে লাগল। আর একটু এগুবার পর পথের, দুধারে বাব্লা বন। পাণ্ডা বলল : এটা গোচারণ ভূমি, এখান থেকে বৃন্দাবন অবধি গিয়ে ঠেকেছে। শ্রীকৃষ্ণের বহু গরু আছে। সব এখানে চরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে গো-শালা। গরুকে এখানকার লোকেরা দেবতাতুল্য ভক্তি করে। করবেই তো, শ্রীকৃষ্ণের লীলার সঙ্গে ধেনু বৎসেরাও যে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। কানাই, বলাই, শ্রীকৃষ্ণের সেই সঙ্গী সাথীরা ভোর না হতেই গো-পাল নিয়ে মাঠে বেরুতো। তা নিয়ে বৈষ্ণব কবিদের গানের অন্ত নেই। বাউল গায়কেরা পূর্ববাংলার ঘরে ঘরে এক সময় এ গান গেয়ে বেড়াতো। অথচ গোচারণ ভূমি সম্পর্কে পূর্ববঙ্গের কোন ধারণাই থাকা উচিত নয়। সেখানে কোন গোচারণ ভূমি নেই। রাখাল নেই গো-পালের পিছনে। পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান, বীরভূম থেকে আরম্ভ করে রাখালিয়া ব্যবস্থা। শত শত গরু নিয়ে মাঠে বের হয় রাখালেরা। এই ব্যবস্থা সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে। পূর্ববঙ্গে এ হবাব উপায় নেই। সেখানে বারমাস মাঠে শস্য। আরো বড় কথা, ঘাস পর্যাপ্ত। দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলেই ঘাস খেয়ে গরুর পেট ভরে। অথচ এই গোচারণ ভূমির গান পূর্ববঙ্গের বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের মুখে মুখে। তারা কি কখনো দেখেছে, দুপুরের রোদে বাঁশীতে করুণ সুর তুলে রাখালদের মাঠে গরু চরাতে ? আজও সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ের ছায়ায় সে বাঁশীর সুর শোনা যায়। এখানে মথুরা থেকে বৃন্দাবন পর্যন্ত দীর্ঘ গোচারণ ভূমি। রাখালিয়ার উৎপত্তি হয়তো এখান থেকেই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এখানে গরু চরিয়েছেন। এর চেয়ে বড় গোচারণ ভূমি হয় তো গোকুলে

আছে। গরুগুলির চেহারা সেই ছবিতে আঁকা কৃষ্ণমুখী গরুগুলির মতই, কাজল পরা দীর্ঘায়ত চোখ। একটা স্নেহের দীর্ঘছায়া ধেনুদের চোখে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন একদিন স্বয়ং বিরাজ করতেন এখানে, তখন হয় তো এই গোচারণ ভূমি শ্যামল তৃণে ছাওয়া ছিল। বাবলার পরিবর্তে হয় তো তখন ছিল সারি সারি কদম্ব বন। গোচারণ ভূমি মাইলের পর মাইল এখানে আছে বটে, কিন্তু সেই শ্রী আর নেই। সমস্ত উত্তর ভারত ব্যাপি এবার অভূতপূর্ব খরা। ক্যাকটাস জাতীয় মরুভূষণ এই যে বাবলা গাছ, সে গাছ পর্যন্ত ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে খর রৌদ্রে। মাঠের ঘাস মজে গৈরিক বর্ণ ধারণ করেছে। কোথাও বা মৃত ঘাসেরও চিহ্নমাত্র নেই। ধূলো উড়ছে। জলের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। সমস্ত উত্তর ভারত জ্বলছে দাউ দাউ করে।

তবুও বাবলার ছায়াতে সেই হারানো দিনের কথা মনে পড়ে। সেদিন স্বয়ং রাখালরাজ তাঁর দলবল নিয়ে মাঠে নামতেন। তৃণচারণা করতে করতে উৎসুক ধেনুগণ মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখত তাঁর সজল কৃষ্ণমূর্তি। উৎকর্ণ হয়ে শুনতো বাঁশের বাঁশীর সেই করুণ মোহময় সুর। তখনকার সমস্ত তৃণ, লতা, পাতা, বৃক্ষ, নদ, নদী, হ্রদ, মানুষ, পশু, পাখি, সব উদ্বেল হয়ে উঠত। এক সপ্রেম জীবন-স্পন্দন উদ্বেল হয়ে কাঁপত এই ব্রজভূমির উপর দিয়ে। কান পাতলে কি সেই সুর আজো শোনা যায় না? কি এক রোমাঞ্চ অনুভব করলুম যেন আমি। এই খর রোদ্র-পীড়িত মাঠও যেন তখন স্নিগ্ধতায় ভরে উঠল। এই পথেই একদিন হয়তো তিনি যেতেন। এইখানে আকুল প্রকৃতি তাঁর অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকতো। ওপারে গোকুলে কোথায় ছিল আয়ান ঘোষের ঘর। ব্যাকুল শ্রীরাধিকা সে মোহন বংশীধ্বনি শুনে লীলানন্দে চমকিতা হতেন। বাঁশীতে শুধু বাজতো শ্যাম নাম—

> "সই কে শুনাইল শ্যাম নাম—
> কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
> আকুল করিল মোর প্রাণ।"

সেই বাঁশীর সুরই তো ছিল শ্যাম নামের ঝংকারে ভরা।

নিশ্চুপ বসে আছে অঞ্জনা আর মিনু। কে জানে, ওরাও একদিন এই ব্রজের গোপবালা ছিল কিনা। সে বংশীধ্বনি একদিন আমরাও শুনেছি কিনা কে বলবে। জন্মে জন্মে যতবার আসি, ততবারই তাই একবার আসতে হয় ব্রজধামে। মথুরার রাজা কালের রজ্জু ধরে যুগ যুগ আমাদের এমন করে টেনে আনছেন।

এখনো বাবলা বনের মধ্য দিয়ে গাড়ী চলেছে। দূরে সামনে বৃন্দাবন। সেখানেই তো মীরার গিরিধারীলাল। তাঁর মুখে সেই ভুবনমোহন হাসি। তাঁর সমস্ত সত্তায় জড়ানো আকুল বংশীধ্বনি। শিহরণ আসে আমার সমস্ত চেতনায়। জানি না কি রসে সিক্ত হয়ে আসে সমস্ত বায়ুমণ্ডল। আমি তো কখনো ভক্তিপথের পথিক নই! কখনো তো ডাকিনি হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলে। ডাকতে চাই নি। তাহলে কি এই

চেতন জগতের ঊর্ধ্বে আর এক অতিচেতনা আছে? তিনি কি হঠাৎ-নিমন্ত্রণে ডেকে নিয়ে এসেছেন এখানে? পরিকল্পনা তো পূর্বাহ্নে কোন কিছুই ছিল না। কে জানে দৃশ্যাতীত সেই অদৃশ্য পরম পুরুষকে। কি উদ্দেশ্য তাঁর মনে তিনিই জানেন। যে মিনুকে চিনি নি, তাঁর অন্তর খুলে গেছে এই পথে। যে অঞ্জনার অস্তিত্ব আছে কিনা জানতুম না, তাকে দেখলুম আলোর ঝলমলানির আড়ালে একখন্ড বর্ষণোন্মুখ সজল মেঘের মত। মানুষের হৃদয়ের যে অসীম প্রান্তর আমার কাছে অনাবিষ্কৃত ছিল, সেখান থেকে আজ দূরাগত করুণ রাগিণী ভেসে আসছে। ভালবাসার স্বরূপ জানি না, কিন্তু তার স্পর্শ পেয়েছি আমি। তাহলে প্রত্যেক প্রেমিককেই কি এই পরম প্রেম-তীর্থে একবার আসতে হয়? টাঙ্গার পেছনে মথুরার দিকে মুখ করে মিনু আর অঞ্জনা বসে আছে। আমি আর বীরেনদা সামনের দিকে তাকিয়ে। পেছনের গাড়ীতে রাঙামাসী, মেসোমশাই, মাসীমা আর পাণ্ডা। তাঁদের ঐ পড়ন্ত বেলার চৈতন্যে বৃন্দাবনের পথ কি ঝঙ্কার তুলেছে, কে জানে?

আজ মনে হয় যোগে বসে আমি আমার পূর্বজন্মের যে বৈষ্ণব মূর্তি দেখেছিলুম সেই প্রাক্তন জীবনের অভিজ্ঞতাই জন্মান্তরে সংস্কারের ধারা বেয়ে আমার মধ্যে নেমে এসেছিল বলেই সেদিন আমার হৃদয়ে অমন এক অজ্ঞাত ঝঙ্কার উঠেছিল। কিন্তু সেসব এখন থাক। ২৫ বছর আগে বৃন্দাবনের পথের যে স্মৃতিচারণা করছিলুম তাই করা যাক—

সমস্তটা গোচারণ ভূমির মধ্যে যেন একটা মায়া জড়ানো, আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। গোচারণ ভূমি পার হয়ে ওধারে বৃন্দাবনের দেউলের চূড়া দেখা গেল। নিজেকে যেন আমার স্বকীয় চেতনার মধ্যে এতক্ষণে ফিরে পেলুম।

অঞ্জনা ফিরে তাকাল: সন্তুদা বৃন্দাবনে এলুম।

ফিরে তাকালুম আমি।

কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন বাক্‌হীনা হয়ে গেল অঞ্জনা। তখনো কি আমার দুই চোখে অশ্রুজলের রেখা ছিল? কি এক অশ্রুত রাগিণী আমার চেতনাতে ঝঙ্কার তুলেছিল। নিজেকে ধরে রাখতে পারি নি। চোখের কোণে হাত দিয়ে দেখি, জল। তাড়াতাড়ি রুমাল বের করে চোখ মুছলুম। অঞ্জনা মুখ ফিরিয়ে নিল, আর তাকাল না আমার দিকে।

বৃন্দাবনে ঢুকছে আমাদের টাঙ্গা। সহরটার দিকে তাকিয়ে দেখলুম, অপরিচিত বলে মনে হয় না। এই দূর উত্তর প্রদেশে বৃন্দাবন যেন বাংলার একটি বিচ্ছিন্ন অঙ্গ। দোকানের গায়ে বাংলা হরফে সাইনবোর্ড লেখা। পথে কথা বলছে বাংলা ভাষায় বাঙ্গালী। সেই ছোট বেলায় গ্রামের পথে মহোৎসবের অঙ্গনে যে মানুষ দেখেছি, শ্যামল প্রকৃতির ছায়ায় পল্লী বাংলার মানুষ, ঠিক সেই রকম মানুষ এখানে—গলায় কণ্ঠী, মাথায় টিকি। সেই হারিয়ে যাওয়া পল্লীজীবনের স্মৃতি তো কোনদিনই ভুলবার নয়। একে নদীয়ার কোন অংশ বলে মনে করলে ভুল হবে না।

গাড়ী থামল। আরো অনেক টাঙ্গা থেমে আছে সেখানে। পান্ডা বলল ঃ নামুন। টাঙ্গায় জুতো রেখে নগ্নপায়ে সকলেই নামলুম। বৃন্দাবনের তীর্থরেণুর জন্য সমস্ত বৈষ্ণব জগৎ চঞ্চল। সেই বৃন্দাবনের স্পর্শ লাভ করলুম। মহাপ্রভু এই বৃন্দাবনের পথের উপর দিয়ে কি হেঁটে গিয়েছিলেন ? জানি না। তিনি গিয়েছিলেন শ্রীক্ষেত্রে। সে উড়িষ্যা দেখে এসেছি। দেখেছি জগন্নাথের মন্দির। যে দেয়ালে তাঁর অমিয় অঙ্গের স্পর্শ দিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানে আজো তাঁর স্পর্শ লেগে রয়েছে। তাঁর প্রেমানুভবে পাষাণ গলে গিয়েছিল। সেই আঙ্গুলের ছাপ আজো সেখানে আছে। আছে নীলাচল। দিগন্ত বিস্তৃত সাগরের উত্তাল তরঙ্গ।

অঞ্জনা আমার পাশে পাশে হাঁটছিল। চুপি চুপি সে আমাকে বলল ঃ তুমি কাঁদছিলে কেন, সন্তুদা ?

—কই, না তো ?

—আমি দেখেছি।

—জানি না। কেমন যেন লাগছে আমার।

—তুমি পরম ভক্ত সন্তুদা।

—গিরিধারীলাল জানেন।

—তোমার সঙ্গে ভাগ্যে পরিচয় হলো। এ কোনদিন ভুলব না।

তাকালুম অঞ্জনার দিকে। আমিও ভুলব না। সেই গিরিধারীলাল প্রেমের এক অপূর্ব শিহরণ আমাকে দিয়েছেন। অঞ্জনার সঙ্গে নইলে পরিচয় হবে কেন। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতেই তো বিরহ ঘনিয়ে আসছে। মানব প্রেমের স্বাদ না পেলে কি ভগবৎ প্রেমের স্বাদ পাওয়া যায় ? সেই স্পর্শের জন্যেই বুঝি কাশী স্টেশনে অঞ্জনার সঙ্গে দেখা হল।

পান্ডার সঙ্গে ওরা সব এগিয়ে গেছে। একটু পেছনে আমরা।

অঞ্জনা হঠাৎ প্রশ্ন করল ঃ বিরহের মধ্যেই প্রেম সবচেয়ে মধুর, না সন্তুদা ?

—হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ?

—এই ব্রজভূমি সেই বিরহের বেদনাতেই তো পবিত্র তীর্থভূমি হয়েছে।

বললুম ঃ এই বিরহের মধ্যেই আছে প্রিয় সান্নিধ্যের স্পর্শ। তাই রাধাকৃষ্ণের মিলনও ঘটেছে।

অঞ্জনা বলল : সেই দুরূহ তত্ত্বের সব তো বুঝি না। তবে এখন কেন যেন একটা প্রবোধ আসছে। তোমার চোখে জল দেখে আমার ভাল লেগেছে। এখন মনে হচ্ছে, অনেক কিছুই পেলুম। অসীম ভাগ্য আমার, তোমার পাশে পাশেই ব্রজভূমি ঘুরে পেলুম।

একটা করুণ দৃষ্টি ফুটে উঠল অঞ্জনার চোখে ঃ ভুলবে না কোনদিন নিশ্চয়ই ?

—না।

সুনীলবাবুরা অনেকদূরে এগিয়ে গিয়েছিলেন। পেছন ফিরে আমাদের দেখলেন।

ডাকলেন : তাড়াতাড়ি এস।

আমরা জোরে হাঁটলুম।

—পেছনে পড়েছিলে কেন?

অঞ্জনা তখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত মানুষ! বলল : বাবা, ঠাকুরমার কাছে শুনেতুম, বৃন্দাবনে ভয়ানক বাঁদরের উৎপাত। রাস্তায় চলতে হাত থেকে জিনিষ কেড়ে নেয়। কৈ? বাঁদর তো দেখছি না কোথাও?

সুনীলবাবু হেসে বললেন : শোন মেয়ের কথা। বৃন্দাবনে সবাই কৃষ্ণের ধ্যান করে, ও করছে বাঁদরের!

অঞ্জনার মুখ লাল হয়ে উঠল।

বৃন্দাবনে অজস্র মন্দির। সপ্তাহ খানিক ঘুরে ঘুরে দেখলেও শেষ হবে কিনা বলা যায় না। আর আছে গোস্বামী বাড়ি। বাঙ্গালীর পক্ষে দর্শনী ভিন্ন সে গোস্বামী বাড়ি দেখা বারণ : দুটি গোস্বামী বাড়ি। প্রতি বাড়ি পিছু দক্ষিণা আটচল্লিশ টাকা।

বীরেনদা পাণ্ডার মুখে গোস্বামী বাড়ি দেখার শর্ত শুনে বললেন : গোস্বামী বাড়ি মাথায় থাক। আসল মন্দির কোথায় তাই দেখাও। খুব বেশী দেখাতে হবে না।

পাণ্ডা আমাদেব নিয়ে এগিয়ে চলল। সামনে বিরাট একটা মন্দির। খুব প্রাচীন। পাথরের কাজ করা প্রবেশপথ। ভেতরে মন্দির। কি নাম বলল পাণ্ডা ভাল করে শুনলুম না। যতদূর মনে পড়ে গোপীনাথের মন্দির। সেখানে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ দেখলুম।

বীরেনদা বললেন : এটাই কি আসল মন্দির?

পাণ্ডা বলল : মন্দির সবই এখানে আসল, নকল কিছু নেই। তবে পুজো দেওয়া হয় সেই বস্ত্রহরণ ঘাটের কাছে মন্দিরে। চলুন, সেখানে যাচ্ছি।

এই মন্দিরের প্রবেশপথে ছবি, ফটো প্রভৃতি বিক্রী হয়। বিক্রী হয় সিঁদুর কৌটো, তুলসীর মালা, এইসব।

রাঙামাসী বললেন : দাঁড়াও, একটা মালা কিনতে হবে। আর সিঁদুরের কৌটো।

পাণ্ডা বলল : এখান থেকে কিনুন। এটা Government regi-terd দোকান। এখানে সব খাঁটি জিনিষ। এক দাম। ঠকবার ভয় নেই।

একগাছা তুলসীর মালা হাতে তুলে নিলেন রাঙামাসী। দাম করলেন। তারপর কি ভেবে বললেন : না, থাক। কাঠের মালা দাও।

মিনু বলল : কেন, তুলসীর মালাই তো কেনে সকলে?

রাঙামাসী বললেন : না, আমি কিনব না। তুলসীর মালা গলায় পড়লে মিথ্যে বলা যায় না কখনো! সংসারে থাকি, কখন দু-একটা মিথ্যে বলতেও পারি। ও-মালা থাক।

রাঙামাসীর দিকে তাকালুম, এই তো খাঁটি মানুষ। স্ট্রেট কনফেসন। বৌরিপ্যাচ নেই। অন্ধভক্তি। ভারতবর্ষের সমাজ এদের জন্যেই টিকে ছিল। এঁরা আজ যেতে বসেছেন। সমাজে ভাঙন ধরেছে। স্বাধীন হয়ে আমরা পরাধীন হয়েছি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু সাংস্কৃতিক পরাধীনতা রয়েছে পশ্চিমের সংস্কৃতির। Fucure shock-এর বলি হতে যাচ্ছি আমরাও।

মথুরার কালো ছায়া বৃন্দাবনে নেই। এখানে সূর্যের হাসি। কিন্তু মথুরারই মত চাপা গলি। সহর আর গ্রাম যেন এখানে এক দেহে মিলিত। পথের ধারে ধরম-শালা। মথুরার চেয়েও অনেক বেশী।

এ পথের আড়াল দিয়ে, ও পথের পাশ দিয়ে, ও ঘরের কোণ দিয়ে, পাণ্ডা আমাদের নিয়ে চলল। বিরাট অট্টালিকার পাশে জীর্ণ কুটিরেরও এখানে ছড়াছড়ি। একটি ক্ষুদ্র কুটিরে বার্ধক্যপীড়িত নিতান্ত জরাজীর্ণ এক বৃদ্ধাকে দেখলুম। বিধবা, রান্না করছেন। হয় তো কেউ নেই এঁর। পথে পথে বিধবার ভীড়। বাঙ্গালী বিধবা সব। ভিক্ষা চাচ্ছে। আমার বুকের মধ্যে এইসব মুখ দেখে একটা করুণ সুর বেজে উঠল। বাল্যবিধবা আমার পিসীমা। তীর্থে তীর্থে ঘুরতেন তিনি। ভাগ্যের ফেরে তাঁকে যদি একাকী এই বৃন্দাবনের পথে পড়ে থাকতে হত? ভিক্ষে করতে হত? বাংলাদেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শত চেষ্টা করেও বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে পারেন নি। সমাজ করুণার্দ্র হৃদয়ে তাকায় নি এদের দিকে। সকলের মন পড়ে আছে এই দূর বৃন্দাবনে। গোপীনাথ তাঁদের ত্যাগ করেন নি হয় তো।

শেঠদের এক মন্দিরে নিয়ে গেল পাণ্ডা। ভেতরে বিরাট অঙ্গন। কীর্তনের সুর ভেসে আসছে। সহস্র নারীকণ্ঠের সমবেত কীর্তন ধ্বনি।

পাণ্ডা বলল : এখানে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা কীর্তন হয়। বিধবারা কীর্তন করে। মাড়োয়ারীরা ওদের খাবার ব্যবস্থা করে দেয়। এই কীর্তনের বিনিময়ে একবেলা খাবারের চাল, ডাল, আর চার আনা করে পয়সা বরাদ্দ। বছরে দু'খানা করে থান কাপড়।

ভেতরে ঢুকলুম। এক দলের কীর্তন তখন শেষ হয়েছে। আর একদল এসেছে। একজন মুখ্য কীর্তনিয়া। আর সব দোহার। যাদের গান শেষ হয়েছে তারা লাইন দিয়ে টিকিট নিচ্ছে। দৌড়ে এখনি ছুটে যেতে হবে সেখানে। চাল, ডাল, আটা দিচ্ছে। ছাড়, ছাড় না বাপু। মুখে এক কথা।

আমরা ওদের পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম।

এত তাড়াহুড়ো কেন ওদের? বোধহয় ঘড়ি ধরে দান করা হয়। এক মিনিট লেট হলে বরাদ্দ জিনিষ মেলে না। তাই সবাই ব্যস্ত। যারা দিচ্ছে, তারা কর্মচারী। কাজ করছে। হৃদয় দিয়ে করছে না কেউ। সবই বাঙ্গালী বিধবা। কত হাজার হাজার বিধবা আছে। বাংলাদেশের বুকে কত হাহাকার, এই বৃন্দাবনে না এলে বুঝি বোঝা যায় না। ধিক্ বাংলার সমাজকে। সর্বহারা এই সব বিধবাদের পর্যন্ত অভয় দিতে পারে নি সে। অনাত্মীয় দূর বিদেশে একমাত্র বৃন্দাবন-চন্দ্র কৃষ্ণ সহায়। সেই

গোপীবল্লভ রাধারমণ শ্রীকৃষ্ণ এদের কি নিজে দেখেন? সমস্ত বঞ্চনা আর বেদনার হাহাকারের উপর শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেন কি? দেখেছি, এইসব হতভাগিনীদের কাশীতে, দেখলুম তাদের বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনে সে অসহায়ত্বের চিত্র আরো প্রকট। যে নিবিড় আশা নিয়ে এঁরা এসেছিলেন ব্রজধামে, সে আকাঙ্ক্ষা কি তাদের রাখালরাজের নিবিড় করুণাস্পর্শে পূর্ণ হয়েছে? আবার কেন যেন একটা আকুল ক্রন্দন অনুভব করলুম নিজের মধ্যে। এই সহস্র বিধবাদের প্রত্যেকের মুখেই যেন আমি আমার পিসিমার মুখের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। সেই ছোট ছোট চুল। সেই আধ ময়লা থান কাপড়। আজন্ম বঞ্চিতা আমার বালবিধবা পিসিমা। আমার মনে হল, আমার যদি কোন সঞ্চয় থাকতো, সমস্ত আমি দান করতুম এদের জন্যে। সেই সমাজ আমাদের দেশে আসুক, যে সমাজ প্রত্যেকটি মানুষকে দেয় নিরাপত্তা, অকুণ্ঠ আশ্রয়। কোন মানুষকে যেন অপরের উদ্ধত অহংকারের উপর কোনদিন নির্ভর করতে না হয়।

দেয়ালে বোর্ডের উপর চার্ট টাঙ্গানো। এই দানছত্রে কি ভাবে দান করা হয় তারই ইতিহাস।

পাণ্ডা বলল: এই দেখুন, এখানে আজ এ পর্যন্ত কতজনকে দান করা হয়েছে তার হিসাব। প্রতিদিন আঠার শত বিধবা এখান থেকে সিধা পান ও চার আনা করে পয়সা।

মনে মনে বললুম: অহংকারেই হোক, আর ভক্তিভরেই হোক, যিনি অসহায়া বিধবাদের এই অন্নবস্ত্রের সংস্থান করেছেন, ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন।

সেই কীর্তন-মন্দির থেকে আমরা বেরুলাম। এবার আসল মন্দির। ঘাটের দিকে শেষ প্রান্তে এই মদনমোহনের মন্দির। এটাই বৃন্দাবনের মুখ্য বিগ্রহ। অবশ্য আমাদের পাণ্ডার মতে। মূর্তি দেখতে অনেকটা সেই বিশ্রাম ঘাটের মত। একই মূর্তি। মথুরা বৃন্দাবনে মন্দির এবং মূর্তির গড়ন এক ধাঁচের। এটা এক এক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য।

মন্দিরের মেঝেতে আমরা বসলুম। একদিকে দেখি দাঁতনের কাঠির মতন কি সব জিনিষ জড় হয়ে আছে। আর একদিকে পেতলের রিঙ।

পাণ্ডাকে জিজ্ঞেস করে এর রহস্য জানতে পারলুম। ঐ রিঙগুলো শ্রীক্ষেত্রে যারা জগন্নাথকে দর্শন করে এসেছেন, তারা রেখে গেছেন। তারা যে জগন্নাথ দর্শন করেছেন, শ্রীকৃষ্ণকে সেই নজির দেখিয়ে সাক্ষী মেনে গেছেন।

আমি বললুম: ঐ কাঠিগুলো কি?

পাণ্ডা বলল: জগন্নাথের মন্দিরে ঢুকবার আগে ডোমেদের ঝাঁটা খেতে হয়। ঐগুলি এক একটি ঝাঁটার কাঠি। এখানে জমা দিয়ে যায় তীর্থযাত্রীরা। তিন বছর এখানে থাকে। তারপর যমুনায় বিসর্জন দেওয়া হয়।

পর্বত প্রমাণ ঝাঁটার কাঠি জমেছে। তা হলে কত শত-সহস্র লোক এ পর্যন্ত পুরী গিয়েছেন! আমিও গিয়েছি পুরী। ডোমের ঝাঁটা খেয়েছি। কিন্তু কাঠি আনি নি

তো। কোন সাক্ষী সঙ্গে নেই। অথচ এই বৃন্দাবনের প্রভুকেই যে পুরীর জগন্নাথের মধ্যে দেখে এসেছি, এটা কি তিনি জানবেন না? যিনি জগন্নাথ, তিনিই তো শ্রীকৃষ্ণ।

ব্যাধের আঘাতে শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করলেন। দাহ কা" হল তাঁকে। কিন্তু সমস্ত দেহ পুড়লো না। দ্বারকা থেকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হল। তাঁর নাভি থেকে বক্ষদেশ পর্যন্ত দেহ সেই দেহ ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকল পুরীর ঘাটে। পুরীর রাজা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তুলে নিয়ে এলেন সেই দেহাবশিষ্ট। দেহ তখন দারুকাষ্ঠে পরিণত। সেই কাষ্ঠে মূর্তি তৈরী করতে হবে। কিন্তু কে করবে মূর্তি তৈরী? হাতুরী বাটালি ভেঙ্গে যায়। কাষ্ঠ ছেদন করা যাচ্ছে না। একদিন এক শিল্পী এলেন, বললেন: আমি করব। একুশ দিন নীরবে এক ঘরে কাজ করব। এর মধ্যে কেউ উঁকি দিয়ে পর্যন্ত দেখতে পারবে না। সেই শর্ত অনুযায়ী সে কাজ পেল। কিন্তু মানুষের মন! রাণী বললেন: লোকটা কাজ করছে কিনা কি করে বুঝবে? দেখা দরকার। তাছাড়া এতদিন অনাহারে রয়েছে সে, বেঁচে আছে কিনা তারই বা ঠিক কি? সেটাও তো আমাদের দেখা কর্তব্য। শর্তাধীন দিনের পূর্বেই রাজা উঁকি দিলেন। কিন্তু শিল্পী নেই। অসমাপ্ত মূর্তি পড়ে আছে। রাজা হায় হায় করলেন। কিন্তু উপায় নেই। ঐ অসমাপ্ত মূর্তিই জগন্নাথের।

আজ পঁচিশ বছর পরে নতুন করে জগন্নাথের মূর্তি সম্পর্কে যখন ভাবি তখন মনে হয় ভারতীয়েরা গভীর সব তত্ত্ব প্রকাশ করতেন গল্পের মধ্য দিয়ে। জগন্নাথের মূর্তি নির্মাণশিল্পে ভাস্কর্যের এমন এক চরম সার্থকতা রয়েছে যা প্রাচীন কালের কোন ভাস্কর্যের মধ্যে ছিল না। ইদানিং কালে পিকাসো সেই সূত্রটি ধরতে পেরেছিলেন বলেই বাহ্য সৌন্দর্যকে আড়াল করে এমন কিংভূত কিমাকার ছবি এঁকেছিলেন, যা নয়ন তৃপ্তিকর নয় বটে কিন্তু ভাবতৃপ্তিকর। জগন্নাথ মূর্তির মধ্যে রয়েছে ভাব। যিনি সর্বগতি সম্পন্ন তার পা থাকবে কোথায়? যিনি সর্বশ্রুতি তার কর্ণ থাকার প্রয়োজন নেই। যিনি সর্বদৃষ্টি সম্পন্ন তাঁর নয়ন থাকবে কোথায়? পরম ব্রহ্মের সেই অবস্থাটা বোঝাবার জন্য তো তাঁর এমন মূর্তি। তিনি সৎ, তাঁর আর দুই অংশ হিসেবে তাই রয়েছে চিৎ (বলরাম) ও আনন্দ (সুভদ্রা)। ঐতিহাসিকেরা এর মধ্যে বৌদ্ধ ত্রিত্ব অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের সন্ধান পান এই তিন মূর্তিতে এবং মূর্তির মুকুটের মণিতে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে জগন্নাথের এ ত্রিমূর্তিতে সেই তত্ত্ব নয়, ভারতের হিন্দুত্বই কাজ করেছে। কিন্তু নব জন্মের এ চিন্তা আমার এখন থাক। ২৫ বছর আগে যে ভাবনার উদয় হয়েছিল সেই ভাবনাতেই আবার ফিরে যাওয়া যাক—

আমি বুঝি গভীর ভাবেই ভাবছিলুম ঐ সব কথা। অঞ্জনা বলল: আবার কি ভাবছ, সন্তুদা?

বললুম: ঐ কাঠি দেখে শ্রীক্ষেত্রের কথা মনে পড়ল। আমিও গিয়েছিলুম কিনা। ডোমের ঝাঁটা আমিও খেয়েছি, কিন্তু কাঠি আনি নি। তাহলে কি শ্রীকৃষ্ণ আমার

পুরী যাত্রার কথা বিশ্বাস করবেন না? শ্রীকৃষ্ণ আর জগন্নাথের মধ্যে পার্থক্যই বা কোথায়?

সমস্ত গল্পটা ওদের ভেঙে বললুম তখন।

অঞ্জনা বলল: তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে পুরী গিয়েছ, সে কথা আমাদের তো বল নি?

রাঙামাসী বলল: পুরী কি সবাই যেতে পারে।

মিনু বলল: গাড়ী আছে, প্লেন আছে, কেন যেত পারে না?

রাঙামাসী বললেন: গাড়ী, প্লেন থাকলেই কি সব হয়। ভাগ্য চাই। পূর্বজন্মে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করে নি, তারা পুরীতে যেতে পারে না।

অঞ্জনা হেসে আমার দিকে তাকাল: পূর্বজন্মে তবে নিশ্চয়ই তুমি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলে? কিন্তু তোমাকে দেখলে তো সেরকম মনে হয় না। তুমি বড়-জোর কোন রাজার সভাকবি ছিলে।

আমি বললুম: সেকালে সভাকবিদেরও যুদ্ধে যেতে হত।

অঞ্জনা হেসে বলল: তাই হবে। আনাড়ির মত যুদ্ধে গিয়ে ঘোড়ার পায়ের নিচে পড়েই বুঝি প্রাণ হারিয়েছিলে।

আমি সে কথার উত্তর না দিয়ে পাণ্ডাকে বললুম: ঐ পেতলের আংটিগুলো কিসের জন্য?

পাণ্ডা বলল: কেদারবদরী যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরা বৃন্দাবনে গোপালের কাছে তাদের সেই তীর্থযাত্রার সাক্ষ্য রেখে গেছেন।

লছমনঝুলার সেই পাহাড়ী পথের রেখা ধরে মানসলোক কেদারবদ্রীর দিকে তাকালুম। যদি তাঁর ইচ্ছা হয়, একদিন নিশ্চয়ই সেই শৈলতীর্থে নিখিল বিশ্বস্রষ্টার এক অনিন্দনীয় শিল্পসৃষ্টির সাক্ষাৎ লাভ করব।

কাঠি আর আংটীর কথা শেষ হল।

পাণ্ডা বলল: কত পুজো দেবেন?

বীরেনদার মুখ সঙ্গে সঙ্গে কালো হয়ে উঠল।

পাণ্ডা বলল: এখানে যত টাকার পুজো দেবেন তার রসিদ পাবেন। সাড়ে আট টাকার পুজোতে ছ'মাস। চৌদ্দ টাকায় একবছর। একশ ছত্রিশ টাকায় সারা জীবন। মাসীমা একবার আমার, একবার বীরেনদার মুখের দিকে তাকালেন।

বীরেনদার মুখের ভাবে মোটেই পুজো দেবার আগ্রহ নেই।

পাণ্ডা বলল: দেখুন বাবু, দূর দেশ থেকে এসেছেন। আর হয় তো কোনদিন আসা হবে না। তীর্থক্ষেত্রে এসে পুজো দিতে হয়। আপনারা যে পুজো দেবেন, তারই উপর তো দরিদ্র নারায়ণের সেবা হবে।

আমি প্রশ্ন করলুম: কি রকম?

পাণ্ডা বলল : এখানকার যে পুজো হয়, তার একভাগ যায় বিধবাদের জন্যে। আর ঐ যে ওদের কীর্তন করতে দেখলেন, ওদের জন্যে।

আর কোন দ্বিধা নেই। বীরেনদাকে বললুম : দিন, চৌদ্দ টাকার পুজো দিন।

রাঙামাসীর চোখ দুটো চকচক করে উঠল।

—চৌদ্দ টাকার!

—হ্যাঁ, তাই দিন। আর তো কখনো আসবেন না রাঙামাসী।

বীরেনদা নিমরাজী হয়ে বললেন : ঠিক আছে, দাও।

আমার ডিসিসনের দিকে বুঝি অঞ্জনাও তাকিয়ে ছিল। ও মাকে বলল : তুমিও পুজো দাও মা।

অঞ্জনার মার মুখেও হাসি ফুটে উঠল।

পুজো দিয়ে বেরুলাম! পাণ্ডা বলল : এদিকে আসুন, এই ঘাটে।

—কোন্ ঘাটে?

—বৃন্দাবনের ঘাটে। যমুনা একদিন এই ঘাটের পাশ দিয়েই বয়ে যেত। আজ দূরে সরে গেছে। এই যে কদম গাছ দেখছেন, এখানেই শ্রীকৃষ্ণ একদিন গোপীদের বস্ত্র হরণ করেছিলেন।

একজন ব্রাহ্মণকে দেখি গাছের নিচে বসে রুমাল বিক্রী করছেন। ঐ রুমালই প্রকৃতপক্ষে বস্ত্র। গাছের ডালে অনেক রুমাল বাঁধা।

সে ডাকল : আসুন, বস্ত্র বেঁধে দিন।

এই আচারের দিকে আমার লক্ষ্য নেই। কান দিলুম না। ঘাটের বাঁধানো সিঁড়ির উপর দিয়ে দূরে যমুনার দিকে তাকালুম। একদিন যমুনা এই বৃন্দাবনের গায়ে গায়ে লেগে ছিল। তখন ইতিহাস লেখা হয় নি। ট্রেনে করে বাসে করে মথুরা বৃন্দাবনে সেদিন আসা যেত না। সে হাজার বছর আগের কথা। না জানি সেদিন শ্যামল তরুর কত বাহার ছিল এখানে। অজস্র ময়ূর-ময়ূরী ঘুরতো তমাল বনের কালো ছায়ার নিচে, আর ঘরে ঘরে কদম্ব ফুল ফুটতো সমস্ত বৃন্দাবনের উপর। সে দিন আর নেই।

বছর দশেক আগের কথা। বৃন্দাবনে সেবার আমি একাই এসেছিলুম। সেবারও এই মন্দিরে এলে পাণ্ডা একশ ছত্রিশ টাকায় সারাজীবন পুজো দেবার কথা বলেছিলেন। এতে রেগে গিয়ে বলেছিলুম যে, পুজো দিতে হবে না। যে টাকার পুজো দেব, চল সে টাকা বাইরে দরিদ্র নারায়ণের ভোজে দিই। তাতে বেশি পুণ্যি হবে। পুজোর নাম করে ভড়ং আমি সহ্য করতে পারি নে। শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ ঘাটে এসে গাছের ডালে বস্ত্র বেঁধে দিতে বললে বলেছিলুম, Nonsenes ওসব রাখ। এখানে কোথাও সাধু সন্ত আছে কিনা বল, সেখানে বরং তাঁর সঙ্গে দেখা করি।

পাণ্ডা বলেছিল, হ্যাঁ, কেশীঘাটের কাছে এক সাধু আছেন। চানতো সেখানে আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।

বলেছিলুম, 'চল।' বস্ত্রহরণ ঘাট থেকে বেশ কিছু দূরে কেশীঘাট। বহুক্ষণ পায়ে হেঁটে সেখানে গিয়ে পেঁাছেছিলুম। কিন্তু সাধুসন্তের চিহ্ন মাত্র না দেখে বেশ হতাশ বোধ করেছিলুম। পাণ্ডাকে বললুম, কৈ, সাধু কৈ? সে আমাকে বালুতটে একটা গর্তের মত জায়গায় নিয়ে গেল। দেখলুম, সেই গর্তের মধ্যে পাগলাটে ধরনের একটা লোক বসে আছে। পরনে বস্ত্র নেই বললেই হয়। শতছিন্ন একটি লেংটি মাত্র। নগ্নগাত্র। মাথার চুল উস্কোখুস্কো। কলকাতার রাস্তায় ডাস্টবিনে খুঁটে খাওয়া ভবঘুরেদের মত দেখতে অনেকটা। পাণ্ডাকে বললুম, সাধু কৈ?

লোকটি মাথা নিচু করে নিজের নাভির দিকে তাকিয়ে ছিল। আমাদের আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে তাকাল। আশ্চর্য! চোখে কনখলের সেই সাধুর মত দুটো সূর্য জ্বলজ্বল করছে।

পাণ্ডাকে দেখলুম, হাতজোড় করে নমস্কার জানাল সেই সাধুটিকে। কথা শুনে বুঝতে পারলুম সাধু বাঙ্গালী। কোন্ মতের সাধু কে জানে। দেহে তন্ত্রমন্ত্রের কোন চিহ্ন নেই। দেখতে বৈষ্ণবের মতও নয়। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, খাবার এনেছিস আমার জন্যে? খাবার?

লজ্জা পেলুম। সত্যিই কিছু আনিনি।

যেন গর্জে উঠলেন তিনি, শালা—কৃষ্ণের পুজোকে ভড়ং বলিস, এ্যাঁ! তবতো তিনি যাকে ধরেই হোক বৃন্দাবনের বিধবাদের এক বেলা খাবারের ব্যবস্থা করেন। তুই শালা কজনের খাবার ব্যবস্থা করেছিস রে? একটি লোককে জীবনে খাইয়েছিস?

হতবাক হয়ে গিয়েছিলুম সাধুর ক্ষমতা দেখে। কোথায় গোপীনাথের মন্দিরে আর বস্ত্রহরণ ঘাটে আমি কি ব্যবহার করেছি, এখানে বসেই তিনি সেটা জানতে পেরেছেন!

তিনি বললেন, শালা তুই পুজোকে ভড়ং বললে কৃষ্ণের তাতে কি যায় আসেরে? তোর মত হাজারো বানচোদ আছে।

সাধুটি নাক কুচকে এমন ভাব করলেন, যেন কোন দুর্গন্ধ পাচ্ছেন। সেই বিকৃত মুখেই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, শালা খুঁজতে বেরিয়েছে। লেখাপড়া করে, দুখানা পুঁথি পড়ে ভেবেছিস, সব জানিস, দুনিয়া জয় করেছিস। বলতে পারিস শালা কোথা থেকে এসেছিস?

জবাব দিয়েছিলুম, কোথা থেকে এসেছি জানি না। কোথায় যাব, তাও জানি না।
—তা যদি না জানিস শালা, তাহলে যা আছিস সেটাকেই সত্য বলে মেনে নিলি কেন?

বিস্ময়ের যেন আমার অন্ত থাকল না। একটি পাগলাটে ধরনের লোকের মুখে এ হেন কথা আশাই করতে পারি নি। শেঠদের মন্দিরে বিধবাদের দুঃখ কষ্ট থেকে অতীন্দ্রিয়ের উপর আমার আস্থা উবে গিয়েছিল। তাই মনে মনে ভেবেছিলুম, ঈশ্বর বলে কিছু নেই, পূর্বজন্ম বলে কিছু নেই। জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু এই ই হল চূড়ান্ত সত্য। কর্মফলটল সব মিথ্যে কথা। মানুষকে নিজের হাতে নিজের ভাগ্য তৈরী করতে হবে।

মানুষের বর্তমানই তার চূড়ান্ত সত্য। বুঝলুম, আমার সেই ধারণাকেই সাধুটি এমন করে ঠুকলেন। তখনও ত্রিকালজ্ঞ হবার Susperstring তত্ত্বটি আমি জানতুম না।

সাধুটি বললেন, চোখে যদি কালো চশমা পরিস তাহলে দুনিয়াটাকে ছায়া ছায়া দেখবি না তো কি দেখবি, বল্ ?

জবাব দিয়েছিলুম, তা ঠিক।

সাধুটি বলেছিলেন, আসল রূপ দেখবি কি করলে, বলতো ?

বলেছিলুম, চশমাটা খুললে।

—তোর চশমা কি জানিস তো ?

—না।

—মায়া, মোহ, লোভ, কাম, মাৎসর্য, এইসব। এগুলো আগে খোল তবে তো এপার ওপার কি আছে দেখতে পাবি। শালা আছিস তো একটা জানালাদরজাহীন ঘরের মধ্যে। যে দিকেই তাকাস দেয়ালের বাধা। বাইরে কিছু দেখতে পাস না। তাই বলে বাইরে কিছু নেই বলতে চাস ?

নিজের ভুল যেন সেই মুহূর্তেই ভেঙে গিয়েছিল। বলেছিলুম, দেয়াল ভাঙা যায় কি করে ? হাতুড়ির ঘা মেরে দেয়াল ভাঙলেই বাইরেটা দেখা যাবে ?

সাধুটি বলেছিলেন :—হাতুড়ি হল বেত, বুঝলি। মাস্টার মশাই যেমন বেত মেরে মেরে দুর্বিনীত ছেলেদের ঠিক করে, তেমনি বেত মেরে মেরে মনটাকে ঠিক কর। এই মনটাই হল দেয়াল। মনটা হল কচুরিপানা।

—কি রকম ?

—পুকুর দেখেছিস ?

বললুম, হ্যাঁ।

—কচুরি পানার পুকুর দেখেছিস ?

—হ্যাঁ।

—আকাশের ছায়া কি কচুরিপানার পুকুরে পড়ে ?

—না।

—কচুরিপানা সরিয়ে দিলে কি হয় ?

—বহুদূর আকাশের ছায়া পড়ে।

সাধুটি বলেছিলেন :—মনের আকাশ থেকে কচুরিপানা সরা, দেখবি দূরে আকাশের ছায়া পড়বে। তোর মন-জলাশয়তো ভাবছে কচুরিপানাই সত্য, তার বাইরে কিছুই নেই। কচুরিপানা সরালে দেখবি আকাশের ছায়া পড়বে। তখন বুঝতে পারবি এ জীবনটাই সব নয়। আরো আছে। আছে, আছে, আর শুধু আছে। শেষ নেই। শালা কুয়োর ব্যাঙ কুয়োর মধ্যে রাজত্ব তৈরী করে অহংকারে ফেটে পড়ছে। বলে, সাগর নেই। যা না শালা, একবার সাগরে পড়, গেলে বুঝবি।

বললুম, সাগরে যাবে কি করে ?

তিনি জবাব দিয়েছিলেন, কুয়ো থেকে উঠে।

—কুয়ো থেকে উঠবো কি করে ?

—পেট ফোলা, হাওয়া ঢোকা পেটের মধ্যে, উঠতে পারবি।

বললুম, এত অবাস্তব কথা। পেট ফুলিয়ে আবার উপরে ওঠা যায় নাকি ?

সাধু যেন তেড়ে উঠেছিলেন ; যায় না, নারে শালা। পেট কখনও ফুলিয়েছিস ? পেট ফোলাবার বিদ্যে জানা চাই। কুলকুণ্ডলিনীকে জাগা, দেখবি পেট ফুলে আকাশে উঠেছিস।

জিজ্ঞেস করেছিলুম। কুলকুণ্ডলিনী, সে আবার কি ?

সাধুটি বললেন : শালা অনেক তো লেখাপড়া করেছিস। এ খবর রাখিস নি ?

—আপনি দয়া করে একটু বলুন না।

সাধুটি তেড়ে উঠেছিলেন :—কেনরে শালা, আমি তোর মাস্টার, যে বলবো ?

—আপনারা না বললে জানব কি করে ?

সাধুটি বলেছিলেন, তুই ব্যাটা কাঠ বাঙ্গাল। আমি ইংরাজী স্কুলের মাস্টার। তুই আমার কাছে পড়বি কিরে ? বাংলা স্কুলে যা।

—বাংলা স্কুল কোথায় পাব ?

সাধুটি যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন, তা আমি কি জানি। তোর বাপকে জিজ্ঞেস করগে যা। ভাগ শালা—

—কিন্তু !

—কোন কথা নয়, ভাগ শালা এখান থেকে। যা, যা, খুঁজে দেখগে যা। একদিন খুঁজে খুঁজে পেয়ে যাবি।

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলুম, পাণ্ডা বাধা দিয়ে বলেছিল, বাবুজী চলুন এখন। এ বড় ক্ষ্যাপা সাধু। শাপ শাপান্ত দিলেই সর্বনাশ। সেই জন্য লোকে এখানে আসেনা। আপনার বহু ভাগ্য আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন। এবার চলুন।

যাবার ইচ্ছে ছিল না। বুঝতে পেরেছিলুম রত্নখনির সন্ধান পেয়েছি। খুঁজলে বহুমূল্য রত্ন পাওয়া যেত। কিন্তু সেবারও হাতে সময় ছিল না। খুঁজতে হলে বৃন্দাবনে থেকে যাবার প্রয়োজন ছিল অনেক দিন। অগত্যা ফিরতে হয়েছিল।

ফেরার পথে আবার দেখেলিুম বস্ত্রহরণ ঘাট। দেখি গাছের নীচে বসে এক ব্রাহ্মণ রুমাল বিক্রী করছেন। ঐ রুমালই বস্ত্রের প্রতীক। কিন্তু আমি বুঝলুম, এ রুমালের অর্থ ঐ ব্রাহ্মণটিও জানে না। আমাদের বস্ত্র আমাদের কামনা বাসনার আবরণ। আমরাই গোপী। সেই বস্ত্র খুলে ফেলতে পারলে তবেই পরমপুরুষ বৈকুণ্ঠাধিপতির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

বহুদিন পরে কুলকুণ্ডলিনীর অর্থও জেনেছি। সাধুটি যে পেট ফুলাবার কথা বলেছিলেন তা হল কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণে এক ধরনের কুম্ভক—যাতে ভূমিত্যাগ হয়। চিত্তবৃত্তির মাত্রা বেড়ে চিদাকাশ বাইরের মহাকাশে মিশে যায়। Carl Sagan-

এর কথা মত 'inside turns out।' এই 'inside turns out'-ই আমার জীবনে নবজন্ম, জন্মান্তর। যে জন্মান্তরের ফলে নতুন দৃষ্টিতে ২৫ বছর আগের আমার সকল চিন্তাধারা ও হৃদয়বৃত্তিকে ছেলেমানুষী রোমাণ্টিকতার আতিশয্য বলে মনে হয় আজ। কিন্তু থাক, এই নতুন জন্মের কথা থাক। আবার ফিরে যাওয়া যাক সেই আবেগ বাহিত ২৫ বছর পূর্বের জীবনে। যদিও আমার জন্মান্তর হয়েছে তবু সংস্কারের শেষতম বীজটিকেতো অন্তরের অন্তস্তল থেকে সম্পূর্ণ তুলে ফেলে দিতে পারিনি। বিশ্বলয়ের পরও ঈশ্বরের বুক থেকে যদি সংস্কারের অভিঘাতে নতুন জগৎ তৈরী হয় তবে এক্ষেত্রে আমি কোন্ ছাড়। য়ুঙের 'collective unconscious'-এর মত ২৫ বছর আগের যে স্মৃতিকে আমারই প্রাক্তন রচনা থেকে খুঁটে তুলছি আমি, তাই আবার কুড়ানো যাক, কারণ তাতেই তো পাঠক দুই জীবনের চিন্তাসূত্রের ধারা বিচার করে বুঝবেন, জন্মান্তর কাকে বলে।

মিনু পাণ্ডাকে বলল : শুনেছি, এখানে জগৎশেঠের সোনার তালগাছ আছে। কোথায় ?

পাণ্ডা বলল : আমাদের টাঙ্গা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার কাছে। বৃন্দাবনে ঢুকতে পথের ডান দিকে। দেখবেন তো তাড়াতাড়ি যেতে হবে। সাড়ে এগারটার মধ্যে মন্দিরের গেট বন্ধ হয়ে যাবে।

সোনার তালগাছ দেখবার এক বিরাট আগ্রহ সকলের মনে। বললুম : চলুন, চলুন, দেখে আসি।

সুতরাং ঘাটে আর দেরী না করে দ্রুত ফিরলুম। আমাদের টাঙ্গাওয়ালা দেখি ঘোড়াকে ঘাস দিয়ে টাঙ্গায় পড়ে ঘুমাচ্ছে। পাশ কাটিয়ে জগৎশেঠের মন্দিরে গেলুম।

মন্দির নয়, যেন একটি দুর্গ। কয়েকটি তোরণ পার হয়ে তবে ভেতরে ঢুকতে হয়। এক একটা দরজা লালকেল্লার দরজাকে যেন হার মানিয়ে দেয়।

মন্দিরের তিন কোণে তিনটি সোনার কলসী।

পাণ্ডা বলল : এক একটা কলসী তিন সের সোনা দিয়ে তৈরী।

ভেতরে ঢুকলুম। একটা সোনার পাতে মোড়া পিলার। একে তালগাছ বলে কেন ভেবে পাইনে। গড়নে বরং একটা মোটা বাঁশের মত। কারুকার্য কিছু নেই। শুধু সোনার পাতে মোড়া।

পাণ্ডা বলল : সাড়ে বার মন সোনায় মোড়া এই তাল গাছ।

সকলের সমবেত আশ্চর্য কণ্ঠ শোনা গেল : সাড়ে বার মন !

—আজ্ঞে !

—সব শুদ্ধো পঁচিশ মন সোনা আছে এই মন্দিরে। পাশের ঘরে অনেক মূর্তি আছে। ঝুলন পূর্ণিমাতে বের করা হয়। বাকী সোনার কাজ সেখানে।

মিনু বলল : দেখা যাবে না ?

—না। বছরে একবার খোলে।

হঠাৎ লক্ষ করলুম, দারুণ ভীড় একটা ঘরের কাছে।

পাণ্ডাকে বললুম : ব্যাপার কী ?

পাণ্ডা বলল : ঐ ঘরে মূর্তিগুলো থাকে। কি জানি, দেখে আসি। ঘরের কাছে গিয়ে পাণ্ডা চেঁচিয়ে ডাকল : বাবুজী, এদিকে আসুন। ঘর খুলেছে।

ছুটে গেলুম আমরা।

পাণ্ডা বলল : আপনাদের ভাগ্য ভাল, দেখতে পেলেন। এখন তো খুলবার কথা নয়!

ঘরে ঢুকে পড়লুম সকলে। শুনে শুনে লোক ঢুকাচ্ছে দ্বারোয়ান। গুনে গুনে বাইরে পাঠাচ্ছে।

ঘরে ঢুকে দেখলুম, সোনার পাতে মোড়া বিভিন্ন মূর্তি। সিংহাসন, ঘোড়া, পাল্কী, খাট প্রভৃতি। পাল্কী আর খাটের কাজ অপূর্ব।

মিনু বলল : যাক, ভাল দিনে এসেছিলুম, দেখা হয়ে গেল।

সোনার মূর্তি দেখে রাঙামাসীদের মুখেও একটা পরিতৃপ্তির ভাব।

বেরিয়ে এসে মন্দিরে মূর্তি দেখলুম। মূর্তির চেয়ে মন্দিরের কারুকার্য আমাকে আকর্ষণ করল বেশী। মানুষের মনে যখন ধর্মের প্রাবল্য, দেশে ভক্তির বন্যা, তখন এখানে কেমন ছিল, কে জানে। কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখবার উপায় নেই। সময় হয়ে গেছে। এখনি দুয়ার বন্ধ হবে। পাণ্ডা তাড়া দিল। বাইরে এলুম আমরা। দেখি, দরজার এক পাল্লা ইতিমধ্যে বন্ধ হয়েছে। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়ালুম।

অঞ্জনা বলল : এত সোনা!

আমি বললুম : এ আর কি ? ভারতবর্ষে ছিল অফুরন্ত ঐশ্বর্য। হাজার হাজার মন সোনা নিয়ে গেছে মুসলমান লুণ্ঠকেরা। সুতরাং মামুদ এই বৃন্দাবন পর্যন্ত লুণ্ঠন করতে ছাড়েন নি। উট্‌বির বর্ণনা পড়লে কি রূপকথার ঐশ্চর্য মামুদ ভারত থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন তা জানা যায়। ভারতবর্ষকে সম্পদশূন্য করেছেন সুলতান মামুদ, তৈমুর লঙ্, নাদির শা আর আহমদ শা আবদালী। শেষে শূন্য করেছে ইংরেজরা। তবে ওদের লুণ্ঠনের ধারাটা অতটা অসভ্য ছিল না, এই যা। নইলে জগৎশেঠের মন্দিরে সোনার তাল গাছ আর থাকতো না। ইংরেজরা openly শুষতো না, শুষতো অড়ালে। তাই গণেশ দেউস্কর ওদের ভ্যাম্পায়ারের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

সুনীলবাবু হঠাৎ অঞ্জনাকে ডাকলেন : ঐ দ্যাখ।

—কি বাবা ?

শেঠেদের মন্দিরের চূড়ার দিকে আঙ্গুল তুলে দেখালেন সুনীলবাবু। সকলে তাকিয়ে দেখলুম, একদল বাঁদর।

সুনীলবাবু অঞ্জনাকে বললেন : তুই বৃন্দাবনে বাঁদরের খোঁজ করছিলি না ? ঐ দ্যাখ্ ।

অঞ্জনা হেসে বলল : তাই বল । আমি ভাবি, কি না কি ?

পাণ্ডা বীরেনদাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আর কোথাও যাবেন বাবু ? গোস্বামী বাড়ি দেখবেন ?

বীরেনদা বললেন : টাকা দিয়ে গোস্বামী বাড়ি দেখবার ইচ্ছে নেই । এবার যেতে হবে । ভাল হোটেল কোথায় আছে, নিয়ে চলুন ।

শেঠজীর মন্দিরের কাছেই রথঘর । ওধারের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলে রামকৃষ্ণ মিশন ।

পাণ্ডা বলল : দেখবেন ?

বীরেনদা বললেন : রামকৃষ্ণ মিশনের পাদপীঠ বেলুড় দেখেছি । এখানে আর কি দেখব ? থাক ।

—ভারত সেবাশ্রম ?

—না ।

আমরা হাসলুম বীরেনদার দিকে তাকিয়ে । সূর্য মাথার উপর উঠে গেছে । বীরেনদার নিশ্চয়ই মাথার ঠিক নেই এখন । তাঁর মনোমত স্থান এখন হোটেল ।

পাণ্ডকে বললুম : একদিনে আর বৃন্দাবন কত দেখব । এখন হোটেলে নিয়ে চলুন ।

পাণ্ডা বলল : তা ঠিক । বৃন্দাবনে যদি তীর্থ করতে হয়, তবে কমপক্ষে একুশ দিন থাকতে হয় । গোস্বামী বাড়ি দেখতে হয় । সাতবার পদব্রজে বৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করতে হয় । ওধারে গিরি গোবর্ধন রয়েছে । ওটাও দেখতে হয় ।

বললুম : থাক, আর বলবেন না । লোভ হবে । গোবর্ধন ধারণ করে কৃষ্ণের এক নাম গিরিগোবর্ধনধারী । এক্ষুনি মনে হবে দেখি গিয়ে । কিন্তু অত সব দেখা আমাদের এই শর্ট টাইমের মধ্যে সম্ভব হবে না ।

পাণ্ডা আর কোন কথা না বলে আমাদের হোটেলের দিকে নিয়ে চলল । যত বেশী দেখব, তত তারই সময় নষ্ট । তাকেই ঘুরিয়ে দেখাতে হবে । অল্প সময়ে কাজ সেরে আবার মথুরা যেতে পারলে সে নতুন তীর্থযাত্রী ধরতে পারবে । সুতরাং পাণ্ডা আর কোন আগ্রহ দেখালো না । বৃন্দাবনের আসল পুজো হয়ে গেছে, তার কাজ শেষ । এখন সারা বৃন্দাবনে অজস্র মন্দির ঘুরিয়ে দেখালেও দক্ষিণা তার বাড়বে না । বৃন্দাবনের ঘরে ঘরেই তো মন্দির ।

বৃন্দাবনে বাঙ্গালীর বাস বেশী । কিন্তু হোটেলের রান্নায় বাঙ্গালীত্বের কোন পরিচয় পেলুম না । মথুরা থেকে দাম কম, এই যা । মথুরাতে দু'টাকাতে যা না মেলে, দেড় টাকাতে এখানে তার চাইতে বেশী মেলে ।

পাণ্ডা ঠাকুরের ঘর বৃন্দাবনে । আমাদের খাবার অবসরে তিনি বাড়ি থেকে খেয়ে

এলেন। আট আনা পয়সা নিলেন আমাদের কাছ থেকে দুধ খাবার জন্যে। আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হলে পান্ডা ঠাকুরের জন্য অপেক্ষা করতে হল মিনিট কয়েক।

অঞ্জনা আর মিনু দুজনকেই প্রশ্ন করলুম : কেমন লাগছে মথুরা বৃন্দাবন ?

ওরা বলল : যা ঝড়ের মতন দেখে গেলুম, কতটুকু স্মৃতি যে এর মনে থাকবে, কে জানে। বছর খানেক বাদে মনে হবে, স্বপ্ন দেখেছিলুম।

বললুম : স্বল্পক্ষণ দেখে গেলে বলে মথুরা বৃন্দাবনের একটা চার্ম থাকবে। সাতদিন এখানে থাকলে এতটা আকর্ষণী ক্ষমতা এর থাকতো না। শুধু মনে রাখবার মত জিনিষটুকুই মনে থাকত। পাকা গৃহিণী যেমন খাঁটি দুধের সবটুকু তুলে রাখেন ঘরে ঘি তৈরী করবার জন্যে, তেমনি পাকা পর্যটক শুধু উল্লেখযোগ্য জিনিস-গুলোকেই মনে রাখেন। অবান্তর সব ফেলে দেন। বরং পরিকল্পনাহীন ভাবে, অজস্র এলোমেলো ভাবে দেখলে সব জড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে।

মিনু হেসে বলল : ভগবান মানুষকে ভাষা দিয়েছিলেন, ঐ টুকুতেই যা সান্ত্বনা। বঞ্চনাকেও কথা দিয়ে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে তারা। তুমি যতই বুঝিয়ে বলতে চাও না কেন সন্তুদা, আমার শুধু মনে পড়ছে ইসফ্‌সফেবলের কথা "গ্রেপস আর সাওয়ার।"

বললুম : অনেক আঙ্গুর টক থাকেই, একথা তুমি অস্বীকার করতে পার কি ?

মিনু বলল : নাও, তুমি তর্ক থামাও। কথার পৃষ্ঠে কথা বাড়িয়ে যেতে তুমি ওস্তাদ।

চুপ করে মুখ ফেরাতে যাব, দেখি পান্ডা আসছে। খাওয়া দাওয়ার পর হোটেলে বসে থাকা অসস্তিকর। বাঁচলুম যেন। এবার তবু চলার মাঝে থাকা যাবে।

পান্ডা এলে টাঙ্গা ছাড়ল আবার মথুরার দিকে।

মথুরায় যখন পৌঁছুলাম তখন বেলা আড়াইটে। বীরেনদাকে বললুম : গোকুল যাবেন নাকি বেড়াতে ?

বীরেনদা বললেন : এই দুপুরে একটু বিশ্রাম করে নাও। আর যেন পারিনে।

দিনের বেলা বীরেনদাকে ক্লান্ত হতে কখনো দেখা যায় নি। আমি তার এই ক্লান্তির কারণ বুঝতে পারলুম। আবার পাঁচ সাত টাকা টাঙ্গার পেছনে খরচ হয়ে যাবে এই তাঁর ভয়।

সুনীলবাবুও বললেন : আর বিশ্রাম না করে চলা যাবে না সন্তু। এবার চল ধরমশালায় ফিরি। একটু বিশ্রাম করে বিকেলে যা হয় ভাবা যাবে। আর মাথায় উপর রোদ্দুরটাও ভীষণ কড়া লাগছে।

আপত্তি জানালুম না কোন। বললুম : ঠিক আছে, তাই হোক। সুতরাং মথুরা ফিরে এসে ধরমশালাতেই উঠলুম আমরা।

অনেক দিন একটানা দেহের উপর একটা ঝক্কি চলেছে। উৎসাহের প্রাবল্যে যতই তাকে অস্বীকার করি না কেন, দেহ ক্লান্ত। ধরমশালায় বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে

পড়েছিলুম সবাই। ঘুম থেকে উঠে দেখে পাঁচটা বাজে। ইচ্ছে ছিল চারটে নাগাদ উঠে গোকুল যাব। কিন্তু কার্তিক মাসে বেলা পাঁচটা মানে সন্ধ্যা। এখন আর সাত আট মাইল পথ ধরে কোথাও যাওয়াটা সঙ্গত নয়। গোকুল যাওয়া বন্ধ হওয়াতে বীরেনদা উৎফুল্ল। কিন্তু আমার মনটা ভেঙ্গে গেল।

অঞ্জনা বলল : সন্তুদা, গোকুল যাবে না ?

বললুম : গোকুল মানে কৈশোর। বহুদিন ছেড়ে এসেছি। গোকুলে আর আমাদের যাওয়া হবে না। স্রোতকে তো আর বিপরীত দিকে ঠেলা যায় না। আমাদের গোকুলে এখন :

গোকুলে মধু ফুরায়ে এল, আঁধার আজি কুঞ্জবন,
আর গাহে না পাখি, ফোটে না কলি, নাহিক অলি গুঞ্জরণ।

হেসে অঞ্জনা বলল : তবে করবে কি ? সন্ধ্যাবেলা ঘরে বসে কাটাবে ?

বললুম : চল, বিশ্রামঘাটে গিয়ে একটু বিশ্রাম করে আসি।

কিন্তু বীরেনদা দিলেন অন্য প্রস্তাব। বললেন : চল, বাস স্ট্যান্ড থেকে একটু ঘুরে আসি। আগ্রার বাস কখন ছাড়ে সেটা জেনে আসি। যদি ভোরের কোন বাস থাকে, তবে ভোর বেলায়ই রওনা হব।

মিনু বলল : সে তো অনেক দূর। সেই স্টেশনের কাছে।

বীরেনদা বললেন : চল না, বিকেলবেলা হেঁটে গেলে শরীরটা ভাল লাগবে। তা ছাড়া হাঁটতে হাঁটতে মথুরাটাকেও ভাল করে দেখা যাবে।

মেয়েদের জন্য ঘর, ছেলেদের জন্য বার। এখন মেয়েরাও ঘরে থাকতে চায় না। মিনু অঞ্জনা দুজনেই বীরেনদার প্রস্তাব মেনে নিল। ও-ঘর থেকে প্রসাধন সেরে এসে ওরা বলল : চলুন।

—চল।

আমরা বেরিয়ে পড়লুম। মেশোমশাই আর রাঙামাসীরা থেকে গেলেন। স্টেশন বিশ্রামঘাট থেকে মাইল দেরেকের কম নয়। চাপা মথুরার পথে বিকেল বেলা অনেক লোক। তার উপর সাইকেল, রিক্সা, টাঙ্গা, এইসব। চলা ফেরাই দুষ্কর। ভীড় এড়িয়ে রাস্তার ধার দিয়ে দিয়ে চলতে লাগলুম। মথুরা সহর স্টেশনের দিকে একটু মডার্ণ রূপ নিচ্ছে। নইলে বিশ্রামঘাটের দিকে এখনো মধ্যযুগে রয়েছে মথুরা। স্টেশনের কাছে, ব্যাঙ্ক, অফিস, সিনেমা হল, সব হয়েছে। ঘর বাড়িগুলোর প্যাটার্ণও আধুনিক।

বাস ডিপো বড়। রেলওয়ে কাউন্টারের মত এখানে কাউন্টার। উত্তর প্রদেশে দূর দূর প্রান্তে বাসে বাসে যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং রেলপথের চেয়ে যাত্রীদের জন্য বাসপথের গুরুত্ব বেশি।

আগ্রার বাসের খোঁজ নিতে গিয়ে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। বাঙ্গালীর মত চেহারা দেখে আমিই পরিচয় করলুম। ভদ্রলোক আলাপ করে খুশি।

বিদেশে বাঙ্গালী দেখে খুবই আনন্দিত। বাড়ি পূর্ববঙ্গের ঢাকা বিক্রমপুরে। সাধনা ঔষধালয়ে আগ্রাতে কাজ করেন। ঔষধের ব্যাপারেই বৃন্দাবন এসেছিলেন। ফিরে যাচ্ছেন সন্ধ্যার বাসেই আগ্রা। আমাদের পরিকল্পনা তাঁকে বললুম: কাল সকালে আগ্রা যাব। ওঠার একটা ভাল জায়গা পেলে হত।

উনি বললেন: সে জন্যে কোন চিন্তা করবেন না। আগ্রায় ধরমশালা এবং হোটেল দুই-ই আছে। যাবেন, ব্যবস্থা করে দেব।

বললুম: ভালই হল। বিদেশে, অপরিচিত হোটেলে উঠতে সাহস হয় না।

তিনি বললেন: ভয়ের কিছু নেই। আগ্রা সহরে অনেক বাঙ্গালী আছেন। আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না। আচ্ছা দাঁড়ান, আপনাদের একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। Fort-এর কাছে দুরো সি নম্বর দুই-এ কানাইবাবুকে খোঁজ করবেন। পানের দোকান। তাকে এই চিঠি দেবেন। আমার সঙ্গে তার বিশেষ পরিচয়। তিনি ভাল ধরমশালা খুঁজে দেবেন আপনাদের। নিরাপদে থাকতে পারবেন। একখানা পত্র লিখে হাতে দিলেন। পড়ে দেখলুম—লিখেছেন:

My dear Kanai Babu,

এইমাত্র সনৎবাবুর সঙ্গে দেখা হইল। আপনি অনুগ্রহ করে আপনার সামনের ধর্মশালা ঠিক করিয়া দিবেন।

নমস্কার নিবেন।

কবিরাজ ... ...

D. A P. ... ..

Agra

হাতের লেখা নিতান্ত জড়ানো, সবটা বোঝা যায় না।

অতি কষ্টে ঐটুকু উদ্ধার করে তাঁকে ধন্যবাদ জানালুম।

ভদ্রলোক বললেন: আপনারা ধরমশালায় থেকে, কাল আগ্রা দেখে, পরশু ফতেপুর-সিক্রি দেখতে পারবেন। আগ্রায় হল্ট না করলে তো চলবে না।

বীরেনদাও পরিকল্পনা কি ভাবে গ্রহণ করলেন জানি না। কিন্তু তাঁর মুখ দেখলুম অপ্রসন্ন।

শুধু কি সময়ের অভাবেই বীরেনদা তাড়াহুড়ো করছেন' না অন্য কিছু? ফান্ড শর্ট পড়বার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সে-সব কথা কিছু তো ভেঙে বলেন না উনি। লজ্জা পাচ্ছেন নাকি? আমাদের জোর করে টেনে আনবার সময় বলেছিলেন, টাকার জন্যে চিন্তা করতে হবে না। এখন বোধহয় মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছেন না।

এ নিয়ে বীদেনদাকে কোন কথা বললুম না। খোঁজ নিলুম বাস ডিপোতে। জানতে পারলুম, খুব ভোরেই বাস পাওয়া যাবে আগ্রার। ছটায় ছাড়বে!

বীরেনদাকে বললুম: তাহলে কাল ভোর ছ'টাতেই বাস ধরা যাক, কি বলেন?

—হ্যাঁ, সেই ভাল।

—চলুন তা হলে এবার।

—চল।

ফিরতে ফিরতে অঞ্জনা বলল : বিশ্রামঘাটে একবার বসে যাব, কি বল সন্তুদা ?

বললুম : বেশ তো যাব। বিশ্রামঘাট যদি বিশ্রাম দিতে পারে, বসব একবার সেখানে।

অঞ্জনা বলল : সারা মথুরায় ঐ একটি মাত্র জায়গা আছে। আর তো কোন জায়গা দেখতে পাচ্ছি না।

আমি হঠাৎ সামনের দিকে সিনেমা হল দেখিয়ে বললুম : আছে আর একটি, ঐ দেখ। যাবে ?

বোম্বে মার্কা একটা হিন্দি বই চলছে।

অঞ্জনা বলল : কলকাতার মেয়ে হয়ে মথুরার এসে সিনেমা দেখব নাকি ? হিন্দি বইও দেখার অভ্যেস আছে নাকি তোমার ?

বললুম : রাষ্ট্রভাষা হিন্দি, তাকে অবজ্ঞা করি কি করে ?

ও বলল : রাষ্ট্রভাষার প্রতি শ্রদ্ধা তো বুঝেছি। একটা হিন্দি কথা বলতে পার না কোথাও। সাইন বোর্ডের একটা হিন্দি পর্যন্ত বুঝতে পার না। বল তো ওখানটায় কি লেখা রয়েছে ?

বললুম : অধ্যাপক মানুষকে তুমি পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলে নাকি ?

—পড়ই না।

—না, আমার ঘাম ছুটে যাচ্ছে। তার চেয়ে তোমার বিশ্রামঘাটে চল। বিশ্রাম করিগে।

অঞ্জনা বলল : উত্তর ভারতে কোথাও অধ্যাপক বলে পরিচয় দিও না। লোকে টিটকিরী দেবে।

অঞ্জনার কথার কোন উত্তর না দিয়ে আমি হাঁটতে লাগলুম।

মথুরার গঠনটা মধ্যযুগীয় হলে কি হবে, এখানে মডার্ণ লোক আছে বুঝতে পারলুম। আপ-টু-ডেট পোষাকে পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আর মহিলারা চলেছে। উগ্র পোষাকে মারোয়ারী আর মারোয়ানীরাও আছে।

অঞ্জনাকে বললুম : পাঞ্জাবী আর মারোয়ারী ভারতবর্ষে সর্বত্রই।

অঞ্জনা বলল : ওদের দৃষ্টিটা বড়। বিশ্বনিখিল ওদের মাগিলে কে তার আত্মপর। ঘরকোণা হয়ে বাঙালীরা মরল। বাইরের লোকের সঙ্গে মিশতে পারল না। অথচ বিশ্বপ্রেমের কথা বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় করে কেউ বলতে পারেন নি।

বললুম : বাঙ্গালী ঘরকোণা হয়ে থাক। তবু মারোয়ারী আর পাঞ্জাবীর মত বিশ্বপ্রেম যেন তার না হয়।

অঞ্জনা বলল : কি আর বলব তোমায় বল। সাত কোটি সন্তানেরে হে মোর জননী, রেখেছ বাঙ্গালী করে মানুষ কর নি। বাঙ্গালী রিফ্যুজিরা তাদের সংকীর্ণতার জন্যেই

আন্দামান যেতে পারল না। দণ্ডকারণ্যে থাকতে পারলে না। আরো সংকীর্ণদৃষ্টি বাংলার রাজনৈতিক দলগুলো তাদের বাংলায় রেখে খেলা করল। বাইরে যেতে দিলে না। অথচ পাঞ্জাব দেখ ছড়িয়ে পড়ে বেঁচেছে। ওদের ছড়িয়ে পড়ার মূলে জানি তুমি স্বার্থপরতা দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু আমি দেখছি কর্মতৎপরতা। পাঞ্জাবীর ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বলং বলং বাহুবলম্। তারা নিজের চেষ্টায় দাঁড়িয়েছে। মারোয়ারীদের ছড়িয়ে পড়ার মধ্যে আছে কারচুপি।

বললুম : বক্তৃতা শুনে মনে হচ্ছে, Student-Front কর? ছাত্রপরিষদের সঙ্গে কানেকশন আছে নাকি?

মিনুর বোধহয় বক্‌বকানী সহ্য হচ্ছিল না। বলল : এবার থাম, তোমাদের জায়গা এসে গেছে। যমুনার হাওয়াতে মাথাটা ঠাণ্ডা করে নাও।

অঞ্জনা মিনুকে বলল : মিছে অভিযোগ করিবনে। আজ সারাদিন বক্‌বক্ করি নি মোটেও।

মিনু বলল : তাই বলে সেটাকে সুদে আসলে উসোল করে নিতে হবে না।

অঞ্জনা বলল : বড় হিংসুক তুই। কথা বলতে দিতে পর্যন্ত গায়ে জ্বালা ধরে।

মিনু বলল : মোটেও না। জ্বালা যদি ধবে সেটা গায়ে নয়, কানে।

অঞ্জনা বলল : শোন সন্তুদা কথা। এই আমি চুপ করলুম।

বললুম : মাথা খারাপ নাকি! তুমি চুপ করলে বিশ্ব-দুনিয়া চুপ্! এতক্ষণ একটা জীবনেব দোলায দুলে দুলে এসেছি। তুমি না থাকলে বে অব্ বেঙ্গলের বুকে ভাসতুম।

মিনু দেখি কৃত্রিম ক্রোধে আমার দিকে তাকাল।

আমার অভিযোগটা হয তো সর্বার্থভাবে সত্য নয়। মিনুও বাণী-তরঙ্গ তুলতে পারে। তবে সে নদীর কলতান। নীরবে একা মন দিয়ে বসে শোনার। অঞ্জনা পুবীর সমুদ্রের গুরু গর্জ্জন, শোনবার জন্যে মনযোগ দিতে হয় না।

ঘাটে আজো সেই প্রদীপের মেলা। হিন্দুস্থানী মহিলারা পুণ্যার্জনের জন্য সারি সারি প্রদীপ ভাসাচ্ছে। ভীড় করেছে সমস্ত ঘাট জুড়ে কচ্ছপেরা। অঞ্জনা দু-আনাব ছোলা কিনে কচ্ছপদের মুখে ছড়িয়ে দিয়ে মজা দেখতে লাগল।

দুটো সিঁড়ির উপবে দাঁড়িয়ে আমি যমুনার জলপ্রবাহের উপর দিয়ে গোকুলের দিকে তাকালুম।

মিনু আমার পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বলল : সাবা দিন তুমি কেন অমন উন্মনা হয়েছিল সন্তুদা?

বললুম : তা হলে তুমি লক্ষ্য করেছ?

—তোমার কি মনে হয়?

—ফিরে তাকাবার সময় নেই।

—বরং ঠিক উল্টো।

—কেন ? সেই কাশী স্টেশনে গাড়ীতে ওঠা অবধি তুমি নীরব হয়ে গেছ।

—কথা বলব কখন ? আর তা ছাড়া তুমি ঠিক আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও কিনা সেটাই বুঝতে পাচ্ছি না।

গম্ভীর ভাবে মিনুর দিকে তাকালুম : তুমি আমাকে এইটুকু বুঝলে ?

সঙ্গে সঙ্গে সুর পাল্টে ফেলল মিনু : না, এমনি বলছিলুম।

—অঞ্জনাকে বুঝি তোমার ভাল লাগছে না ?

—কেন ? তুমি আমাকে কি ভেবেছ, বল তো ? এত নিচু মনে করছ ? কেন ভাল লাগবে না ?

—আমার সঙ্গে এত মিশছে ?

—মিশলেই বা।

—ভয় করে নি তোমার এতটুকু ?

—ভয় ? না, ভয় করবে কেন ?

—এতটুকুও না ?

একটু নীরব থেকে মিনু বলল : না। তোমায় যে আমি বিশ্বাস করি।

আমার বুঝতে বাকী থাকল না মিনুর মনে কালো ছায়া দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোকুলের দিকে আবার তাকালুম।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মিনু বলল : সারাদিন আজ কি ভাবছ তুমি ?

—কিছু না। কিন্তু মনটা কেন যেন উন্মনা।

—কেন ?

—মনে হয়, কি যেন ছিল। কি যেন হারিয়ে গেছে, খুঁজে পাচ্ছি না।

আবার আমি গম্ভীর হয়ে ওপারে তাকিয়ে থাকলুম। সত্যি এক অব্যক্ত যন্ত্রণার অনুভব এই ঘাটে দাঁড়াতেই আবার আমি পাচ্ছি। মথুরার মন্দিরে, বৃন্দাবনে, গোচারণ ভূমিতে, সর্বত্রই এই যন্ত্রণা আজ আমি অনুভব করছি। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে মিনু ভাবল, আমি বুঝি ওর উপর রাগ করেছি। অনুরোধের ভঙ্গিতে বলল : আমার উপর রাগ করলে ?

ম্লান হেসে ফিরে তাকালুম : না, না, রাগ করব কেন ?

করুণ অনুরোধের সুরে মিনু বলল : যদি ভুল করে থাকি, আমার উপর রাগ কোরো না তুমি। একটা আবেগে রুদ্ধ কণ্ঠ মিনুর।

আমি বললুম : মাথা খারাপ। তুমি এমন ভাবছ কেন বল তো ? ছি !

অঞ্জনার তখন কচ্ছপকে খাওয়ানো শেষ হয়েছে। সে উঠে এল। দেখল, আমরা দুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। সদা রহস্যময় কণ্ঠ তার। বলল : বিরক্ত করলুম ?

মিনু স্বাভাবিক সুরে বলল : খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে, না ?

অঞ্জনা বলল : বাড়াবাড়ি আর করতে পারলুম কই। বান্ধবীর মনে ব্যথা লাগবে, ভয়ে করলুম না।

মিনু বলল : তুই আমায় কি ভেবেছিস বল তো ? যা ইচ্ছে কর্‌ না। তুই ভেবেছিস ভয় করব ?

অঞ্জনা বলল : জানি, করবি না। নৌকো তোর ঘাটে ভিড়েছে জানিস কি না।

—নে, থাম্‌ তো। এবার যাবি ?

—চল্‌। বীরেনদা কোথায় ?

অঞ্জনা চঞ্চল কণ্ঠে ডাকল : বীরেনদা।

বীরেনদা বোধহয় আমাদের আলাপ করবার সুযোগ দেবার জন্যেই একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ডাক শুনে কাছে এলেন।

অঞ্জনা বলল : এবার চলুন।

—চল।

ধরমশালায় ফিরে দেখি, মেশোমশাই সেই পাণ্ডার সঙ্গে বেশ গল্প জুড়ে দিয়েছেন। আমাদের দেখে ও বলল : এই যে, বৃন্দাবন ভাল করে ঘুরে দেখে এলেন তো ?

—হ্যাঁ, এলুম।

—কোন অসুবিধে হয় নি ?

—না।

—ভাল। আমরা ব্রজবাসীরা তীর্থযাত্রীদের সেবার জন্যেই তো আছি। টাকাটা বড় কথা নয়। বুঝলেন বাবুজী, ব্যবহারটাই বড়।

বীরেনদা বললেন : তাহলে দক্ষিণার টাকাটা ছেড়ে দাও না। দেখি কেমন ?

পাণ্ডা হেসে বলল : বেশ তো দেবেন না, ওতে কি আছে।

বুঝলুম : মানুষের সাইকোলজি পাণ্ডার খুব ভাল করেই জানা আছে। হাজারো তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে মিশে মিশে মানুষকে এরা ভাল করেই চিনতে পেরেছে। কে ঠকাবে কে ঠকাবে না, কে দেবে, কে দেবে না, মানুষের মুখের দিকে তাকিয়েই ওরা বলে দিতে পারে।

আমি বললুম : ঠাকুর মশাই, এবার কাজের কথা শুনুন। কাল ভোরেই আমরা চলে যাচ্ছি। আপনার টাকাটা নিন। বীরেনদা ওকে টাকাটা দিয়ে দিন।

বীরেনদা পাঁচটা টাকা বের করে পাণ্ডার হাতে দিলেন।

পাণ্ডা বলল : ব্রাহ্মণকে কিছু জল খেতে দেবেন না ?

বীরেনদা বললেন : তেমন কোন কথা ছিল নাকি ?

পাণ্ডা বলল : কথা ছিল না। আপনাদের খুশি।

পাণ্ডা ঠাকুরের বয়েস অল্প। মুখ হাসিখুশি। আমার যেন বেশ লাগছে। নিজের পকেট থেকে একটা টাকা বের করে ওর হাতে দিলুম। তীর্থস্থান তো এই মথুরাতেই শেষ। আর তো যাচ্ছি না।

পাণ্ডা খুশি মনে চলে গেল।

সুনীলবাবু বললেন : এইটুকু বয়স ছেলের, কিন্তু সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছে। বাংলা দেশের সব জেলা, আর সব গ্রামই বুঝি ঘুরেছে।

বললুম : ঘুরবেই তো, ওটা ওদের পেশা।

তখন প্রায় রাত নটা। আর দেরী না করে আমরা হোটেলের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম। খাওয়া দাওয়া সেরে, খাবার নিয়ে এলুম সেখান থেকে মেশোমশাইদের জন্যে।

খাওয়া শেষে বীরেনদা সকলকে লক্ষ্য করে বললেন : কাল ছটাতেই রওনা হব মনে থাকে যেন। উঠতে হবে রাত চারটেয়। স্নান-টান সেরে নিতে হবে ওরই মধ্যে। বিছানা-পত্র বাঁধা-ছাদা আছে। পাঁচটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে।

অঞ্জনা বলল : এত সকালেই স্নান কেন? আগ্রার ধরমশালায় গিয়ে স্নান সারা যাবে।

বীরেনদা বললেন : ধরমশালায় উঠব না।

—তবে?

—দিল্লীর মত গাড়ী করে আগ্রা ঘুরে দেখে কালই বেরিয়ে পড়ব।

—সে কি। ফতেপুরসিক্রি দেখবেন না?

—না, সময়ই নেই।

—এত কাছে থেকে না দেখে চলে যাব?

—কি করব, আমাকে চারদিন পর অবশ্যই গিয়ে কাজে জয়েন করতে হবে। তোমরা ইচ্ছে করলে থাকতে পার। সন্তু, রাঙামাসীদের নিয়ে যেও।

বললুম : সেটা হয় না, বীরেনদা। আপনি ফিরে গেলে আমরাও ফিরে যাব।

—আমাকে যে যেতেই হবে।

বললুম : যাবেন, আমরাও কালই রওনা হব।

অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে বললুম : তোমরা তাহলে একদিন আগ্রা থেকে যাও। ঐ ভদ্রলোকের চিঠিটা নিয়ে ধরমশালায় উঠবে। ফতেপুরসিক্রি দেখে ধীরে সুস্থে ফিরবে।

অঞ্জনার মুখে দেখলুম একটা বেদনার ছায়া নেমে এল।

সুনীলবাবু বললেন : না, না, তাহলে আমরাও আর ফতেপুরসিক্রি যাব না। আমারও কলকাতায় ফেরা খুব তাড়াতাড়ি দরকার।

অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে বললুম : অঞ্জনা, মন খারাপ কোর না। আমার মনটাও খুব খারাপ। মোগল স্থাপত্য দেখা মিথ্যে, যদি না ফতেপুরসিক্রি দেখা যায়। একমাত্র ফতেপুরসিক্রিতেই মোগল বাদশার নিজস্ব শিল্পবৃত্তি ধরা পড়েছে। আকবর ছিলেন স্রষ্টা। নিজে সৃষ্টি করেছেন তিনি ফতেপুরসিক্রি। অন্যান্য বাদশাদের তো ভাড়া করা শিল্পী দিয়ে কাজ। ফতেপুরসিক্রি দেখে আকবরের স্থাপত্য কর্মের উপর Fergusson অভিমত প্রকাশ করেছেন এই বলে : It is simply a reflex of the mind of the great man who built it.

অঞ্জনা বলল : না, মন খারাপ করব কেন। এ সবই হঠাৎ দেখা। যতটুকু পেলুম তার তুলনা নেই। এর চেয়ে বড় ভ্রমণ জীবনে আর কোনদিন হবে না আমার। কোন ক্ষোভ নেই সন্তুদা।

অঞ্জনা কি বলল, সে বুঝলুম আমি আর অঞ্জনা। আর কেউ হয় তো বুঝল না।

অঞ্জনার ওকথার পর, আর যেন আমার কোন কথা থাকল না।

সুনীলবাবু বললেন : তাহলে ঐ কথাই রইল, আগ্রা থেকে কালই ফিরে যাব।

বীরেনদা মিনুর দিকে তাকালেন : কি মিনু, তুমি কি বল ?

মিনু বলল : কি আর বলব, অনেকই তো ঘুরলুম। ভাগ্যে থাকে আবার আসব ফতেপুরসিক্রি।

সুনীলবাবু বললেন : ফেরার প্ল্যানটা কি ?

বীরেনদা জবাব দিলেন : আগ্রা দেখে কালই রওনা হব দিল্লীতে। সন্ধ্যাবেলা ওখানে গিয়ে ট্রেন ধরব। সাহেবগঞ্জ নেমে মনিহারী দিয়ে ওপার কাটীহার যাব।

আমি বললুম : আমি তাহলে বরাবর কলকাতার টিকিট কাটব।

—কেন ?

—কাটীহার থেকে যাতায়াত বড় কষ্ট। নদী পার হয়ে গাড়ীর জন্য ঠেলাঠেলি করা এক ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। আবার গিয়ে দুদিন পরেই তো নদী পার হতে হবে। আর ও ঝঞ্ঝাটটা করব না।

মিনু বলল ? সে কি ! শংকরদা যে জলপাইগুড়ি থেকে এসে তোমার জন্যে বসে আছে কাটীহারে ?

—কলকাতায় দেখা হবে। দু'দিনের জন্যে আর ঝঞ্ঝাট করে ওপারে যেতে চাইনে।

—আমাকেও তো কলকাতায় ফিরতে হবে ?

—তুমি তো আরো দিন দশেক কাটীহার থাকবে। আমার সময় কোথায় ? আমি অঞ্জনাদের সঙ্গে একেবারে কলকাতায় পাড়ি দেব।

সুনীলবাবু বললেন : সেই ভাল, আলাপ করতে করতে চলে যাওয়া যাবে।

অঞ্জনা আর কোন উচ্চবাচ্য করল না। সে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেছে। একটা বিষণ্ণ গম্ভীর ছায়া যে আমার মনেও না পড়েছে তা নয়। একটা একান্নবর্তী পরিবারের মত এ কয়দিন আমরা চললুম, বেড়ালুম। কাল আরম্ভ হবে বিচ্ছিন্ন হবার পালা। এ রকম যোগাযোগ জীবনে দু'বার ঘটে না। আর হয় তো এমন করে সবাই কোনদিন মিলতে পারব না। না হোক, তবু স্মৃতির মণিকোঠায় যে সঞ্চয় আমার জমা হয়ে রইল, জীবনে তা কখনো শূন্য হবার নয়।

সাত

ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সকাল ছটা। মথুরা বাস স্ট্যান্ড থেকে আগ্রার বাসে আজকেই আমাদের ভ্রমণ শেষ। প্রকৃতপক্ষে মথুরা থেকেই বিদায়ের পালা। বাবলা গাছে ছাওয়া পথের মধ্য দিয়ে বাস চলেছে। বাস ভর্তি। সকলেই আগ্রা যাত্রী। কিন্তু সকলেই ভ্রমণ-পথিক নয়। রুক্ষ পশ্চিমের মাটি। সকাল বেলার শিশিরেও স্নিগ্ধতা ফোটে নি। মাঠে ঘাস পর্যন্ত নেই, শিশিরের অশ্রু ঝলমল করবে কোথায়? মথুরা ছাড়িয়ে আরো দূরে যাচ্ছি। সমতল ভূমিতে ধীরে ধীরে পাহাড়ের ছায়া ফুটে উঠছে। অথচ পাহাড় ধাবে কাছে কোথাও নেই। ইতিহাসের গন্ধে ভরা পথের দুদিক। আমার বার বার মনে পড়তে লাগত, "শক হূণ দল, পাঠান মোগল" দলে দলে এ পথের উপর দিয়েই গিয়েছে, ইতিহাস রচনা করেছে। আজ তারা নেই। কিন্তু ইতিহাসের ছায়া যেন আজো এ-পথের উপর ছড়ানো।

উত্তর প্রদেশের সরকার এ রাজ্যের জন্য কি কি করেছে জানিনে। তবে একথা প্রমাণ হচ্ছে যে পরিবহণ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করেছে তারা। সুন্দর মসৃণ মেটালিক রোড। ঝড়ের বেগে বাস ছুটে চলেছে আগ্রার দিকে। এ বাস কলকাতার মত অহরহ থামে না। অহরহ যাত্রী ওঠানামা করে না। আগে টিকিট কাটতে হয়, টিকিট রিজার্ভ করতে হয়। দাঁড়িয়ে যাবার অনুমতি নেই।

বাসের পথ, পায়ে হাঁটা পথ অনেক জায়গায় পাশাপাশি মিশে গিয়েছে। উভয় পথই পিচ ঢালা। কোথাও বা পাশাপাশি তিনটি পথ। মাঝে মাঝে ব্রীজ পার হচ্ছে বাস। সকালবেলা সে দৃশ্য সুন্দর লাগছে। ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রীজ দেখে ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের হৃদয়ের অনুভব তিনি নিজের কাব্যে বর্ণনা করে গেছেন। আমার সে কবি প্রতিভা নেই, কিন্তু হৃদয় আছে অনুভব করবার। অনুভব করছি এক অপ্রাকৃত প্রভাব। এই দূর অপরিচিত মাঠে রাখালেরা গরু নিয়ে যাচ্ছে। কর্কশ মৃত্তিকাকে কর্ষণ করবার চেষ্টা করছে দীর্ঘকায় কৃষকেরা। ওরা কি জানল, কতকগুলো উৎসুখ নয়ন সপ্রেম দৃষ্টিতে ওদের তাকিয়ে দেখে যাচ্ছে?

উত্তর ভারতের মাঠের বুকে একটা উদাস সুর। বিহার থেকে হরিদ্বার অবধি সে মাঠের উদাস গান হৃদয় দিয়ে শুনেছি। দিল্লী থেকে মথুরাতে যে উদাস গানের সুরে গাঢ়তা অনুভব করছিলুম, সেই সুর মথুরা থেকে আগ্রার পথে আরও প্রগাঢ়। আশে-পাশে ব্রজভূমির ছায়া—যত তা ছাড়িয়ে অগ্রসর হচ্ছি আগ্রার দিকে ততই এগিয়ে আসছে ইতিকথার রঙ্গমঞ্চ। গোপীবল্লভের বাঁশীর সুর থেকে নবাব বাদশার অস্ত্র ঝঞ্চনা। কিন্তু দুইয়ের মধ্যেই করুণ রাগিণী; একটি অশ্রুসজল, আর একটি চাপা

দীর্ঘশ্বাসের। ক্রমশ চোখের উপর ভেসে উঠেছে হিন্দু মন্দিরের চূড়ো ছাড়িয়ে মুসলিম স্থাপত্যের গম্বুজ। মাঝে মাঝে পথ ছাড়িয়ে, ঘাট ছাড়িয়ে, মন চলে যাচ্ছে আগে আগে আগ্রায়। কোথায় কেমন করে কালের কল্লোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল তাজমহল জ্বলছে কে জানে। সেই অনাগত অনিন্দ্যসুন্দরের চিন্তায় মাঝে মাঝে মনে প্রাণে ব্যাখ্যাতীত শিহরণ অনুভব করছি।

মিনু তাকিয়ে আছে সামনে, অঞ্জনাও। নিশ্চুপ তাকিয়ে বীরেনদা সুনীলবাবু, রাঙামাসী, অঞ্জনার মা। সকলেই কি ভাবছেন সেই তাজমহলের কথা?

বাস চলছে দ্রুত। প্রকৃতির অঞ্চল ধরা দিচ্ছে ক্রমশ মধ্যযুগের স্থাপত্য শিল্পের কাছে। ক্রমেই চোখের উপর ঘন হয়ে দেখা দিচ্ছে ইতিহাসের সেই প্রচেষ্টাগুলি জীর্ণ অথচ কালের আক্রমণ উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকা পাঁচশ বছর আগেকার মানুষের স্বপ্ন। যত বেড়ে উঠছে Indo-Persian Architecture-এর নমুনা ততই অন্তরে দোলা লাগছে, এই বুঝি এল আগ্রা। ঘনায়মান ঘর বাড়ি, জনারণ্য, ক্রমশ বুঝিয়ে দিচ্ছে, আগ্রা অনেক দূরে নেই। রাস্তা প্রবেশ করছে বসতীর মধ্যে। কৃষকের পরিবর্তে নগরের মানুষ চলেছে পথে পথে—কেউ হেঁটে, কেউ সাইকেলে। গম্বুজের চূড়ো ভেসে উঠলো বাঁ দিকে। বিরাট উদ্যানের মধ্যে মলিন মধ্যযুগ। গেটে দেখলুম ইংরেজী হরফ : সেকেন্দ্রা। অঞ্জনাকে ডাকলুম : অঞ্জনা, ঐ পেছনে বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখ, সেকেন্দ্রা, আকবরের সমাধি।

মিনু আর অঞ্জনা দুজনেই কৌতূহলে পিছনে তাকিলে দেখল। মনে পড়ল, হুমায়ুন কবীরের কবিতার লাইনটি :—'সেকেন্দ্রা তাঁহার অস্থি করিছে ধারণ।' সেকেন্দ্রা থেকে আগ্রা আর দূর নয়। এলুম বলে। ক্রমশ লোকালয় আরো ঘনীভূত হতে লাগল। বাসের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল পাশের বাড়ির দেওয়ালগুলিতে।

লোদীদের সময় আগ্রা পেল অগ্রাধিকার। নইলে দিল্লী ছিল রাজধানী। ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে বাবর দিল্লীর চেয়ে আগ্রাতেই থাকলেন বেশী। হতভাগ্য হুমায়ুন আগ্রা থেকেই পালালেন ভারতবর্ষ ত্যাগ করে। ভারতসাম্রাজ্য দীর্ঘদিন উপভোগ করবার সুযোগ তিনি পেলেন না। পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পা হড়কে পড়ে গিযে মৃত্যু হল তাঁর। এলেন আকবর। ভারতবর্ষে মোগলেরা প্রথম তাদের শিল্প-কৌশল প্রয়োগ করলেন। গড়ে উঠল ঘর বাড়ি, ইমারৎ, বাগান, উদ্যান। শিল্পের সীমানাকে অতিক্রম করে বিলাস এগিয়ে এল জাহাঙ্গীরের সময়ে। ঐ সামনে বাগান ঘেরা ঘরগুলি দেখা যাচ্ছে। স্থাপত্যে ইসলামের ছাপ। ফুলের মধ্যে পুজোর নম্রতা নেই, আছে রংয়ের উগ্রতা আর সৌরভ। পথ এসেছে গ্রাম ছাড়িয়ে সহরের সীমানায়। চৌমাথায় পুলিশ দেখি ট্রাফিক কন্ট্রোল করছে। সারি সারি গভর্ণমেন্ট কোয়ার্টার। আগ্রায় এসে গেছি আমরা। কিন্তু বাস থামবে আর একটু আগে ফোর্টের কাছে—আগ্রা ফোর্ট। বাসের গতি কমছে। এবার সে থামবে। সরকারি কোয়ার্টারের পেছনে আগ্রার বস্তী। তার গা ঘেঁষে মধ্যযুগের সাক্ষী, আগ্রার দুর্গ। লাল পাথরের

উন্নত প্রাচীর ফুটে উঠল চোখের সামনে। ভেতর থেকে রংমহলের ইঙ্গিত। অঞ্জনাকে ডাকলুম : অঞ্জনা, আগ্রা এসে গেছি, ঐ দুর্গ।

ঝাঁকি খেয়ে বাস থেমে গেল।

ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি আটটা।

বাস স্ট্যাণ্ডের রিক্সাওয়ালা এবং ট্যাঙ্গাওয়ালারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন।

বীরেনদাকে বললুম : ট্যাক্সি করবেন, না এই সব ?

বীরেনদা মত দিলেন টাঙ্গার।

দুটো টাঙ্গা দর কষাকষি করে ঠিক করা হোল। আগ্রার সব দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখাবে, চার্জ—প্রতি টাঙ্গা পনের টাকা। জিনিসপত্র নিয়ে টাঙ্গায় উঠলুম। আমাদের চোখের সামনে তখন তাজমহলের স্বপ্ন, আমাদের মাথার উপর আগ্রা দুর্গের ছায়া।

টাঙ্গা ছাড়ল। টাঙ্গা যাবে প্রথমে দয়ালবাগে। দয়ালবাগ সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল না। শুনলুম, মন্দির তৈরী হচ্ছে বহুদিন যাবৎ। শ্বেতপাথরের কাজ। তাজমহলের সমমর্যাদাসম্পন্ন একটি স্থাপত্য নিদর্শন তৈরী করতে চায় হিন্দুরা।

দয়ালবাগের দিকে রাস্তা বেশ প্রশস্ত, পরিষ্কার।

দুই ধারে দীর্ঘছায়া ফেলে তরুশ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে। সরকারি কর্মচারীদের অনেকের আবাস এদিকে। মাঝে মাঝে পথে বাঙ্গালীরও দেখা মিলছে।

দয়ালবাগে টাঙ্গা এসে প্রথম থামল কোন স্থাপত্য নিদর্শনের কাছে নয়, একটি দোকানের সামনে।

বললুম : এটা কি ?

গাড়োয়ান বলল : ভেতরে যান, অনেক জিনিষপত্র আছে, দেখুন।

রাস্তার দুই ধারে দোকান। মনোহারী সৌখিন জিনিষ বিক্রী হয়। যাত্রী দেখলেই পাল্লা দিয়ে ডাকতে থাকে ওরা।

রাস্তার ডান পাশে আমাদের গাড়ী দাঁড়াল। বাঁ পাশের দোকানদাররা চিৎকার করে ডাকতে লাগল : এদিকে আসুন, ওধারে ঠকবেন।

এ ধারের যে দোকানে দাঁড়িয়ে ছিলুম, তার কর্মচারী বললে : ওগুলো সব নকল দোকান, তাই চেঁচামেচি করে। আসুন এদিকে।

ভেতরে ঢুকলুম। পাথরের কাজ করা ছোট ছোট মূর্তি, তাজমহলের মডেল, হাতীর দাঁতের কাজ, চন্দন কাঠের কাজ। নানা মনোহারী জিনিষ। ওধারে শতরঞ্জ, কার্পেট এই সব।

লুব্ধ দৃষ্টিতে সেই সব জিনিসের দিকে আমরা সকলেই তাকালুম।

মিনু বলল : একটা কিছু কিনতেই হবে। কিন্তু অঞ্জনা চুপ। অথচ বীরেনদার মত হিসেবী লোকও নিজেকে হারিয়ে ফেললেন এখানে এসে। দেখি, হা করে মডেলগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। একটা তাজমহলের মডেল নিয়ে দেখতে লাগলেন। মিনুর হাতেও তাজমহলের মডেল।

সত্যি সবগুলো কাজেরই জাদুকরি ক্ষমতা। না তাকিয়ে পারা যায় না। রাঙামাসী পর্যন্ত দেখলুম সাগ্রহে সব লক্ষ্য করেছেন।

মিনু আর বীরেনদা দু'জনেই তাজমহলের মডেল হাতে নিয়ে।

মিনু বলল : কিনব ?

বীরেনা বললেন : আমিও একটা নেব।

অঞ্জনা কোন কিছুই কেনার কথা বলছে না।

অঞ্জনাকে বললুম : তোমার মুখে যে কথা নেই ? কিছু কিনবে না তুমি ?

অঞ্জনা বলল : কি কিনব বুঝে উঠতে পাচ্ছি না।

বললুম : দাঁড়াও, তোমার জন্যে আমি পছন্দ করে দিচ্ছি।

একটি বুদ্ধমূর্তি কিনে দিলুম তাকে।

দাম দিতে চাইলে বললুম : ওটা আমার উপহার।

উজ্জ্বল দৃষ্টিতে অঞ্জনা আমার দিকে তাকাল। আমাকেও একটা কিছু দিতে হবে এই কথা ভাবল বুঝি। মাইশোরের চন্দন কাঠের সিগারেট কেস আর পাইপ কিনে দিল সে আমাকে। সুনীলবাবুদের আড়ালেই সে জিনিসটা কিনল।

অঞ্জনা বলল : হঠাৎ আমায় বুদ্ধমূর্তি কিনে দিলে যে ?

—তোমার আড়ালে, তোমার আসল সত্তাটাকে আমি জেনেছি বলে। কিন্তু তুমি আমাকে একি দিলে ?

অঞ্জনা হেসে বলল : এই কেস্ ব্যবহার কোর। আমার কথা সব সময় মনে পড়বে।

মিনু ওখানে তাজমহল নিয়ে ব্যস্ত। অঞ্জনা আমাকে বলল : ওকে কিছু কিনে দিলে না ?

অঞ্জনার ইঙ্গিতটা আমি বুঝলুম। মিনুর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললুম : কি কিনবে ?

মিনু বলল : এই তাজমহল।

পঁচিশ টাকা দাম হল তাজমহলের। টাকাটা আমি দিলুম।

মিনু বলল : সে কি !

বললুম : আমার উপহার।

সকৃতজ্ঞ হাসি হাসল মিনু।

বীরেনদাও তাজমহলের মডেল কিনলেন।

সুনীলবাবু বললেন : আগ্রার শতরঞ্জ বিখ্যাত, আমি ঐ একটা কিনব।

রাঙামাসী বীরেনদাকে বললেন : আমাকেও একটা শতরঞ্জ কিনে দাও।

ওদের দু'জনের জন্য দুটো শতরঞ্জ কেনা হল।

এবার ঢুকতে হবে দয়ালবাগে।

ভেতরে কাজ হচ্ছে। বাইরে থেকে কিছু আঁচ করা যায় না। তাজমহলের সঙ্গে

পাল্লা দিতে চায় নাকি নতুন দয়ালবাগের মন্দির। ভেতরে গিয়ে দেখলুম, এখনো অর্ধেকের বেশী কাজ অগ্রসর হয় নি। মিস্ত্রিরা কাজ করছে। পাথরের ওপর সুন্দর নক্সা বসিয়েছে মন্দিরের গায়ে। উপরে দেখি, ফুল কাটছে কয়েকজন। লক্ষ্য করে দেখলুম। তাজমহলকে তখনো দেখি নি। তুলনা করি কি করে। কিন্তু দয়ালবাগ সুন্দর। নির্মাণ শেষ হলে লক্ষ লক্ষ লোকের নয়নকে তৃপ্তি দান করবে। অনেক দিন কাজ হচ্ছে দয়ালবাগে। ত্রিশ বছরের উপর বোধ হয়। পাথরের বুকে শিল্পীর স্বপ্ন ফোটাতে গেলে সময় লাগে বই কি! তাজমহল তৈরী করতে বিশ বছর লেগেছিল। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে ফুল কাটা দেখতে লাগলুম। তাজমহলের দেয়ালে বসে সেই সব বহু স্মরণীয় শিল্পীও এমন করে নক্সা কাটতো বোধ হয়। এই শিল্পীরা সেই শিল্প ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকারী। বংশ পরম্পরায় এই স্থপতির কাজই তারা করে আসছে।

অর্ধ সমাপ্ত দয়ালবাগ দেখে বাইরে এলুম। গাড়ী আবার ফিরে চলল। আবার আগ্রা দুর্গের লাল পাথরের দেওয়াল। যমুনার পাশ দিয়ে চলল আমাদের টাঙ্গা! যমুনার ওপারে প্রাচীন কীর্তিসমূহ দাঁড়িয়ে। কোন্‌টা কি, তার পরিচয় সবটা জানি না। কিন্তু সবই যেন স্বপ্নের মত। মথুরাতে এই যমুনা এত খোলে নি। ফোর্টের পাশে এই রাস্তা থেকে যমুনার দিকে তাকালে মন ভরে যায়। অতীত দিনের গল্প জড়ানো এক বিশেষ রূপ যমুনার। এপারে ওপারে মধ্যযুগের ইতিহাস নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। ওই যমুনার বাঁকে, সামনে শ্বেতমর্মরের গম্বুজ, মিনার। এক খণ্ড শ্বেত স্বপ্ন।

মিনু, অঞ্জনা দুজনেই চেঁচিয়ে উঠল: সন্তুদা, ঐ তাজমহল।

বাক্‌হীন হয়ে তাকালুম। বহু দিনের স্বপ্ন ঐ তাজমহল সম্মুখে দাঁড়িয়ে। হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যে যেন উত্তাল তরঙ্গ তুলল অবদমিত স্বপ্নেরা।

অধৈর্য অঞ্জনা আর মিনু দুজনেই।

অঞ্জনা বলল: কি ভাবছ সন্তুদা? কথা বলছ না যে?

—কি বলব অঞ্জনা! দূর থেকে ঐটুকু দেখেই যে কথা হারিয়ে ফেলেছি।

—কি মনে পড়ছে তোমার?

আবৃত্তি করলুম: "হে সম্রাট কবি,

এই তব হৃদয়ের ছবি;

এই তব নব মেঘদূত

অপূর্ব অদ্ভুত

ছন্দে গানে

উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে—"

অঞ্জনা বলল: আহা! কবিতাটা আমার মনে পড়ল না?

মিনু বলল: সন্তুদা, আমরা তো এখন তাজমহলেই যাচ্ছি?

—না।

—কেন? যেন অভিমান মিনুর।

বললুম: অন্য সব আগে দেখে নি। সব শেষে তাজমহলের স্বপ্ন নিয়ে ফিরব। কীর্তনের শেষে যেমন গান চলে না, মিষ্টির পর খাওয়া শেষ, তেমনি তাজমহল দেখবার পর আর কিছু থাকে না।

অঞ্জনা বলল: ঠিক বলেছ সন্তুদা, কিন্তু ধৈর্য যে থাকছে না!

—ধৈর্য ধরতে হবে। তাজমহলের পরিকল্পনা যিনি করেছিলেন, কুড়ি বছর তাঁকেও অপেক্ষা করতে হয়েছিল নিজের স্বপ্নকে মর্মর বক্ষে রূপায়িত হতে দেখতে। কুড়ি হাজার লোক নিত্য কাজ করেও কুড়ি বছরের আগে শেষ করতে পারে নি এ কাজ। স্বয়ং শাহজাহান ধৈর্য করে ছিলেন, আমরা ধরব না?

—এখন তবে কোথায় যাবে?

—ইত্মাদউদ্দৌলার কবর দেখতে।

—সেটা কার?

—সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের পিতা গিয়াসবেগের। তৈরী করেছিলাম নূরজাহান ১৬২৮ খৃীষ্টাব্দে।

—নূরজাহানের নিজের কবর কোথায়?

—লাহোরে, জাহাঙ্গীরের কবরের পাশে। কিন্তু সে-কবরে চাকচিক্য নেই কিছু।

—কেন?

—যিনি সে-কবর তৈরী করিয়েছিলেন, সেই শাজাহান নূরজাহানকে তত পছন্দ করতেন না।

সময় লাগল বেশ কিছু। ইত্মাদউদ্দৌলার কবরে এলুম। শ্বেতপাথরের কবর। কারুকার্য করা। চারদিকের মিনার এবং নিচের কাজ তাজমহলের দিকে মোগল আর্টের এক দিক্ পরিবর্তন।

অঞ্জনাদের বললুম: কেমন লাগছে?

—অপূর্ব।

—এই সৌধের একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

—কি রকম?

—মোগল স্থাপত্য এর আগে লালপাথরের অনুরাগী ছিল। আকবর রেড স্টোনে সব কাজ করতে ভালবাসতেন। আগ্রা দুর্গের মধ্যে আকবরের সে কাজ দেখতে পাবে। দিল্লীতে হুমায়ুনের কবর দেখে এসেছ। রেড স্যান্ড স্টোনের রীতি পরিবর্তিত হল এখান থেকে। শাজাহানের আমলে তিনি সাদা পাথরেই কাজ করেন। শুভ্র মর্মরের দিকে শাজাহানের একটা বিরাট দুর্বলতা ছিল।

সুন্দর সবুজ ঘাসের লন। সামনে শ্বেতমর্মরের শিল্প। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছি আমরা। মনে পড়ে যাচ্ছে কবি সাদীর কথা। অঞ্জনাকে বললুম: কবি সাদী

একথা বলেছিলেন, "A man who has left behind him great works in temples, bridges, reservoirs and caravanserais for the public good does not die" কথাটা তিনি ফার্সীতেই বলেছিলেন। কিন্তু কথাটা সত্য। মোগল বাদশারা বেঁচে আছেন তাঁদের শিল্পে, স্থাপত্যে। যদি না থাকতো আকবরের ফতেপুরসিক্রি, যদি না থাকতো শাজাহানের তাজমহল, যদি না থাকতো মোগলদের লালকেল্লা, দেওয়ান-ই- আম, দেওয়ান-ই-খাস, মোগল ইতিহাস বুঝি অনেকটাই নিষ্প্রভ হয়ে যেত।

আমার ইচ্ছা ছিল আরো একটু দেখি। মিনু তাড়া দিল : চল।

আমি বললুম : তাজমহলের জন্য তুমি অধৈর্য হয়ে পড়েছ। কিন্তু সে এখনো অনেক দেরী। আচ্ছা, চল।

টাঙ্গা ফিরল আবার আগ্রা সহরের মধ্যে। গাড়োয়ানেরা বলল : এই জামা-মসজিদ।

নামলুম, ভেতরে গেলুম। বাদশা কন্যা জাহান আরা বেগম তৈরী করেছিলেন এই মসজিদ। সেই শিল্পী রাজকন্যার স্নিগ্ধ মনের ছায়া এখনো রয়েছে এখানে।

সেই চাকচিক্য আর কারুকার্য এখানে নেই—যা দেখেছি দিল্লীতে বা ইত্মাদ্দৌলার কবরে। কিন্তু এর পেছনে একটা করুণ মনের ছায়া আছে। জাহান আরার জীবনের ইতিহাস না জানলে তাঁকে উপলব্ধি করা যায় না। শাজাহান আগ্রাতে বন্দী হবার পর যাঁরা জাহান আরার কথা জানেন, তারা তাঁর সেই জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে মসজিদটার মূল্য বুঝবেন। অবশ্য মসজিদটা শাজাহান বন্দী হবার আগেই তৈরী।

বুঝতে পাচ্ছি, মিনুদের আগ্রহ এখানে কম। তারা শুধু চোখের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতেই দেখছে, অন্তরালে যেতে চাইছে না। সুতরাং বেশী সময় না নিয়ে মসজিদ থেকে বেরুলাম।

জামা-মসজিদের কাছে অনেক চায়ের দোকান, খাবারের দোকান। বীরেনদাকে বললুম : চা-টা কিছু খেয়ে নেওয়া যাক এখানে, কি বলেন ?

বীরেনদা বোধহয় এমন একটা প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কথাটা তুলে নিয়ে বললেন : হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটাই ভাল। বেলাও তো হয়ে যাচ্ছে।

আমরা সকলে গিয়ে দোকানে বসলুম। রাঙামাসী আর মাসীমা টাঙ্গায় বসে থাকলেন। হোটেলে রেস্টুরেন্টে খাবার অভ্যাস তাদের জন্মে নেই। বিশেষ করে এখানে public রেস্তোরাঁতে বসে খাওয়া তাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। কারণ চতুর্দিকে অজ্ঞাত লোকেদের দোকান। ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাবার সম্ভাবনা। কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে এ বয়সে তাঁদের আর ওঠা সম্ভব নয়।

পুরি আর তরকারি নিলুম। একটু মিষ্টি আর চা। খাওয়া শেষে মুখ মুছতে মুছতে বীরেনদা বললেন : সব দেখাশুনা শেষে, এখানেই ভাল একটা হোটেলে ভাত খেয়ে নিয়ে দিল্লীর বাসে উঠব। দিল্লী থেকে সন্ধ্যেবেলা ট্রেন ধরব।

মিনু বলল : আমরা তো খেলুম। মাসীমারা খাবেন কি ? এখনকার মত অন্তত সিঙ্গাপুরী কলা কেন। সব দেখাশুনা হয়ে গেলে দুপুর বেলার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করা যাবে। হিন্দু হোটেলে রুটি তরকারি খেতে নিশ্চয়ই ওঁদের কোন আপত্তি থাকবে না।

মিনুর suggestion অনুযায়ী সিঙ্গাপুরী কলা কেনা হল রাঙামাসীদের জন্যে।

অঞ্জনা বলল : এবার কি ?

বললুম : এখন তাজমহল নয়। আগে ফোর্ট, তারপর তাজ।

—বেশ চল।

—চল।

এসে টাঙ্গায় উঠলুম। ফোর্ট কাছেই।

দিল্লীর লাল কেল্লা আর আগ্রা ফোর্টের নির্মাণ-কৌশল একই। রেড স্যাণ্ড ষ্টোনের তৈরী দুর্গ। একধারে মিলিটারী ছাউনী, আর একদিকে প্রাসাদ। মোগল বাদশারা সব সময় সামরিক বাহিনী নিয়ে বাস করতেন।

ফোর্টের গেটে এসে টাঙ্গা থেকে নামতেই গাইড ধরল।

বীরেনদা বললেন : গাইডের আর কি প্রয়োজন, সন্তু তো আছেই। পারবে না ?

বললুম : পারব নিশ্চয়ই। আগ্রা দুর্গের অলিগলি সম্বন্ধে অনেক কথাই আগে পড়েছি। চলুন, দেখা যাক।

সুতরাং গাইডের সাহায্য ছাড়াই অগ্রসর হলুম।

প্রাসাদের অভ্যন্তরে ঢুকবার রাস্তাটা বেশ প্রশস্ত আর ঢালু, দুর্গের দিকে ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে।

বললুম : এই যে পথ দিয়ে আমারা যাচ্ছি, এই পথ দিয়ে হাতী, ঘোড়া, রথ পদাতিক, সব একদিন দুর্গে প্রবেশ করত। বাঁদিকে মিলিটারী ছাউনী। ডানদিকে প্রাসাদ। আসুন।

প্রাসাদে ঢুকতে প্রথমে জাহাঙ্গীর মহল। রেড স্যাণ্ডষ্টোনে আকবর তৈরী করিয়েছিলেন। শক্ত এই স্যাণ্ডষ্টোনের উপর অপূর্ব কারুকার্য করা। সম্রাট জাহাঙ্গীর এখানেই থাকতেন। এটাকে অনেকে নুরজাহানের মহলও বলেন। কিন্তু আসলে এটা জাহাঙ্গীর মহল।

জাহাঙ্গীর মহলের পাশ দিয়ে খাস মহলে ঢুকতে হয়।

খাস মহল দেখে ভাল লাগল সবারই।

অঞ্জনা বলল : চমৎকার। মনে হয় যেন সেদিন তৈরী হয়েছে।

শ্বেতপাথর দিয়ে তৈরী বলেই এত ভাল লাগছে। এই মহল তৈরী করেন শাজাহান। শাজাহান শ্বেতমর্মরের বড় ভক্ত ছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী ধারাকে পাল্টে দিয়ে শ্বেত-পাথর ব্যবহার করতে থাকেন।

মিনু বলল : এই খাস মহলেই শাজাহান থাকতেন ?

—হ্যাঁ। ঐ পাশে ছোট ছোট শ্বেতপাথরের যে দুটি ঘর, ওতে থাকতেন সম্রাটের দুই কন্যা, জাহান আরা আর রোশন আরা।

অঞ্জনা বলল : ঘরের দরজা জানালা কৈ ?

হেসে বললুম : এটা কি, তোমার আমার বাড়ি। দরজার প্রয়োজন কি ? এটা দুর্গ। ওপাশে সামরিক ছাউনী। খাস মহলে অনবরত পাহারা থাকতো দুর্ধর্ষ খোজারা। সুতরাং দরজা জানালার প্রয়োজন কি ? চোর ডাকাতের ভয়ের জন্যই না দরজা জানালা করি আমরা ? হেন কোন চোর ডাকাত ছিল তৎকালে যে, মোগল হারেমে ঢুকবে ? অবশ্য তবু যে দু-একজন না ঢুকতো তা নয়। তারা প্রেম চুরি করবার জন্যে ঢুকতো, অন্য কিছুর জন্য নয়। মোগল শাহজাদীরা কখনো কখনো গোপনে তাঁদের প্রণয়ীদের ডেকে আনতেন। অবশ্য তাতে বাঁদী এবং খোজাদের হাত থাকতো। ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ের ঔরংজীবের আমলে দিল্লী-প্রাসাদের তেমন দুটো বর্ণনা দিয়েছেন। ঔরংজীব যখন বাদশা, তখন রোশনআরা বেগম অন্তঃপুরে দুজন যুবককে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন বলে গুজব রটে। ঔরংজীব শুনে ক্ষুব্ধ হন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভগ্নীকে কিছু বলেন না। একদিন রোশন আরার নির্দেশে অন্তঃপুর থেকে পরিচারিকাদের সাহায্যে বাইরে নিয়ে যাবার সময় একটি যুবক ধরা পড়ে যায়। চোখে পড়ে প্রহরীদের। পরিচারিকারা আতঙ্কে পালিয়ে যায়। প্রহরীরা তাকে ধরে নিয়ে বাদশার কাছে উপস্থিত করে। উত্তেজিত না হয়ে ঔরংজীব তাকে প্রশ্ন করেন, অন্তঃপুরে সে ঢুকেছিস কি ভাবে। যুবকটি বলে, প্রাচীর টপকে। তাকে কোন শাস্তি না দিয়ে যেভাবে ভেতরে এসেছিল, সেইভাবে বাইরে যাবার নির্দেশ দেন ঔরংজীব। কিন্তু খোজারা প্রাচীর থেকে নামবার সময় ধাক্কা দিয়ে তাকে নিচে ফেলে দেয়। বুঝতেই পারছ, এখান থেকে মাটী কত নিচে। যুবকটি মারা যায়।

আর একটি যুবকও ধরা পড়ে একদিন। বাগানের মধ্যে তাকে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরতে দেখা যায়। খোজারা তাকে ধরে নিয়ে যায় বাদশার কাছে। বাদশা তাকে প্রশ্ন করে জানেন, কি ভাবে সে ভেতরে প্রবেশ করেছিল। যুবকটি বলে : ফটকের ভিতর দিযে। ঔরংজীব সোজা ফটক দিয়ে তাকে বাইরে চলে যাবার নির্দেশ দেন। কোন শাস্তি দেন না। কিন্তু শাস্তি দেন খোজাদের। কারণ তাদের পাহারাতে নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি ছিল, নইলে বাইরের লোক অন্তঃপুরে প্রবেশ করল কি করে ? এরপর থেকে পাহারা আরো কড়া করেছিলেন ঔরংজীব।

মিনু বলল : কিন্তু দরজা জানালা না থাকলে Privacy থাকতো কি করে ?

আমি বললুম : ও হরিবোল। তুমি তাহলে ব্যাপারটা আঁচ করতে পার নি ? বহু মূল্যবান সিল্কের পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকতো এই সব ঘর। ভেতরে সিল্কের চাদরে মোড়া শয্যা। মেঝেতে কার্পেট বিছানো। সে এক অপূর্ব দৃশ্য ছিল। আজ অনাড়ম্বর প্রাসাদই আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করছে। সেদিন না জানি কি ছিল।

খাস মহলের উঠানের নিচে প্রাঙ্গণ।

অঞ্জনা বলল : এখানে কারা থাকতো ?

—বান্দা, বাঁদী, খোজা, এরা থাকতো নিশ্চয়ই। Arrangement দেখে সে-রকমই মনে হচ্ছে।

মিনু বলল : শুনেছি, মোগলদের বেগম মহলে হাজারো জেনানা থাকতো। এইটুকু জায়গার মধ্যে তারা কি করে থাকতো ?

বললুম : সে প্রশ্নটা আমার মধ্যেও জাগছে। আমার মনে হয় ওদিকে আরো জায়গা আছে, সেখানে অন্যান্য বেগমেরা থাকতেন। এটা খাস মহল। মুখ্য বেগমের সঙ্গে বাদশা এখানে থাকতেন। এই দেখ, বারান্দার দিকে বাইরে অলিন্দ। এটাও শ্বেতপাথরের। বাদশা শাজাহানই এটা তৈরী করেছিলেন। কেন জান ?

—কেন ?

—তাহলে এখানে এসে দেখ।

মিনু আর অঞ্জনা একটা বিরাট কৌতূহলে কাছে এগিয়ে এল। ঔৎসুক্য শুধু ওদের দুজনেরই নয়, সকলেরই। সকলেই এল। আমি যমুনার বাঁকে ওধারে তাজমহলের দিকে অঙ্গুলী তুলে দেখালুম।

অঞ্জনা বলল : How lovely! আঃ! অপূর্ব!

এইখানে বসে শাজাহান তাজমহল দেখবেন বলে এই অলিন্দের সৃষ্টি করেছিলেন। কাজ দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পাচ্ছ, এ-সব কম্পারিটিভ্‌লি নতুন সৃষ্টি। আরো আছে। এই যে দেওয়ালে কাজ দেখছ, লতাপাতা আঁকা, এই যে ফুল, এর মধ্যে মূল্যবান মণিমুক্তা বসানো ছিল।

উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে অঞ্জনা বলল : আহা! না জানি তখন কত সুন্দর দেখাতো এই প্রাসাদকে!

—এই দেখ, ফুলগুলোর মধ্যে ফাঁকা। এখানে কি ছিল জান ?

—কি ?

—পাথর। সে পাথরগুলি নেই। একটু নীলাভ ছিল সেই পাথরগুলি। লুঠেরারা লুঠ করে নিয়ে গেছে। এইসব দুর্গের উপর অত্যাচার তো কম হয় নি। দিল্লীতে সে কাহিনী তোমাদের বলেছি। এত সব ঝড় ঝঞ্ঝাটের পর এই ঘরগুলি যে অক্ষত আছে এটাই তো ভাগ্য। ঐ দেখ একটা ফুলের গায়ে এখনো একটা পাথর বসানো।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু না, ওটা পাথর নয়। পাথরের অনুরূপ একটি কাঁচ। কিন্তু সেই কাঁচেই আমার কাজ হল। মিনুদের বললুম : এই দেখ, এই পাথরের বুকে তাকাও।

—কেন ?

—তাকাও না ?

উল্লাসে যেন ফেটে পড়ল ওরা : অপূর্ব! অপূর্ব! এ যে তাজমহলের প্রতিচ্ছবি!

– হ্যাঁ, তাজের প্রতিচ্ছবি। এই সব ফুলের বুকে অজস্র পাথর ছিল। সেইসব

পাথরে তাজমহলের প্রতিবিম্ব পড়ত। ওধার থেকে যদি কখনো মুখ ফেরাতেন সম্রাট, এধারে দেখতেন প্রতিবিম্ব। কখনো তাজমহল তাঁর চোখের আড়াল যাতে না হয়, সেজন্যই তিনি এ ব্যবস্থা করেছিলেন।

সকলের চোখের মধ্যে দেখলুম, একটা মুগ্ধ বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

অঞ্জনা বলল : কত গভীর ছিল শাজাহানের প্রেম।

হেসে বললুম : সে কথা বিচার্য। বাদশার খেয়ালও তো হতে পারে এটা ?

অঞ্জনা যেন ঘোরতর প্রতিবাদ করে উঠল : না, না, তুমি এমন কথা বোল না। দেখতে পাচ্ছ না, শাজাহান শুধু প্রেমিক নন, কবিও ছিলেন। তাই বুঝি রবীন্দ্রনাথ 'হে সম্রাট কবি' বলে তাঁকে সম্বোধন করেছেন।

আমি বললুম : তাহলে বার্ণিয়ের তাঁর বর্ণনাতে কি বলছেন শোন। বৃদ্ধ বয়সে শাজাহান তিনজন বেগম নিয়ে থাকতেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন তের বছরের বয়সের এক কিশোরীকে দেখে তিনি প্রেমে পড়ে গেলেন। যৌবন ফিরিয়ে আনবার জন্যে উত্তেজক দাওয়াই খেলেন। ফলে পড়লেন অসুস্থ হয়ে। সেটাই civil war-এর কারণ হয়ে দাঁড়াল। তাহলে প্রেমের স্থায়িত্ব বোঝ। অথচ মমতাজ জীবিত থাকতে তিনি অন্যান্য বেগমের ঘরে যান নি। মমতাজের গর্ভেই তাঁর ছিল আঠারজন ছেলে মেয়ে। তাঁদের মধ্যে সবাই যে বেঁচে ছিল তা নয়। শোনা যায়, মমতাজের মৃত্যু-শোকে একরাতে তাঁর সব চুল পেকে গিয়েছিল। এত গভীর প্রেম অথচ তিনিই কিনা তের বছরের এক কিশোরীকে দেখে নিজেকে সামলাতে পারলেন না। ঠিক যেন বাংলা সাহিত্যের চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। স্ত্রী বিয়োগে লিখলেন 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'। অথচ বছর না ঘুরতেই আবার বিয়ে করলেন। আরো বলতে পারি—

অঞ্জনা ঘোরতর প্রতিবাদ করে উঠল : তোমার তা-ভার্ণিয়ের না বার্ণিয়ের, সে একটা বুজরুক। ভারতীয়দের সম্পর্কে ইউরোপীয়ানদের চিরকালের অবজ্ঞা। চুটকি সংবাদের মধ্যেই ভারতবর্ষটাকে ধরতে চায় ওরা। যমুনার তীরে আগ্রার এই অলিন্দে দাঁড়ালে তোমার বিশ্বাস হয় যে, এটা শুধু সাময়িক উচ্ছ্বাস ছিল বাদশা শাজাহানের ?

বললুম : আমি ইতিহাসের উল্লেখ করছি। নিজের কোন বক্তব্য তো রাখছি না। আমার কথা আমার। আবার ঐতিহাসিকদের মধ্যেও অনেকে আছেন, যাঁরা শাজাহানের প্রেমকে এ্যাপ্রিসিয়েট করে উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়েছেন। তবে ত্রুটি যদি কিছু থেকে থাকে তাকে অতিক্রম করে প্রেম আর বেদনাই জয়ী হয়েছে আগ্রা দুর্গে আর তাজমহলে। কিন্তু এ নিয়ে তর্ক এখন থাক। চল, ওধারে যাই।

এগিয়ে গেলুম শাহজাদীদের ঘরের কিনারে।

ছোট্ট একটি ঘর। উর্ধ্বে কনভেক্স মিররের নক্সা। চৌবাচ্চা। ফুলের মৃণাল দিয়ে জল গড়িয়ে পড়বার ব্যবস্থা।

—এর নাম কি জান ?

ওরা উৎসুক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

—এর নাম শিষ্মহল। এইখানে প্রসাধন সারতেন বেগমেরা। এই মৃণাল দিয়ে আতর জল এসে পড়ত চৌবাচ্চাতে। নিচে চতুর্দিকে এই দেওয়ালের খোপে মোমবাতি জ্বলত। এই শিষ্মহল যে কি এক মায়াপুরি, ঠিক এমনি তা বোঝা যাবে না। দেখাচ্ছি, দেখ।

পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে একটি কাঠি ধরালুম। বললুম: উপরে তাকিয়ে দেখ।

অঞ্জনা ওপরে তাকাল। তাকিয়েই আশ্চর্য হয়ে গেল, ঐ সব কনভেক্স মিররে একই মুখের, একই দেহের, হাজারো ছবি।

বললুম: প্রায়-অন্ধকার এই হলে নির্মল-জ্যোতি মোম জ্বালিয়ে যখন বেগমেরা এসে আতর জলের ফোয়ারা ছেড়ে দিয়ে এই টবে বসতেন কোন এক গ্রীষ্মসন্ধ্যায়, তখন অনিন্দ্যসুন্দরী পেলব-দেহ সেই সব বেগমদের মুখচ্ছবিপ্রতিবিম্বিত এই শিষমহল কল্পনা কর দেখি। কি এক অপূর্ব লাবণ্যময় পরিবেশের সৃষ্টি হোত তখন এখানে! যদি তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথ থাকতেন, আর কবিতা লিখতেন উর্বশীকে নিয়ে, স্নানরতা সেই সব বেগম বা শাহজাদীরা অনায়াসে নিজেদেরই প্রতিবিম্বে মুগ্ধ হয়ে সে কবিতা আবৃত্তি করতে পারতেন:

'স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী, হে ভুবন মোহিনী উর্বসী।'

আমার সেই দীর্ঘ বর্ণনা শুনে হেসে ফেললেন সুনীলবাবু: ইতিহাস পড়লেও তুমি কবিই সনৎ।

এই এ্যাপ্রিসিয়েসনে যেন অঞ্জনারই বেশী আনন্দ হল। উচ্ছল আবেগে সে বলে উঠল: বলি নি তোমায় আমি!

আমি বললুম: থাক, আর বলতে হবে না, এদিকে এস।

—এটা কি, বল তো?

—মসজিদের মত দেখাচ্ছে!

—হ্যাঁ, মসজিদ। এই মতি মসজিদ। শাজাহান গোঁড়া সুন্নী মুসলমান ছিলেন। হারেমের মধ্যেও পাঁচবার নামাজ পড়বার জন্যে তিনি মসজিদ তৈরী করেছিলেন। মোগল স্থাপত্য এক চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে এই মসজিদে। শাজাহানের স্থাপত্যের উপর আলোচনা করতে গিয়ে একজন সমালোচক একে বলেছেন: "Jewel caskets magnified into architecture" শ্বেতমর্মরে খচিত এই মসজিদ দেখে কি তাই মনে হয় না?

অঞ্জনা বা মিনু নয়, উত্তর দিলেন সুনীলবাবু: ঠিক তাই। ঠিক বলেছ তুমি।

—আর এই যে এধারে একটু নিচে শ্বেতপাথরের জালি দেখছেন, এটা কি জানেন?

বললুম: জালি দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখুন। ঐ ছোট্ট লন। ঐ বাঁধানো চত্বর। এর নাম ঝরোকা। শাজাহান অসুস্থ হয়ে যখন আগ্রা আসেন, তিনি বেঁচে আছেন এ-

কথাটা প্রমাণ করবার জন্য এই ঝরোকাতে এসে তাঁকে প্রজাদের দর্শন দিতে হত। ঠিক এইখানে বসতেন তিনি। এবার এদিকে আসুন।

আমার সঙ্গে সকলে দেওয়ান-ই-খাসের দিকে অগ্রসর হলেন।

হারেম থেকে বাইরে গিয়ে দেওয়ান-ই-খাসে উপস্থিত হলুম। শ্বেতপাথরের কাজ শেষ। আবার সেই রেড স্যাণ্ড স্টোন। আগ্রার দরবার। সামনে দিয়ে রাস্তা। ওধারে ছোট্ট লন। দরবার আজ শূন্য। শূন্য পড়ে আছে মঞ্চরূপী বিরাট পাথরখণ্ড। একদিন এখানে আমীর ওমরাহদের ভীড় হত। দেশ বিদেশের রাজদূতেরা বসতেন। ইউরোপীয় রাজদূতেরা এখানেই দেখা করেছেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে। একদিন প্রাণ-স্পন্দনে স্পন্দিত এই দরবার আজ নীরব। ইতিহাসের সাক্ষী মাত্র সে।

আমি সকলকে দরবারের কলাকৌশল ব্যাখ্যা করে শোনালুম। কোথায় বাদশা বসতেন, উজীর, কোথায় আমীরেরা, কোথায় রাজদূতেরা, কোথায় বা সাধারণ দর্শকেরা দাঁড়াতেন, এই সব।

মেশোমশাই বললেন : ইতিহাস তো আমরাও পড়েছি, কিন্তু তুমি এই সব শিখলে কোথায়? আমাদের দেশে তো শুধু পাঠ্যপুস্তক। পড়বার জন্যে রাজনৈতিক ইতিহাস। এসব তুমি জানলে কি করে? যা বর্ণনা দিলে তাতে মনে হচ্ছে যেন সবকিছু তোমার চোখের উপর ভেসে উঠছে।

বললুম : কষ্ট করে এ-সব সংগ্রহ করেছি অনেকদিন ধরে। মধ্যযুগের ইতিহাসের নৃশংসতা, বিলাস, আড়ম্বর, প্রাচুর্য, বেদনা, হাসি-কান্না, আমাকে এত আকর্ষণ করেছিল যে, পাঠ করে করে অনেকটাই জেনেছি তার। এ জন্যে অবশ্য ট্র্যাভেলারদের অ্যাকাউণ্টস আর original ফার্সী ইতিহাসের ইংরেজী translation-এর মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে।

সুনীলবাবু বললেন : সে তো বুঝতেই পাচ্ছি। বেশ ভাল। তুমি এ যুগের উপর কাজ করে যাও, দেখ কিছু নতুন দিতে পার কিনা। মধ্যযুগের ইতিহাসের অন্তর্নিহিত প্রকৃত সুরটা যেন এখনো পাঠ্যপুস্তকে ফুটে ওঠে নি।

দরবারের কাছ দিয়েই পথ। ও পথ দিয়ে বাইরে যাওয়া যায়। অঞ্জনা আর মিনুর দিকে তাকিয়ে বললুম : আগ্রা দুর্গ দেখা শেষ। ওধারে মিলিটারী ছাউনী, যাওয়া যাবে না। দর্শকদের জন্য এইটুকুই। এই রাস্তা বাইরে চলে গেছে। কি করবে?

বীরেনদা বললেন : চল, বাইরে যাই।

অঞ্জনা বলল : না, আর একটু ভেতরে ঘুরে আসি।

আমি বললুম : ইতিহাসের পাথরগুলোতে বড় মায়া ছড়ানো অঞ্জনা। যতই দেখ, নয়ন ভরবে না আর।

অঞ্জনা বলল : তা হোক, আর একবার দেখে আসি চল।

—চল।

আবার সবাই খাস মহলে ফিরে গেলুম।

মাথার উপর দুপুরের রোদটা ভালই উঠেছে। অথচ খাস মহলে স্নিগ্ধ একটা হাওয়া।

অঞ্জনা বলল: এই জলভেজা বাতাসটা কোথা থেকে আসছে?

আমি বললুম: এই মহলের নিচে ফাঁপা। অনেক ঘর আছে সেখানেও। নিচে যমুনা থেকে হাওয়া আসবার ব্যবস্থা আছে। দেখ খেয়াল করে, হাওয়াটা যেন নিচে থেকে আসছে। তাই মনে হয় না?

ওরা একটু খেয়াল করে বলল: হ্যাঁ।

—এর নিচে অনেক গোপন কক্ষ আছে। ঐ দেখ, সরকারি নোটীশের বলে কক্ষগুলো বন্ধ। ঐ যে বন্ধ কুয়োর মত দেখছ, ওখান দিয়ে নিচে যমুনাতে নামা যেত। ওখান থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে বরাবর যমুনার ঘাটে।

অঞ্জনা বলল: এস, খাস মহলের অলিন্দে দাঁড়াই। এখান থেকে যমুনা আর তাজমহলকে তাকিয়ে দেখি।

আমি বললুম: তোমার এই ইচ্ছেটা আমি আগেই বুঝতে পেরেছি।

অলিন্দের একেবারে ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম আমরা সকলে। নিচে যমুনার জল। যমুনার বাঁকে শুভ্র তাজমহল।

অঞ্জনা বলল: সন্তুদা, আগ্রা দুর্গের তো তুমি তেমন গল্প করলে না? দিল্লীর মত আগ্রাতেও কি কোন কাহিনী ছিল না?

বললুম: ছিল নিশ্চয়ই। কেন থাকবে না।

—মনে পড়ছে তোমার?

—পড়ছে। কিন্তু গল্পের চেয়ে দিন শেষের একটি বিষন্ন বেদনার কথাই আমার মনে পড়ছে বেশী। আগ্রার ঐশ্বর্যই দেখলুম আমরা। কিন্তু এর দেয়ালে দেয়ালে যে গুমরে মরছে একটি ব্যর্থ কান্না, তাতো শুনি নি। সেই কান্নার কথাই মনে পড়ছে আমার।

সাগ্রহে সকলেই আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: এই দুর্গেই শাজাহান শেষ জীবনে বন্দী ছিলেন, জান তো?

—হ্যাঁ।

—ডি, এল, রায়ের 'শাজাহান' পড়েছ অঞ্জনা?

—পড়েছি, কেন?

—সেই মহম্মদকে এই আগ্রা দুর্গেই সাম্রাজ্যের লোভ দেখিয়েছিলেন শাজাহান। এই অলিন্দে বসে সিক্ত নয়নে তাজমহলের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছেন তিনি, আর শুনেছেন একের পর এক করুণ দুঃসংবাদ: দারার মৃত্যু, মুরাদের শিরচ্ছেদ, সুজার পলায়ন। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়, নিজেকেও সহ্য করতে হয়েছে দুঃসহ যন্ত্রণা, নিজেরই পুত্রের হাতে। সেই হাহাকারই আগ্রা দুর্গের করুণ কাহিনী, অদৃশ্য সেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি।

সামুগড়ের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দারা আগ্রা এলেন। দেখা করলেন না পিতার সঙ্গে। শাজাহান অনুরোধ করে পাঠালেন শেষ দেখা দিয়ে যাবার জন্যে। লজ্জায় দারা দেখা করলেন না। প্রিয়তম পুত্রের জন্য দৌলতখানা অবারিত করে অর্থ দিলেন পিতা। দারা পালালেন দিল্লীর দিকে। পেছনে পেছনে মুরাদ আর ঔরংজীব এসে ছাউনি ফেললেন নূরমঞ্জিল বাগিচায়। দুর্গদ্বার বন্ধ করে দিলেন শাহজাহান। পুত্রের সেনাবাহিনী পিতাকে দুর্গে ঘিরে দাঁড়াল। কিন্তু দুর্গদ্বার খুললেন না কিছুতেই শাজাহান। অবশেষে যমুনার দিকে খিজিরী ঘাট বন্ধ করে দিলেন ঔরংজীব। জলের অভাবে দুর্গে উঠল হাহাকার। পুত্রের কাছে করুণ আবেদন জানালেন পিতা পত্র লিখে: হে আমার বীর পুত্র, ভাগ্যের বিরুদ্ধে হাত নেই। আল্লার ইচ্ছাতেই আমি আজ বন্দী। গতকাল আমি ছিলুম নয় লক্ষ সৈন্যের অধীশ্বর। আজ তোমার কাছে এক কলসী পানির ভিখারী। হিন্দুদের প্রশংসা করি, তারা মৃতকেও পানি দিতে কার্পণ্য করে না, অথচ তুমি আমার পুত্র। তুমি বিচিত্র মুসলমান। তোমার পিতাকেও পানির অভাবে কষ্ট দিচ্ছ।

কিন্তু সে অবেদনে পুত্রের মন গলল না। দুর্গ না খোলা পর্যন্ত জল নিতে দিলেন না তিনি। শুধু নির্মম উত্তর দিলেন: এ আপনার কৃতকর্মের ফল।

দুর্গ খুললেন পিতা এই অশ্বাসে যে, শাজাহানকে ঔরংজীব অমর্যাদা করবেন না। কিন্তু দুর্গে ঢুকেই ঔরংজীব বন্দী করলেন পিতাকে। শৃঙ্খল পরালেন না, কিন্তু বাইরে যাবার অনুমতি থাকল না শাজাহানের। চতুর্দিকে বসল সশস্ত্র প্রহরী। অনুমতি ভিন্ন বাইরে বা ভেতরে যাবার উপায় নেই কারো। অসুস্থ শাজাহানের জন্য হেকিম নিতেও ঔরংজীবের অনুমতির প্রয়োজন। শাহজাদী জাহান আরা ঔরংজীবের সঙ্গে দেখা করে বিরোধ মেটাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ফল হল না। আসন্ন অমঙ্গলের আশঙ্কায় শাজাহান প্রস্তাব করলেন: ভাইয়ে ভাইয়ে সাম্রাজ্য ভাগ করে নাও। শুনলেন না ঔরংজীব। ঔরংজেবের পুত্র মহম্মদ নজরবন্দী করেলেন বৃদ্ধ সম্রাটকে।

দারার জন্যে উদ্বেগাকুল শাজাহান। কিন্তু সংবাদ পাবার উপায় নেই। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত শুধু নিজের মনের মধ্যে গর্জাতে থাকলেন তিনি। ঔরংজীব স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, দারার সংবাদ নেবার চেষ্টা করতে পারবেন না সম্রাট।

সম্রাট বললেন: আমার পুত্রের সংবাদ আমি নেবই।

প্রত্যুত্তরে সম্রাটের ভৃত্যদের সাবধান করে দিলেন ঔরংজীব এই বলে যে, বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করলে তাদের দেওয়া হবে মৃত্যুদণ্ড। সম্রাটের হাতের কাছ থেকে লেখনী পর্যন্ত সরিয়ে নেওয়া হল। পুত্রের এই নির্মম ব্যবহারে শুধু অসহায়ের মত কাঁদলেন শাজাহান। ঔরংজীবকে জানিয়ে দিলেন: তোমারও পুত্র আছে, একথা মনে রেখ।

ঔরংজীব উত্তর দিলেন দুর্গের মধ্যে হাত বাড়িয়ে।

আগ্রা দুর্গের প্রত্যেকটি গৃহ, প্রকোষ্ঠ, শাজাহানের সঞ্চয়ে পরিপূর্ণ। বন্দী

অবস্থায়ও মাঝে মাঝে নিজের হাতে এসব খুলে দেখেন তিনি। চাবি রাখেন নিজের কাছে। মাঝে মাঝে কাঁদেন। এ সমস্ত তো তিনি দারার জন্যে রেখেছিলেন। অথচ সে দারা আজ কোথায় কে জানে।

ঔরংজীব হুকুম জারি করলেন: আগ্রা দুর্গের সমস্ত ঐশ্বর্য রাষ্ট্রের। শাজাহান আর খুলে দেখতে পারবেন না। চাবি কেড়ে নিলেন তিনি।

শাজাহানের সৃষ্টির মধ্যে ময়ূরাসন একটি। সস্নেহে তাকে আগলে রাখেন বৃদ্ধ সম্রাট। ঔরংজীব ময়ূরাসন দাবি করে পাঠালেন। শেষ বারের মত ময়ূরাসনটিতে হাত বুলিয়ে দেখবার ছলে দুটো হীরে আর পান্না খুলে রাখলেন সম্রাট। কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন।

দারার সতেরো লক্ষ টাকার গহনা ছিল পিতার কাছে। ঔরংজীব তাও দাবি করে পাঠালেন। প্রতিবাদ করলে বল প্রয়োগের ভয় দেখানো হল। কিন্তু এতেই শেষ নয়। ঔরংজীব বলে পাঠালেন: আপনার কাছে একশত খণ্ড মুক্তা আছে। মহামূল্যবান দর্পণ আছে। আপনার অঙ্গুরীতে মূল্যবান হীরক আছে। আমাকে পাঠিয়ে দিন। বল প্রয়োগের ভয়ে সবই সমর্পণ করলেন সম্রাট। শুধু হাতের অঙ্গুরীতে যে হীরক খণ্ড আছে তা খুলে দিলেন না। ঔরংজীব গুণে গুণে দেখলেন, সেই অঙ্গুরী নেই। সেই অঙ্গুরীর জন্যে হুকুম পাঠালেন তিনি। বলে দিলেন, না দিলে জোর করে খুলে নেওয়া হবে। অশ্রুসিক্ত চোখে আপন হাতের সেই অঙ্গুরী খুলে দিলেন সম্রাট। দেবার সময় বলে দিলেন: নামাজ পড়বার সময় এই অঙ্গুরী আমি ব্যবহার করি, ঔরংজীবকে বলো।

ধর্মের দোহাই শুনে অবশেষে অঙ্গুরীখানা ফিরিয়ে দিলেন ঔরংজীব।

দারার হারেম আগ্রা দুর্গে। ঔরংজীব পত্র লিখলেন তাদের পাঠিয়ে দিতে: 'আপনি এখন বৃদ্ধ। নর্তকী আর গায়িকাতে আপনার প্রয়োজন নেই। ওদের আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।' দারার গচ্ছিত জেনানাদের অসহায়ের মত ঔরংজীবের কাছে সমর্পণ করলেন শাজাহান।

তবু কিছু সম্মান ছিল বৃদ্ধ সম্রাটের তখনো। প্রহরী ছিলেন নিজেরই পৌত্র মহম্মদ। এবার তার জায়গায় এল খোজা মুতামদ। সম্রাট হলেন লাঞ্ছিত। বৃদ্ধ সম্রাটের চটি ছিঁড়ে গেছে। চটি চেয়ে পাঠালেন। চার টাকা দামের এক জোড়া সাধারণ চটি পাঠিয়ে দিল মুতামদ। বীণার তার ছিঁড়ে গেছে। সারাই করতে দিলেন। বীণা আসে না। তাগাদা দিলে মুতামদ জানালো: বন্দীর আবার বাদ্যের সখ কেন। এবার বৈদ্যের খোঁজ করুন।

একদা ভারতের সম্রাটকে কিনা একজন খোজা করল অপমান।

ক্রুদ্ধ হয়ে শাজাহান পুত্রকে তিরস্কার করলেন: তুমি আমার পুত্র নও।

ঔরংজীব উত্তর দিলেন: যতক্ষণ আপনি শাসনকর্তা ছিলেন, আমি অবাধ্য হই নি।

এবার আমি শাসক, আমাকে মানুন। আপনি বিজ্ঞ হয়েও আল্লার কাজকে মানুষের বলে ভুল বুঝছেন। আল্লার ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করুন, শান্তি পাবেন।

শেষে আল্লার কাছেই আশ্রয় নিলেন বৃদ্ধ সম্রাট। কি করবেন? দারা তখন নিহত, মুরাদ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত সুজা পলাতক। আর তো কিছু নেই তাঁর!

সুখ ছাড়লেন, স্বাচ্ছন্দ কাড়লেন, হাতে নিলেন কোরাণ।

এত ব্যথাতেও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন না সম্রাট। শুধু বললেন: মহান আল্লা! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

কোরাণ পাঠ করেন। কোরাণ আলোচনা করেন বাদশা। একমাত্র সঙ্গী জাহান আরা। পিতাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে জাহান আরাও ধরলেন ধর্মের পথ। দরবেশ মিঞা পীরের কাছে দীক্ষা নিয়ে সব ত্যাগ করলেন তিনি।

ধীরে ধীরে স্থবির হয়ে গেলেন সম্রাট। আকাঙ্ক্ষা থাকল না আর কোন। নিষ্পলক দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে দেখতে লাগলেন তাজমহলকে।

ইতিমধ্যে একদিন তেল মালিশ করে জ্বর হল। ভালও হলেন। কিন্তু নিভবার আগে শেষবার জ্বলে ওঠার মত। চুয়াত্তর বছর বয়স হয়েছিল। ঘাত প্রতিঘাতে অবশিষ্ট ছিল না কিছু আর।

শেষে আর উঠে বাইরে এই অলিন্দেও আসতে পারতেন না তাজমহলকে দেখতে। দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এল। শ্রবণ বধির। জাহান আরা বললেন: ঔরংজীবকে ক্ষমা করে যান পিতা। স্মিত হাস্যে ক্ষমা করে চোখ বুজলেন সম্রাট। চলল কোরাণ পাঠ। বৃদ্ধ সম্রাট শেষ বাণী উচ্চারণ করলেন: হে খুদা, ইহলোক ও পরলোকে তুমি মঙ্গলময়। দোজখের অগ্নি থেকে আমাকে রক্ষা কর।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন শাজাহান।

জাহান আরা ঔরংজীবের কাছে সম্রাটের মৃতদেহকে শোভাযাত্রা সহকারে তাজমহলে নিয়ে যাবার জন্যে অনুমতি চাইলেন। অনুমতি মিলল না। নীরবে অন্তরঙ্গ কয়েকজন আত্মীয়ের কাঁধে চেপে সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে ভারত সম্রাট শাজাহান এলেন তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর সমাধির পার্শ্বে, পরলোকে মিলিত হবার জন্যে।

থামলুম আমি।

দেখি, ম্রিয়মান নিঃশব্দে সবাই আমার দিকে তাকিয়ে।

অঞ্জনা একটা গভীর দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করল।

আমি বললুম: এবার তাহলে যাওয়া যাক?

অঞ্জনা বলল: সন্তুদা, ইতিহাস যে তলিয়ে গেল? শুধু একটা করুণ দীর্ঘশ্বাস বেঁচে রইল।

মৃদু হেসে তাজমহলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললুম: কিন্তু ঐ দেখ:

প্রেমের করুণ কোমলতা—
ফুটিল তা—
সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।

সুনীলবাবু যেন নিজেকে আর চেক্ করতে পারলেন না। এই মনের মত কথাটাই বুঝি তাঁর সান্ত্বনা। বললেন : অপূর্ব ! এটুকুই সান্ত্বনা সনৎ। তুমি ঠিকই বলেছ।

আগ্রা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলুম। দেখা শেষ। এবার তাজমহল। টাঙ্গা চলল সেই অনবদ্য স্মৃতিসৌধের দিকে। কিন্তু কি এক বিষণ্ন ছায়া যেন অনুসরণ করে চলল আমাদের।

মিনু বলল : কত কৌতূহল, কত উৎসাহ জমিয়ে রেখেছিলুম তাজমহলের জন্যে. তোমার এ গল্প যেন সব মাটি করে দিল। আর যেন সেই প্রাণের সাড়া পাচ্ছি না। যেন যাচ্ছি একটা funeral procession-এ।

বললুম : এই ব্যাথার মন নিয়ে তাজমহলকে দেখাই তো সব চেয়ে বড় সার্থকতা।

সুনীলবাবু বললেন : Exactly so ! তুমি ঠিক বলেছ।

অঞ্জনাকে দেখলুম, সে কেমন ম্রিয়মান। যেন কথা হারিয়ে ফেলেছে।

টাঙ্গা এসে থামলো তাজমহলের বাইরে গেটের সামনে। টাঙ্গা, ট্যাক্সি, বাস, প্রাইভেট কার, সব সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবী এসেছে প্রেমের তীর্থ দেখতে।

টাঙ্গা থেকে নেমে আমরা হাঁটলুম। দুর্গ থেকে তাজমহল দেখা যাচ্ছিল। কাছে থেকে সে আড়ালে। রেড স্যান্ড ষ্টোনের গেট পার হলুম প্রথম।

দুধারে লাল পাথরের ঘর। ভারত সরকার এখন সেখানে এই সব স্থাপত্য সম্পর্কিত অফিস খুলেছেন। সামনে লাল পাথরের দুয়ার বসানো মূল সমাধিসৌধে প্রবেশের পথ। দ্বিতীয় গেট থেকে ঐ দূরে নীল আকাশের পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে শ্বেতমর্মরের স্বপ্ন।

মনে হল ছুটে যাই। দৌড়ে যাই। আর তর্ সয় না। তাজমহল, এই সেই তাজমহল। আমাদের স্বপ্ন, সাধ, আকাঙ্ক্ষা।

দুই ধারে বাঁধানো পথ। ঝাউয়ের সারি। মাঝখানে ফটোষ্ট্যান্ড। তাজমহলের ফটো তুলতে হলে এখানে দাঁড়িয়েই তুলতে হয়। সর্বাঙ্গীণ view নিয়ে তাজমহলকে দেখতে হলেও এখানেই দাঁড়াতে হয়।

দেখব কি, তার আগেই মনের মধ্যে ভয় জাগে—কিছুকাল পরেই যে এ দৃশ্য হারিয়ে যাবে। আগ্রা ছেড়ে আমরা রওনা হব দিল্লীর দিকে। চোখের পলকটাও যেন সময়ের অপচয়। বুঝি এতটুকু চোখের আড়ালে যায় এই ভয়ে আমরা শঙ্কিত। বার্ধক্যের শ্লথ স্রোত এখন সুনীলবাবুর মধ্যে। কিন্তু নিজেকে তিনি যেন ভুলে গেলেন। স্থান কাল পাত্র ভুলে চেঁচিয়ে আবৃত্তি করে উঠলেন :

"হীরা মুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
শুধু থাক

এক বিন্দু নয়নের জল,
কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।"

যেন সুনীলবাবু পাগল হয়ে গেছেন। আমায় চিৎকার করে বললেন: সন্তু! সন্তু! তোমার কি মনে হয়?

বললুম: ভয় পাচ্ছি, যদি চোখের পলক পড়ে!

উচ্ছ্বসিত আবেগে সুনীলবাবু বললেন: সনৎ, সত্যি তুমি কবি।

বললুম: মেসোমশাই নাম মনে পড়ছে না, কে যেন তাজমহল দেখে বলেছিলেন: "a dream in marble, designed by Titans, and finished by jewellers"। সেই সঙ্গে Zoffany-র কথা মনে পড়েছে: it only needed a glass case."

সব কিছু ভুলে সুনীলবাবু আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

অঞ্জনা দেখি মর্মর মূর্তির মত স্তব্ধ, নিষ্পলক-দৃষ্টি।

ঘোর কাটতেই যেন সময় লাগল অনেকটা। এবার এগিয়ে গেলুম, স্পর্শ করে দেখতে হবে। যেন স্বর্গের অনুপম সৌন্দর্যের মধ্যে প্রবেশ করছি।

তাজমহলে কাজ কোথায়? কাজ নেই। যে একটু রঙিন লতাপাতা, তা অর্থহীন। মণিমুক্তা এর গায়ে দিয়ে কি হবে? কোন দস্যুরা তা উঠিয়ে নিয়ে গেছে? যাক। তাজমহল শিল্প নয়, স্বপ্ন। তাজমহলের কৃতিত্ব তার নক্সায় নয়, সেটিং-এ। কে সে মহান শিল্পী, যমুনার তীরে নীল আকাশের পশ্চাৎপটে এমন অতুলনীয় স্থান খুঁজে বের করেছিলেন? তাজমহল, তাজমহল তার ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডের জন্য। পেছন থেকে নীল আকাশ সরিয়ে নাও, তাজমহল নিষ্প্রভ, অর্থহীন। হে অজ্ঞাত শিল্পী, তোমাকে নমস্কার।

তাজমহলের মর্মর চত্বরে উঠলুম আমরা। ঘুরে ঘুরে দেখলুম। অবশেষে পেছনে যমুনার দিকে গিয়ে দাঁড়ালুম। কারো মুখে কথা নেই। নীল যমুনা বয়ে চলেছে। আমি বললুম: জান অঞ্জনা, আর একটি তাজমহল তৈরী করবার ইচ্ছে ছিল শাজাহানের। তিনি ঠিক করেছিলেন, যমুনার ওপারে অনুরূপ আর একটি সৌধ নির্মাণ করবেন। সেখানে সমাধিস্থ হবেন তিনি নিজে। মাঝখানে যমুনার উপর দিয়ে দুটি সৌধকে যুক্ত করবে একটি সেতু।

সুনীলবাবু বললেন: বাঃ! চমৎকার idea! সত্যি, শাজাহান এমন পরিকল্পনা করেছিলেন নাকি?

—হ্যাঁ, মেসোমশাই। কিন্তু তা সফল হয় নি। মানুষের কটি স্বপ্নই বা বাস্তবে রূপ লাভ করে? V. A. Smith তাই সুন্দর করে বলেছেন: সেতু এপার ওপার যুক্ত হয় নি। শুধু মাত্র মাঝে মাঝে সবুজ টিয়াপাখিরা নদীর উপর দিয়ে উড়তে উড়তে প্রদোষের কম্পিত সোনার আলো থেকে পান্নার শারক চুরি করে আকাঙ্ক্ষার

বাণীকে মন্থর জলস্রোতের উপর দিয়ে মৃত্যুর কাছে নিয়ে যায়।" ("except at times a flight of green parakeets, skimming over the surface of the water, emerald arrows stolen from the golden quiver of the twilight a message from desire to death over the waters softly flowing")

সুনীলবাবু বললেন : ইতিহাস দেখি কবির দৃষ্টিকেও হার মানিয়েছে ?

বললুম : ইতিহাসের মধ্যে এক স্রষ্টা-প্রাণ প্রবাহিত। ইতিহাস তাকে না ধরে পারে ?

অঞ্জনা দেখি আজ কেন গম্ভীর। কথা না বলে বার বার তাজমহলের দিকে তাকিয়ে দেখছে।

সুনীলবাবু বললেন : চল, ভেতরটা দেখি।

বীরেনদা, সুনীলবাবু, মিনু, রাঙামাসী, সবাই আবার ওদিকে গেলেন।

অঞ্জনাকে ডাকলুম : এসো।

অঞ্জনা মুখ ফেরালো না। এক মনে তাজমহলের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে।

আমি এগিয়ে গিয়ে ওর মুখের দিকে তাকালুম। একি! অঞ্জনার চোখে যে জল! কেন ?

—অঞ্জনা, তুমি কাঁদছ ?

কোন কথা না বলে, রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিল সে।

শরতে দিনের বেলার আকাশে শ্বেতশুভ্র নির্মল ভাসমান মেঘের মত অঞ্জনা। কিন্তু সেও যে ভোরের মাঠে শিশিরের অশ্রু হয়ে ঝরতে পারে, এ কল্পনাটা আগে আমার আসে নি।

বললুম : কি হয়েছে অঞ্জনা ?

অঞ্জনা বলল : সব কথার কি উত্তর আছে সন্তুদা ? বৃন্দাবনে তোমার কি হয়েছিল ?

সে অব্যক্তভাবের উত্তর আমি দিতে পারব না। কিন্তু অঞ্জনারও কি সেই অতীন্দ্রিয়ের পরশ !

অঞ্জনা বলল : এখান থেকেই আমাদের ফেরার পালা, না ?

—হ্যাঁ।

—ভুলে যাবে কলকাতা গিয়ে নিশ্চয়ই ?

—কি ভুলব ?

—সব কিছুই ?

অঞ্জনা কি বলতে চায়, সেকি আমি বুঝতে পারিনি। সব বুঝি। ভুলব না, ভুলব না কোনদিন তাকে।

বললুম : হঠাৎ নিমন্ত্রণে বেরিয়ে এসে কাশীর স্টেশনে অকস্মাৎ যে মুক্তো আমি

কুড়িয়ে পেয়েছি, তাকে হারাব না কোনদিন অঞ্জনা, হারাবো না। সযত্নে রেখে দেব একথা তুমি নিশ্চয় জেন।

—কলকাতায় গিয়ে, অনুরোধ করলে দেখা করবে না সন্তুদা ?

—কেন করব না ?

অঞ্জনা কি একটু ভাবল। জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল : না, থাক। আর লোভ করব না। এই স্মৃতি সুনির্মল হয়ে আমার মনের মধ্যে থাক, সেটাই হবে বড় পাওনা। কেন যে তুমি অমন করে গল্প বললে, অমন প্রাণের রস ঢেলে...

আমার যেন আর কোন কথা বলবার থাকল না। নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলুম।

অঞ্জনা ডাকল : চল, ভেতরে গিয়ে দেখি।

—চল।

ওধার দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলুম।

বললুম : প্রেমের মন্দিরে ঢুকছি আমরা, না ?

অঞ্জনা বলল : অথচ কি করুণ, না সন্তুদা ?

—আর কি স্নিগ্ধ !

—সন্তুদা, ঐ যে কি বলেছিলে, ওপারে আর একটি সৌধের কথা, গড়া হোল না। এপার ওপার সেতু বন্ধনও হল না। তোমার সেই যে জসিমুদ্দিনের কবিতা—এপারে গোকুল, ওপারে মথুরা, মাঝে যমুনার জল, নীল নয়নের ব্যথা বুঝি হায় বয়ে যায় ছলছল্। প্রেমের সেই বেদনা কোনদিন থামবে না।

বললুম : সে না থামাতেই যে প্রেমের সার্থকতা অঞ্জনা। প্রেম এক অবর্ণনীয় মানব আত্মার লাবণ্য। বিরহের আকুলতার মধ্যে সে বেঁচে আছে। আগ্রা দুর্গ থেকে শাজাহান তাজমহলের শ্বেতমর্মরের গায়ে নিত্য যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন, সেই অস্থির চলমান দৃষ্টির মধ্যে প্রেম লাভ করেছে স্বর্গীয় সৌরভ। অলকা আর রামগিরি পর্বতের মধ্যে নিত্যব্যবধান, তাই তো মেঘদূত ! তাই তো প্রেম বেঁচে আছে। মনে কর সেই মেঘদূতের উপসংহার :

> ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্র নয়ান
> কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান ?
> কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ ?
> কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ ?
> সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে
> মানস সরসী তীরে বিরহ শয়ানে
> রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
> জগতের নদী গিরি সকলের শেষে।

শাজাহান আর মমতাজ পাশাপাশি শায়িত। জালিকাটা ঝরোকার ফাঁকে তাকিয়ে আছি। পাশাপাশি অথচ ব্যবধান আছেই। প্রেমের মধ্যে এ ব্যবধান অনিবার্য।

শিশিরসিক্ত দৃষ্টি অঞ্জনার ; দেখছে পাশাপাশি প্রেমিক সম্রাট দম্পতিকে।

হঠাৎ পাশে শুনি সুনীলবাবুর কণ্ঠ : এই যে সনৎ, তোমরা এখানে ? আসল কবর কিন্তু এটা নয় ! ঐ নিচে, ওখান দিয়ে যাও। সত্যি অপূর্ব !

—তাই নাকি ? কোথায় ?

—ঐ নিচে।

—চল অঞ্জনা, দেখে আসি।

—চল।

নিচে স্নিগ্ধ শীতল জ্যোৎস্নার আলো জ্বালানো। ভূগর্ভস্থ সেই গৃহে হাওয়ার পাখায় জড়িয়ে আতরের ঘ্রাণ। ধন্যবাদ শিল্পকল্পনাকে, যে এই পরিবেশের কল্পনা করেছে তাকে। যেন পৃথিবী ছেড়ে অন্য এক রহস্যময় জগৎ এখানে। যেন দেহ ছেড়ে আত্মার জগতে প্রবেশ করেছি। পাশে অঞ্জনা, আরো কজন ইউরোপীয় পর্যটক। যেন কয়েকটি আত্মার ছায়া, সম্রাট দম্পতির সমাধির চতুর্দিকে ভেসে বেড়াচ্ছি আমরা। চিন্তা যেন দেহাতীত এক লঘু কল্পনায় এখানে পাখা মেলে দেয়। আশ্চর্য সমাধি, আশ্চর্য শিল্পীর প্রেম কল্পনা !

বেরিয়ে এসে অঞ্জনাকে বললুম : যেন ঠিক স্বপ্নের জগৎ থেকে ঘুরে এলুম, তাই না ?

অঞ্জনা বলল : কোন্ শিল্পী এ কল্পনা করেছেন ?

বললুম : ইতিহাসে তা নিয়ে তর্ক আছে। তর্ক থাক। সে শিল্পী, এইটুকুই তার পরিচয়। জগতের সমস্ত প্রেমিকের আকাঙ্ক্ষার যে নিত্য স্বপ্ন, হে মানুষের শুদ্ধ প্রেম, তোমাকে নমস্কার।

অঞ্জনা দেখি, তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিল। আবার কি কান্নার বেগ এসেছে তার মধ্যে ?

সমস্ত মন প্রাণ মেলে, আবার, আবার, আবার দেখলুম তাজমহলকে।

যেতে হবে, কিন্তু যেতে যেন মন চায় না।

বীরেনদা ডাকলেন : চল।

—চলুন।

—মিনু কোথায় ?

—মিনু, মিনু !

ওধারে গিয়ে দেখি, এক মনে সে যমুনার দিকে তাকিয়ে।

—মিনু।

ফিরে তাকাল সে।

—চল।

—চল।

—কি ভাবছিলে ?

—কি ভাবব সন্তুদা ? এই শুভ্র প্রেমের উপর দাঁড়িয়ে ভাবনা যেন লোপ পেয়ে গেছে। শুধু অনুভব করবার চেষ্টা করছিলুম। প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, কি বল ?

—যায় বই কি. শিল্পী তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন।

—চল।

তাজমহলের বারান্দা থেকে নামলুম সবাই।

ফিরছি। কিন্তু চোখ বার বার তাজমহলের দিকে ফিরে তাকাতে চায়।

সেই ফটো স্ট্যান্ডের উপর এসে আবার সকলে ফিরে তাকালুম।

সুনীলবাবু বললেন : সনৎ, কি মনে হচ্ছে তোমার ?

বললুম : এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর তো কিছুই মনে পড়ছে না মেসোমশাই। শুধু ভাবছি—

"হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
সৌন্দর্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কি মালা দুলায়ে
করিলে বরণ—
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে !"

সুনীলবাবু বললেন : তাজমহল দেখবার পর অন্য কিছু দেখা চলে না। বীরেনবাবু যদি নাও বলতেন, তাজমহল দেখবার পর আর এ-যাত্রায় আমি অন্য কিছু দেখতুম না। ফিরে যেতুম। ফতেপুরসিক্রি না দেখার দুঃখ নেই আর। আবার হবে, এবারে আর নয়। কীর্তনের সুর বেজে উঠেছে, আর অন্য কোন গান চলবে না। চল।

—চলুন।

একটা সিক্ত মন নিয়ে সকলে বেরলুম। টাঙ্গায় চাপলুম আবার। আমাদের নিজেদের হৃদয়ের তারই যেন কোথায় ছিঁড়ে গেছে। নীরব আমরা সকলেই। এক অতি দূরাগত বীণার করুণ তান বাজছে সকলেরই হৃদয়ে। আর বৈশিষ্ট্য নেই, ব্যক্তিগত বায়-বায়না নেই।

যন্ত্রের মত আগ্রার একটা হোটেলে খেয়ে নিয়ে দিল্লীর বাসে চাপলুম আমরা ! উদাসীন শূন্য প্রান্তরের মধ্য দিয়ে বাস চলল।

সন্ধ্যা বেলা এলুম দিল্লী।

টিকিট কাটালুম। ঘুষ দিয়ে বসবার এবং শোবার স্থান সংগ্রহ করলুম।

গাড়ী ছাড়ল।

এক রাত, একদিন, আবার রাত।

নির্মম খরাক্লিষ্ট ক্লান্ত পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে গাড়ী চলেছে।

বীণার তার ছিঁড়ে গেছে বুঝি। কলহাস্যের কলতান আর ফুটে উঠছে না। একত্রে চলেছি, তবু যেন বিচ্ছিন্ন সবাই। আসার পথের সঙ্গে এ ফেরার পথের তুলনা চলে না। তখন ছিল সমুদ্রের জোয়ার, প্রবল উচ্ছ্বাসে ভেতরে ঢুকেছি। এবার ভাটা। ক্লান্ত শিথিল গতিতে সমুদ্রযাত্রা। অঞ্জনার সেই তরঙ্গ থেমে গেছে। লছমনঝুলার চপলা তটিনী এখন বঙ্গোপসাগরের মুখে প্রকাণ্ড মোহনা। মিনুও নীরব। সুনীলবাবু আবার তাঁর বই খুলে বসেছেন।

মিনু, বীরেনদা আর রাঙামাসী নামবে সাহেবগঞ্জ। সুনীলবাবুরা যাবেন কলকাতা। আমিও কলকাতা। মিনুদের সঙ্গে সুনীলবাবুদের ছাড়াছাড়ি হবে সাহেবগঞ্জ স্টেশনে। আমার সঙ্গে অঞ্জনাদের ছাড়াছাড়ি হবে হাওড়া স্টেশনে।

ভোরের আভাস ফুটতে চাচ্ছে। রাত সাড়ে তিনটে। আর মিনিট দশেকের মধ্যেই সাহেবগঞ্জ।

হঠাৎ মিনু বলল ঃ সন্তুদা, তোমার টিকিট ?

—আছে পকেটে।

—দেখি !

—কেন ?

—দেখি না।

টিকিট বের করে দিলুম।

মিনু বলল ঃ কলকাতা তোমার যাওয়া হবে না। আমাদের সঙ্গে নামবে এখানে।

—সেকি !

—হ্যাঁ। ওঠ তো, বিছানাটা গুটিয়ে নি।

—কি পাগলামো করছ ? টিকিট যে হাওড়ার ?

—না হয় দুটো টাকা যাবেই। সর।

—মিনু !

—আর কোন কথা বোল না।

আমাব বিছানা গুটিয়ে ফেলল মিনু।

সুনীলবাবু মিনুকে বললেন ঃ চললে মা ?

—হ্যাঁ, মেসোমশাই।

—কলকাতায় গিয়ে আমাদের ওখানে যেও।

—নিশ্চয়ই যাব।

অঞ্জনা কোন কথা বলল না। নীরবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে।

সাহেবগঞ্জ স্টেশনে গাড়ী থামল। তখনো ধূসর অন্ধকার পৃথিবীর বুকে জড়িয়ে। আমরা উঠলুম।

মিনু বলল : অঞ্জনা, চলি, আবার দেখা হবে।

—আচ্ছা।

বীরেনদা, মিনু, রাঙামাসী, ওরা নামল। আমিও উঠে দাঁড়ালুম।

ম্লান হেসে অঞ্জনা তাকাল আমার দিকে : চললে?

আমি কেন নামছি, অঞ্জনা তা জানে। ও কি লক্ষ্য করে দেখে নি মিনুকে?

সুনীলবাবু অবাক হলেন : একি! সন্তু, তুমি নামছ যে! কলকাতা যাবে না?

বললুম : যাবার কথা ছিল। কিন্তু এখানে একটু নামতে হচ্ছে। কাটীহার যেতে হবে।

—আচ্ছা এসো, আমার ওখানে যেও?

—যাব।

অঞ্জনার দিকে তাকালুম। একটা মলিন হাসি তার মুখে।

—চলি অঞ্জনা!

উত্তর নেই। মুখে মলিন ক্লান্ত হাসি, চোখে করুণ চাহনী, অঞ্জনা তাকাল আমার দিকে।

আমি নামলুম।

প্ল্যাটফর্মে মিনুরা দাঁড়িয়ে।

গাড়ী ছেড়ে দিল।

জানালা দিয়ে আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে অঞ্জনা। ওর চোখের কোণে কি শিশির জমেছে?

গাড়ী চোখের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। কি এক করুণ বেদনা অনুভব করছি বুকের মধ্যে। চোখে জল আসতে চায়। দূর থেকে অপসৃয়মান গাড়ীর ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে আসছে। অনেক কিছুই হারালুম, আবার অনেক কিছুই পেলুম।

মিনু ডাকল : সন্তুদা, চল। ঘাট-গাড়ীতে উঠতে হবে।

—চল।

২৫ বছর পরে। নিজেরই রচনার পাতা উল্টে জন্মান্তরিত নতুন মানুষ ২৫ বছর আগেকার সেই দিনগুলোকে পড়ে পড়ে দেখছিলুম। কুলকুণ্ডলিনীকে জাগরিত করতে পেরেছি। Carl Sagan-এর কথামত আমার ভেতর বাইরে চলে এসেছে। জেনেছি জীবন ক্ষণস্থায়ী নয়। সৃষ্টি চিরস্থায়ী না হলেও প্রায় যেন অনন্তপ্রবাহে এগিয়ে চলেছে। আমাদের বিশ্বজগতের ওপারেও জগৎ আছে। আইনস্টাইন-রোজেন ব্রীজের মত Blackhole পার হলেই আরেক বিশ্ব। অনন্তকোটি ছায়াপথ শুধু নয়, বিশ্বেরও শেষ নেই। পৃথিবীতে আমরাই শুধু প্রাণী নই, আরো গ্রহান্তরে প্রাণ

আছে। দীর্ঘ প্রাণের প্রবাহ টেনে নিয়ে কত মানুষকে কতবার আবার এই পৃথিবীতেই ফিরে আসতে হবে। কাউকে জন্ম নিতে হবে ভিন্ন গ্রহে। কেউ ভাসমান থাকবে ষষ্ঠ, সপ্ততলে সূক্ষ্মাত্মা হয়ে। কেউবা মনে করবে হারিয়ে গেছে তুরীয়াতীত নিথর স্তব্ধতায়। কিন্তু সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও যদি মহাপ্রলয়ে মহাশূন্যতার মধ্যে হারিয়ে যায় সংস্কারের আকারে বীজরূপে কিন্তু তার অস্তিত্ব থাকবেই। তারই বেগে আবার ফুটে উঠবে নতুন জগৎ। আবার হয়তো ঘটবে এমনই সব কিছুর পুনরাবৃত্তি। চির নির্বাণ বলতে কিছু নেই। মুক্তি আছে শুধু মাত্র আত্মজ্ঞানের মধ্যে। কিন্তু সেই জ্ঞানের মধ্য থেকে সংস্কারের সূক্ষ্ম বীজকে কোনদিনই নাশ করা যাবে না। এই অনন্ত জীবনের পাশে ২৫ বছর আগের কয়েকদিনের স্বল্প মুহূর্তের ব্যক্তিসত্তায় জড়ানো এই সামান্য একটি ঘটনা বিশ্বচেতনায় নিজেকে আমি যতই জড়াইনা কেন, তা কি একেবারে হারিয়ে যেতে পারবে? য়ুঙের collective unconscious-এর মত বহু সুদূর অতীত থেকে স্বপ্নের মধ্যেও সে কথনও কি ছদ্মবেশ ধরেও বেরিয়ে আসতে পারে না! জন্মান্তর কি পূর্বজন্মের সূত্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া?